আত্ম-দর্শন-যোগ

প্রণেতা

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নিয়ত যোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহ কামিনী বা প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়াছেন একথা বলিতে পারেন না। পরন্তু যাঁহারা জীবন রক্ষার জন্য সামান্য অন্ন মাত্রও গ্রহণ করেন, তাঁহারাও যে একেবারে বহিরর্থে কাঞ্চন-ত্যাগী হইয়াছেন, ইহাও বলা যায় না। বশিষ্ঠাদি মহাযোগিগণ, স্ত্রী, পুত্র পরিবার রক্ষা ও রাজমন্ত্রিত্ব করিয়াও অর্থাৎ বহিরর্থে কামিনী কাঞ্চন পরিবৃত থাকিয়াই যোগ তপস্যা করিয়াছেন। ভোগাসক্তি ও মায়াপ্রপঞ্চ ত্যাগ করিবার জন্যই ব্রতধারণ আবশ্যক। যাঁহারা "কামিনী-কাঞ্চন" বলিতে উহার বহিরর্থই ব্যাখ্যা করিয়া, নিজে নিজকে 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে' অসমর্থ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেন সংসারে থাকিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার ও অর্থ লইয়া স্বধর্ম্মানুযায়ী গার্হস্থ্য বা সংসারধর্ম্মই পালন করুন্ না! সেই গার্হস্থ্যধর্ম্মমধ্যেই সকল ধর্ম্ম ও সকল ব্রতই আছে; অপরন্তু ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরে বিবাহ করিয়া, সন্তানোৎপাদন ও অন্যান্য গার্হস্থ্যব্রত প্রতিপালন না করিলে, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকার জন্মে না। বরং তাহাতে প্রত্যবায় জন্মে। তজ্জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্মে অনাস্তিক্য-বুদ্ধি জরৎকারু মুনিকেও শেষ জীবনে আশুতোষ-কন্যা মনসাদেবীকে বিবাহ করিয়া. পুত্রোৎপাদন করিতে হইয়াছিল। তাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আস্তিকতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি পুত্রের নাম "আস্তিক্য" বা আস্তিক রাখিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেও আত্মজ্ঞানানুশীলন আবশ্যক। নচেৎ অনিত্য সংসারাসক্তি ও মায়াপ্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া মানব ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং পশ্বাচারী হইয়া থাকে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম বড়ই কঠিন ধর্ম্ম বা প্রধান ব্রত। গার্হস্থ্যাশ্রমে সত্য কথন, পরোপকার, অতিথি সৎকার বা সদাব্রত, দান, সদাচার, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কয়েকটি ব্রতই প্রধান অনুষ্ঠেয়। গৃহিগণ সংসার ধর্ম্মের সেবাইত মাত্র। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত ঐহিক

সুখ ভোগের কামনায়, তাঁহাদের কোন কর্ম্মই নাই। পিতৃগণ, ভূতগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধনই তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম ভিন্ন কিছুতেই সংসারধর্ম্মপালন হইতে পারে না। এ নিমিত্ত বালকবালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য বা তদনুরূপ অন্যান্য নানাপ্রকারে ৫।৭।৮।৯।১০।১২ ও ১৪ বর্ষকাল ব্যাপি এক একটি ব্রতানুষ্ঠানে নিয়োজিত রাখিয়া, তাহাদের অন্তঃকরণে ঐ ঐ ব্রতের জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। উহার নামই ব্রত উদ্‌যাপন বা ব্রত প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রব্যবস্থামত এই প্রজ্ঞা বা ব্রত প্রতিষ্ঠাই বিন্দুধারণের প্রধান সহায়ক। এই প্রতিষ্ঠাকর্ম্মদ্বারাই ইন্দ্রিয়-বৃত্তির কামনা নিঃশেষিত হইয়া, তথায় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রজোগুণ-জাত দুর্জ্জয় কাম, মানবদেহস্থ দ্বাদশটি স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে সংসারমোহে বিমুগ্ধ রাখিয়াছে। সুতরাং "বিন্দু-ধারণযোগে" ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম পূর্ব্বক ঐ কামনা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত, মহাসমারোহে ঢাক ঢোল বাজাইয়া ব্রতাদি প্রতিষ্ঠার বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা, কখনই ব্রতের জ্ঞান বা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায়ও তাহাই বলিয়াছেন।

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্॥" ৩য় অঃ

দশ ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধি ইহারা কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়। এই কাম, ইন্দ্রিয়বিষয় দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, সতত দেহীকে বিমুগ্ধ রাখিতেছে। অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ঐ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ "কামকে" জয় কর। সুতরাং অন্ধকার রাত্রিতে কাগজে সূর্য্য অঙ্কিত করিয়া, সূর্য্য

উদয় হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলে যেমন অন্ধকার নাশ হয় না, সেইরূপ বিন্দুধারণযোগে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম না হইলে, ব্রতপ্রতিষ্ঠার বাহ্য অভিনয়ে কখনই অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইয়া ব্রতের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবদ্গীতায়, প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের প্রশ্নেও তাহাই বলিয়াছেন :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" গীতা ২য় অঃ

হে পার্থ! পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন যোগী, মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। যিনি সকল বিষয়ে মমতাশূন্য এবং সেই সেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত ও বিষাদিত না হন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যোগী বা সাধক স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূর্ব্বক আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত বা বশীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিও। অতএব ভগবদ্বাক্যেও আত্ম-জ্ঞান-যোগ বলে ইন্দ্রিয়, সংযম করিবার উদ্দেশ্যেই, ব্রতাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই

রহিয়াছে এবং সেই পৃথ্বীতত্ত্বই সপ্তব্যাহৃতি আখ্য সপ্তলোক ধারণ করিয়াছে, এজন্য উহার অপর নাম ধরিত্রী। এই ধরিত্রীকে প্রাণরূপ বিষ্ণুই ধারণ করিয়া আছেন। (প্রাণোহি ভগবানীশ ইতি) অতএব সেই পৃথ্বীতত্ত্ব, কূর্ম্ম বা বজ্রাখ্যনাড়ী-মধ্যগত চিত্রিণীপথে মনঃপ্রাণ স্থিত রাখিয়া কর্ম্ম করার জন্যই উক্ত প্রকারে দেহস্থির সম্পাদক আসনশুদ্ধিরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া স্থূল ধরিয়া কর্ম্ম করি, কাজেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আত্ম-জ্ঞানবলে মনকে স্থির করাই দেহ স্থিরের সহজ উপায়। একমাত্র মন স্থির হইলেই, দেহ আপনা হইতে স্থির হইবে। আত্ম-দর্শন-যোগে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্রও তাহাই বলেন।

মনঃ স্থৈর্য্যে স্থিরোবায়ুস্ততোবিন্দুস্থিরো ভবেৎ।
বিন্দুস্থৈর্য্যাৎ সদা সত্ত্বং পিণ্ডস্থৈর্য্যং প্রজায়তে॥ যোগপ্রদীপিকা

মনের স্থিরতা হইলেই প্রাণবায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলেই; বিন্দুস্থির হয়। বিন্দু স্থির হইলেই দেহ স্থির হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়।

১৫। যোগবলে সমস্ত জগতের তত্ত্ব জানিবার উপায়।—সমস্ত জগৎ বুঝিতে আমরা সৌরজগৎ বুঝিয়া থাকি, সৌর-জগতে সূর্য্যই মূল, সুতরাং সূর্য্যের উপর সংযমন করিলেই, আমরা সমস্ত জগতের তত্ত্ব জানিতে পারি। যোগীর পক্ষে একমাত্র বহির্জ্জগতের সূর্য্যই ধারণার বিষয় নহে, তিনি অন্তর্জ্জগতের কোন অবস্থায়ই বিস্মৃত হইবেন না। অত্র গ্রন্থে পূর্ব্বে এ সকল বিষয়, বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

১৬। যোগবলে দূরবর্ত্তী বস্তু দর্শন ও দূরবর্ত্তী বিষয় জানিবার উপায়।—আত্ম-দর্শন-যোগ-বলে আমাদের দেহাভ্যন্তরে যে একটি মহাজ্যোতিঃ সন্দর্শন হয়, ঐ

মহাজ্যোতির উপর সংযমন করিলে, স্থূল, সূক্ষ্ম, অব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বস্তু ইচ্ছামাত্র আমরা অবলোকন করিতে সমর্থ হই। দূরে কোন ঘটনা হইতেছে, অথবা কোন বস্তু দূর দূরান্তরে অবস্থিত রহিয়াছে; এমন কি সপ্তসর্গ, সপ্তপাতালস্থ যে কোন স্থানের যে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া সংযমন কর, তাহাই জানিতে সমর্থ হইবে! আমাদের পূর্ব্বতন যোগি-ঋষিগণ সমাধিস্থ হইয়া এই শক্তিবলে ত্রিলোকের যে কোন তত্ত্ব জানিতে অথবা যে কোন বস্তু দর্শন করিতে পারিতেন। কেহ কেহ হৃৎপদ্মস্থ জ্যোতিকেও মহাজ্যোতিঃ বলিয়া ব্যক্ত করেন বটে; কিন্তু যে যোগী আত্ম-দর্শন-যোগে হৃৎপদ্ম ও সহস্রদল এই উভয় স্থানের জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই সেই জ্যোতির তারতম্য বিচারে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহারই সকল সংশয় দূর হইবে।

১৭। যোগবলে শক্তি বা বল আকর্ষণ করিবার উপায়।—আমাদের মধ্যেই অনন্তশক্তি নিহিত আছে, সাধক যোগবলে সেই শক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে যথাবশ্যক শক্তি লইয়া কার্য্য করিতে পারেন। আমরা সাধন-বলে যদি দৈবশক্তি লাভ করিতে পারি এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তবে আমরা সেইরূপ সাধন কৌশলে সিংহ মাতঙ্গের শক্তিও যে লাভ করিতে পারিব, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভগবান্ বশিষ্ঠ, ব্রহ্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া বিনাযুদ্ধে বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যোগবলে দৈবশক্তি লাভ করিয়া আংশিকভাবে সৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্য গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয় ছিলেন। মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, ইন্দ্রজিত যোগবলে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিলেন। মহিষাসুরবধের জন্য স্বয়ং ভগবতীকেও দৈহিকবল বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য অর্জ্জুনকে বল বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আরও

উৎসর্গ-পত্রম্।

আত্ম-দর্শন-যোগপরায়ণ

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মহামান্য প্রধান বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ভাইসচ্যান্সেলার জাষ্টিস্ স্যার **শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** সরস্বতী এম, এ, ডি, এল; এফ, আর, এ, এস; এফ, আর, এস, ই; ডি, এসসি; সি, এস, আই; কে, টি; সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী; বিদ্যাসরিৎসাগর— * * *

মহোদয় করকমলেষু।

মহাত্মন্!

আপনি কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য (চিফ্ জাষ্টিস্) প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করা অবস্থায় বিগত ১৩২৮ সনের কার্ত্তিক মাসে যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার—৺কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" সভার অধিবেশনে শুভাগমন করিয়া সভার মহদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে স্মরণীয়। পরন্তু কিরূপে "আত্মজ্ঞান" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সময়ের স্বল্পতা প্রযুক্ত সে প্রশ্নের [illegible]ত সুযোগ না হওয়ায়, আমার বক্তব্য পশ্চাৎ জানাইতে [illegible]ছিলাম। আপনিও "পুস্তকাকারে" লিখিয়া দিতে [illegible] আপনার সেই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর এবং আমার [illegible]

শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার বিপুল উৎসাহে, আমার জন্মজন্মান্তরীয় সাধনলব্ধ "আত্ম-দর্শন-যোগ" ভাষার সাহায্যে প্রকাশযোগ্য কিয়দংশ মাত্র যথাশক্তি ভাবে "পুস্তকাকারে" লিপিবদ্ধ করিয়া আজ ভবদীয় করে সমর্পণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া কর্ম্মফল একমাত্র সেই আশুতোষ বিশ্বনাথে সমর্পণ করাই শাস্ত্র-ব্যবস্থা; কারণ বারাণসী নাম্নী "আত্ম-দর্শন-যোগ" ক্ষেত্রে মহেশ্বর আশুতোষ বিশ্বনাথই সর্ব্বময়; তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই।

আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় শিবপূজাই (মানসপূজা) "আত্ম-দর্শন-যোগ"। তদ্ধেতু সেই নিত্য অনুষ্ঠেয় মহেশ্বর আশুতোষ-শিবপূজার আদর্শেই মদীয় "আত্ম-দর্শন-যোগ" পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া, বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবের মহাদুর্দ্দিনে আর্য্যসন্তানগণের স্বধর্ম্ম শিক্ষায় একান্ত যত্নশীল—সেই আশুতোষ সদৃশ নরোত্তম আশুতোষ-করে সমর্পণ করিতেছি।

সর্ব্বমঙ্গলদাতা আশুতোষের তৃপ্তির জন্য তাঁহার কত ভক্তগণ নানা ভাবে কত "সাহিত্য"-পূজোপচার তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া, তাঁহার তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমি দরিদ্র; "সাহিত্য-জগতের" উত্তম উত্তম উপচার সংগ্রহ মাদৃশ জনের পক্ষে সম্ভাবনা কোথায়? তবে একটি মাত্র ভরসা এই যে, (পুরাণে উক্ত আছে) আশুতোষ মহেশ্বর, কোন ভক্ত কর্ত্তৃক বিল্বকণ্টকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, তাহাকে "অমর" বর প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও সেই নজীর অনুসরণ পূর্ব্বক অনন্ত-শক্তি ভাবে এই "আত্ম-দর্শন-যোগ" স্বরূপ কণ্টকিত বিল্ববৃক্ষ "সমূলে" উৎপাটন করিয়া আজ আশুতোষের কর লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতেছি। এ ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত ভক্তের নীতি অনুসৃত হইলেও আমি আমার ব্যক্তিগত অমরত্ব লাভের প্রয়াসী নহি। আমি আমার প্রাণাধিক সনাতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অমরত্বই বাঞ্ছা করি। আমার সেই শুভ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে

যাঁহার উৎসাহে, যাঁহার যত্নে, যাঁহার আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের ঐকান্তিক আগ্রহে আমি পরমোৎসাহিত হইয়া "আত্ম-দর্শন-যোগ" স্বরূপ এই বিরাট গ্রন্থ, সেই আশুতোষের করে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি; আমার সেই মাতৃস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার অমরত্বই আমার বাঞ্ছনীয় এবং তাহা একমাত্র বিশ্বনাথ আশুতোষের কৃপাতেই সফল হইতে পারে।

এ ক্ষেত্রে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে "আত্ম-দর্শন-যোগের" সহিত বিল্ববৃক্ষের সাদৃশ্য কিরূপে হইল? তদুত্তর এই যে—বিল্ববৃক্ষ আশুতোষ শঙ্করের প্রিয়। ("সদাত্বং শঙ্কর প্রিয় ইতি") "আত্ম-দর্শন-যোগ"ও সেই শঙ্কর আশুতোষেরই অতিপ্রিয়। বিল্ববৃক্ষ কণ্টকযুক্ত, ত্রিপত্র শোভিত, সুস্বাদু ও সুখদ ফলদাতা, "আত্ম-দর্শন-যোগও" তাহাই। বর্ত্তমানকালে শম-দমাদিভাবযুক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধারণ লৌকিক চক্ষে সুতীক্ষ্ণ বিল্বকণ্টক তুল্য; কেন না ইহা "শ্রবণ" যোগে হৃদয় বিদ্ধ হইলে, জীবের মায়া-মোহ-জনিত অনিত্য-সুখপ্রদ "তমো-রজ" নিষ্কাশন করে। সুতরাং স্মৃতিভ্রংশ আত্ম-বিশ্বাসহীন জীবের লৌকিক চক্ষে ইহা প্রথমে কণ্টকতুল্য সন্দেহ নাই। তৎপর ইহাও ত্রিগুণস্বরূপ ত্রিপত্র বিশিষ্ট, এই হেতু আশুতোষ-যোগানন্দ বর্দ্ধক। জীবের পক্ষে ঐ ত্রিগুণযুক্ত পত্র, "মনন" যোগে ধারণাযুক্ত হইলে, সতত আত্মজ্ঞান-যোগানন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতঃপর "নিদিধ্যাসন" যোগে ইহা হইতে বিল্বফল সদৃশ সুখসেব্য নিত্যতৃপ্ত স্বধর্ম্ম রুচিকর মোক্ষফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং ফল-পত্র-সুশোভিত বিল্ববৃক্ষ-সদৃশ "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশুতোষেরই নিত্যপ্রিয় জানিয়া, মদীয় এই "আত্ম-দর্শন-যোগ" সেই বিশ্ববন্দ্য আশুতোষের করেই অর্পিত হইল। ভাষামাতৃকা "সরস্বতীর" সারস্বতদৃষ্টি "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত হইলে, পুনর্ব্বার আর্য্যদেশ আত্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া, জ্যোতিষ্মান হইবে। আর যদি ইহা অযোগ্য বলিয়া দূরেও নিক্ষিপ্ত হয়,

তাহা হইলেও যতদূরেই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, আশুতোষের বিশ্বময় জ্ঞানরাজ্য ছাড়িয়া ত দূরে পড়িবে না। পরন্তু যে দিকেই নিক্ষিপ্ত হউক, সেই বিশ্বময়ের "বিশ্ববিদ্যালয়" মধ্যেই পড়িবে। তাহা হইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যেহেতু "আত্ম-দর্শন-যোগ" যে কোন রূপে মদীয় "অবিদ্যা-আলয়" হইতে ভবদীয় "বিদ্যা-আলয়" মধ্যে একটু স্থান প্রাপ্ত হইলে, নিশ্চয়ই ইহার শক্তি বিশ্বব্যাপী হইয়া, আমার আত্ম-স্বরূপ সনাতন আধ্যাত্মিকধর্ম্ম; ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানব-সমাজে পুনঃ আত্ম-দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। অলমিতি

৺কাশীধাম,
সত্যযুগাব্দা ৬ই বৈশাখ ১৩৩০ সন

ভবদীয়—
সচ্চিদানন্দ।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী মহাশয়ের যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাধনলব্ধ "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমানযুগে আমাদের দেশে, সাধারণতঃ যোগ-সাধন-তত্ত্ব একরূপ বিলুপ্ত প্রায়; ধর্ম্মকর্ম্ম বলিতে একমাত্র সকাম কর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানই নিত্যকর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। মানসকর্ম্মে পরিপক্কতা লাভ না হইলে, বাহ্যকর্ম্ম নিষ্ফল বা শক্তিহীন। ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিলেও আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হেতু, ইদানীং লোকসমাজের পক্ষে প্রাগুক্ত প্রকার বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করা ভিন্ন যে, অন্য কোনরূপ গত্যন্তর আছে, তাহাও অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। সুতরাং কর্ম্মের নামে অকর্ম্ম অনুষ্ঠানে সমাজ যে বিষবিদুষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এহেন দুর্দ্দিনে পূজ্যপাদ স্বামীজি মহাশয়, তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূত "আত্ম-দর্শন-যোগ" নানাবিধ উপাদেয় যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্র-প্রমাণাদিযোগে লিপিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তমান সমাজের এক গুরুতর অভাব দূরীকরণে প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন। বেদোক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিযুক্তে আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় "শিব পূজার" আদর্শে তিনি দশবিধ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ এবং নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্যলাভের সাধনপ্রণালী সহ, নিত্য প্রয়োজনীয় আরও বহুতত্ত্ব ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া, পুস্তক খানিকে পরমোপাদেয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে এই "আত্ম-দর্শন-যোগ" নিতান্তই আবশ্যক বিবেচনায়,

ইহা সত্বর মুদ্রাঙ্কণ ও সাধারণে প্রকাশ জন্য আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ইহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এতদিনে আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলমনোরথ হইয়া, এই অমূল্যরত্ন "আত্ম-দর্শন-যোগ" সর্ব্বসাধারণের দর্শন পথে যে স্থাপন করিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমরা পরমানন্দিত; পরন্তু ইহাই আমরা প্রচুর লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। গ্রন্থের সূচীপত্রখানা একবার পাঠ করিলেই সকলে বুঝিবেন যে, পুস্তকমধ্যে কি অমূল্যরত্ন নিহিত আছে।

অবশেষে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, এই "আত্ম-দর্শন-যোগ" গ্রন্থের যাবতীয় স্বত্ব, "আত্ম-দর্শন-যোগে"র একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংরক্ষিত। পুস্তকের কাপিরাইট আইনতভাবে তাহার নামে রেজিষ্টারী করিবার জন্য অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রোপ্রাইটারের বিনানুমতিতে এই পুস্তক বা ইহার কোন অংশ স্বাধীনভাবে কেহ মুদ্রিত কিম্বা ভাষান্তরাদি করিতে পারিবেন না। করিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হইবেন।

যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশের জন্য মুদ্রাঙ্কণাদিকার্য্যে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মধ্যে অত্রত্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ কাব্যবিশারদ মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকারে প্রুফসংশোধনভার গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে কোথায়ও কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে, সুধীব্যক্তি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি ১৩৩১ সাল ১৬ই বৈশাখ।

৺কাশীধাম বি, এল, চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স এয়োরবটতলা।	বিনীত— শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বত্বাধিকারীর নিবেদন।

পরমারাধ্যতম মত্তাত শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত "আত্ম-দর্শন-যোগ" হস্তে লইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম। "আত্ম-দর্শন-যোগ" যাহাতে স্বল্পমূল্যে দেশে প্রচার হইতে পারে, সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বামীজি মহাশয় পুস্তকের যাবতীয় স্বত্ব আমাতে অর্পণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে পুস্তকখানি কিঞ্চিৎ কমবেশী পাঁচশত পৃষ্ঠার অধিক হইবে না; সেই অনুমানে কাগজে বাধাই ৩৲ টাকা ও ভাল বাধাই সুবর্ণ অক্ষরে নাম খোদিত ৩৷৹ তিন টাকা আট আনা মাত্র খরচ স্বরূপে ধার্য্য করিয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছিল। তদনুসারে অনেক স্বধর্ম্মপরায়ণ, আত্ম-দর্শন-যোগ পিপাসু ব্যক্তি বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইয়া এই অমূল্য গ্রন্থ প্রচারে আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত ও আশান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ হওয়ায় দেখিতেছি যে, পুস্তকখানি ৫ টী স্তরে অন্যূন ৭১ টী প্রকরণে ৭৫০ পৃষ্ঠার উপরে বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুমিষ্ঠ হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহার্ঘতার দুর্দ্দিনে এতাদৃশ বিরাটগ্রন্থ সৃজন করা অপরন্ত ভাল কাগজে এবং কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের প্রণিধান করা সহজ নয়। বাজার মূল্যে এরূপ ৫টী স্তর (খণ্ড) যুক্ত উপাদেয় বিরাটগ্রন্থ একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকার কমে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অসম্ভব লাভবান্ হওয়ার প্রত্যাশা করিয়া কেহই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই; দেশে

জ্ঞান প্রচারই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এতদর্থে পুস্তকের সহায়তায়, "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রণেতা স্বামীজি মহাশয়ের জন্মস্থান পবিত্র "রত্নপুরে" "সচ্চিদানন্দ-লাইব্রেরী" "যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" ও "যোগেশ্বরী-চতুষ্পাঠী" নামে লাইব্রেরী, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থী হইতেছি। অপরন্তু বহু হিতৈষী ও বন্ধুব্যক্তি "আত্ম-দর্শন-যোগ" হিন্দী ও ইংরাজি ভাষায় মুদ্রাঙ্কণ জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন; এই সকল মুদ্রাঙ্কণাদি খরচ বাদে লাভের কিয়দংশ দ্বারা যাহাতে চিরদিন ঐ সকল মহদনুষ্ঠান পরিচালিত হয়, তদুদ্দেশ্যে স্বধর্ম্মপরায়ণ ও সহৃদয় নরনারীগণের সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য প্রার্থী হইয়া, এই "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত হস্ত প্রসারণ করিতেছি। সকলে যথাশক্তিভাবে ইহার এক বা একাধিক খণ্ড গ্রহণ করিয়া এবং স্ব স্ব বন্ধুবান্ধবগণকে গ্রহণে অনুরোধ করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে দেশবাসীকে স্বধর্ম্মে অনুরক্ত ও আত্মশক্তি বর্দ্ধনের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সফল করিবেন আশাকরি।

"আত্ম-দর্শন-যোগ" অমূল্য গ্রন্থ, সুতরাং তাহার কোন মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া বিনামূল্যেই প্রদান করিব। তদ্বিনিময় পূর্ব্বোক্তভাবে "রত্নপুরে" "সচ্চিদানন্দ-লাইব্রেরী", "যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম" ও "যোগেশ্বরী-চতুষ্পাঠী" ইত্যাদি স্বধর্ম্ম রক্ষা, জ্ঞান প্রচার অনুষ্ঠানের ও পুস্তকের ছাপা খরচ প্রভৃতির সাহায্য জন্য সমর্থপক্ষে আত্ম-দর্শন-যোগ ৫৲ পাঁচ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ৩৲ তিন টাকা মাত্র ভিক্ষা বা সাহায্য স্বরূপে প্রার্থী হইলাম। ভিক্ষার্থে—রিক্তহস্ত প্রসারিত না করিয়া আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত হস্ত প্রসারণ করিলাম। **এতদ্ভিন্ন দয়াপরবশ হইয়া এতদর্থে যে কোন দাতা অতিরিক্ত যাহা প্রদান করিবেন তাহা ধন্যবাদের সহিত পরিগৃহীত হইবে।**

এই পুস্তক প্রকাশে যাঁহারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, আমি সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে, সদাশয় মহাত্মাগণ দয়া প্রকাশে জানাইয়া বাধিত করিবেন, পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।

গ্রাম রত্নপুর।
পোঃ শোলক,
জিলা বরিশাল।
তাং ১৬ বৈশাখ
১৩৩১ সন

বিনীত
শ্রীপ্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
"আত্ম-দর্শন-যোগ" গ্রন্থের
একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

পুস্তকের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কেহ কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে, ৺কাশীধাম যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ১১নং ব্রহ্মপুরী (অহল্যাবাঈ) ঠিকানায় শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্রও লিখিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত—

যোগেশ্বরী-সাধন-সঙ্গীত··· ··· ···যন্ত্রস্থ

ব্রাহ্মণ-গীতা··· ··· ··· ··· "

পুস্তক প্রাপ্তি স্থান—

বাঙ্গালাদেশীয় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

এবং

৺কাশীধাম যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ১১ নং ব্রহ্মপুরী (অহল্যাবাঈ)

৺কাশীধাম বি, এল, চাটার্জ্জি এণ্ড সন্স্, এয়োর বটতলা।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০নং নলগোলা, ঢাকা।

শ্রীপ্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোপ্রাইটার

রত্নপুর, পোষ্ট শোলক, জিলা বরিশাল।

মা—ভগ্নীগণের নিকট "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রচারার্থে—

স্বেচ্ছা সেবিকা শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী ভারতী, ৺কাশীধাম।

পুস্তকগ্রহীতাগণ কি ভাবের পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরিষ্কার লিখিবেন। যাঁহারা ডাকে লইবেন তাঁহাদের ভিঃ, পিঃ খরচ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

শ্রীপ্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্ম-দর্শন যোগের একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

সূচীপত্র।

তৃতীয় স্তর।

দশবিধ নিয়ম।

চতুর্থ স্তর।

পঞ্চম স্তর।

পরিশিষ্ট।

সাধন-সঙ্গীত-সূচী ঃ

আত্ম-দর্শন-যোগ সূচী
সমাপ্ত।

—:*:—

☞ দয়া করিয়া স্বত্বাধিকারীর নিবেদন পত্রখানা একবার পাঠ করুন।

উপক্রমণিকা।

"সূর্পাবদ্দোষানুৎসৃজ্য গুণান্ গৃহ্নন্তি সজ্জনাঃ।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানই একমাত্র অনন্ত। সেই অনন্ত জ্ঞানবারিধির গভীরতম প্রদেশে যে কত প্রকারের অসংখ্য মণিমুক্তাদি বহুবিধ অমূল্যরত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মহর্ষিপাতঞ্জল, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, কণাদ প্রভৃতি বড় বড় ডুবরিগণ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সেই অতলস্পর্শ জ্ঞানার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ পূর্ব্বক এই আর্য্যদেশকে অতুলনীয় সম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাবী বংশধর আর্য্যসন্তানগণের অপ্রণিধান, অযত্ন ও উপেক্ষায়, ক্রমে তাহা অন্তর্হিত, অপহৃত এবং অবশিষ্ট ভাগ দ্রুতগতিতে অদৃশ্য বা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। তন্নিবন্ধন আর্য্যসন্তানগণ কাঙ্গালের ন্যায় আজ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ-কবলিত শুক্তিকেই মুক্তাভ্রমে ভিক্ষার্থী ভাবে তাহাদিগের দ্বারস্থ হইয়া, মৃগ-তৃষিকা-ভ্রান্ত পান্থের ন্যায়, পূর্ব্বগৌরবসহ আত্মশক্তি বিস্মৃত হওয়ায়, অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এবম্বিধ স্মৃতিভ্রংশকর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মহাদুর্দ্দিনে ইহাদিগের আত্মস্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া যাহাতে আত্মদৃষ্টি সঞ্জাত হয়; যাহাতে সেই পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যোগলব্ধ অমূল্য রত্নরাজী, যাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার পুনরাবিষ্কার; যাহা অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার; যাহা স্বগৃহে লুক্কায়িত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও পুনরায়ত্ত হইয়া, অনিত্য-সংসার-মোহজনিত-দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হয়, তন্নিরাকরণার্থ দিব্যদৃষ্টিপ্রদ "আত্ম-দর্শন-যোগ" অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। ইহা মনে করিয়া মদীয়

কতিপয় শিষ্য ও ভক্তবন্ধু, আত্ম-দর্শন-যোগ পন্থা গ্রন্থাকারে প্রকাশ জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। অপরন্তু যাঁহার অন্নে, যাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ও বাৎসল্যে এই দেহ গঠিত, যিনি এতদর্থে ৺কাশীধামে "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা" স্থাপন করিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে, আর্য্যনরনারীগণের আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-বিধানের চেষ্টায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; সেই মাতৃ-স্বরূপিণী যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার অদম্য উৎসাহপূর্ণ একান্ত আগ্রহে, মদীয় জন্মজন্মান্তরীয় অর্জ্জিত প্রত্যক্ষানুভূত "আত্ম-দর্শন-যোগ" যতদূর সম্ভব ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়াছি। যাহা অব্যক্ত তাহাকে বর্ণের দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য; কাজেই কোন কোন স্থলে শব্দার্থগত কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে; সুধীবৃন্দ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্বানুশীলনক্রমে সংশোধনযোগ্য বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ-বৈষম্যে প্রত্যেক মানবেরই রুচি বিভিন্ন, (ভিন্নারুচি হি মানবাঃ) তন্নিবন্ধন জগতের কোন পদার্থই সকলের নিকট সমভাবে সমাদৃত হয় না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বিষয়-পরিগৃহীত, প্রত্যেক বস্তুমধ্যেই ঐ ভাব নিহিত আছে। এ নিমিত্ত কোন পুস্তক পাঠ করিতে হইলেও যাঁহারা সাহিত্যিক, তাঁহারা সাহিত্যের ভাবে; যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহারা ইতিহাসের ভাবে; এইরূপ বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, আয়ুর্ব্বেদিক, অপরন্তু বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব ভাবে পুস্তকের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন ক্ষেত্রেই সকলে সমভাবালম্বী নহেন। "আত্ম-দর্শন-যোগ" আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মৌলিক গবেষণা; গুরুমুখী ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করা ভিন্ন আত্ম-দর্শন-যোগ উপলব্ধি হয় না। গুরূপদিষ্ট শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন

পন্থানুসরণেই "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রত্যক্ষানুভূত হয়। আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা পূজাই "আত্ম-দর্শন-যোগ"। এ নিমিত্ত শিবপূজার আদর্শেই ইহা বিবৃত করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা আত্ম-দর্শন-যোগ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা মননযুক্তে স্বধর্ম্মানুযায়ী নিত্যকর্ম্মরূপ সন্ধ্যা, পূজা বা উপাসনাদির ক্রিয়াযোগে আত্মোপলব্ধি করিয়া, অতঃপর যেন আত্ম-দর্শন-যোগ অথবা যোগাঙ্গগুলির দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হন। অন্যথা কষ্টস্থ-বিদ্যার বিচার বিতর্ক, এক্ষেত্রে পণ্ডশ্রম হইবে।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা জাতীয় শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠাভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষেও "আত্ম-দর্শন-যোগ"ই একমাত্র আদর্শনীয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রিয় শিষ্য—সখা অর্জ্জুনকে নিষ্কাম অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ-মননযুক্তভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী ক্ষত্রিয়োচিত স্বধর্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্যই,"আত্ম-দর্শন-যোগ" বা "বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ" প্রত্যক্ষ করাইয়া, তাঁহার হৃদয় হইতে দেহাত্মবোধ-জনিত অজ্ঞানতা বা অনিত্য-সংসার-মোহ জাত কাপুরুষতা বিদূরিত করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধরূপ কর্ম্মে, আত্ম-জ্ঞানযুক্ত পুরুষকার সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং ভগবদ্গীতায়ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই যে "বিশ্বরূপ-দর্শন" বা "আত্ম-দর্শন-যোগ" বা আত্ম-প্রত্যক্ষের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত সেই উচ্চ আদর্শ বা আত্ম-দর্শন-যোগের পন্থা অনুসরণ না করিয়া শুধু "বর্ণাশ্রম" "বর্ণাশ্রম" বলিয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে না। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পেও "আত্ম-দর্শন-যোগ"ই মূলভিত্তি বা প্রধান অবলম্বন। "নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়"।

"আত্ম-দর্শন-যোগ" সমগ্র গ্রন্থ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পন্থানুসরণে পাঁচটি স্তরে ও প্রায় একাত্তরটি প্রকরণে বিভক্ত হইলেও, প্রত্যেক প্রকরণ-যোগেই যে আত্ম-দর্শন লাভ হইতে পারে, ইহা প্রমাণাদিসহ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

অধ্যবসায় সম্পন্ন কোন সাধক বা যোগী দৃঢ়তার সহিত উহার যে কোন একটি যোগ বা যোগাঙ্গ আশ্রয় করিবেন, সমস্ত যোগাঙ্গগুলিই ক্রমে তাঁহার করতলগত হইবে। গুরূপদিষ্টভাবে "আত্ম-দর্শন-যোগ" অনুশীলন করিলে, সাধক নিশ্চয়ই আত্ম-ত্রাণের সহজপন্থা ও বহুবিধ যোগৈশ্বর্য্য লাভের অধিকারী হইবেন। কিন্তু শ্রবণ-মননাদি-যোগে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি স্তর বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহার পক্ষে যোগসিদ্ধি বা আত্মসাক্ষাৎকার সুলভ হইবে না।

আত্ম-দর্শন-যোগ অল্পশিক্ষিত সাধারণ নরনারীগণেরও যাহাতে সহজ বোধগম্য হয়, তন্নিমিত্ত ইহার ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। গীতা উপনিষদাদি যোগশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত মূল শ্লোকসমূহ যে স্থলে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থলে ঐ মূল শ্লোক যথাযথ রাখিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু যে স্থলে জ্ঞানার্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাদৃশ কোনও কোনও স্থলে মূলশ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া সহজ বোধগম্য জন্য উহার বাঙ্গালা পদ্য গদ্য অথবা সঙ্গীতাকারেও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এ নিমিত্ত তত্ত্বশাস্ত্র প্রচারকগণ সকাশে অবশ্যই কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই। এখন স্বধর্ম্মপরায়ণ পাঠক পাঠিকাগণ, আত্ম-দর্শনলক্ষে "আত্ম-দর্শন-যোগ" পিপাসু হইলে চেষ্টা সফল মনে করিয়া ধন্য হইব।

মৎপ্রণীত "আত্ম-দর্শন-যোগে"র যাবতীয় স্বত্ব মমাত্মজ শ্রীমান্ প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদান করা হইল। তাহার উৎসাহ ও চেষ্টায় গ্রন্থখানি সত্বর মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়া, সর্ব্বসাধারণ মধ্যে স্বল্প মূল্যে প্রচারিত হইলে, আনন্দিত হইব। অলমিতি—

৺কাশীধাম, যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।
৬ই বৈশাখ ১৩৩০ সাল
সত্যযুগাব্দা।
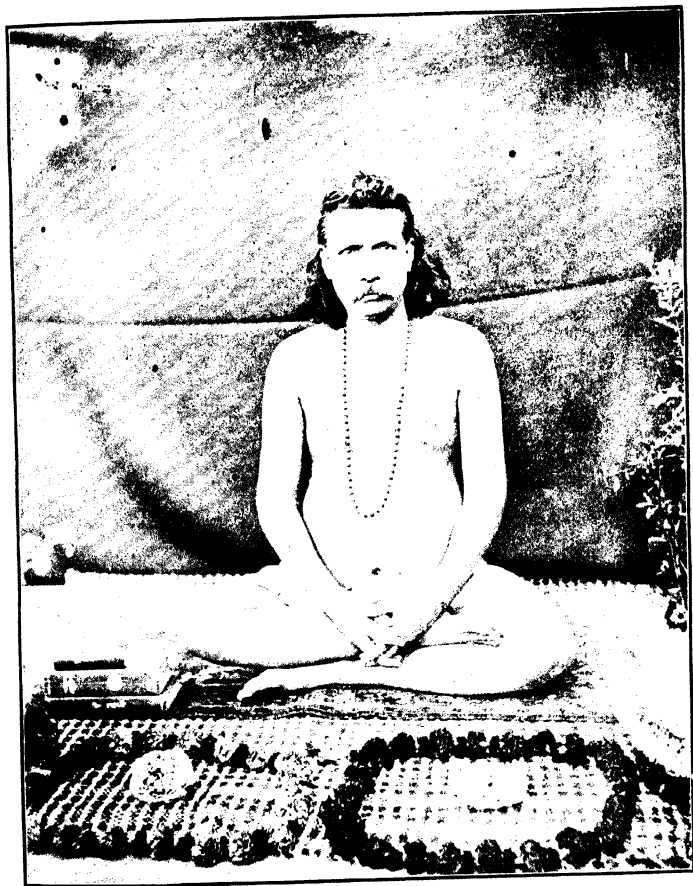
সচ্চিদানন্দ

আত্ম-দর্শন-যোগ

প্রণেতা

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষে বেদানুবর্ত্তী দর্শন ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র মতে আর্য্য সন্তানগণের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিধান যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা প্রণিধান করিলে দেখা যায়, সকলের উদ্দেশ্যই এক, সকল শাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মুক্তি। আত্ম-দর্শন-যোগই তাহার রাজবর্ত্ম। ঐ প্রশস্ত পথের এক প্রান্তে জন্ম-মৃত্যু-জনিত শোক-দুঃখ-ময় এই নশ্বর দেহ বা অনিত্য সংসার, অপর প্রান্তে অমৃতময় অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখ শান্তিপূর্ণ জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় মোক্ষধাম। একদিকে জীবের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অনিত্য বাসনাযুক্ত কর্ম্মজনিত আসক্তি-পরিবেষ্টনী-বদ্ধ মায়ামরু, অপর দিকে অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম প্রসূত নিত্য সুখ সেব্য মোক্ষ ফল প্রসূ শান্তি-পাদপরাজি-পরিশোভিত মুক্ত প্রান্তর, উহার সংসার প্রান্তভাগের নাম অবিদ্যাক্ষেত্র এবং মুক্ত প্রান্তভাগের নাম বিদ্যা বা মুক্তিক্ষেত্র। সুষুম্নারূপী উক্ত রাজবর্ত্মের অবিদ্যাক্ষেত্র হইতে সব্যাপসব্য ভাবে বহু শাখা প্রশাখা (গলি রাস্তা) বহির্গত হইয়া অবিদ্যাক্ষেত্রকে লৌহবর্ত্মাকারে পরিবেষ্টন করিয়া নানাস্থানে মরীচিকারূপ নানা প্রকার

আপাত রমনীয় ভাব ধারণ পূর্ব্বক রাজবর্ত্মগামী অজ্ঞান পান্থগণকে প্রতি নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। সেই মৃগ তৃষ্ণিকায় ভ্রান্তচিত্ত অজ্ঞ জীব, মোহাচ্ছন্ন হেতু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ঐ সকল কুটিল ও সংকীর্ণ পথের অনুসরণে বিপথগামী হইয়া বদ্ধভাবে পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপময় সংসার রূপ অবিরাম চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। আর যাঁহারা গুরুদত্ত আত্মজ্ঞান প্রভাবে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় করিয়া অচঞ্চল ধারণাযুক্ত জ্ঞান দৃষ্টিতে আত্মদর্শন যোগযুক্ত হইয়া গন্তব্য স্থানের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সাধনা বা নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগাভ্যাসে বাসনা কামনার প্রলোভন ও আকর্ষণরূপ সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া অক্ষয় বিমলানন্দ লাভে সমর্থ হন। সুতরাং সেই মুক্তিরূপ চরম লক্ষ্যের অনুবর্ত্তন করাই সাধন ভজন বা সন্ধ্যাপূজাদি নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা।

কিন্তু হায় ইদানীং মানব সমাজ মধ্যে যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি বা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যে তাঁহারা মানব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ মহান্ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। আত্মজ্ঞান হীনতা বা দেহাত্ম বোধই ইহার একমাত্র কারণ। অন্য ধর্ম্ম বা সমাজের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের আর্য্য সন্তানগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী যে সকল উপাসনা বা সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বেদ এবং তন্ত্রই তাহার মূল স্বরূপ। ঐ মূল হইতে কাণ্ড, অনুকাণ্ড, বহু শাখা প্রশাখা সমুদ্গত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল পরিবৃতে বর্ত্তমানে আমাদের স্বধর্ম্ম-রূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্ধেতু আমরা সেই সাধন বৃক্ষের উর্দ্ধ ভাগস্থ মূলের প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মূলস্থ বিন্দুরূপী-মহাকালের ধারণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-আসক্তিরূপ মহাকাল (মাকাল ফল) লোভে শাখা মৃগের ন্যায় শাখায়

শাখায় বিচরণ করিয়া ফলান্বেষী হইতেছি এবং কর্ম্মফলের সার পদার্থ ভুলিয়া কেবল মাত্র খোসা লইয়া টানাটানি করিয়া সমাজশীর্ষ পুরাতন যোগিঋষিগণের বংশজাত দুর্ল্লভ মানব জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা যেরূপ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, আমরা যদি তাহা কিছু মাত্রও উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবে এ অবস্থায় তিলার্দ্ধ সময়ও বৃথা নষ্ট না করিয়া পুনর্ব্বার যাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আদর্শানুযায়ী সাধন-তরু-মূলস্থ সেই ব্রহ্ম বিন্দু লক্ষ্যে গমন পূর্ব্বক ইহ ও পর জীবনের দুর্ব্বিষহ দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের সকলের ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত ভাবে চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? - আমাদের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির একমাত্র পন্থাই আত্ম-দর্শন-যোগ। সমাজে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, জ্ঞানী এবং কৃতবিদ্য, তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে আত্ম-দর্শন-যোগারূঢ় হইয়া অধিকারী বিবেচনায় আত্মজ্ঞান প্রচার দ্বারা যাহাতে বর্ত্তমান মানব মণ্ডলীর অজ্ঞানতা মুলক কুসংস্কার দুর করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তদুদ্দেশ্য সাধনের যথা শক্তি সাহায্য জন্যই এই "আত্ম-দর্শন-যোগ" গ্রন্থের উদ্ভব।

বেদ বা শ্রুতি বাক্যানুযায়ী আত্ম-বিস্মৃত অর্থাৎ দেহাত্মবোধী অজ্ঞানীকে প্রথমেই আত্মজ্ঞান শ্রবণ করাইতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কলির অজ্ঞান জীবকে সেই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করাইয়া আত্মবুদ্ধি উদ্দীপিত করিবার জন্য গীতাচ্ছলে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে আত্মজ্ঞান শ্রবণ ব্যতীত শিক্ষা দীক্ষা কোন কর্ম্মেই ফল লাভ হয় না। ইহা ভগবদ্বাক্য একমাত্র আত্মজ্ঞান বলেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। একমাত্র আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। একমাত্র আত্মশক্তি বলেই জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হওয়া

যায়। একমাত্র আত্মতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব অনুশীলনেই সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ হওয়া যায়। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জানিবার পক্ষে আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন ;—

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্য মবশিষ্যতে" ॥২॥

গীতা ৭ম অধ্যায়।

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত এই মদ্‌বিষয়ক (আত্মবিষয়ক) যে জ্ঞান তাহা বিশেষরূপে বলিব, যাহা জানিলে জগতের আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আরও বলিয়াছেন,

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্" ॥২॥

গীতা ৯ম অধ্যায়।

বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান অতি গুহ্য, বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, কার্য্য দ্বারা আত্মবোধরূপ, ধর্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয়, পরন্তু আরও বলিয়াছেন ;

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি" ॥৩॥

গীতা ৯ম অধ্যায়।

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মের অশ্রদ্ধাকারি-পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া অনিত্য সংসারে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

অতএব সর্ব্বশাস্ত্র সারভূত, কলির জীবের তারকমন্ত্র, ভগবদ্বাক্যরূপ গীতার উপদেশে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের অনুশীলন

করিলে, জগতে আর কোন বিষয়ই জানিবার বাকী থাকে না। যাহা অতি গোপ্য অর্থাৎ অন্তর্নিহিত, এবং বিদ্যা সকলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র ও ধর্ম্মসম্মত, পরন্তু অক্ষয় সেই বিষয়টির নাম "মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান" বা "আত্মজ্ঞান"। এবম্বিধ আত্মজ্ঞানই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। "জ্ঞানং তেঽহংসবিজ্ঞানমিদমিতি" (অহং তে তুভ্যং, সবিজ্ঞানম্, ইদং মদ্‌বিষয়কজ্ঞানং) মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কারণ ভগবদ্‌গীতায় বহুস্থানে "আমি" "আমার" বা মদ্‌বিষয়ক ইত্যাদি ভাবে যে সকল শব্দ উক্ত আছে তাহা ব্যষ্টিগত বা স্থূলদেহের ভাবে যে তিনি বলেন নাই, তাহা যে সমষ্টিগত ভাবে পরমাত্মার ভাবেই বলিয়াছেন, শান্তি গীতায় অর্জ্জুনের প্রশ্নে তিনি স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—

> "দেহাত্মমানিনাং দৃষ্টির্দেহেঽহং মম শব্দতঃ।
> কুবুদ্ধয়ো ন জানন্তি মম ভাবমনাময়ম্" ॥৪॥

শান্তি গীতা ৫ অধ্যায়।

গীতায় "আমি" "আমার" এরূপ শব্দ প্রয়োগ করাতে দেহাত্মবুদ্ধি লোকেরা আমার দেহেতে দৃষ্টি করিয়া আমাকে দেহরূপ জ্ঞান করে। মূঢ় লোকেরা আমার নিত্যশুদ্ধ নির্ব্বিকাররূপ জানে না।

অতএব গীতোক্ত মদ্‌বিষয়ক শব্দে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বা আত্মজ্ঞান বিষয়ক অর্থই বুঝিতে হইবে। তদ্ধেতু এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে সেই প্রকৃত অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান, শ্রবণে জন্মে না, এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; যেহেতু ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, উপদেষ্টা বা গুরু আত্মজ্ঞান প্রথমে বলিয়া বুঝাইবেন; ইহার নামই শ্রবণরূপ শাস্ত্র জ্ঞান; অতঃপর গুরু বা উপদেষ্টা আত্মশক্তি দ্বারা সাধকের ভিতরে

শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক আত্মদর্শন বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইবেন। ইহারই নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অবস্থা দ্বারাই সাধকের মনে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া থাকে, ইহারই নাম মনন এবং সেই বিজ্ঞান অবস্থা জ্ঞানবলে সাধনা দ্বারা আত্ম-প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার নামই নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাঙ্গস্বরূপ ব্রতাদি কর্ম্ম বা অভ্যাসযোগ, পূর্ব্ববর্ণিত গুরুকৃপালব্ধ প্রত্যক্ষানুভূতি বা বিজ্ঞানলক্ষ্যে গুরূপদিষ্ট জ্ঞানযুক্ত নিত্যকর্ম্ম-রূপ অভ্যাস-যোগানুশীলন দ্বারা, কর্ম্মযোগসিদ্ধি অবস্থায়, আত্মদর্শনবলে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে তখনই প্রকৃতপক্ষে যোগের অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ আত্মদর্শনবলে চিত্ত আপনা হইতেই সংযত ও আত্মাতে উপরত হয়। সে অবস্থায় যোগী আত্মজ্ঞান-যোগে আত্মদর্শন করিতে করিতে সচ্চিদানন্দভাবে সতত বিভোর হইয়া ক্রমেই মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে ক্রিয়া দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই কর্ম্ম। মুক্তির উদ্দেশ্যে এই কর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম। জ্ঞানযুক্ত ভাবে এতাদৃশ নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ইন্দ্রিয় সংযম ও মনের একাগ্রতা সম্পাদন হয়। শাস্ত্রমতেও নিত্যকর্ম্মের ইহাই উদ্দেশ্য।

অতএব উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত ভাবে সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। সেই প্রকার নিত্যকর্ম্ম কোন অবস্থাতেই পরিত্যজ্য নহে, তাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়; কিন্তু সেই নিত্যকর্ম্ম যাহাতে যথাবিধানে সম্পন্ন হয়, নিত্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত, মন সতত স্বধর্ম্মানুরক্ত এবং বিবেকবুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, তদুদ্দেশ্যেই সন্ধ্যা বন্দনাদিরূপ নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা। সম্যক্‌প্রকারে ধ্যানযোগে আত্ম-অনুশীলনের নামই সন্ধ্যা। নচেৎ কতকগুলি মন্ত্র বা সংস্কৃত শ্লোক মুখে আবৃত্তি করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিচলিত মনে কোশাকুশি ঠনঠনি ও জল ঢালাঢালি, চিরকাল

দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার ন্যায় অঙ্গবিশেষের পরিচালনাদি দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন, প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে নাসিকা মর্দ্দন বা সেই অবস্থায় নিজের কিম্বা অপরের চক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, জপের পরিবর্ত্তে বিষয়-চিন্তা-নিরতমনে করাঙ্গুলি সঞ্চালন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে প্রকৃতপক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদি বলা যায় না। এই প্রকার কর্ম্ম দ্বারা কখনও অজ্ঞান নিবৃত্তি বা চিত্তশুদ্ধি হয় না ; পক্ষান্তরে এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা কেবলমাত্র শক্তিহীনতা, শ্রদ্ধা ভক্তির হ্রাস ও অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাই বর্ত্তমানে জীব, অবিশ্বাসী, জড়বাদী, নাস্তিক্যমতাবলম্বী হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিয়া, অসংযমী অজ্ঞানজীবকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বাহ্যিক নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করাই এতাদৃশ অধঃপতনের একমাত্র কারণ। যে সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভকালেই প্রাণযজ্ঞ, আচমনের প্রথম মন্ত্রই "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা", "পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা" সে ক্ষেত্রে তাহারা জানে না যে আত্মা বা পরমাত্মা কি ? কোথায় থাকে ? নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি ? আচমনের উদ্দেশ্য কি ? ও ইহার ক্রিয়াশক্তি কি ? এরূপ বাহ্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান যে কেবলমাত্র অন্তঃকর্ম্মের তত্ত্বানুশীলন বা অভ্যাসযোগ, আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া বাহ্য নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান ধরিয়া কেবল 'নিত্যকর্ম্ম' 'নিত্যকর্ম্ম' বলিয়া চিৎকার করিতেছি।

শাস্ত্রমতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম বা প্রত্যাহারই এই বাহ্য নিত্য কর্ম্মানুশীলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। মুক্তিপন্থারূপ যে ক্রিয়ানুশীলন করা হয়, তাহাই কর্ম্মনামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শম দম গুণ বর্জ্জিত বাসনা বা অজ্ঞান অবিশ্বাসযুক্ত যে কর্ম্ম, তাহা অকর্ম্ম, তদ্দ্বারা আত্মার অবনতি ও স্বধর্ম্ম নষ্ট হয়, এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদ-মাৎসর্য্যমেবচ।
এতে মনসি বর্ত্তন্তে কর্ম্মপাশং কথং ত্যজেৎ" ॥৪॥

গর্ভ গীতা।

ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে প্রথম হইতে আত্মবশের চেষ্টা না করিয়া, সন্ধ্যা পূজা, যাগ, যজ্ঞ যতপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বৃথা বা অকর্ম্ম। তদ্দ্বারা শতকোটি জন্মেও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মদ্বারা কখনও অজ্ঞান নিবৃত্তি বা মুক্তি সাধন হয় না।

"কর্ম্মাকর্ম্ম দ্বয়ং সাধোঃ জ্ঞানাভ্যাসঃ সুযোগতঃ॥"

গর্ভ গীতা।

জ্ঞানাভ্যাস হইতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য যে সকল জ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগজনিত, সুতরাং সে সমস্তই অজ্ঞান। এতৎ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—

কর্ম্মনাবাধ্যতে জন্তুজ্ঞানান্মুক্তো ভবাদ্ভবেৎ।
আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোঽন্যথা॥

শঙ্করভাষ্য।

জীবসকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহা আত্মজ্ঞান নহে তাহা অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংযম হয় না। ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংযম না হইলে স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম বিবেকে মন বিশুদ্ধভাবে গঠন বা স্থির হয় না। মন গঠিত বা স্থির না হইলে সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা, ধারণা, ধ্যান, কিছুই স্বধর্ম্মোচিত ভাবে সম্পন্ন হয় না।

দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস, মজ্জা, মনেরই বিকার মাত্র। দেহরূপ কল্পবৃক্ষ ও তাহার শাখা প্রশাখাদি মন-বানরের উৎপাতে সততই এমনভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে যে, তাহাতে ভক্তিপুষ্প ও মোক্ষফল ধরিতে দেয় না। সুতরাং একমাত্র মনকে শান্ত ও শান্তিময় করিতে পারিলেই মোক্ষফল লাভ হইয়া থাকে। বন্ধন ও মোক্ষ মনেরই অধীন। মনোরূপ দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিতে পারিলেই দেহ-কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ হইয়া থাকে। গুটীপোকা যেমন লালা বিস্তার করিয়া বদ্ধ হয়, তাদৃশ জীবরূপ-মন, বাসনা বিস্তার করিয়া বদ্ধ হয়। শ্রীগুরু-কৃপায় নিত্যকর্ম্ম বা সন্ধ্যা উপাসনার ক্রিয়াকৌশলে সেই মনকে আত্ম বা ব্রহ্মসদ্‌ভাব করিতে পারিলেই মন তখন জ্ঞান প্রজাপতি হইয়া বাসনা গুটী কাটিয়া ঊর্দ্ধে উড়িয়া যায়। ইহারই নাম মুক্তি। যখন জীবের চিত্ত বা মন কোন বাসনাজালে বদ্ধ না থাকে, তখনই জানিবে সে জীবন্মুক্ত। জীব নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাসযোগে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই শান্তি বা নিত্যসুখ লাভ করিয়া থাকে। মণিমুক্তা কাঞ্চনাদি জ্যোতির্যুক্ত মূল্যবান রত্নও যেমন কর্দ্দমাদি সংসর্গে জ্যোতির্হীন ও নিষ্প্রভ হয়, চিত্তও সেইরূপ দেহাত্মবাদী অজ্ঞানীর সংস্পর্গে দৈহিক ভোগ সুখেচ্ছাজনিত বাসনায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যরূপ সংযম অভ্যাসযোগে ও সদ্‌গুরূপদিষ্ট অন্তঃকর্ম্ম ক্রিয়া কৌশলযুক্ত প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি প্রত্যাহার ধ্যান ধারণাদি নিত্যকর্ম্মানুশীলনে, ত্রিসন্ধ্যায় সেই মলিন চিত্তকে তপোবলে মার্জ্জিত কর, দেখিবে কোটী কোটী রবি শশী অসংখ্য হীরা মণি-মুক্তা ইত্যাদি জগতের যাবতীয় জ্যোতিরাশি হইতেও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মতেজ বা ভর্গো জ্যোতিঃ ইচ্ছামাত্রে তোমার চিত্তে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিবে। তখন আর ক্ষণকালও তোমার জ্ঞাননেত্র সেস্থান হইতে ফিরিতে চাহিবে না। এই দেহে তখন তুমি জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব ষড়রিপু তখন

মিত্ররূপ ধারণ করিবে। তখন আর এই অনিত্য সংসারের মায়া, মোহ, শোক, দুঃখ, অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, দর্প, অভিমান, কুলশীল, লজ্জা, ভয় আর কিছুতেই তোমাকে বন্ধনে রাখিতে পারিবে না। তখন তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তভাবে বিভোর হইয়া সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, সেই প্রাণাবস্থায় প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষানুভব করিয়া, তাঁহার সহিত অভেদ-রূপে প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া "সোঽহং" ভাবে মিশিয়া যাইবে। জীব! ইহাই নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা উপাসনা লব্ধ ফল। ইহার নামই স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম। আত্মজ্ঞানযোগে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে এতাদৃশ নিত্যকর্ম্মপথে প্রত্যাহারযুক্ত ভাবে পরিচালন না করিয়া কেবল মাত্র বিষয় চঞ্চল মনে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক-আবৃত্তি বা জল ঢালাঢালি বা তীর্থবাস, গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, ব্রত, উপবাস, যাত্রা, দর্শন, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জপ, হোম, কীর্ত্তন ইত্যাদি বাহ্যানুষ্ঠানের ফল কি হয় ভাবিয়া দেখ—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!
তাই ভাবি মনে।"

অতএব বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানলাভ না করিয়া বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুমাত্র ফল লাভ হইতে পারে না। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চাতুর্ব্বিধ সামগ্রী বাড়ীতে রন্ধনশালায় রাখিয়া বাহিরে সদর দরজায় বসিয়া যদি সেই খাদ্যের নাম শ্রবণ বা আবৃত্তি কর, অথবা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহার্য্য সম্মুখে রাখিয়া ঐ আহার্য্য পদার্থ যথাযোগ্য ক্রিয়া দ্বারা রসনাযোগে অন্নবহ পথে উদরাভ্যন্তরে চালনা না করিয়া বাহ্য ভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, গাত্রে বা উদরের বহিস্থচর্ম্মের উপর লেপন কর, তাহাতে কি তুমি ক্ষুধা নিবৃত্তির ফল পাইবে? না বস্তুর আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে, না তদ্দারা তোমার দেহ রক্ষা বা জীবনরক্ষা হইবে?

সেইরূপ যাহারা কেবল মুখের কথায় বাহ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহার ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। পঞ্জিকায় দশ আড়া জল লেখা থাকে বটে, কিন্তু সেই পঞ্জিকা নিষ্পেষণ কর এক বিন্দুও জল পাইবে না। এমতাবস্থায় নিত্য কর্ম্মের গতি উদ্দেশ্যপথে অন্তর্মুখী করিবার জন্য যোগাবলম্বন করিলে নিশ্চয় ঈপ্সিত ফললাভ হইবে। এরূপ বাহ্য নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

কর্ম্মাণি যানি নিত্যানি বিহিতানি শরীরিণাম্।
তেষামাত্মন্যনুষ্ঠানং মনসা যদ্ বহির্বিনা ॥

যে কর্ম্ম আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, বাহ্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সেই সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মের মনে মনে অনুষ্ঠান করার নামই প্রত্যাহার। (অন্যরূপ প্রত্যাহার বিষয়েও যথা স্থানে আলোচনার চেষ্টা করা হইবে)।

নিত্য কর্ম্মে বাহ্যানুষ্ঠানাদির ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি দ্বারা যেন একথা কেহ মনে না করেন যে সকলের পক্ষেই আমি বাহিরের অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতী বা বাহিরের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধবাদী অথবা উচ্ছেদকামী। আমার বর্ণিত বিষয়ের উদ্দেশ্য তাহা নহে। অধিকারী ভেদে কর্ম্মের ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কে প্রকৃত অধিকারী, কে অনধিকারী, তাহা বর্ত্তমানে নির্ব্বাচন করে কে? যাঁহারা নিজেই অর্থ সম্পত্তির অনধিকারী, তাঁহারা অপরকে অর্থ সম্পত্তি কি করিয়া দিবেন; যাঁহারা নিজেই আত্মজ্ঞান বা যোগের অনধিকারী তাঁহারা জগতের সকলকেই অনধিকারী মনে করেন। যাঁহার আত্ম-শক্তির উপর বিশ্বাস নাই, তিনি অপরের শক্তির উপর কখনই বিশ্বাস করিতে

পারেন না। সুতরাং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ বিভাগ বা তাদৃশ প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞান দ্বারা যিনি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়াছেন, তিনি নিয়ত আমার দেহ, আমার হস্ত, আমার পদ, ইত্যাকার ভাবে 'আমার' 'আমার' করিয়াও আমি বা দেহী কে, এবং দেহই বা কি ; আত্ম-জ্ঞান-যোগে তাহার বিশেষ ভাবে অনুশীলনদ্বারা "আত্মপ্রজ্ঞা" প্রতিষ্ঠিত না করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। তদ্ধেতু তাঁহারা দেহাত্মবোধে পার্থিব দেহকেই "আমি আমার" বুঝিয়া থাকেন এবং ব্রহ্ম বিদ্যা বা গীতা প্রচারক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও মানব দেহধারী মনে করিয়া তাঁহার পরমাত্মজ্ঞান, তদ্বর্ণিত গীতায় বহু স্থলে যে, কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ কর', 'আমার শরণাপন্ন হও', 'আমাকে নমস্কার কর', 'আমার রূপ দেখ' ইত্যাদি "আমি" "আমার" শব্দ গুলিও সংঘাত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত ভাব মনে করিয়া গীতার কদর্থই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জীবের দেহাত্ম-বোধরূপ "অহং জ্ঞান" দূর করিয়া ভগবদ্ভাবে আত্মজ্ঞানযুক্ত যোগশাস্ত্র প্রচার দ্বারা স্বধর্ম্মোচিত নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী করাই যাঁহার গীতা প্রচারের উদ্দেশ্য, অজ্ঞতা প্রযুক্ত দেহাত্মাভিমানী মানবগণ সেই ভগবানের বর্ণিত "আমি আমার" শব্দের গূঢ় অর্থ সাধারণ জ্ঞানে কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন ? ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা নর নারায়ণ অর্জ্জুন গুরুকৃপাবশে অজ্ঞানী জীবের এতাদৃশ ভ্রম প্রমাদের কারণ যাহাতে উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্য শান্তি গীতাচ্ছলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
পুরা প্রোক্তস্য তাৎপর্য্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদ ॥"

শান্তি গীতা।

আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহার তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"মাং শব্দস্তত্ত্ব দৃষ্ট্যাতু নহি সংঘাত দৃষ্টিতঃ।
একোহহং সচ্চিদানন্দস্তাৎপর্য্যেণ তমাশ্রয় ॥"

শান্তি গীতা।

আমি যে বলিয়াছি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহার নিগূঢ়ার্থ এই যে, সংঘাত দৃষ্টিতে আমার শরণাপন্ন হও, একথা আমি বলি নাই, স্বরূপ দৃষ্টিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। আমি এক, সচ্চিদানন্দ রূপ, আমার সেই রূপকে আশ্রয় কর এবং সেইরূপে যে আমাকে সর্ব্ব ভূতে দর্শন করে সেই তত্ত্বদর্শী। সুতরাং ভগবানের বাক্যে ইহাই সুসিদ্ধান্ত হইল যে, তিনি দেহাত্মবোধে গীতা বর্ণনা করেন নাই, পরন্তু তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ণিত গুণ-কর্ম্মোচিত ভাবে স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকেও স্বধর্ম্মোচিত নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী করিবার জন্য "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ" ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্তচ্ছলে তাঁহারই সমধর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজর্ষি জনকের আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের আদর্শ প্রদর্শন করান নাই,এবং কৃপাবশে "বিশ্বরূপদর্শন" যোগে পরমাত্মার স্বরূপদর্শন করাইয়াও অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মানুরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনি ঋষিগণোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলেন নাই অপরন্তু তিনি নিজেও রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া স্বধর্ম্মের অনুসরণ এবং অপরকেও স্বধর্ম্মানুরাগী হইবার জন্য চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সেই উচ্চ আদর্শের

মর্ম্ম না বুঝিয়া আজ চাতুর্ব্বর্ণ্যকেই তাঁহার বাহ্য পূজার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া তদ্‌বর্ণিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে কর্ম্মে একাকার করিয়া ফেলিতেছি। আমরা উচ্চবর্ণের বংশধরগণও কিনা আজ তাঁহার বাল্য লীলা ক্ষেত্র গোপীজনপদ-লাঞ্ছিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামের ধূলি বক্ষে মাখিয়া কৃত কৃতার্থ মনে করি। আমরাই কিনা জন্মাষ্টমী ও রাম নবমীর ব্রত করিয়া নন্দ গোপ, যশোদা, কৌশল্যাদির পূজা করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করি না। আমরা সেই কশ্যপ বশিষ্ঠাদির বংশধরগণ কিনা সাবিত্রী ব্রত করিয়া দ্যুমৎ সেন, সত্যবান্ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পূজা এবং মনসা পূজাচ্ছলে লক্ষ্মীন্দর ও চাঁদ সদাগর প্রভৃতি বৈশ্য বনিকের ও নেতা ধোপানীর পূজা করিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। ইহা কি আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ও আত্মজ্ঞানাভাবের পরিচয় নহে? একমাত্র আত্মজ্ঞানের অভাবই কি আমাদের এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ নহে? একমাত্র আত্মজ্ঞানযোগাশ্রয়ভিন্ন আমাদের আত্মোন্নতি বা স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবার আর কি উপায় আছে? এমতাবস্থায়ও কেহ কেহ "আত্মজ্ঞান" শব্দশুনিলেই লাফাইয়া উঠেন অথচ তাহারাও ধূমাচ্ছাদিত অগ্নি, মলাচ্ছাদিত দর্পণ সদৃশ দুষ্পূরণীয় কামনাচ্ছাদিত আত্ম-জ্ঞান-বশে নিয়ত আমি আমার বলিয়া কত অসার স্বপ্নের ঘোরে দেহ বা আত্মার পৃথকত্ব জ্ঞাপন পূর্ব্বক স্মৃতি বিভ্রমে জ্ঞান নেত্রহীন আত্মজ্ঞানের অনধিকারী; অপরকেও তাহাই মনে করিয়া থাকেন। যে জন্মান্ধ সে জগতের অপর কাহারও চক্ষু আছে ইহা কি কখন ধারণা করিতে পারে? যে অসচ্চরিত্র সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহ সচ্চরিত্রের অধিকারী তাহা মনে করিতে পারে না। যে ভাগ্যবান্ নিজে পিতৃ মাতৃগুরু ভক্তির অধিকারী তিনি অপরকেও পিতৃ মাতৃ ও গুরুপদে অচলা ভক্তির অধিকারী করিতে নিয়ত উৎসুক থাকেন। যিনি নিজে প্রকৃত ভাবে আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের সহিত

শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞানের অনুশীলনে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি অপরেও তাদৃশ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে মনে করিয়া স্বীয় পন্থানুসারে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানে যত্নবান হন। যদি স্বভাবজ গুণ ও শ্রদ্ধার অসামঞ্জস্য হেতু বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও উপদেশগ্রাহীকে তত্তুল্য জ্ঞানের অধিকারী করিতে না পারেন, তথাপি আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের শিক্ষা দ্বারা তাহার যৎসামান্য জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকিলেও তাদৃশ স্বল্প জ্ঞান জীবকে অনিত্য সংসারাসক্তি-রূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে। উহা কদাচ বিফল হয় না। ইহা ভগবদ্বাক্য, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ না করিয়া আমরা জগৎকে অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করি। আমরা এমনই অজ্ঞান যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বর্ণ, যাঁহারা জন্ম জন্ম কৃত সুকৃতি বা প্রাক্তন বশে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত ভাবে যাহাদিগকে মাতৃগর্ভাধান হইতে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নাশন, চূড়াকরণাদি স্বধর্ম্মোচিত বিবিধ সংস্কার করণান্তর শেষ উপনয়ন সংস্কারে জ্ঞানের অধিকারী সাব্যস্ত স্বরূপে ব্রহ্মতেজ রূপ গায়ত্রী বা সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভর্গোজ্যোতির উপাসনা বা দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি; পরক্ষণেই আবার তাঁহাদিগকে নিত্য কর্ম্ম রূপে কাম্য কর্ম্মাদিযুক্ত নানা দেব দেবীর বাহ্য পূজাদি ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা হরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে অজ্ঞানী ও নিষ্কাম কর্ম্মের অনধিকারী ও অযোগ্য রূপে প্রতিপাদন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। মহাভারতে শল্য কর্তৃক কর্ণের তেজোবধের বিবরণ আলোচনা করিলে বর্ত্তমান ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্ষেত্রেও অনেক উপদেষ্টাই স্বীয় মুখে শল্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। আমাদের অবিশ্বাস অজ্ঞানতা ও শক্তির অসমর্থতা

হেতু আমরা জ্ঞানীর বংশধরগণকে অজ্ঞানযুক্ত ব্রত, উপবাস, পূজাদি বাহ্য আড়ম্বরে রত করিয়া চিরদিন আত্ম বিস্মৃত ও একমাত্র অজ্ঞানাবৃত কামনা বাসনারূপ পরধর্ম্মাশ্রয়ে প্রতি নিয়ত অজ্ঞান খড়্গে এমনভাবে আহত করিয়া থাকি যে, আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মে পুনরধিকার দ্বারা তাহাদের আত্মার উন্নতি সাধন সুদূর পরাহত হইয়া থাকে। অজ্ঞানীকে জ্ঞানের পথে লওয়াই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নচেৎ অজ্ঞানীর পক্ষে আর মুক্তির সম্ভাবনা কি? জ্ঞানীর মনে করিতে হইবে যে, অজ্ঞানী মুক্তি লাভেচ্ছায় প্রাক্তন বশে মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

এই প্রকারের অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্ম্ম ফল ভোগের অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া জীব দেহাত্মজ্ঞানে সংসার চক্রে প্রেতযোনি, পশুযোনি, নরযোনিতে বিচরণ করে। তৎপর হয়ত কোন সময়ে পুণ্য প্রভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে সংসারানুরাগাদি পাপাশয় বিসর্জ্জন পুরঃসরঃ ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করিয়া শমদমাদি বা ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রভাবে পরমাত্মাকে বিদিত হয়। তখন সে মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মজ্ঞানযোগে এই সংসার গহনে সুগুপ্ত অনন্ত ব্যাপী পরমাত্মাকে যে জীব অভিন্ন ভাবে পরিজ্ঞাত হয় সেই জীব অবিদ্যা জনিত নিখিল সংসার মায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভে অধিকারী হয় এবং অসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকে।

এরূপ অবস্থায় গুরু পুরোহিত বা উপদেষ্টাগণ অজ্ঞান জীবকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বধর্ম্ম

যুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী করিলে, জ্ঞানীর সাহায্যে প্রকৃত পক্ষেই অজ্ঞানীর মুক্তির পন্থা অনুষ্ঠিত হয়। অজ্ঞানীকে স্বধর্ম্মানুরাগী করিবার চেষ্টা কখনই "বুদ্ধিভেদ" বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই অর্জ্জুনের ক্ষাত্রধর্ম্ম বিরোধী বুদ্ধিকে কাপুরুষতা পদবাচ্য করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত স্বধর্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শুনাইয়া আত্মজ্ঞান-যোগযুক্ত অর্জ্জুনকে তাদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ রূপ কর্ম্মে উত্তেজিত করিতেন না। সুতরাং কর্ম্মে নিয়োগের পূর্ব্বেই বর্ণ ও আশ্রমানুসারে স্বধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ, বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে যাহা স্বধর্ম্ম, নিষ্কাম ভাবে তাহাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্যাবধারণে নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; তাহা হইলেই কর্ম্মের গতি ধারাবাহিকরূপে পরিচালিত হইবে। সুতরাং বর্ণ ও আশ্রম ভেদে গুণোচিত কর্ম্ম বিভাগ করিয়া কি কর্ম্ম এবং কি অকর্ম্ম অগ্রে তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥"

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন, অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব। যে কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়, তাদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম বলিয়া ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষ্কাম। এই কর্ম্ম ফলও চারিটি, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এতদ্দ্বারা দেখা যায়, নিত্য কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম। নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল অর্থ, কাম্য কর্ম্মের ফল কাম এবং নিষ্কাম কর্ম্মের

ফল মোক্ষ। এমতাবস্থায় ভগবদুক্ত গীতা-বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যে কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তির আসক্তি দূর হয় তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মই নিত্য কর্ম্মরূপে স্বধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। পরন্তু কাম্য কর্ম্ম যে অপকৃষ্ট তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥"

গীতা ২য় অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞান-যোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি সেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে আশ্রয় কর। ফলকামী মানবেরা কৃপণ অর্থাৎ হেয়। সুতরাং তিনি বর্ণাশ্রম বিভাগমতে ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকেও যখন স্বধর্ম্মানুযায়ী নিত্য কর্ম্মানুরূপ যুদ্ধ, নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করাই মোক্ষপ্রদ বলিয়া, তাহার পক্ষে কাম্যকর্ম্ম অপকৃষ্ট বিবেচনায়, কর্ম্মযোগে অর্জ্জুনকে রজোগুণজাত কামনা পরিহার করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়ান্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥"

গীতা ৩য় অধ্যায়।

হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ কামকে জয় কর, সংসারী ক্ষাত্র-ধর্ম্মাবলম্বী অর্জ্জুনকেও যখন ভগবান্ এতাদৃশ সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞানীর বংশধর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্রবিধানে সুসংস্কৃত ও ব্রহ্মগায়ত্রী উপাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মোচিত নিত্য-কর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক কর্ম্ম বা যোগানুশীলনে অনধিকারী

কল্পনা করিয়া বাহ্যভাবে অপকৃষ্ট কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী করা, ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভোগ সুখে লিপ্ত করা এবং সংযম স্বধর্ম্ম ও মুক্তির পথ রোধ করা কি, ঘোর অজ্ঞানতা বা বাতুলতার পরিচয় নহে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের অজ্ঞানতা ও ভেদবুদ্ধিনাশের জন্যই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"

গুণকর্ম্ম বিভাগে চারিটি বর্ণ ও প্রত্যেক বর্ণের আচরণীয় ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা দ্বারা তিনি জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। তাহা আমরা নিয়ত পাঠ করিয়াও, কেন আমাদের নিত্য অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মে সেই ভগবদ্বাক্য আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করি না? আমাদের আত্মজ্ঞানের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদৈবতপূজনং।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥"

গর্ভগীতা।

মানব সকল বিবিধ শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যয়ন বহুবিধ দেবতার্চ্চনা করুক না কেন, হে পার্থ! **আত্মজ্ঞান ব্যতীত** সমস্ত কর্ম্মই নিরর্থক বা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ভগবদ্বাক্যে এতাদৃশ জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ণাশ্রমবিরোধী অশাস্ত্রীয় একাকার কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না। গুরুতা পৌরহিত্য ও ধর্ম্ম প্রচার, ব্যবসায় পরিণত হইয়া, আজ তাহা এমন অনেক স্বার্থপরের হস্তগত হইয়াছে যে একমাত্র অর্থই তাহাদের ঐহিক পরমার্থ স্বরূপ ভিন্ন, তাঁহারা আর কিছুই যেন জানেন না। তাঁহারা পরিত্রাণেচ্ছুক মানবের স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মের বিরুদ্ধে চতুর্ব্বর্গফলদাতা উপাস্য বা ইষ্টদেবতাকে উপেক্ষা করিয়া ভোগেচ্ছায়

অর্থ সম্পত্তি ও স্বর্গ লাভের কামনায় নানা দেবতার বাহ্য পূজা দ্বারা পরমার্থজ্ঞান নষ্ট করিতেছেন। কিন্তু আমার এই সকল কথায় ইহাও কেহ মনে করিবেন না যে, আমি কতকগুলি শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা একমাত্র অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিবার জন্য জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড হইতে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা বা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদি পরমাত্মবিষয় হইতে পৃথক, অতএব তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং গুণ ও বর্ণাশ্রমভেদে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য দেবদেবীর পূজা বা বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান, পরমার্থ জ্ঞান লাভের পক্ষে ব্যষ্টিগতভাবে সহায়ক এবং উহা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি স্বীকার করি। কিন্তু স্বধর্ম্ম বা আত্ম-জ্ঞানযুক্ত হইলেই ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিক্কতা লাভ হইতে পারে; ভগবান্‌শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন।—

"যুক্তকর্ম্ম ফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকিম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

গীতা ৫ম অধ্যায়।

আত্মযুক্ত ব্যক্তি, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও পরমাত্ম-নিষ্ঠোৎপন্না শান্তি প্রাপ্ত হন, অযুক্ত বা আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কামনা প্রবৃত্তি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বদ্ধ হয় সুতরাং তাদৃশ ভাবে অযুক্ত কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আমরা কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য যে, জ্ঞান ও মুক্তির আদর্শ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। নিষ্কামভাবে যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহা এখন ধারণা করাও আমাদের পক্ষে যেন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বীরবংশোদ্ভব ব্যক্তিরাও বহুকাল যাবৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা না করায় যেমন অস্ত্র ঝনৎকার শুনিলেই কাপুরুষের ন্যায় ভয়ে চমকিয়া উঠে, আমাদের অবস্থাও সেই প্রকার ঘটিয়াছে। এখন আমরা

নিষ্কামকর্ম্মের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠি বলিয়া নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাহীন, চতুর্ব্বর্গফলদাতা ইষ্টদেবতার উপর বিশ্বাসহীন হইয়াছি। স্বগৃহে নানা অমূল্যরত্ন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আত্মবিস্মৃতিবশে আমরা কাঙ্গাল। তাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে পরের দুয়ারে সতত লাঞ্ছিত। আমরা নিজগৃহ-দেবতাস্বরূপ পরমেষ্টদেবতার নিষ্কাম পূজা ও উপাসনা, বিফল ও অপ্রীতিকর মনে করিয়া কুলটার ন্যায় অপর বহুদেবতার নিকট ভোগ লালসা পূরণের আশায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং তাহাদের প্রীতি সাধনে ব্যস্ত বা উৎসাহিত হই। কেহ কেহ আবার এ সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা লোকের স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়া বলেন যে, "সকল দেবতাই এক ; কোন কামনার জন্য বহু দেবতার পূজা করি না। যখন যে দেবতার পূজা করি, সেই দেবতার প্রীতিকামনায় সংকল্প করিয়া থাকি। দেবতার প্রীতি কামনা কাম্যকর্ম্ম নহে।" এস্থলে তাহাদের ঐ সকল অপূর্ব্ব যুক্তির যথাক্রমে এক একটি করিয়া উত্তর দেওয়া স্বধর্ম্মরক্ষার পক্ষে আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি—

যদি সকল দেবতাই এক হয়, তবে একমাত্র ইষ্টদেবই যখন সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী অনাদি অনন্ত পরমাত্ম স্বরূপ, তখন ইষ্টদেবের মধ্যেই সকলকে ধারণা করিতে না পারিলে, তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব নষ্ট করা হয় কি না ? এবং সেই একত্ব ছাড়িয়া চিত্তবৃত্তিকে বহুত্বের সম্মুখীন করায় চিত্ত বা লক্ষ্য স্থির হইতে পারে কি না ? এবং তদ্দারাই ইষ্টদেবের প্রতি লোকের ভক্তি বিশ্বাস শিথিল হইতেছে কি না ? এরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যে সমাধি বা মোক্ষলাভের অযোগ্য তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন—

বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥

গীতা ২য় অঃ।

কামনা বাসনা জন্য বহুদেবতার পূজা করা হয় না, একথাটি নিতান্তই আত্মপ্রতারণা। যেহেতু, কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য উৎপত্তি হয় না। যদি একের ভিতরেই সব পাই, তবে বহুর কাছে কেন যাই। যাহারা মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয় প্রলোভনে আসক্ত থাকিয়া বাহ্যিক সংযম বা স্বধর্ম্মপরায়ণতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ তাহাদিগকে মিথ্যাচারী কপট বলিয়াছেন, যথা—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

গীতা ৩ অঃ।

বর্ণাশ্রম বিভাগ মতে একমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ঈশ্বর বা দেবতা প্রীতি কামনায় যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান হয় তাহাও কাম্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। একথাও স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—

কামসংকল্প-সংত্যাগাদীশ্বর-প্রীতিমানসাৎ।
স্বধর্ম্মপালনাচ্চৈব শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বয়াৎ॥

শান্তিগীতা ৩য় অঃ।

ঈশ্বর প্রীতি সাধন মানসে কামনা ও সংকল্পাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্তচিত্তে স্বধর্ম্ম পালনার্থ কর্ম্ম করিবে। সুতরাং এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কখনও চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধিই যখন বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী নিশ্চয়ই তাহার অনুকুল নহে, কারণ তাহা হইলে জীব কখনই ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থাহীন, আচারানুষ্ঠানে অসংযতচিত্ত, শোক, দুঃখ, মায়া, মোহে অভিভূত হইয়া ক্রমেই এতাদৃশ অবনাতর পথে ধাবিত হইত না। কেহ কেহ একথা শুনিয়া, বলিয়

থাকেন যে, এ কলিকাল, রাজা বিধর্ম্মী, কাজেই হিন্দুধর্ম্মের এই পতন অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। ইহা বড়ই হতাশের কথা। হতাশ অপেক্ষা উন্নতির প্রধান অন্তরায় আর কিছু নাই। এক সুস্থদেহ মানবকে যদি কেহ বলে যে, তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে সে জীবনাশায় হতাশ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুর কবলাধীন হইয়া পড়ে। একজন মেধাবী ছাত্রকে যদি বলিতে থাক, তুমি অকর্ম্মণ্য মেধাহীন, তাহা হইলে সে পড়াশুনায় কখনই কৃত-কার্য্য হইতে পারিবে না। বরং হতাশের অবস্থাতে আশার বাণী শুনাইয়া মনের বল বৃদ্ধি করিতে হয়। তান্ত্রিক সাধকদের মতে রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিলে, সহজেই সিদ্ধি লাভ হয়। এই বিশ্বাসে শ্মশানে যাঁহারা সাধনা করিতে বসেন, তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য ভবকাণ্ডারী সর্ব্বভয়ত্রাতা গুরুদেব স্বয়ং উত্তর সাধক থাকিয়া উচ্চশব্দে 'মা ভৈঃ' 'মা ভৈঃ' রবে সতত অভয়বাণীতে তাঁহাদের ভীতি দূর করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাধনায় সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। আর আমরা শিষ্য যজমানকে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ সারথি শল্যের ন্যায়, শিষ্য যজমানের কর্ম্ম বা দেহ-রথের সারথিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ ফল দিতে না পারিয়া "কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্মের কোন ফল নাই" ইত্যাদি বলক্ষয়কর হতাশবাক্যে শিষ্য যজমান প্রভৃতির বিশ্বাস, দৃঢ়তা, ভক্তি নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা পাপ বা নরকের ভয় দেখাইয়া এবং রাজৈশ্বর্য্য স্বর্গলাভের প্রলোভন দিয়া জীবকে সতত কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত করি, কিন্তু তদ্দ্বারা যখন কর্ম্মফলরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রাপ্ত-হেতু স্বধর্ম্মাচারী হইল না, তখন "কলিকাল" "ম্লেচ্ছ রাজা" এই সকল কথা বলিয়া আমরা নিজ নিজ অজ্ঞানতা ঢাকিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। তখন আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখি না যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের মধ্যে অল্প সময়ে কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ, কলিযুগের মত অন্য তিন যুগে

ছিল না। কলিতে ষাটহাজার বৎসর ব্যাপী যোগ তপস্থার প্রয়োজন হয় না। স্নুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন যুগের স্থায় কর্ম্মাড়ম্বরতারও আবশ্যক দেখা যায় না। কালও যেমন কলি, কার্য্যও তেমনি সহজ; এ জন্য দেবগণও অল্পেই মুক্ত হইবার ইচ্ছায় কলিতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিপথগামী হইয়া থাকেন। **কলি বলিতেই আমরা পাপ কলি না বুঝিয়া, যদি সত্য বিকাশের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থা মনে করি, তবে নিশ্চয়ই বুঝিব যে সত্যের উপরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত। এ পাপ কলি নহে, সত্যেরই কলি।** ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া, কলির মধ্যাবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিলেই সত্যের ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দে বিভোর হইব এবং আমরা এই কলিতে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মুক্তি আমাদের অদূরবর্ত্তী মনে করিয়া নিজকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিব। মনোবৃত্তিকে বহির্মুখ রাখি বলিয়াই ত্রেতা ও দ্বাপরের তুলনায় আমরা নিজেকে ক্ষুদ্র, অকর্ম্মণ্য, অধর্ম্মাচারী মনে করিয়া, শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি। আত্ম-জ্ঞানযোগে ঐ **মনোবৃত্তিকে ঘুরাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিলেই,** সেই অলৌকিক সত্য জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া নিজকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাবস্থায় কোটি কোটি রবি শশী অপেক্ষাও জ্যোতিঃবিশিষ্ট হিরণ্ময় ব্রহ্মজ্যোতিঃতে সত্য ও তেজোময়রূপে দেখিতে পাইব। স্নুতরাং **আমাদের লক্ষ্যস্থল ও অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ত্রেতা দ্বাপরের আদর্শনীয় নহে, সত্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্যস্থল।** এমতাবস্থায় পুরাণ অথবা স্মৃত্যুক্ত বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানকে আমরা প্রবল বলিয়া গণ্য না করিয়া সত্যের ক্রিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানকে যতই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিব, ততই

আমরা কলি ছাড়িয়া শীঘ্রগতিতে "সত্যে" উপনীত হইব। সুতরাং **সংসার চক্রকে আমরা সত্যের সম্মুখীন ভাবে পরিচালিত না করিয়া, পশ্চাদ্ভাবে দ্বাপর ও ত্রেতার আদর্শে পরিচালিত করিতে যাইয়াই বিপথগামী হওয়ায়, অজ্ঞানান্ধকার-রূপ বিপদে পড়িয়াছি।** এ সময়েও যাঁহারা প্রাঙ্মুখে সত্যের উষালোকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পশ্চান্মুখে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন যামিনীতে 'কলি' 'কলি' বলিয়া চিৎকার পূর্ব্বক দিশাহারা হইতেছেন, তাঁহাদিগের মোহাপনোদন ও আত্মস্মৃতি লাভের জন্য একটু স্থিরভাবে চিন্তাকরিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে, বর্ত্তমান কলিকালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ব্রহ্মবিদ্যা বা গীতা প্রচার এবং সপ্তমবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গী কর্ত্তৃক রাজা পরীক্ষিত শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন ও তৎপুত্র রাজা জন্মেজয় সর্পসত্র করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত যজ্ঞাহুতি দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সমস্তই কলিকালের ঘটনা।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষানামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥"

রাজতরঙ্গিনী।

কলির ৬৫৩ বৎসর গতে কুরুপাণ্ডবেরা বর্ত্তমান ছিলেন এবং তৎসময় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর এই কলিকালেই বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ নরপতি আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমরা পঞ্চগোত্র যাঁহাদের বংশধর, সেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন "হাতি বাঁধা শুষ্ক গজারীগাছ"। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণের মৃতসঞ্জীবনী আশীর্নির্ম্মাল্য স্পর্শে সজীব হইয়া অদ্যাপিও ঢাকা জেলার

অন্তর্গত "রামপাল" গ্রামে দেদীপ্যমান অবস্থায় আমাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আজ যে নিতাই চৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেমভক্তিতে দেশপ্লাবিত, তাহাও বর্ত্তমান কলিকালের অদূরবর্ত্তী ঘটনা। এই উনবিংশ, বিংশ শতাব্দির মধ্যেও বিশ্ববিশ্রুত মহাভাগ ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিশ্ববন্দ্য বিশুদ্ধানন্দ, তাপসশ্রেষ্ঠ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, পাহাড়ী বাবা প্রভৃতি আরও কত অপরিজ্ঞাত ঋষিতুল্য জীবন্মুক্ত পুরুষগণের অলৌকিক শক্তির মহিমা সাধারণ্যে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও কি কলির অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে? ইহা সত্ত্বেও যাহারা কলিকালের দোহাই দিয়া হতাশবাণী প্রচার করেন, তাহাদের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, কলি কোথায়? বাহিরের কলিকে রাজা পরীক্ষিত নিগ্রহ করিয়া, চারিটি স্থান মাত্র তাহার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যথা—দূতক্রিয়াক্ষেত্র, বেশ্যালয়, শৌণ্ডিকালয়, ও স্বর্ণকার বিপণি। এ সব স্থান ত সাধারণের গন্তব্যক্ষেত্র নহে, সুতরাং কলি জীবের ভিতরে। এই ভিতরের বহিরাসক্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনামক কলিকে দমন করার নামই পুরুষকার বা সাধনা। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রকে এই জন্যই বার বার পুরুষকার অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষকারই সাধকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। পুরুষকারের নিকট কখনই হতাশ আসিতে পারে না; সুতরাং সাধনসমরে স্বধর্ম্ম বা আত্মরক্ষার জন্য গুরুদত্ত আত্ম-জ্ঞানরূপ পুরুষকারকে সহায় করিতে পারিলে, পাপ কলি বা বিধর্ম্মী রাজার ভয়েও সিদ্ধিলাভে হতাশ হইতে হয় না। বিধর্ম্মী রাজা চারিযুগেই ছিল, তজ্জন্যই দেবাসুর বা আর্য্য অনার্য্যজাতির নিত্য সংঘর্ষ আমরা ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাই। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

"ন্যূনৈরপি শত্রৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ॥"

মহারাজ সুরথ যখন প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় যথা শাস্ত্র পালন করিতেছিলেন এমন সময় "কোলাবিধ্বংসী" নামক শূকর খাদক যবনরাজগণ কর্ত্তৃক তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং ইত্যাকার অসুর দানব ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিধর্ম্মী বা অনার্য্য জাতির রাজত্ব কালে যে ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, ইহা নিত্য পুরুষ-কারাবলম্বী ব্রাহ্মণোচিত বাক্য নহে, মুসলমান রাজত্ব কালাপেক্ষা বর্ত্তমান বিধর্ম্মী রাজগণের সময় স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম আচারানুষ্ঠানে ও যথা শাস্ত্র শিক্ষা দীক্ষায় কোন রূপ বাধা প্রতিবন্ধক নাই। পক্ষান্তরে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সহানুভূতি আছে। আমরা ভোগ সুখের লালসায় প্রাচীনাদর্শে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা ছাড়িয়া তাহাদের দুয়ারে "তীর্থ কাক" হইতে যাইব, অর্থ লোভে অনার্য্য সন্তানকে সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে যাইব, ইহা আমাদেরই ধর্ম্ম শিথিলতা। তাহারা এ সম্বন্ধে কোন অত্যাচার বা আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী নহে। এখনও দেশে হিন্দু নরপতি এমন অনেক আছেন, যাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য বহু অর্থ ও বহু দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দিয়া আসিতেছেন। জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ধনিগণকে এ বিষয়ে একবারে কৃপণ বলা যায় না। ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও গুরু পুরোহিতের বৃত্তি অদ্যাপিও শাস্ত্র বাক্যানুসারে নির্দ্ধারিত আছে। আমাদের অজ্ঞানতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অসমর্থতা এবং স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস হেতু এতাদৃশ আত্মাবনতির জন্য, ক্রমে আমরা অপরের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের স্বার্থ পূর্ণ ভ্রষ্টাচারে, জীবন-উপায় ও আত্ম-সম্মান নষ্ট হইতেছে। নিরপেক্ষ বিচারে তজ্জন্য আমরাই দায়ী, বিধর্ম্মী রাজার উপর দোষারোপ করা কাপুরুষতা মাত্র। এখনও তীর্থাদি স্থানে ধনী, রাজা, জমিদারগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মানুরক্তির পরিচায়ক, দান ও ক্রিয়া কলাপ যাহা নিত্য অবলোকন করিতেছি, তাহার অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র ব্রাহ্মণ ফল

ভাগী। আমি বাঙ্গালা দেশে এরূপ অনেক স্বধর্ম্ম পরায়ণ ও দানশীল নরপতি জমিদার, তালুকদার দেখিয়াছি যে, স্বধর্ম্ম রক্ষায় তাঁহারা মুক্ত হস্ত। এতৎ সম্পর্কে সর্ব্ব প্রথমে আমি বাঙ্গালার গৌরব স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির বর্ত্তমান বংশধরগণের কথাই উল্লেখকরিতেছি। তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা অনুরাগ, স্বধর্ম্মে অবিচলিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সতত আমার প্রাণে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ৺কাশী নরেশ ও দ্বারবঙ্গাধিপতি মহোদয়গণেরওস্বধর্ম্ম পরায়ণতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ময়মনসিংহের প্রায় অধিকাংশ জমিদারই এই দান ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত। গৌরীপুর, রামগোপালপুর, ভবানীপুর, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর, মুক্তাগাছা, আমবারিয়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কাহার নাম রাখিয়া কাহার নাম উল্লেখ করিব? মুক্তগাছার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়কে আমি বিষয় ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত বলিয়াই জানি। তাঁহার স্বর্গীয়া জননী মহাবিদ্যা স্বরূপা "বিদ্যাময়ী দেবীর" এবং ভগিনী ব্রহ্মময়ী স্বরূপিনী "ব্রহ্মময়ী দেবীর" আচারানুষ্ঠান, দান, ধর্ম্ম, দয়া সরলতার কথা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে শাপ ভ্রষ্ট দেব দেবী স্বরূপে অদ্যাপিও আমি দর্শন করিয়া অশ্রুধারায় বিগলিত হই। এতদ্ভিন্ন "রাণী ভবানী" মহারাণী "অহল্যাবাই" "রাণী শরৎসুন্দরী" মহারাণী "স্বর্ণময়ী" প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে সমস্ত বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতি পালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণ সেই দানের এক বিন্দুও উচ্ছেদ বা আত্মসাৎ করেন নাই। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বৃদ্ধিই করিতেছেন। নাটোর, পুঁটিয়া এবং বর্ত্তমান কাশীমবাজারাধি-পতির কার্য্য কলাপ প্রণিধান করিলে অনেকেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অবশেষে আমার এই নশ্বর দেহের জন্মস্থান বরিশাল রত্নপুরের ভুস্বামীগণের স্বধর্ম্মপরায়ণতার কথাও কর্ত্তব্য বোধে উল্লেখ করিতেছি।

তাঁহারা ও বাঙ্গলার অন্যান্য স্বধর্ম্ম পরায়ণ রাজা জমীদার গণের ন্যায় ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠায় বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর প্রদানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এমতাবস্থায় কলিকাল, বিধর্ম্মী রাজা ইত্যাদি বাক্যে সমাজে হতাশ সঞ্চার না করিয়া, যোগবাশিষ্ঠের উক্তি মতে পুরুষকার-রূপ আত্ম-জ্ঞানাবলম্বনে স্বধর্ম্ম উদ্দীপিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব যে কলির পরমায়ু শেষ হইয়াছে। যাহারা চাটুপ্রিয়, বিলাসী, ধনী ও জমিদারের ন্যায় অজ্ঞান তিমিরে আবৃত অর্থাৎ যাহারা পৃথ্বিতত্ত্বে বা মূলাধারে থাকিয়া লজ্জা, ভয়, কুল-শীল, দম্ভ, দর্প, অহঙ্কারাদি মায়া কর্ত্তৃক অষ্টপাশে বদ্ধ, যাহারা বহির্ম্মুখী পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি সপ্ত সমুদ্ররূপ প্রকৃতির তম অংশে পরিবেষ্টিত ও যাহাদের কুলকুণ্ডলিনী বা জীবাত্মা, তাদৃশ মায়া মোহে অচৈতন্য, সুষুম্নামুখ বা জ্ঞানদ্বার যাহাদের অবরুদ্ধ, তাহারাই প্রকৃত কলি অবতার। আত্ম-জ্ঞানযুক্ত গুরুদত্ত মহামন্ত্র শক্তিতে মায়া মোহের অষ্টপাশছিন্ন ও কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য করিয়া শক্তিসঞ্চালনে তাঁহাকে সুষুম্নাস্থ জ্ঞানমার্গে পরিচালন করিলেই সত্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে এবং কলি সত্যের সন্তাপে অন্তর্হিত হইবে।

ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করিলে আমাদের নিত্য পাঠ্য সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারময়ী গীতা যাহা অবিসংবাদিত রূপে সর্ব্ব সাধারণে সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহাতে বর্ণ, আশ্রম, গুণ ও শ্রদ্ধা বিভাগে ধর্ম্ম কর্ম্মের বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু **কলিকাল বিভাগ করিয়া কোনরূপ কর্ম্মের বিভাগ করা হয় নাই।** এমতাবস্থায় পৌরাণিক যুগের অতীত কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অবিচলিত-চিত্তে সত্যপথ প্রদর্শক গীতা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি নির্ভর করিলেই আমরা সহজে কলির প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গুরূপদিষ্ট রূপে ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব ভুতাশয়স্থিতঃ।"

আমি সর্ব্ব ভূতেই আত্মারূপে স্থিত। অতঃপর আরও বলিয়াছেন।

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"

আমি সমুদায় প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করিতেছি। চণ্ডীতেও তাহাই বলিয়াছেন—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।"

সকলের মধ্যেই তিনি বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন। পরন্তু

"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥"

যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী, অর্থাৎ নিয়োগ কর্ত্রী সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তি রূপিনী দেবীকে নমস্কার করি। সুতরাং ভগবদ্বাক্যে বা শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে চণ্ডী ও গীতার প্রমাণে ভগবৎ-শক্তি যে আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন; সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি। এমতাবস্থায় পাপ কলি, বা কলিকালের ভয়ে আমাদের হতাশ হইবার কারণ কি? আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে কলিকালরূপ মিথ্যাপাপসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপে "আমিই ভগবান্" দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে ইহা ধারণা করিতে হইবে এবং যখন যখনই ধর্ম্মের হানি, অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখনই সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হওয়াই আমাদের মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য; এই জ্ঞান রাখিতে হইবে। সুতরাং আমরা জ্ঞানীর বংশধরগণ নিজ নিজকে ভগবানের অবতার স্বরূপ মনে করিয়া আসুন্ পাঞ্চ জন্য নির্ঘোষে, আমরা কায়মনোবাক্যে ঘোষণা করি যে,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তাহা হইলেই "**আত্ম-দর্শন-যোগ-প্রভাবে**" পাপ কলি পরাজিত ও ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের এই মানবদেহ ধারণের সেই মহান্ উদ্দেশ্য যাহাতে যথাযথরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারি; ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে সেইরূপ ভাবে আত্মস্মৃতি, আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তি লাভের প্রচেষ্টাই **আত্ম-দর্শন-যোগ** গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমাদের সন্ধ্যা, পূজা বা উপাসনাদি নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলি সমস্তই মানস ক্ষেত্রের কর্ম্ম; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ মানসক্ষেত্রেরই কর্ম্ম, সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এবম্বিধ অষ্টাঙ্গ যোগ-অনুষ্ঠানদ্বারা মানসক্ষেত্র সুগঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বাহ্যকর্ম্মের অধিকার জন্মে না। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ ও তন্ত্রমধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এ নিমিত্ত বৈদিক দীক্ষা যেমন মানসকর্ম্ম, তান্ত্রিক দীক্ষাও সেইরূপ; সমস্ত দেবদেবী পূজার প্রথমেই মানসপূজা আচার্য্য বা গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। মানসকর্ম্ম সাধন-পরিপক্কতা লাভে, আত্ম-প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বাহ্য-পূজায় অধিকার জন্মে। মানস-পূজা যেমন, আত্ম-পূজা বা আত্ম-দর্শন-যোগ, বাহ্য-পূজাও তদ্রূপ সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ। অন্তর ব্যষ্টি, বাহ্যসমষ্টি; আমাদের নিত্য-অনুষ্ঠেয় শিবপূজা মধ্যেই অষ্টাঙ্গযোগ, অন্তর-বাহ্য বা ব্যষ্টি সমষ্টির মূলতত্ত্ব স্বরূপ আত্ম-দর্শন-যোগ অন্তর্নিহিত আছে। তদ্ধেতু অষ্টাঙ্গ-যোগ-

যুক্ত "শিবপূজার আঁদর্শে," আত্ম-দর্শন-যোগের উপায়স্বরূপ এই "আত্মদর্শন-যোগ," স্বধর্ম্মপরায়ণ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানপিপাসু নর-নারীগণের যোগদৃষ্টি আকর্ষণ জন্য অভিনবভাবে বিরাট বপু পরিগ্রহ করিয়া আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার্থে বহির্গত হইতেছে। সহৃদয় আর্য্যসন্তানগণ এতৎপ্রতি আত্ম-জ্ঞান-যোগ দৃষ্টিপ্রদ অনুকম্পা প্রকাশ করিলে, অবশ্যই ইহার শক্তি ক্রমে দীপ্তস্মানভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্থূল, জ্যোতিঃ, সূক্ষ্ম, যিনি যেরূপ দৃষ্টিতে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি সেইরূপভাবেই আত্ম-দর্শন-যোগে, আত্ম-প্রতিবিম্ব বা আত্ম-দর্শন করিয়া আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠা ও বিবিধ প্রকার যোগৈশ্বর্য্য লাভের নিশ্চয় অধিকারী হইবেন। আত্ম-দর্শন-যোগে শাক্ত, বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নাই; জাতি, বর্ণ কিম্বা সাম্প্রদায়িক দলাদলি নাই; **আত্ম-দর্শন-যোগ, আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠারই একমাত্র রাজবর্ত্ম।**

আত্ম দর্শন যোগ

প্রথমস্তর

প্রথম প্রকরণ।

আত্ম-দর্শন-যোগ ও তাহার উপায়।

আত্মদর্শনযোগই আত্মদর্শনের উপায়, যোগ শব্দের দার্শনিক অর্থ— চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং আভিধানিক অর্থ— "উপায়"। যোগ শব্দের অর্থবাদ সম্বন্ধে বহু সংজ্ঞা পরিদৃষ্ট হয়। (যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধঃ) চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করাই যোগ, (নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে) "নিশ্চিন্তই যোগ ;"—(সমত্বং যোগ উচ্যতে) "সমত্বই যোগ" (যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্) সুকৌশলং (যৎ) কর্ম্ম (তদেব) যোগঃ, "সুকৌশল কর্ম্মই যোগ," ইত্যাদি (১) প্রকার কতকগুলি যোগ সূত্র "যোগ" লাভের পন্থা বা "উপায়" স্বরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "যোগ" শব্দের একটি বিশেষ অর্থও আছে, যদ্দারা য়োগ শব্দের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, সেই অর্থটি সার্ব্বভৌমিক ; জীব যে অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সংসার বা অবিদ্যা ক্ষেত্রে নিপতিত, অনিত্য মায়া মোহে বদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কবলাধীন হইয়া আত্ম-বিস্মৃতি-বশে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,

---

(১) যোগ-সূত্র সম্বন্ধে যথা স্থানে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে।

জীবের সেই স্বাভাবিক **"আত্ম মুক্ত"** **অবস্থার নাম** **"যোগ"** এবং তাহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তদর্থে "যোগ"ই-ধর্ম্ম, (২) যে ক্রিয়া কৌশলে সেই স্বধর্ম্ম বা "মুক্ত" অবস্থা লাভ হয় তাহার নাম, "উপায়," এই অর্থে চিত্তবৃত্তি নিরোধাদি সূত্র গুলি যোগ লাভের "উপায়" স্বরূপে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" (তৎ + ত্বং + অসি) মহাবাক্যের অর্থ বোধে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের ঐক্যরূপ "অহংব্রহ্মাস্মি" "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান (আত্ম-জ্ঞান) দ্বারা "আত্ম-সাক্ষাৎকার" অর্থাৎ জীব চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের পৃথক ভ্রান্তি পরিহার করিয়া নিজেকে একমাত্র, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য-স্বরূপ পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভাবে ধারণাই যোগের বুৎপত্ত্যর্থরূপ স্বধর্ম্ম। অতএব যে উপায়ে বা কৌশল অবলম্বনে জীবের সেই পরম ধর্ম্ম স্বরূপ "যোগ" বা "আত্ম-সাক্ষাৎকার" সংঘটিত হয় তাহার নাম **"আত্ম-দর্শন-যোগ"**।

আত্মদর্শনযোগ নামটী শুনিয়াই কেহ যেন ভীত না হন এবং এরূপ মনে না করেন যে উহা সংসারাশ্রম বা স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ-মূল-বাসী হওয়ার উপদেশরূপকৌশলপূর্ণ বাক্যজাল অথবা কেবল আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুশীলনের শাস্ত্রস্বরূপ কতকগুলি একঘেয়ে সংস্কৃত শ্লোকের কচকচি মাত্র। এই অনুমান করিয়া কেহ যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। আত্ম-দর্শন-যোগ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় মৌলিক গবেষণার উপায় মাত্র। সত্য-অনুসন্ধিৎসা, মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং সেই সত্য বা ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্যই কর্ম্মের উদ্ভব। যে ক্রিয়া, ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত-ভাবে মানবজাতিকে সেই লক্ষ্য স্থলে যাইবার সহায়তা করে, তাহার নামই কর্ম্ম। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ ভাবেই উহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। লক্ষ্য স্থির থাকিলে সমস্ত বিষয়

---

(২) তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। পাতঞ্জলদর্শন সঃ।

বা পদার্থের মধ্যেই সেই সর্ব্ব-মূলাধার আত্মার অনুভূতি হয়। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে সামান্য পরমাণু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যেই যে তাঁহার অলৌকিক শক্তি বিদ্যমান আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু প্রথমতঃ নিজদেহমধ্যে সেই শক্তির অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই, আত্মজ্ঞানরূপ দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হয়। তখন সেই আত্ম-জ্ঞানরূপ দিব্যচক্ষুর দৃক্‌শক্তিবলে অপরাপর যাবতীয় পদার্থ মধ্যেই সেই আত্মশক্তির দর্শন এবং সেই আত্ম-প্রত্যক্ষবশে যে কোন পদার্থ বা বিষয়ের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন করিলেই, তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সেই উপলব্ধিকৃত ধারণা-বশেই পূর্ব্বতন যোগী-ঋষিগণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি এবং ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি এবং যে কোন প্রকার মুক্তিবিষয়ক সাধন-নীতি সমস্তই আত্মদর্শনযোগের অন্তর্গতভাবে দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সকল বিষয়ের মধ্যেই যেন আত্মার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদক এমন একটা সজীবভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্ত-অবস্থা ভিন্ন তাহার অন্তর্নিহিত সত্য বা দার্শনিকভাবে তাহার মূলতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। বর্ত্তমানে আত্মজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত অপূর্ণভাবে কর্ম্মদ্বারা কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হইতেছে না। পক্ষান্তরে বদ্ধনৌকার দাঁড় টানার ন্যায় দৈহিক ও মানসিক শক্তির সহিত আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে মাত্র। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে যিনি বা যে জাতি ধ্রুবসত্য স্বরূপ সেই সনাতন উপায় অবলম্বন না করিবেন, তিনি বা তজ্জাতি অধুনা বা বংশপরম্পরায় ধনে, মানে, কুলে, শীলে কিম্বা দৈহিকবলে যতই প্রবল পরাক্রান্ত বা গর্ব্বিত হন্ না কেন, তাঁহার বা তজ্জাতির আত্মোন্নতির আশা বৃথা মাত্র। আত্মজ্ঞানের অভাবে বর্ত্তমানে আর্য্যজাতি সেই দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায়

আত্ম-দর্শন-যোগই সেই পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও উন্নতি লাভের প্রধান সোপান। অপরন্তু আত্ম-দর্শন-যোগের উপেক্ষাই সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূল কারণ। তদ্ধেতু বর্ত্তমানে আত্ম-দর্শন-যোগ বিস্মৃত হইয়া আর্য্যসন্তানগণ জড়ত্বে পরিণত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। লৌকিক চক্ষে তাঁহাদের দৈহিক স্পন্দন দেখিয়া হয় ত অনেকেই আমার উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিবেন কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্মদর্শী, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন যে, অজ্ঞানীর ঐ দৈহিক স্পন্দন দেহাত্মবোধস্বরূপ ভবব্যাধির বৈকারিক লক্ষণমাত্র। উহা আত্মশক্তির ক্রিয়া নহে; ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনিত্য বিষয়-উপসর্গজনিত বিকার-স্পন্দন। বাজিকর-করস্থিত ক্রীড়া-পুত্তলিকাপ্রায়, ইহারা ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কর্তৃক চালিত হইয়া চৈতন্য-শীলের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে মাত্র। সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞানরূপ ঔষধ সেবনে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনিত্য-বিষয়াসক্তিরূপ বিকার নষ্ট হইয়া দেহাত্ম-বোধ-স্বরূপ ভবব্যাধি-আরোগ্যসম্পাদন হইলেই ইহারা আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকারী হইবে এবং তখনই প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অহং ভাব-জনিত দুর্ব্বলতা বা জড়ত্ব নাশ হইয়া "সোঽহং" রূপ বল-সঞ্চারে আত্মশক্তি, বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে প্রথম রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলেই, রোগ নিবৃত্তির ঔষধ নির্ব্বাচন সহজ হইয়া থাকে। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগে ইহার মৌলিক গবেষণা বা মূল তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আত্মবিশ্বাস" না থাকাই এই রোগের প্রধান কারণ। আত্ম-অবিশ্বাসবশেই আত্মজ্ঞান বিস্মৃতির উৎপত্তি। আত্মজ্ঞান বিস্মৃতির ফলেই দেহাত্মবোধরূপ ভব-ব্যাধির আক্রমণ। তাদৃশ ভব-ব্যাধির আক্রমণ-অবস্থায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধি-প্রবৃত্তি-মূলক কামনাজনিত অকর্ম্মরূপ কুপথ্য গ্রহণ এবং সেই কুপথ্যের ফলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অসংযমরূপ এতাদৃশ বৈকারিক

লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু দীর্ঘকাল যথানিয়মে শম, দম ভাবাদিযুক্ত সুচিকিৎসক অভাবে, পক্ষান্তরে অদূরদর্শী ভোগাসক্ত স্বার্থপর হাতুড়ে চিকিৎসকের স্বেচ্ছাচারমূলক কুচিকিৎসায়, বর্ত্তমানে এই ব্যাধি এরূপ অস্থিমজ্জাগতভাবে রোগীর চিত্তকে কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে যে, রোগী আর তাহার পূর্ব্বস্মৃতি চিন্তা করিতে না পারিয়া, মুক্ত অবস্থার প্রকৃত সুখ কি এবং ব্যাধি-অবস্থার প্রকৃত দুঃখ কি, তাহা ধারণা করিতে অসমর্থতা-প্রযুক্ত "ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিকারমূলক ভোগাসক্ত অবস্থাই সুখ" এবং "ইন্দ্রিয়বৃত্তির নির্ব্বিকারমূলক অনাসক্ত অবস্থাই দুঃখ" মনে করিয়া, বিকার বশে প্রবৃত্তি-মূলক-ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগ-লালসায় সতত ছুটাছুটি-পূর্ব্বক অনিত্য দুঃখ দারিদ্র্যের তীব্র দহনে দগ্ধ হইতেছে। বর্ত্তমানে সেই মজ্জাগত ব্যধি বা কুসংস্কার দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে মনের উপর শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য চতুর্ম্মুখ স্বরূপ বেদোক্ত আত্মজ্ঞান মহৌষধি যথাযোগ্য ভাবে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ অনুপানযোগে সেবন ভিন্ন অন্য কোন বহিঃস্থ নিগ্রহাদি কর্ম্মযোগে এ দুরারোগ্য কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন মানসিক বিকাররূপ ভব-ব্যাধির অবসান হইবে না। সুতরাং মন বিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চেষ্টা নিষ্ফল। বেদ-বিধায়ক 'চতুর্ম্মুখ'-স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান্‌ও এতাদৃশ রোগীর পক্ষে তাহাই বিধান করিয়াছেন;—

> "যাবদ্ বুদ্ধি-বিকারেণ আত্মতত্ত্বং ন বিন্দতি।
> যাবদ্ যোগঞ্চ সন্ন্যাসং তাবচ্চিত্তং নহি স্থিরম্॥
> অভ্যন্তরং ভবেৎ শুদ্ধং চিন্তাবস্তু বিকারজম্।
> ন ক্ষালিতং মনোমাল্যং কিং ভবেৎ তপঃ কোটিষু॥"

গর্ভ গীতা।

যাবৎ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিবিকার পরিপাক না হয় এবং অনাসক্তরূপ সন্ন্যাসযোগ বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত স্থির হয় না। চিদানন্দ-সেবী অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব-পরায়ণ ব্যক্তির আত্মজ্ঞান দ্বারা মানসিক বিকার নষ্ট হইলে চিত্তশুদ্ধ বা চিত্তে পবিত্রভাব উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহার মনোমালিন্য দুর হয় নাই, তাহার পক্ষে যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, দান, প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণাদি কোটি কোটি বাহ্য-তপঃ অনুষ্ঠানের দ্বারাও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকেও তাহাই বলিয়াছেন;—

"ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈ ন´ দানৈ
ন´ চ ক্রিয়াভি ন´ তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।"

গীতা ১১ অধ্যায়।

হে কুরুপ্রবীর! তোমার ন্যায় গুরুভক্তি সম্পন্ন ও গুরুপ্রসন্নতালব্ধ আত্মদর্শী ব্যতীত অপরে কি শাস্ত্রাধ্যয়ন, কি যজ্ঞ, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া কিম্বা চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার স্বরূপ অর্থাৎ আত্ম-দর্শনের যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং গুরুভক্তি সম্পন্ন সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত নির্ম্মল মনে আত্ম-তত্ত্ব অনুশীলন ভিন্ন আত্ম-দর্শনলাভ হয় না। অতএব অবিসংবাদিত সত্যস্বরূপ ভগবদ্বাক্যানুসারে অজ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান বা আত্ম-দর্শন-যোগ শ্রবণ করাইতে হইবে।

"জ্ঞানন্তু শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনমন্তরেণ ন সম্ভবতি॥"

তথাচ শ্রুতি:—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব্যতীত আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মাকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপরে মনন, অতঃপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অনন্য মনে ধ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বংপদার্থ বিবেকায় সংন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥"

জীব ও পরমাত্মার বিবেক জ্ঞানার্থ, সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাসসাধন অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহারা ঐ প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কর্ম্ম করে তাহারা পতিত হয়। সুতরাং যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রে একমাত্র কাম্যকর্ম্মেরই উপদেশ প্রদানে কর্ম্মের ফল-শ্রুতি শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এতাদৃশ শ্রবণ ও তাহার বহিরর্থ গ্রহণ দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি বা শ্রবণের উদ্দেশ্য কদাচ সাধিত হয় না। শ্রবণার্থে একমাত্র **আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান** অর্থাৎ যাহা শ্রবণে, দেহাত্মবোধ পরিহার হয়, তদুদ্দেশ্যে "**তত্ত্বমস্যাদি**" মহাবাক্য শ্রবণই আত্মজ্ঞান বিধায়ক রূপে শাস্ত্র ব্যবস্থা এবং তাহারই মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্ম-দর্শন লাভ হয়। উক্তপ্রকারে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিনভাবের একত্র অনুষ্ঠান ভিন্ন জ্ঞানস্থিতি বা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এসম্বন্ধে স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত আছে—

"ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ॥"

জ্ঞানকে এই ত্রিভাবে অর্থাৎ পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে ধারণা করিলেই উত্তম যোগাবস্থা লাভ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র

শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণ, অথবা ব্যাকরণাদির সাহায্যে মৌখিক বিচার ও বিতর্ক দ্বারা অসত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য-পরিগ্রহ না করিয়া, কেবল মাত্র বাচনিক বাদানুবাদকে প্রকৃতরূপে বিচার বলা যায় না, কারণ তাহা বিবেক মূলে পরিগৃহীত নয়। এ নিমিত্ত তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ বা প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত হয় না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা ভিন্ন যোগ বা যোগলব্ধ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না অর্থাৎ ধারণাযোগে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বা অভেদজ্ঞান ভিন্ন আত্মদর্শন হয় না। অন্যথা মৌখিক বিচার-বিতর্ক পণ্ডশ্রম মাত্র। এ সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যক মুনি বলিয়াছেন ;—

"বহু ব্যাকুল-চিত্তানাং বিচারাত্তত্ত্বধী র্ন হি।
যোগ-মুখ্যস্ততস্তেষাং ধী-দর্পস্তেন নশ্যতি ॥"

নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষদিগের বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে যোগই মুখ্যরূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ যোগানুশীলন দ্বারা অন্তঃকরণগত বিষয়-বাসনারূপ দোষসমূহ বিনষ্ট হওয়াতে অন্তঃকরণের সূক্ষ্মতা উৎপাদন হয়। সেই সুসূক্ষ্ম মনে পদার্থ ও বাক্যার্থজ্ঞান যখন যথার্থরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখন "ত্বং" পদের অর্থ 'প্রত্যক্ চৈতন্য' ও "তৎ" পদের অর্থ 'ব্রহ্মচৈতন্য, উভয়ে এক এবং অভেদ জ্ঞান হওয়াতে আত্মদর্শন লাভ হয় সুতরাং ইন্দ্রিয়-বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির একত্র সাধন ভিন্ন শুধু শাস্ত্রপাঠ বা তাহার অর্থ শ্রবণ কিম্বা মৌখিকভাবে বিচার বিতর্কে আত্ম-দর্শন-যোগ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "চুরি করা বড় দোষ" "পরনিন্দা বা মিথ্যাবাক্য বলা কদাচ কর্ত্তব্য নয়।" "মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, আত্মবৎ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ” ইত্যাদি নীতিবাক্যানুযায়ী কার্য্য দ্বারা উত্তমভাবে স্বীয় চরিত্র গঠন না করিয়া কেবল মাত্র মৌখিক আবৃত্তি বা শ্রবণ অথবা ব্যাকরণগত শব্দার্থের বিচার বিতর্কে কখনই অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় না। তদ্ধেতু জ্ঞানচক্ষে এই অনিত্য সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সবই যেন অন্ধকারাছন্ন। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী দরিদ্র, সকলেই যেন অজ্ঞানান্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বা দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ধকারে, কেহ বা শোকের, কেহ বা মায়া মোহের অন্ধকারে, নিয়ত অবস্থান করিয়া একবারে দৃষ্টিশক্তিহীন বা অন্ধ হইয়া পরিয়াছে। কেহ বা শিক্ষা না পাইয়া অন্ধকারে; কেহ বা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, আত্মজ্ঞান বা আত্মসম্মান বিস্মৃতি বশতঃ ততোধিক অন্ধকারে; কেহ বা শাস্ত্র পাঠ না করিয়া অন্ধকারে, কেহ বা শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, তাহার তত্ত্বানুশীলনে উপেক্ষা প্রযুক্ত অন্ধকারে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ অন্ধকারে, আর ধর্ম্ম-বিশ্বাসী নরনারীগণ সন্ধ্যা, পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ব্রতোপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পুরশ্চরণ এবং তীর্থ ভ্রমণাদি কর্ম্ম করিয়াও চিত্তশুদ্ধি ও প্রত্যক্ষানুভূতির অভাবে অন্ধকারে, ইহার কারণ কি? সর্ব্বত্রই এতাদৃশ অন্ধকার কেন? সংসারস্থ জীবপ্রধান মানবকুল, প্রকৃতি-প্রসূত ঐ **জ্যোতিরিন্দ্র** সূর্য্য এবং চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশে অপরন্তু জড় বিজ্ঞান সাধিত তৈলগ্যাস ও বৈদ্যুতিক উজ্জল আলোকরশ্মির দীপ্তিতে বহির্জগতের যাবতীয় পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াও নিত্য-দীপ্ত চিত্তানন্দকর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে পারিতেছে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে কেন? প্রকৃতই কি পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থগুলিতে ও অনুষ্ঠিত ঐ ধর্ম্ম কর্ম্মগুলির মধ্যে যথাযোগ্য আলোক নাই? তাহা নহে। এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ঐ সকল জ্যোতির্যুক্ত আলোকরশ্মিতে মানব,

বহির্জগতের যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু তাহার নিজেকেই সে দেখিতে পায় না। পাঞ্চভৌতিক দেহটা দেখিতে পায় সত্য, কিন্তু দেহমধ্যস্থ "দেহীকে" বা নিজের স্বরূপ দেখিতে পায় না অর্থাৎ "আত্ম-দর্শন" করিতে পারে না। তজ্জন্যই চিত্তের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার বিদূরিত না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্ধকারে বাস করিতেছে। অন্তর্জগতের অন্ধকার নাশ করিতে পারে এরূপ শক্তি ঐ চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রে কিম্বা জড় বিজ্ঞানলব্ধ তৈলগ্যাস বা বৈদ্যুতিক অগ্নিতে নাই, হীরা, মুক্তা, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, পদ্মরাগাদি মণিতে নাই। কারণ উহারা যাঁহার জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ম্ময় তাহাই যে **"আমার আত্ম-জ্যোতিঃ"** শ্রুতিতে উক্ত আছে।—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তিকুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা কিরণ দেয় না, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, অগ্নি সেখানে নিষ্প্রভ; কারণ ঐ সমস্ত বস্তুই সেই দীপ্তমান্ আত্মার জ্যোতিঃ প্রকাশে অনুপ্রকাশিত। অগ্নিদগ্ধ লৌহখণ্ডের জ্যোতিঃতে যেমন মূল অগ্নিকে জ্যোতির্ম্ময় করে না, তদ্রূপ চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্ন্যাদির জ্যোতিঃতে জীবদেহস্থিত পরমাত্মাকে বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ দর্শন-ইন্দ্রিয়াদির গোচর করিতে পারে না বিধায়, জীবের চিত্তান্ধকারও বিদূরিত হয় না। চিত্তান্ধকার বিদূরিত না হওয়ায় "আত্ম-দর্শন"ও ঘটে না। সুতরাং আত্ম-জ্ঞান-হীন,

শাস্ত্রবাক্য, শ্রবণ বা শাস্ত্র-আবৃত্তি কিম্বা ধারণাহীন মৌখিক বিচারবিতর্কে অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্তি না হওয়ায় "আত্ম-দর্শন" লাভ হইতে পারে না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ।—

জীবদেহস্থিত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ বা স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় হইলেও জীবের ইন্দ্রিয়-বিষয়জনিত গাঢ় মলিনতাযুক্ত মায়া-মোহরূপ অবিদ্যার কঠিন আবরণে তাহার দৃক্শক্তি আবৃত। তদ্ধেতু মেঘ বা কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় ঐ সকল মায়ামোহরূপ নীরদ, নীহার, জীবের দৃক্শক্তিকে এরূপ গাঢ়ভাবে আবৃত করিয়া রাখে যে, অন্য কোনরূপ সহজজ্ঞান সেই আবরণ অপসারিত করিয়া, আত্মদর্শন ঘটাইতে সমর্থ হয় না। যে উচ্চতর জ্ঞান ঐ সমস্ত মায়ামোহের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, দৃক্শক্তিকে আত্মার কাছে পৌছাইতে বা '**আত্ম-দর্শন**' করাইতে সক্ষম, তাহার নাম "**আত্ম-জ্ঞান**"। সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত সেই আত্ম-জ্ঞানের অনুশীলনে "আত্ম-দর্শন-যোগ" অবলম্বন ভিন্ন "আত্ম-দর্শন" লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে।

বর্ণিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের প্রকৃত স্বরূপ কি এস্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। উহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে শাস্ত্রবাক্যের তত্ত্বানু-সন্ধানে প্রকৃতভাবে তৎপর হইতে হইবে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান, শ্রবণ দ্বারা যখন মন হইতে দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হইবে এবং আত্মার প্রতি বুদ্ধি দৃঢ়-নিশ্চয়াত্মিকাভাবে অর্থাৎ অনন্যশরণ হইয়া, অবিচ্ছেদে সতত আত্মতত্ত্বে অনুরাগ বা চিত্তের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে শ্রোতব্য বিষয় ও শ্রবণের উদ্দেশ্য সফলতা স্বরূপ মনের বিষয় বৈরাগ্য আপনা হইতে সঞ্চারিত হইয়া, স্বাভাবিকভাবে চিত্ত সংযমের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ভগবদ্বাক্য অনুসন্ধান করিলেও আত্ম-জ্ঞান শ্রবণের অর্থ তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥"
গীতা ২য় অধ্যায়।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ-গহন দুর্গ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রবণের উদ্দেশ্য বা ফলশ্রুতি। (১) ইহার নামই আত্ম-জ্ঞান-যোগসূত্র এবং তদবস্থাই আত্ম-দর্শন-যোগের পূর্ব্বাভাস বা প্রথম সোপান।

উপরোক্ত প্রকার শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই মননের অবস্থা অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তঃকরণে ধারণা বা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ঐ প্রকার ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার নামই মনের বিষয়নাশ। অনিত্য সুখ-দুঃখই মনের বিষয় এবং স্মৃতি, ভয়, বিকল্পাদি (ভ্রান্তি) মনের ক্রিয়া। নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি মনের "বুদ্ধি," অহং, মম ইত্যাকার বৃত্তি মনের "অহঙ্কার" ও অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিই "চিত্ত" নামে অভিহিত। পরন্তু মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। এই অন্তকরণই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণভেদে

---

(১) শ্রবণ ষড়বিধ—

ষড়্‌বিধলিঙ্গৈরশেষ বেদান্তনামাদ্বিতীয় বস্তুনি
তাৎপর্য্যাবধারণং শ্রবণমিতি—বেদান্তসার।

তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয় প্রকার লিঙ্গ (অনুমান সাধন) দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্যাবধারণকে শ্রবণ বলে। ছয় প্রকার অনুমান সাধনে শ্রবণ সিদ্ধ হয়। যথা—

"উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে

(১) উপক্রম উপসংহার (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ (৬) উপপত্তি—এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গ বা অনুমান সাধন।

তিন প্রকার। তন্মধ্যে আস্তিক্য মনোনৈর্ম্মাল্য ও মুখ্যরূপে ধর্ম্মবিষয়ে রুচি প্রভৃতি সত্ত্বজ সত্ত্বগুণ; আর কাম ক্রোধ লোভ-মদাদি, সত্ত্বজ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। অপরন্তু নিদ্রা, আলস্য অনবধানতা ও বঞ্চনাদি, সত্ত্ব-রজোজ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি বিশুদ্ধ সত্ত্বজভাব আছে। ইন্দ্রিয়-প্রসন্নতা, আরোগ্য ও অনালস্যাদি ইহারা সাত্ত্বিক সত্ত্বজ ভাব নামে অভিহিত। সুতরাং মনের বিষয়, নাশ হইতে মননের কার্য্য আরম্ভ হইয়া, অন্তঃকরণে সত্ত্বজভাবে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে; এবং ক্রমে তমঃ ও রজোভাবের নাশ হওয়ায় উহাদের স্ব স্ব গুণগুলি সত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইয়া সাত্ত্বিক সত্ত্বজভাবে অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞানস্থিত বা দৃঢ় ধারণাযুক্ত হওয়ায় বিভূতি যোগের অবস্থা লাভ হয়।

---

(১) উপক্রমোপসংহার—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তেতে সেই বস্তুর কথন, যথা—আত্মদর্শন লাভোদ্দেশে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ শ্রবণে আদিতে 'তৎ+ত্বং+অসি' এই বাক্য দ্বারা জীব (শ্রোতা) অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ অনুমান সাধনে আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া অন্তেতে "অহংব্রহ্মাস্মি"—"আমিই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" স্বরূপ জগন্ময়, এইরূপ মহাবাক্যের পুনরুক্তি দ্বারা উপক্রম উপসংহার সাধিত হইয়াছে। অথবা বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়ামে আদিতেও পরমাত্মস্বরূপ প্রণব, অন্তেতেও সেই প্রণব দ্বারা উপক্রম-উপসংহার সাধিত হইয়াছে।

(২) অভ্যাস—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুর প্রতিপাদন; যথা—এই আত্মদর্শনযোগ গ্রন্থে আত্মতত্ত্ব বিচার জন্য যোগ প্রকরণে বারংবার ঐ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য ও বাক্যার্থ নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া, অভ্যাস সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা হইয়াছে। যোগসিদ্ধির পক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ইত্যাকার পুনঃ পুনঃ প্রদিপাদন দ্বারাই শ্রবণজনিত অভ্যাস সাধিত হয়। বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়ামেও ব্রহ্মভাব উপলব্ধি জন্য দশধা প্রণব উচ্চারসাধনরূপ অভ্যাস প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

(৩) অপূর্ব্বতা—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য তাহার তৎপ্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয় প্রতিপাদন। যথা—আত্মদর্শনযোগে আমিই "সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা"

এতদবস্থায় অন্তঃকরণ হইতে নাম-রূপের ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে, এবং আত্ম ও অনাত্ম বস্তু নিরূপণপূর্ব্বক যাহা প্রকৃত অনাত্ম বস্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্তাপথ হইতে স্বভাবতঃ বিদূরিত হইয়া, আপনা হইতে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযম বা অপরিগ্রহ অবস্থা উদিত হইতে থাকে। ইত্যাকার-ভাবে অন্তঃকরণ অবিচ্ছেদে অনন্ত-ধারণাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, যখন এক চরম-তত্ত্বের অনুভূতি লাভের জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই সাধক প্রকৃত শ্রবণ ও মননযুক্ত যোগাবস্থা প্রাপ্তির অধিকারী হন; ভগবদ্গীতা অনুসরণেও এতাদৃশ মননের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদাস্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলাবুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥" গীতা ২য় অঃ

স্বরূপ অবধারণ জন্য যোগপ্রকরণে, বেদান্ত বা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি ভিন্ন, উহা অন্য প্রমাণের অবিষয়, ইহা নানাভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ শ্রবণে, ইত্যাকারভাবে দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিতে পারিলেই অপূর্ব্বতারূপ শ্রবণ সাধিত হয়। বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়ামেও প্রণবের উদ্ধার সাধন একমাত্র উপলব্ধি ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৪) ফল—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে তাহার বা তদনুষ্ঠানের শ্রূয়মান প্রয়োজন যথা,—যে যোগী "আত্মদর্শনযোগ" অবলম্বনে নিজেকে পরমাত্মা পরমপুরুষস্বরূপে জানিতে পারেন, সেই সিদ্ধ যোগীর বিদেহ পর্য্যন্ত মুক্তি সাপক্ষে প্রারব্ধভোগ, বিদেহ পরেই পরব্রহ্মে লীন হইবেন, এই প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্তই আত্মতত্ত্ব বা তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণের উদ্দেশ্য ও তাহাই ফলশ্রুতি। বৈদিক সন্ধ্যার প্রাণায়ামতত্ত্ব, শ্রবণের ফলশ্রুতি।

(৫) অর্থবাদ—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই বস্তুর প্রশংসা, যথা—শ্রোতা স্বাশিষ্য আত্মদর্শন লাভের উপায় স্বরূপ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থবাদ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, উপদেষ্টা বা গুরুকর্ত্তৃক তাহাকে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মতত্ত্ব নানা

যখন বুদ্ধি অবিচলিত ভাবে, বেদ প্রতিপন্ন আত্ম-জ্ঞান বা প্রণব ধ্বনি শ্রবণে পরমাত্মায় নিশ্চল ও অভ্যাস-পটুতা বশতঃ স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ বা তত্ত্বজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এতাদৃশ মনন অবস্থাই "আত্ম-দর্শন-যোগের" দ্বিতীয় সোপান। অর্জ্জুনের ন্যায় গুরু-প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে, সদ্‌গুরুকৃপায় নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বে এবম্ভুত মনন-অবস্থায়ও অর্থাৎ তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলে "আত্ম-সাক্ষাৎকার" বা "আত্ম-দর্শন" লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে সফল হওয়া সাধন সাধ্য। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিবৃত করার চেষ্টা করিব। সুতরাং ঈদৃশ প্রকার শ্রবণ, মনন দ্বারা আত্মজ্ঞানযুক্ত যোগ-অবস্থা লাভ হইলেই অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যানযোগে "আত্ম-সাক্ষাৎকার" লাভের জন্য অন্তঃকরণ

প্রকার (নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা পূজাদি) দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে যে, একমাত্র আত্মাকে জানিলে সর্ব্ববিধ অশ্রুত পদার্থের শ্রবণ, অস্মৃত পদার্থের স্মরণ এবং অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হয়, এস্থলে এবম্বিধ শ্রবণের নামই অর্থবাদ (প্রশংসা), আমাদের বৈদিকী প্রাণায়াম ও গায়ত্রীর অর্থবাদও ঈদৃশ ভাবেই শ্রবণ যোগ্য। এ নিমিত্ত আত্মদর্শন-যোগ গ্রন্থের প্রত্যেক স্তর ও প্রত্যেক প্রকরণ পাঠ বা শ্রবণ জন্য ইত্যাকার অর্থবাদই প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৬) উপপত্তি—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে সেই বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রূয়মান্ যুক্তি। যথা—আত্ম-দর্শন-যোগ গ্রন্থে প্রতিপাদ্য "আত্মজ্ঞান" বা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি স্বধর্ম্মযুক্ত নিত্যকর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি সহযোগে নিষ্কামভাবে সমাধান করিবার জন্য উহার যে কোন একটি বিষয়ে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলেই, তদ্দ্বারা আত্মদর্শন-যোগাবস্থা বা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে, শাস্ত্রসম্মত যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহা সমাধান করা হইয়াছে, এ স্থলে আত্ম-দর্শনই ঐ সমস্ত কর্ম্মের মূল, বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত্তিকা ও মৃৎপাত্রের ন্যায় পৃথকরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রত্যেক প্রকরণে আত্ম-দর্শন-যোগরূপেই উহা সমাধান করা হইয়াছে, ইত্যাকার আত্মদর্শন-

ব্যাকুল হয়। সে অবস্থায় "অহংজ্ঞান" ত্যাগ হইয়া, ভগবৎ প্রেরণাই সমস্ত কর্ম্মের মূল ইহা ধারণা হওয়ায় অনাসক্ত ভাবে অর্থাৎ মনোগত সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, যোগী একমাত্র আত্মাতেই রমণ করিতে থাকেন এবং দেহ ও আত্মা তখন সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় যোগী ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া, তদ্গতচিত্তে ধ্যান-যোগাবলম্বনে "আত্ম-দর্শন" লাভে সমর্থ হয়। শ্রুতিতেও এই ভাবের উপদেশই পরিদৃষ্ট হয়।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা য়েঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"

কঠোপনিষদৎ ৬ষ্ঠ বল্লী।

যেসকল কামনা মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সে সমুদয় যখন বিনষ্ট হয় তখন মর্ত্ত্য অমর হয় ও এই দেহ মধ্যেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয় তখন মর্ত্ত্য অমর হয় ইহাই উপদেশ। ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিলেও আমরা নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হই।

যোগের প্রতিপাদ্য আত্ম-দর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভের ক্রিয়াকৌশল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শ্রবণ বা পাঠ করিলেও প্রত্যেক প্রকরণের মধ্যেই আত্মদর্শন-যোগ সমাধান বা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ইহার নামই উপপত্তি।

শ্রবণ সম্বন্ধে যে ষড়্‌বিধ প্রকার বর্ণিত হইল, এই ভাব শ্রবণ-যোগ্য বিষয় মাত্র মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে।

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥" গীতা ২ অঃ

সাধক বা যোগী যখন কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিয়া, ধ্যানযোগে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই আত্ম-দর্শন-যোগযুক্তাবস্থা লাভ হয়। ইহাই আত্মদর্শন-যোগের তৃতীয় সোপান। পুনঃ পুনঃ এরূপ নিদিধ্যাসন বা অনন্যমনে ধ্যানযোগ-সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্ম-দর্শন-যোগের চতুর্থ অবস্থায় চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। তখন যে কোনও বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে সমাধিযোগাবলম্বন করিলেই দিব্যদৃষ্টিবলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা।

আমরা যাঁহাদের নামানুসারে গোত্র উল্লেখ করিয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সেই সকল যোগী-ঋষিগণ আত্ম-দর্শনবলে দেহরূপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড ও বহির্ব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় তত্ত্ব ইচ্ছামত পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। তাঁহাদের জ্ঞান বর্ত্তমান সময়ের ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানবের ন্যায় কেবলমাত্র পুঁথিগত-বিদ্যা বা মৌখিক শাস্ত্রচর্চ্চা মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহারা মৃত জীব জন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, প্রাণিতত্ত্বের গবেষণা করেন নাই। তাঁহারা অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিশক্তি পর্য্যালোচনা করিতেন না। তাঁহারা তাপমান যন্ত্র কিম্বা বক্ষপরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে দেহ পরীক্ষা করিয়া, ঔষধ ব্যবস্থা বা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। প্রাগুক্ত চতুর্দ্দশ ভুবন অর্থাৎ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিতে, তাঁহাদের মানচিত্র বা দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের আবশ্যক হইত না। তাঁহারা স্কুল কলেজে কিম্বা সভা

সমিতিতে বিধর্ম্মীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিতে যাইতেন না, কিম্বা তদানীন্তন প্রচলিত শাস্ত্র বা বেদের তত্ত্বানুশীলন বিহীন কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াই, নিজকে ত্রিলোকপূজ্য মহাজ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন না। তাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধন বলে এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতেই ভৌতিকতত্ত্ব বা পদার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আত্ম-দর্শন-যোগে সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভূততত্ত্ব বা পদার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। তাঁহারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-মূলক জ্ঞান, বা আত্ম-শক্তি অর্জ্জন না করিয়া, ধর্ম্মের ব্যবসা অবলম্বনে স্বীয় ইষ্টদেবতার বা শিষ্য যজমান কর্ত্তৃক নিয়োজিত বাহ্যপূজা ও ব্রতাদি অনুষ্ঠানে "ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামং কৃত্বা, সোঽহং ভাবং বিচিন্তয়েৎ" এই বাক্য আবৃত্তি করিয়া ঘণ্টা-ধ্বনিতে কর্ম্মের দক্ষিণান্ত করিতেন না। কারণ তাঁহারা এই অনিত্য দেহের ভোগ বিলাসিতারূপ ঐহিক সুখকেই দুঃখ মনে করিয়া "আত্ম-দর্শন-যোগে" যাবতীয় অনুষ্ঠানমধ্যে পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ নিত্যসুখেরই অন্বেষণ করিতেন এবং এই মায়িক সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, শোক-দুঃখ-প্রদ জন্মমৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভৌতিক দেহস্থ বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়-বিষয়জনিত ভোগ-লালসা পরিত্যাগের চেষ্টা বা সংযম সাধনই জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তজ্জন্য স্বধর্ম্মরক্ষা, মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং একমাত্র "আত্মজ্ঞানই" নিত্যসুখের আকর বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

হায়! আজ সেই যোগী-ঋষির বংশধরগণ কিনা আত্মজ্ঞান ভুলিয়া একমাত্র আশুতৃপ্তিকর ভোগবাসনাসংপূরক ইন্দ্রিয়বৃত্তির মিথ্যা-কল্পিত দুঃখরাশিকেই সুখ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং এরূপ ভাবে সুধা ভ্রমে বিষপান করিয়া যে, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহারা নিজের অধঃপতন ঘটাইতেছেন,

দুর্ব্বল, অল্পায়ু, শক্তিহীন হইতেছেন, কেবল মাত্র তাহাই নহে, তাঁহারা বর্ণাশ্রমজনিত ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া যাইতেছেন। যেহেতু অগ্রগামী পথিক পথের দুর্গমতা প্রণিধান করিয়া, যথাশক্তি ভাবে তাহা সুগমের চেষ্টা না করিলে, তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণকারিগণও যে, তাদৃশ দুঃখ ভোগ করিবে, তাহা অনিবার্য্য। শাস্ত্রবাক্য এই যে, "অগ্রবর্ত্তিভাবে তুমি বিপন্ন হইলে, তোমার পশ্চাদনুবর্ত্তী যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিপন্ন হইতে দিও না।" আমাদের বর্ত্তমানকালের অগ্রবর্ত্তিগণ সেই নীতি-বাক্য উপেক্ষা করায়, তাঁহাদের কৃতকার্য্যে আমাদের, ও আমাদের সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্মবল, কর্ম্মবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল ও যোগবল, ভ্রষ্ট এবং তন্নিবন্ধন "**আত্ম-দর্শন**"শক্তি নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এই অনবধানতায় সমগ্র আর্য্যজাতিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত করিয়া, অধঃপতনের পথে পরিচালন করা হইতেছে। তদ্ধেতু "**আত্ম-দর্শন-যোগ**" বিস্মৃত হইয়া আজ যোগীঋষির বংশধরগণ কিনা অধস্তন জাতির পদরজঃ আশে লালায়িত হইতেছেন। তাঁহারা কিনা আজ নিকৃষ্ট জাতির পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছেন। এতাদৃশ লাঞ্ছনা পীড়নেও কেন তাঁহাদের আত্মবুদ্ধি অন্তর্মুখী হইতেছে না? ইহার প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়-বিষয়-বাসনাজনিত অনিত্য ভোগ-লালসা পূরণ দ্বারা তাহার নিবৃত্তির আশা দুরাশা মাত্র। তাদৃশ ভোগলালসা নিবৃত্তির একমাত্র উপায় "**আত্ম-দর্শন-যোগ**"।

সন্নিপাতগ্রস্ত রোগী যেমন যত বেশী জলপান করে, ততই তাহার পিপাসা বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়ানুরাগগ্রস্ত ভোগ-লালসার রোগীর পক্ষেও প্রবৃত্তিজনিত কামনা-বাসনা যতই পূরণ হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের ভোগ-লালসাও অত্যুৎকটভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্ধেতু সততই তাঁহারা অনিত্য বস্তুতে সুখের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হন। হায়! তাঁহারা এই ধ্রুবসত্যটি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, অনিত্য ভোগ-লালসার

অনুসরণে কেহ কখনও প্রকৃত সুখ পায় নাই ও একমাত্র **আত্ম-দর্শন-যোগ** ভিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি কেহ কখনও পাইতে পারে না।

"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একংরূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥"
কাঠোপনিষৎ ৫ম বল্লী।

যিনি এক ও সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় এক রূপকে বহু প্রকারে পরিণত করেন, যে জ্ঞানিগণ আত্ম-দর্শন-যোগে তাঁহাকে আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়, অন্যের নহে। সুতরাং সেই অনির্ব্বচনীয় শান্তি একমাত্র "**আত্ম-দর্শন-যোগ**" ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কিম্বা কেবলমাত্র বাহ্যভাবে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শান্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।—

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং
যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং"
কাঠোপনিষৎ ৫ম বল্লী।

যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্‌দিগের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে অনেকের ঈপ্সিত বস্তু সকল বিধান করেন, যে জ্ঞানিগণ "**আত্ম-দর্শন-যোগে**" তাঁহাকে আপনাতেই দর্শন করিতে সমর্থ, জগতে তাঁহাদিগেরই নিত্য শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অপরের নহে। অতএব ইহাই সুসিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মাই একমাত্র নিত্য-

পদার্থ এবং "আত্ম-দর্শন-যোগে" যিনি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপে আপনাতে দর্শন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই পরিদৃশ্যমান্ অনিত্য বস্তু-সমূহের মধ্যেও আত্ম-দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এতাদৃশ আত্ম-জ্ঞানের প্রভাবেই গীতায়,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ"

এই আত্মবিভূতির কথাই অর্জ্জুনকে শুনাইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অন্তর বাহিরে সেই আত্মদর্শনের উপায় কি? তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক, সর্ব্বাপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটের বস্তু। আমাতেই আত্ম-দর্শন-যোগ্য আত্মার যাবতীয় বিভূতি দেদীপ্যমান থাকা সত্বেও কেন আমরা "আত্ম-দর্শন" করিতে পারি না, ইহার কারণ কি? কারণ অন্ধতা। জীবের এতাদৃশ অন্ধতা বহু প্রকার আছে। তৎসম্বন্ধে চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে।—

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধা স্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্য দৃষ্টয়ঃ॥"

পেচকাদি জন্তু দিবাভাগে অন্ধ। কাকাদি কোন কোন জন্তু রাত্রিকালে অন্ধ। (কেঁচো প্রভৃতি) কোন কোন প্রাণী দিবারাত্রি উভয় সময়ে অন্ধ, এবং কোন কোন প্রাণী দিবারাত্রি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। দিবানিশা সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"সর্ব্বজীব দেখে যাহা নিশার মতন।
জিতেন্দ্রিয় জীব তাহে করে জাগরণ॥
সর্ব্বজীব যে বিষয়ে থাকে জাগরিত।
আত্মদর্শী মুনি তাহে থাকেন নিদ্রিত॥"

চণ্ডী ও গীতোক্ত দিবা নিশা সম্বন্ধে কোন সাধক ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"দিবা অর্থে আত্মজ্ঞান মোক্ষ প্রকাশক।
সংসারীরা অন্ধ তায় দিবান্ধ পেচক॥
নিশা অর্থে মায়ামোহ তাহে দৃষ্টি নাই।
আত্মজ্ঞানিগণ সদা নিশা-অন্ধ তাই॥
মায়া-মোহে শোক-দুঃখে কাষ্ঠ-মৌনী যারা।
নিশিদিন "অন্তর্ব্বাহ্য" দু'য়ে অন্ধ তারা॥
চৈতন্য-সমাধিগত সর্ব্ব ব্রহ্ম যাঁর।
দিবানিশি "অন্তর্ব্বাহ্য" সমদৃষ্টি তাঁর॥"

অতএব সংসারস্থ মানব নানাভাবে অন্ধ। এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর অন্ধ আছে, যাঁহাদের মানসিক দুর্ব্বলতাই অন্ধতার প্রধান কারণ। তাঁহারা নিজেকে সততই এমন ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, যেন তাঁহাদের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম, আত্মার উন্নতি, কি জগতের অন্য কোন প্রকার উন্নতি সাধন হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা মনে করেন, কলিকালে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হইবে না। যদি কোন দিন দেবতা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া, আত্মার উন্নতি বিধান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর কিছুই হইবে না। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ব্বদেবমূলাধার "গুরুব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরঃ" এই ধারণাটিও মনে দৃঢ় রাখিতে পারেন না। বর্ত্তমানে অনেকের এতাদৃশ মানসিক দুর্ব্বলতাহেতু দর্শনশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অন্ধত্বে পরিণত হইয়াছেন। আজ যে গুরু পুরোহিতের উপর অধিকাংশ মানবের অবিশ্বাস ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অধিকাংশ স্থলে আত্ম-অবিশ্বাস বা মানসিক

দুর্ব্বলতাই ইহার প্রধান কারণ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ম-জ্ঞান-হীন দেহাত্মবাদী ও অদূরদর্শী গুরু-পুরোহিতগণও যে, এজন্য দায়ী নহেন তাহা বলা যায় না। কারণ নিজেদের অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেকেই শিষ্যযজমানকে বহু প্রকারে **আত্ম-অবিশ্বাসের** ভাব শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন—যথা—"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ" অর্থাৎ নিজে পাপ, তাহার কর্ম্ম পাপ, তাঁহার আত্মা পর্য্যন্ত পাপ, তাহার যত কিছু তৎসমস্তই পাপ। গঙ্গা স্নান করিয়া উঠিয়া বলিবে "পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাহং" বিষ্ণু পূজা করিয়া উঠিয়া বলিবে "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং" এরূপ যত কিছু কর্ম্ম শেষ করিয়া বলিবে "পাপোঽহং" সুতরাং তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, তাহাদের ভিতরে পুরুষকার, তাহাদের মনে আত্ম-নির্ভরতা, কিরূপে স্থিত বা ধৃত হইবে? যিনি নিয়ত শ্রবণ করিবেন তিনি মহাপাপী, সতত উহা আবৃত্তি করিবেন তিনি মহাপাপী। তাঁহারা—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" গীতা ৪র্থ অধ্যায়

জন্মরহিত অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও "আমি" স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্ম-মায়া বশতঃ প্রকাশিত হই। অজ্ঞানকর্ম্মান্ধজীবগণ এই আত্ম-বিশ্বাসপূর্ণজ্ঞান কিরূপে মনে ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন? সুতরাং "পাপোঽহং" রূপ এতাদৃশ মিথ্যা বাক্য, এতাদৃশ হীনতা ও এতাদৃশ দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক-ভাব প্রতি নিয়ত শ্রবণ বা পাঠ দ্বারা কি আমাদের আত্ম-শক্তি ও সমাজের শক্তি নষ্ট করা হইতেছে না? অন্য কোন ধর্ম্মের ভিতরে এরূপ আত্ম-অবিশ্বাসের ভাব নাই পরন্তু আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থ শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও গীতায়, নিজের প্রতি এরূপ আত্ম-ধিকার সূচক মহাপাপী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। সুতরাং "পাপোঽহং" ইত্যাকার আত্ম-জ্ঞান-ধ্বংসকর

বাক্য, যে আর্য্য সন্তানগণ সর্ব্বদা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস, তাঁহাদের মনে পুরুষকারের ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল হইবে? কাজেই এই আত্ম বিশ্বাস-হীন অজ্ঞানতা-মূলক সংক্রামক ব্যাধির প্রবল আক্রমণে সমাজকে যে অন্ধ করিবে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নষ্ট এবং শ্রেষ্ঠবর্ণের আধ্যাত্মিক বল বা আত্ম-দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিবে সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত চেষ্টায় এই অন্ধতা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? এতাদৃশ অন্ধতা নিবারণের একমাত্র উপায় "আত্ম-দর্শন-যোগ" পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাঁহারা নিজকে মহাপাপী মনে করিয়া থাকেন, যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে এইরূপ অন্ধ হইয়া, এ জন্মে ইহা হইতে পরিত্রাণ নাই মনে করিয়া হতাশ হইতেছেন, তাঁহাদিগকে একবার আত্ম-দর্শন-যোগের মূলমন্ত্র ভগবদ্বাক্য, অনন্যচিত্তে প্রণিধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ—

"সর্ববপাপী হ'তে যদি হও পাপাচার।
জ্ঞানতরী বলে হ'বে পাপার্ণব পার ॥ ৩৬
জ্বলন্ত অনল যথা কাষ্ঠ করে ক্ষয়।
জ্ঞানানলে সর্ববকর্ম্ম ভস্মীভূত হয় ॥" ৩৭

গীতাসুধা ৪র্থ অধ্যায়।

অতএব হে অজ্ঞানান্ধজীব! ভগবদ্বাক্য বিশ্বাস করিয়া "আত্ম-জ্ঞান" আশ্রয় কর। অনায়াসে পাপ-সমুদ্র পার হইবে ও পূর্ব্ব কর্ম্মফল নিশ্চয়ই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে। কেহ নিজের চক্ষু নিজে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধ সাজিও না। তাহার পরিণাম ফল আরও বিষময় জানিবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেই নিজের চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া নিজের অন্ধতা উৎপাদন করেন, এবং অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্তমহাপাপী-সংস্কার-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের অবস্থাও তদ্রূপ। আপনাকে আপনি দুর্ব্বল, মহাপাপী, হতভাগ্য বলা অপেক্ষা মিথ্যা কথা জগতে আর কিছুই নাই। তাঁহারা ঐরূপ মিথ্যা বাক্য বলিয়া, কি চিন্তা করিয়া নিজের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া থাকেন। "আত্ম-জ্ঞান" প্রদানে উহাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস উৎপাদন কর, দেখিবে ঐ শূন্য মার্গস্থিত কুসংস্কারের ফস্কা-গিরা তখনই খুলিয়া যাইবে। ঐ মিথ্যা বন্ধন, মনে করিলেই বদ্ধ, আর সত্যের অবলম্বনে, মুক্ত মনে করিলেই মুক্ত। যাঁহারা কুসংস্কার-রূপ হস্তাবরণে জ্ঞান-চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া ভ্রমান্ধকারে পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবার আত্ম-বিশ্বাস বলে ঐ কুসংস্কার-রূপ হস্ত সরাইয়া দেখুন তখনই জ্ঞানালোকে ভ্রমান্ধকার নাশ পাইবে, তখন আর নিজকে অপবিত্র ও মহাপাপী বলিয়া মনে করিবেন না, তখন নিজকে দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন, বলিয়াও বিশ্বাস করিবেন না। তখন প্রত্যেকে মনে করিবেন আমিই "পরমাত্মা স্বরূপ" জগতের আদি কারণ "সচ্চিদানন্দ"-ময়-শিব। তখন নিজেই নিজকে **শিবোঽহং, শিবোঽহং, শিবোঽহং** ভাবিতে ভাবিতে দেহাত্ম-বোধ-রূপ নাস্তিকতা বিদূরিত হইবে। একবার "আত্ম-দর্শন-যোগে" আত্ম-প্রত্যক্ষ করুণ, তখনই দেখিবেন—

> "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার শ্চিত্তাদি নাহং
> ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ-নেত্রম্।
> নচ ব্যোমভূমি র্ন তেজো ন বায়ু
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥ নির্ব্বাণাষ্টক

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিম্বা বায়ু নহি, **আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শিব।** "**শিবোঽহং শিবোঽহম্**" জীব! এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-পোত আশ্রয় কর, দুস্তর সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে। অজ্ঞান, অবিশ্বাস, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং মায়া-মোহ-জনিত অন্ধতা রূপ ভবব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। অপরন্তু তখন নিজকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময় বলিয়া জ্ঞান হইবে। ইহাই আত্ম-দর্শন-যোগের স্বরূপ-অবস্থা। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত আত্ম-দর্শন লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। যেমন দর্পণ মলিনতা যুক্ত হইলে দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, তদ্রূপ চিত্ত দর্পণেও মলিনতা যুক্ত থাকা পর্য্যন্ত কদাচ "আত্ম-দর্শন" হইতে পারে না। আত্ম-জ্ঞান-রূপ তপোবলে পুনঃ পুন চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত কর, দেখিতে পাইবে আত্ম-প্রতিবিম্ব তাহাতে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিতেছে। এ জন্যই সাধক গাহিয়াছেন,—

যোগেশ্বরী-সাধন-সঙ্গীত।

বিষয়—চিত্তশুদ্ধি।

রাগিণী—সুরট-মল্লার,—তাল-ঝাঁপ।

চিত্তশুদ্ধ কর আগে, আত্মজ্ঞান (রূপ) তীর্থস্নানে—
শুদ্ধচেতা না হইলে, কি হ'বে তপ-জপ-ধ্যানে॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যমেব চ,
এতে মনসি বর্ত্তন্তে, ন শুদ্ধং বাহ্যকর্ম্মণি—
পঞ্চ-তত্ত্ব হ'লে শুদ্ধ, (ঐ) রিপুগণ হবে বাধ্য,
(তুমি) আত্মতত্ত্বে হ'য়ে বুদ্ধ, (আদৌ) শুদ্ধ কর "অহং" জ্ঞানে॥

ন শুদ্ধং ভ্রমণে তীর্থং, ন শুদ্ধং ভস্ম-লেপনে,
ন শুদ্ধং ধর্ম্ম-কর্ম্মেষু, ন শুদ্ধং দেহ-তাড়নে—
কোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, কোটি অশ্ব গজ দানে
চিত্তশুদ্ধ হয় না কভু, বিনা সেই আত্মজ্ঞানে ॥
নানা শাস্ত্র পাঠ কিম্বা, নানা দেবতা পূজনে,
আত্মজ্ঞানং বিনা কর্ম্ম, (সব) নিরর্থকং জেনো' মনে—
না হয় তাতে চিত্তশুদ্ধি, না যায় তাতে ভেদ-বুদ্ধি
(জীব) অজ্ঞানতায় ঘোরে শুধু, বদ্ধ নৌকার দাঁড় টেনে ॥
(যথা) ঔষধ বিনা রোগমুক্ত, হয় না শুধু অনুপানে,
(তথা) ধ্যান ধারণা বৃথা চেষ্টা, (ঐ) আত্মজ্ঞান-ঔষধি বিনে—
প্রাণায়াম প্রত্যাহার, (জেনো) সকলি কুপথ্য তার
(আত্ম) জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই (আর) যোগেশ্বরীও তাই জানে ॥

জীবের আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানই চিত্ত-শুদ্ধির উপায় এবং চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়। ইহাই ভগবদ্বাক্যের শেষ সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে শ্রুতি ও বলিয়াছেন,—

"অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ মণ্ডুক-উপনিষৎ

সাধকের চিত্ত-শুদ্ধ হইলে নিজের মধ্যেই জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন।

"জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব।
স্তুত স্তুতং পশ্যতে নিস্কলং ধ্যায়মানঃ ॥"

মণ্ডুক উপনিষৎ

নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলেই সাধক পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হ'ন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সাহায্যে কখনও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈ র্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা।

মণ্ডুক উপনিষৎ

চক্ষু বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় বা কঠোর তপস্যা বা কর্ম্মদ্বারা পরমাত্মাকে জানা যায় না। কেবল মাত্র অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই তাঁহাকে জানা যায়। সুতরাং জ্ঞানেচ্ছু সাধককে তাদৃশ প্রকার চিত্তশুদ্ধির পথে আসিতে হইবেই হইবে। যিনি যে পদার্থ বা বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে সেই বিষয়ে চিত্তকে সমাহিত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। চিকিৎসক বা কোন সুস্থকায় ব্যক্তি কোন রোগির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে রোগীরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে। ধনবান্ ব্যক্তি দরিদ্রের অবস্থা বুঝিতে চাহিলে, তাঁহাকে দরিদ্রের ভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে, জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীর দুঃখ বুঝিতে চাহিলে অজ্ঞানীর ভাবে চিত্ত সমাহিত না করিলে কখনই তিনি তাহার দুঃখ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। তদ্রূপ সন্ধ্যা পূজায় মহেশ্বর বা ইষ্টদেবকে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে, নিজের চিত্তকেও সেই মহেশ্বর বা ইষ্টদেবের ভাবে সমাহিত করিতে হইবে, নচেৎ অন্য কোন প্রকারেই তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইবে না। সেইরূপ আত্মা বা পরমাত্মার দর্শন অর্থাৎ আত্ম দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে কায়মনোবাক্যে নিজকে আত্মা বা পরমাত্মার ভাবে সম্যক্‌রূপে সমাহিত করিতে হইবে। নিজকে ব্রহ্মভাবে জ্ঞান না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত ভাবে কেহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব" অর্থাৎ যিনি নিজে ব্রহ্ম হইতে পারিয়াছেন

তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। এস্থলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী মনে করিয়া কোন কোন তার্কিক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে, ইহা কি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর? তাহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম যেমন নির্ব্বিকার ও শান্ত, তেমনই নির্ব্বিকারও শান্ত হওয়া। তিনি যেমন "সর্ব্বভূতে সম" সেইরূপ সর্ব্বভূতে সম হইতে চেষ্টা করা। এককথায় দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার সদৃশ নির্ব্বিকার, নির্ম্মল ও শান্ত ভাব অবলম্বন করা। ইহাই "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ইহাই প্রকৃতপক্ষেব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্ম বিচরণশীল হওয়ার অভিব্যক্তি। নচেৎ একবেলা শুধু আতপান্ন ও নিরামিষাহারই ব্রহ্মচর্য্য নহে। তাহা ব্রহ্মচর্য্যের অনুকল্প মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে সমাহিত করিতে পারিলেই, একাগ্রতাবশে আত্ম-দর্শন লাভ হয়। অবশীকৃত, চঞ্চল ও অশান্ত চিত্ত দ্বারা কথনই আত্ম-দর্শন লাভ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন।—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্ত মানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"

কাঠোপনিষৎ।

শান্ত বা সমাহিত চিত্ত না হইলে অন্য কোন উপায়ে আত্ম বা ইষ্টদেবের দর্শন লাভ হয় না। এথন চিত্ত সমাহিত করার উপায় কি? তাহাই প্রণিধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রথমে আত্ম-জ্ঞান শ্রবণযোগে মননের উপর শক্তিসঞ্চার করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই যে শ্রবণ-মনন-জনিত সাধারণ একটা জ্ঞান হয়, ইহা প্রায় সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। যেমন পড়াশুনা করিলে শ্রবণাদিজনিত বিশ্বাসরূপ কতকটা জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকে। অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম্ম-যোগানুশীলনে তাহা

স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে পারিলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা সম্যক্‌রূপে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। আত্ম-জ্ঞান শ্রবণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। আত্ম জ্ঞান-শ্রবণ দ্বারা আত্ম-বিশ্বাস, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত আত্মবিশ্বাস, এমনভাবে সুদৃঢ় করিতে হইবে যে, এই দেহ মধ্যেই আত্মানুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই আত্ম-দর্শন লাভ হইবেই হইবে। এইরূপ আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আত্ম-দর্শন সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।—

"ওম্ অষ্টপাদং শুচির্হংসং ত্রিসূত্রং মণিমব্যয়ম্।
দ্বিবর্ত্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ব্বং পশ্যন্ ন পশ্যতি ॥"

চুলিকোপনিষৎ।

যেরূপ কণ্ঠাবলম্বিমণিময় উজ্জল ত্রিগুণিত বাম দক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাতিশয় প্রভাববান্ হার, সকল লোকই চক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, সেইরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকার অষ্টপাদ সম্পন্ন উজ্জল হংস অর্থাৎ অজ্ঞানহারক ধর্ম্মার্থ কামাত্মক ত্রিসূত্রান্বিত (কিম্বা সত্বাদিগুণত্রয়বান অথবা ঈড়াদি নাড়ীত্রয়যুক্ত) মণি প্রকাশক অব্যয়, একরূপী, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরে বর্ত্তমান ও স্বীয় প্রভায় প্রজ্জলিত পরমাত্মাকে দেখিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রবণাদি দ্বারা আত্ম-বিশ্বাস উৎপাদন হইলেই অবিদ্যারূপ অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ হয়। ইহাই আত্ম-দর্শনের উপায়। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।—

"ভূতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে।
অন্তঃ পশ্যতি সত্ত্বস্থং নির্গুণং গুণকোটরে ॥" চুলিকোপনিষৎ

ভূতগ্রামের মোহকারী অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সকলে স্বীয় দেহেতে আত্ম দর্শন করিতে পারেন। অজ্ঞান নাশ হইলে

তিনি বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইতে থাকেন এবং নির্গুণ হইয়াও গুণকোটির মধ্যে জলদ-মালায় আদিত্যের ন্যায় উদিত হন। সুতরাং আত্মবিভূতি শ্রবণে অন্তঃকরণ দৃঢ় ও নির্ম্মল হইলে অজ্ঞান-অন্ধতা বিনষ্ট হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ্য দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। অর্জ্জুনও সেই দিব্যনেত্রবলেই আপনাতে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন,

"অশক্যঃ সোহন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ ॥"

চুলিকোপনিষৎ।

অজ্ঞানের নিরাশ হইয়া, দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্যদৃষ্টিতে সেই অজর-পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে **আত্ম-দর্শন-যোগই দিব্যদৃষ্টি**, এই দিব্যদৃষ্টি লাভ না হইলে আত্ম-দর্শন ঘটে না।

দিব্যদৃষ্টি—দ্বিবিধ উপায়ে লাভ হইতে পারে। প্রথম গুরুকৃপালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় গুরূপদিষ্টভাবে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন। এই উভয় পন্থাই আত্ম-দর্শন-যোগের অন্তর্গত বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন গুরুর সেবা ও প্রসন্নতা ভিন্ন, উহার কোন পন্থাই সুলভ নহে। "**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া**" ইহাই জ্ঞান বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

অর্জ্জুন গুরুকৃপায় দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ও আত্মনির্ভরতাই উহার প্রধান কারণ। তাদৃশ প্রকারে একমাত্র গুরুর উপর একাগ্রতা স্থাপন করিতে পারিলে মানবের পক্ষে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখাও আবশ্যক যে, যিনি নিজেই অন্ধ, সে, যেরূপ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না; সেইরূপ যে নিজেই অজ্ঞান বা যোগানুশীলন করে নাই, যাহার দিব্যনেত্র বিকাশে

আত্ম-দর্শন লাভ হয় নাই, তিনি অপরের জ্ঞাননেত্র উন্মিলন করিতে, অর্থাৎ যোগশিক্ষা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া আত্ম-দর্শন করাইতে কদাচ সমর্থ নহেন। এই জন্যই শাস্ত্রে গুরুর স্বরূপ বুঝাইতে, তাদৃশ দিব্যনেত্র-সম্পন্ন আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্ত শ্রীগুরুর কথাই উক্ত হইয়াছে ;—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

যাহার জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত এতাদৃশ অন্ধব্যক্তির চক্ষুকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি উন্মিলিত করিয়া দেন, সেই পরাৎপর সদ্‌গুরুকে নমস্কার। সুতরাং সেই জ্ঞানরূপ দিব্যদৃষ্টি প্রদান করাই গুরুর কর্ত্তব্য। জগতে অপর কেহই তাদৃশ মুক্তিদাতা গুরুর সমকক্ষ নহেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে,

"ন মিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ।
ন স্বামীচ গুরো স্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥"

জ্ঞানসঙ্কলিনী।

যে গুরু দিব্যদৃষ্টি প্রদানে পরমপদ অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় আত্ম-দর্শন লাভ হয়, কি মিত্র কি পুত্র, কি পিতা, কি বান্ধব, কি স্বামী কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। অপরন্তু—

নচ বিদ্যা গুরো স্তুল্যং ন তীর্থং নচ দেবতাঃ।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোহপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥ ৯৩

জ্ঞানসঙ্কলিনী।

যাঁহার কৃপায় আত্মদর্শনরূপ পরমপদ লাভ হয়, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা কেহই সেই জ্ঞানীগুরুর তুল্য নহে। পরন্তু শিষ্যওঅর্জ্জুনের ন্যায় গুরুভক্তি-সম্পন্ন, গুরু-নির্ভরশীল এবং উক্ত প্রকার "গুরুর্গরীয়ান্" অর্থাৎ

মিত্র, পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুই শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান হইলেই সতত গুরু-প্রসন্নতা বলে জ্ঞানলাভ ও তাঁহার দিব্যদৃষ্টি স্ফুরণ হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, গুরুর দৈহিক সেবাই একমাত্র গুরুভক্তি নহে, অবিচারিত চিত্তে জ্ঞানী-গুরুর উপদেশ পালন করিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত পক্ষে গুরু-ভক্তির পরিচয়। তদ্দ্বারাই গুরু-প্রসন্নতাবলে আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন।

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং॥" গীতা ১১ অঃ

হে অর্জ্জুন! তোমার আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া আমার (আত্মার) এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম; যাহা তোমার ন্যায় আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত গুরুভক্ত ভিন্ন অপর কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। মূল শ্লোকস্থিত "**আত্ম-যোগাৎ-প্রসন্নেন**" বাক্যের অর্থ আত্মনো যোগ বলেন হেতুনা, প্রসন্নেন ময়া অর্থাৎ তোমার আত্ম যোগ বলেই আমি প্রসন্ন হইয়া এই বিশ্বরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। সুতরাং আত্ম জ্ঞান দ্বারাই যে দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ হয়, ভগবদ্বাক্যে তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

ভগবদ্বাক্যে আরও সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্ম-জ্ঞান যোগ ভিন্ন গুরু-প্রসন্নতা লাভ হইতে পারে না। সুতরাং আত্ম জ্ঞানই যে সর্ব্ব কর্ম্মের মূল ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরন্ত গুরু প্রসন্নতাবলে আত্ম দর্শন লাভ করিতে পারিলেও অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ অনন্য মনে পুনঃ পুনঃ আত্ম-বিষয় ধ্যান

করিতে না পারিলে তাহা কদাচ দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না। তজ্জন্য অর্জ্জুনের সেই আত্ম-দর্শন যোগ অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে নাই। তবে বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম-জ্ঞান অবশ্যই তাঁহাতে স্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে একনিষ্ঠা ও নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি দৃঢ় না হইলে তাদৃশ গুরু-প্রসন্নতা লাভ করা সম্ভব নয়। পূর্ণভাবে গুরু-কৃপা বা গুরু-প্রসন্নতা লাভ না করা পর্য্যন্ত, গুরূপদিষ্ট আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ আশ্রয়ে, আত্ম-দর্শন-লাভের যে চেষ্টা তাহার নামই যোগ। এই কর্ম্মযোগ আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত ভাবে স্থির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারাও আত্ম-দর্শনোপযোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ হইতে পারে। সদ্‌গুরূপদিষ্ট আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান, শ্রবণ-মননানুযায়ী নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম্ম-যোগ অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাণ-অপানাদি সকল শক্তি বা উহার যে কোন একটিকে গুরূপদিষ্ট অন্তঃ প্রাণায়ামাদি সাধন কৌশলযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃৎপিণ্ডস্থ স্বর্গদ্বারে আনিতে পারিলেই ঐ স্থানে তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ যে জ্যোতিঃ দর্শন হয়, তদ্দারা আত্ম-দর্শন-যোগ্য দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকে এবং সহজে ইন্দ্রিয় সংযত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য ঐ স্থান স্বর্গদ্বার বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ঐ দিব্যনেত্রযুক্ত আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান-যোগে কর্ম্ম-যোগানুশীলন দ্বারা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান দ্বারা জীবন্মুক্তি-স্বরূপ আত্ম-দর্শন-যোগাবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

অতএব এতদ্দারা দেখা যাইতেছে যে, অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহারা গুরু কৃপাবশে আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ যুক্ত দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে একাগ্রতার সহিত মনন অর্থাৎ সদসৎ বিচার পূর্ব্বক অন্তঃকরণ হইতে অসদ্ভাব সমূহ কায়-মনোবাক্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমঃ রজঃ গুণ সত্ত্বে লয় করিয়া স্বধর্ম্মোচিত সাত্ত্বিক গুণ অবলম্বনে সর্ব্বতোভাবে সৎকে আশ্রয় করিতে পারেন

তাঁহারাই গুরু প্রসন্নতাবলে আত্ম-দর্শন-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এবম্বিধ অবস্থার নামই গুরুকৃপায় আত্ম-দর্শন। অতঃপর নিদিধ্যাসন রূপ অনন্য মনে পুনঃ পুনঃ সেই পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা তাঁহার আত্ম দর্শন যোগ সিদ্ধ বা জীবন্মুক্তি-পদপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-যোগ, লয়-যোগ, রাজ-যোগ, ইহারই অন্তর্গত। এতাদৃশ যোগের অনুষ্ঠানকারিগণই প্রধান যোগী। তাহা ভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে।

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

গীতা ১২ অধ্যায়

আমাতে (আত্মাতে) মন একাগ্র করিয়া ও সর্ব্বদা আত্মাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার (পরমাত্মার) উপাসনা করেন, তাঁহারাই "**আমার**" মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান যোগী। আর যাঁহারা আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ করিয়াও অনন্যমনা হইতে পারেন না এবং তদ্ধেতু তমোরজো-গুণাত্মক যাহা অসৎ, তাহা পরিহার পূর্ব্বক, যাহা সত্ত্বজ সাত্ত্বিক তাহা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারাও গুরূপদিষ্ট ভাবে পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বনে আত্ম দর্শনের অধিকারী হইয়া মুক্তিপ্রদ আত্ম-দর্শন-যোগ-সিদ্ধাবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, বা কর্ম্মযোগ ইত্যাদিও বর্ণিত আত্ম-দর্শন-যোগের অন্তর্গত। এবম্বিধ যোগানুষ্ঠান-কারিগণের সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে;—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

সং নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

গীতা ১২ অধ্যায়

যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি (অচঞ্চল বুদ্ধি) সম্পন্ন হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সমূহ সম্যক্‌রূপে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয়, রূপাদি বিহীন, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, স্থির, নিত্য, অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূতহিতকারিগণও আমাকেই (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভগবদুপদিষ্টভাবে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা বুদ্ধির সমতা ও সর্ব্ব ভূতে আত্মদৃষ্টি ভাবে একাগ্রতা সাধনই কর্ম্মযোগ। দৈনন্দিন ভাবে তাহার অনুশীলনই নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাসযোগ। ঈদৃশ অভ্যাস-যোগাবলম্বনেই চিত্ত বৃত্তি নিরোধ, চিত্ত শুদ্ধ, এবং ভেদ বুদ্ধি পরিশূন্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও আত্ম-দর্শন-যোগ-লাভ যোগ্য নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই প্রকৃত যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যোগ সম্বন্ধে মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগোনিশ্চিন্তোযোগ উচ্যতে॥" জ্ঞানসঙ্কলিনী

সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিলে যে নিশ্চিন্ত ভাব উদয় হয় তাহাকেই যোগ বলে। যোগ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥" গীতা ২য় অঃ

হে ধনঞ্জয়! ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ অহংজ্ঞান রহিত অবস্থায় যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মকর। 'সমত্বই' যোগ বলিয়া উক্ত হয়। যোগ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" পাতঞ্জল-দর্শন

চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম হইতে না দেওয়াই যোগ। আত্ম-জ্ঞানযুক্ত নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাস-যোগ-অবলম্বন করিলেই প্রকৃতপক্ষে যোগের অবস্থা লাভ হয়। এ সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় যাহা উক্ত আছে, সাধারণের বোধগম্যজন্য তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল ;—

"অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়।
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয় ॥
জ্ঞান গম্য চিদানন্দ উদয় যখন।
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় সুখে মগ্ন মন ॥
আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে।
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই যোগ বলে তাকে ॥ ২০।২১
মধুময় সে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়।
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয় ॥
মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর।
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই যোগ নাম তার ॥" ২২

গীতা ৬ অধ্যায়

জীবমাত্রই স্ব স্ব কর্ম্ম ফলে দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। আমরাও সেই প্রাক্তনবশেই মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। সংসারে আমাদের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে কর্ম্ম নামে অভিহিত, প্রণিধান করিলে বুঝিবে তৎসমস্তই যোগ। যোগ ভিন্ন কোন কর্ম্ম নাই। তদ্ধেতু আত্ম-দর্শন যোগের যাবতীয় কর্ম্মই যোগ। ভগবদ্‌গীতায়ও সমস্ত কর্ম্মই যোগ নামে অভিহিত যোগ ভিন্ন যে কর্ম্ম, তাহা আত্ম দর্শন যোগের বিরোধী হেতু, তৎসমস্তই অকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন সাধক বলিয়াছেন ;—

"ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্ম্মে কেবল।
সে কর্ম্মই কর্ম্ম আর কুকর্ম্ম সকল॥"

কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় যাহা উক্ত আছে, তাহার পদ্যানুবাদ এই—

"পরম অক্ষর যিনি ব্রহ্ম নাম তাঁর।
অধ্যাত্ম সে ব্রহ্ম ভাব প্রভার আত্মার॥
জীবের অধ্যাত্ম ভাব হবে যাহায়।
সেই সে নিষ্কাম যজ্ঞ কর্ম্ম বলে তায়॥"

গীতা ৮ অধ্যায়

অতএব আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ মনন দ্বারা আত্ম-জ্ঞান-যোগে-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সংযম পূর্ব্বক আত্মাকে আত্মবশতাপন্ন করাই মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদন্যথায় সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াও আত্ম-অবিশ্বাস বশে অনেকেই আত্ম-দর্শন যোগ লাভের অধিকারী হইতেছেন না; কারণ অসংযমীর পক্ষে যোগ দুর্ল্লভ। গীতাতে তাহাই উক্ত আছে। তাহার পদ্যানুবাদ এই;—

"কৌন্তেয়! সতত আত্মা অসংযত যার।
কহিতেছি আমি—যোগ, দুষ্প্রাপ্য তাহার॥
আত্মা যাঁর অনুক্ষণ আত্মবশে রয়।
যত্ন বলে যোগ-রত্ন লাভ তাঁর হয়॥" ৩৬

গীতা ৬ অধ্যায়

মনঃ সংযমের চেষ্টার নামই যোগাভ্যাস। আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পুরশ্চরণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি যাবতীয় কর্ম্মই আত্মসংযম উদ্দেশ্যে অভ্যাস যোগ। আত্ম দর্শন-লাভের জন্যই ঐ সমস্ত যাবতীয় কর্ম্মমধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের সমস্ত অনুষ্ঠান গুলিই অন্তর্নিহিত আছে। বর্ত্তমানে একমাত্র আত্ম-জ্ঞানের অভাবে

আত্ম-দর্শন-যোগের উদ্দেশ্য ভুলিয়া জ্ঞানীর বংশধরগণ কামনা-বাসনার দাস হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন। এ জন্যই শিক্ষা, দীক্ষা, সন্ধ্যা, পূজাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। উহার কারণ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

"নানা শাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানা দৈবত পূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ ৭

লোক বিবিধ শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং বহু দেবতার পূজা প্রভৃতি, যে কোন কর্ম্ম করুক্ না কেন, হে পার্থ! আত্মজ্ঞান ভিন্ন সমস্তই বিফল হইয়া থাকে। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, একমাত্র আত্মজ্ঞানের অভাবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বিফল হইতেছে। নচেৎ চিরজীবন ঐ সমস্ত কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়াও কেন অধিকাংশ লোকের চিত্ত-শুদ্ধি হইতেছে না? কেন ভেদবুদ্ধি দূর হইতেছে না? কেন আত্ম-দর্শন লাভে-অধিকারী হইতেছে না? ইহার একমাত্র কারণ আত্ম-জ্ঞানের অভাব। আত্ম-জ্ঞানের অভাবে ঐ সকল কর্ম্ম সুকৌশলে ("যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্") পরিচালিত না হওয়ায়, নঙ্গর বদ্ধ নৌকার দাঁড় টানার ন্যায় চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে না। ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করিলে দেখিতে পাইবেন, তিনি যথা যোগ্য ভাবে সকলের জন্যই আত্ম-দর্শন যোগে নিত্য সুখের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি অর্জ্জুনকে যে উপদেশ করিয়াছেন সাধারণের বোধগম্যজন্য তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া হইল ;—

"আমাতেই চিত্ত যদি না রাখিতে পার।
অভ্যাসে লভিতে মোরে ক্রমে যত্ন কর॥ ৯
অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও।

আমার প্রীতির কর্ম্মে সদা রত রও ॥
কেবল আমার তরে কর্ম্ম যদি হয়।
কর্ম্মেতেও মুক্তি লাভ হইবে নিশ্চয় ॥ ১০
ইহাতেও অসমর্থ হও পার্থ যদি।
আমার শরণাপন্ন হও নিরবধি ॥
মনঃ স্থির করি কর্ম্ম কর সমুদয়।
ফলের প্রত্যাশা কিছু রাখিও না তায় ॥"

গীতা ১২ অ্যায়

কামনা বাসনা প্রসূত ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিয়া 'ভগবৎ প্রীতিকামঃ' এই বাক্য বলা এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিরত মনে কেবলমাত্র হাত ঘুরাইয়া কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিবার অভিনয়, আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। ভগবান্, তাঁহার শরণাপন্ন ভাবে মনঃস্থির করিয়া, ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম-যোগের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। অভ্যাসকারী যে চিরজীবনই তাহাতে অসমর্থ থাকিবেন, ইহা কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস যোগ্য? না আত্ম-বিশ্বাসের অভাবজনিত কাপুরুষতা? যাঁহার আত্মবিশ্বাস নাই, তিনি চিরজীবনই অসমর্থ। আর যাঁহার আত্মবিশ্বাস আছে, তিনি, অহল্যানন্দন "শতানন্দের" ন্যায় যুগান্তর পরিবর্ত্তনেও সমর্থ। সুতরাং সমর্থ অসমর্থের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, অভ্যাসযোগে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মে বা বাহ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে লোককে ব্রতী করা আবশ্যক। ঘরে বসিয়া যদি স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, কাব্য ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র এবং পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়া স্মৃতিতীর্থ, বেদান্ততীর্থ, তর্কতীর্থ, কাব্যতীর্থ ইত্যাদি অপরন্তু এম, এ, এম, এসসি, ডি, এসসি, পাশ করিতে সমর্থ বা "অধিকারী" হওয়া যায়, তবে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য গুরুমুখীভাবে নিত্য-কর্ম্ম

অর্থাৎ **"সন্ধ্যা গায়ত্রী" ও "মানস পূজা" স্বরূপ** ক্রিয়া-যোগযুক্ত অধ্যাত্ম বা আত্ম-বিদ্যা-লাভে চিরজীবনেও কি সমর্থ বা "অধিকারী" হওয়া যায় না? ফুটবল খেলাদি, শারীরিক ক্রিয়া কৌতুক এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র বন্য জন্তুকে শিক্ষা দ্বারা ও এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ে নানা প্রকার শক্তি সঞ্চয় করিয়া, প্রতি-যোগিতা-ক্ষেত্রে যদি পাশ্চাত্য জাতিকে পরাভূত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা হইলে কি একমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষাকল্পে আত্ম দর্শন যোগ অবলম্বনে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা আত্মার উন্নতি বিধানের প্রতিযোগিতা পোষণ পূর্ব্বক অপরাজেয় আত্ম শক্তি অর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের নাম গৌরব রক্ষা করা যায় না? ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য? না সত্য? ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ! হে যোগিঋষির বংশধরগণ! বর্ত্তমান মহাদুর্দ্দিনে আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান অনুসরণে আত্ম-দর্শন-যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মরক্ষায় আত্ম নিয়োগ কর। একমাত্র আত্ম-দর্শনযোগ বলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। আত্ম-দর্শন-যোগের লক্ষ্য মুক্তি। ইহা শুনিয়া ভীত হইও না। উহা শুধু 'মরণান্মুক্তি' নহে। আত্ম-দর্শন-যোগের লক্ষ্য— **'জীবন্মুক্তি'** বা দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত। **"আত্ম-দর্শন-যোগই অসহযোগিতার চরম আদর্শ"।"** আত্ম-দর্শন-যোগের অবস্থা—সংসার বা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ নহে, উহা ইন্দ্রিয় অসংযম-জনিত বিকার বা আসক্তি ত্যাগমাত্র। মনে রাখিও আমাদের প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষ যোগিঋষিগণও স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত থাকিয়াই আত্ম-দর্শন-যোগবলে ইচ্ছামাত্র অসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অতএব বর্ণিত আত্ম-দর্শনযোগের উদ্দেশ্য—**আত্ম-দর্শন**। ফল—**ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ**। তাহার পন্থা—**আত্মজ্ঞান**। উপাস্য—**কুটস্থ চৈতন্য স্বরূপ**

প্রাণাত্মা। তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল—তপোলোক, বা আজ্ঞা-পদ্ম। চরম লক্ষ্য—মুক্তি বা ব্রহ্মবিন্দুতে বিশ্রাম। পথ প্রদর্শক—শ্রীগুরু। অবলম্বন—সুকৌশল-যুক্ত কর্ম্ম বা যোগ। সিদ্ধাবস্থা—সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন বা চৈতন্য-সমাধি। বিকারাবস্থা—দেহাত্ম-বোধরূপ অবিদ্যা বা সংসার মায়া। অনিত্যাবস্থা—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত ভাব। নিত্যাবস্থা—"আত্ম-দর্শন-যোগ"। পূর্ণাবস্থা—ব্রহ্মসদ্ভাব। আত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহাই আত্মদর্শন-যোগের মূল অভিব্যক্তি।

আত্মদর্শন যোগ

প্রথমস্তর

দ্বিতীয় প্রকরণ।

আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন।

আত্ম দর্শন-যোগ বুঝিতে হইলে আত্মজ্ঞান বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হইতেছে, জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিয়া আত্ম-দর্শন-যোগে তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করা। সুতরাং নিত্যকর্ম্ম দ্বারা, যে আত্মজ্ঞানকে মার্জ্জিত করিব, সেই আত্মজ্ঞান বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে মার্জ্জিত করিব কি? আত্মজ্ঞান শব্দের সাধারণ অর্থ নিজ সম্বন্ধে জ্ঞান। এখন নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান বুঝিতে হইলেই নিজ অর্থাৎ "আমি" কে? ইহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজকে চিনিতে না পারে, সে অপরকে চিনিতে পারে না। সুতরাং নিজের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণতঃ স্থূলদেহের কথাই বুঝিয়া থাকি যে, "আমার দেহ," "আমার হস্ত" "আমার পদ" "আমার মস্তক," ইত্যাদি। দেহের এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এই স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার আত্মীয় এইভাবে আমি, আমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আমার দৈহিক সম্বন্ধ

বিশিষ্ট যত বস্তু আছে, তাহাদিগের মধ্যে "আমিকে"? খুজিতে গেলে, অবশেষে পুনরায় আসিয়া নিজদেহের ভিতরই আমার নিজের অস্তিত্ব বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু দেহের কোথায় আমি অধিষ্ঠিত, দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাহা চিন্তা করিয়া নিজকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করি না এবং কিরূপ কর্ম্ম করিলে "আমিকে" ধরা যায়, "আমিকে," প্রকৃত সুখ শান্তি প্রদান করা যায়, তাহার চিন্তা না করিয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ দেহের ভোগ সুখেই অহর্নিশি ব্যস্ত থাকি, চক্ষের উপর নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেহ দেহত্যাগ করিলে, দেহের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ শেষ হয়। তখন তাহার স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবর্গ যে কেহ হউক না কেন, চিরকাল যে দেহের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ বলিয়া সেই দেহের কত আদর যত্ন করিয়াছেন, তাহারা এখন ঐ দেহকে দর্শন করিতেও যেন ভীত হন। হায়! যে দেহের ভোগ সুখের জন্য বহু প্রকার পাপাচরণ করিতেও যাঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, সেই দেহের আজ কি দুর্গতি! আত্মীয় বন্ধুবর্গ ঐ দেহকে তখন মৃত বা শব জ্ঞান করিয়া, তাঁহার জন্য একমাত্র রোদন করা ভিন্ন ঐ দেহকে আর আপনার বলিতে সাহস করেন না। ঐ দেহ যে সকল উপাদেয় খাদ্যের জন্য লালায়িত ছিল, এখন তাহাকে সেই সকল খাওয়াইয়া দিলেও খায় না। তাহার নিত্য বিলাস সামগ্রী পরাইয়া দিলেও সে সন্তুষ্ট হয় না; আত্মীয় বন্ধুগণের করুণ রোদনধ্বনিতেও সে কিছুমাত্র কাতর হয় না। সে তখন চিত্রপুত্তলিকাবৎ; তখন তাহাকে অগ্নিসাৎ কর, আর জলেই ডুবাও, তজ্জন্য সে কিছুমাত্র বিচলিত বা কোনরূপ কষ্টানুভব করে না। আত্মীয় বন্ধুগণও যাঁহার অবসানে শোক দুঃখে ব্যাকুল হন, দিবা নিশি অশ্রুবর্ষণ করেন, সে কি দেহের জন্য, না দেহীর জন্য করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা জানেন না। অথবা এতাদৃশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আত্মাবস্থা পর্য্যা-

লোচনা দ্বারা নিজকে চিনিবার জন্য অনেকেই তত্ত্বানুসন্ধান করেন না। মায়া-মোহে অজ্ঞান হইয়া সব ভুলিয়া পুনর্ব্বার নিজের অনিত্য দেহকেই "আমি" "আমি" করিয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন।

এরূপ অজ্ঞানতাবশেই জীব সংসারক্ষেত্রে বিচরণপূর্ব্বক দেহের সুখেই আত্ম-সুখ, দেহের সম্বন্ধই আত্ম-সম্বন্ধ, দেহের কর্ম্মই আত্ম-কর্ম্ম, দেহের ধর্ম্মই নিজের স্বধর্ম্ম, ইহা মনে করিয়া, একজন অপরকে ঠকাইয়া বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে। কেহ অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়া, কেহবা অপরের জিনিষ চুরি করিয়া অর্থবান্ হয়। কেহবা অপরের বৃথা নিন্দা করিয়া নিজের সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কেহ বা নশ্বর দেহ বা অনিত্য বিষয়-মদ-মত্ততায় স্ফীত হইয়া অহঙ্কারে ধরাকে শরা জ্ঞান করিয়া যেন স্বধর্ম্মজ্ঞানে তদপেক্ষা দুর্ব্বলের পীড়ন জন্য প্রতি নিয়ত মিথ্যা সুযোগ অনুসন্ধান করে এবং অনিত্য-ভোগের অতৃপ্ত তৃষ্ণার ব্যাকুলতায় কত ধর্ম্ম-কর্ম্ম দেবতা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধকর কর্ম্মের অভিনয় করিয়া, নিজকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য নানাভাবে জয়-ডঙ্কা বাজাইতে লজ্জানুভব করে না। ধর্ম্মকর্ম্মের নামেও ঈদৃশ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণায় আজ দেশ প্লাবিত হইতেছে। জগৎ খুঁজিয়া দেখ প্রায় পৌনে ষোল আনা লোকের শান্তি নাই, সকলেই অভাবগ্রস্ত; অথচ কিসের অভাব জানে না। অনিত্য বস্তুর অভাব একবার পূর্ণ হইলে, পুনর্ব্বার তাহার দ্বিগুণ অভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি বস্তু আছে, যাহা পাইলে জীবের আর কোন অভাব থাকে না; আর কোন বস্তু পাওয়ার লালসা জন্মে না; তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করে না। যে জ্ঞান পাইলে জগতে আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না; একমাত্র যে শাস্ত্রটী অধ্যয়ন করিলে সর্ব্ব-শাস্ত্রতত্ত্ব-বেত্তা হওয়া যায়; যে তত্ত্বানুশীলন করিলে, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; যে

আস্বাদ পাইলে জগতের আর কোন বস্তর আস্বাদ পাইতে বাকী থাকে না, একমাত্র সেই বস্তটার নাম **"আত্মতত্ত্ব"** বা **"আত্মতত্ত্ব।"**।

সেই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ "আত্মজ্ঞান" অনুসন্ধান না করিয়া, দেহকে আত্ম-জ্ঞান করাই জীবের যত দুঃখের মূল। অথচ আমার দেহ ভিন্ন,—আমি দেহ, একথা কেহ বলেন না। অথবা দেহ আমি নই, ইহা মনে করিয়া **"আমি"** কে? অনেকেই খুঁজিয়া দেখেন না। মায়া-মোহে বিষাদিত অর্জ্জুনওএই অবস্থায় স্বধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যত হওয়ায়, স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করার জন্য কর্ম্ম প্রারম্ভে গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সাংখ্য-যোগে আত্ম-জ্ঞান শুনাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে **"তুমি দেহ নও" "দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু"** 'তুমি নিত্য' 'অবিনশ্বর,' 'জন্ম মৃত্যু রহিত; 'তোমাকে অস্ত্রে ছেদন করিতে পারে না', 'অগ্নিতে দাহ করিতে পারে না', 'জলে ডুবাইতে পারে না', 'বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না', ইত্যাদি গীতার এই সকল কথা আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। সুতরাং আমি এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে যাঁহারা বলেন "আত্মজ্ঞান" শ্রবণে জন্মে না, তাঁহাদের অজ্ঞানতা নিবৃত্তির জন্য "আত্মদর্শন যোগ" গ্রন্থে আত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার বর্ণিত বিষয় (শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠিত "আত্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভার" মহদুদ্দেশ্য প্রমাণ) এবং গীতার বিকৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন জন্য; অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত গীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত, স্থানে স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক। আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান অনুশীলন করিতে হইলে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মজ্ঞান প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপর মনন, তৎপর নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। (এতৎ সম্বন্ধে "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রকরণে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা গিয়াছে।) এইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "সংসার-

মোহান্ধ," বিষাদিত অর্জ্জুনকে প্রথমেই সাংখ্যযোগে আত্ম-জ্ঞান শুনাইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত করণেচ্ছায় বলিয়াছেন ;—

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগ ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥" গীতা ২ অঃ

আত্ম-তত্ত্বে (আত্ম-জ্ঞান-বিষয়ে) তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল। অতঃপর কর্ম্মযোগে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ! যে বুদ্ধি যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্ম-বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে তাহাই বলিতেছি। এই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের প্রারম্ভে বিফলতা নাই, প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই, এই ধর্ম্মের অল্প মাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে জীব জন্ম-মৃত্যু-জনিত সংসারাসক্তি-রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং আত্মাকে প্রথমতঃ শ্রবণ করিয়া দেহাত্ম-ভ্রম দূর অর্থাৎ দেহ ও আত্মা পৃথক্, এই জ্ঞান মনে দৃঢ় রাখিতে হইবে। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর, 'চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব' সমবায়ে গঠিত দেহ একটা ক্ষেত্র মাত্র। অতএব দেহ কখনও আত্মা বা "আমি" হইতে পারে না। ভূমি ও ভূম্যধিকারীর ন্যায় আমি দেহক্ষেত্র হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বস্তু। দৃঢ়তার সহিত এই জ্ঞান হওয়ার নামই মনন কিন্তু মনন কথাটা বুঝিতে হইলে মন কি বস্তু তাহার কি ধর্ম্ম, ও কি কর্ম্ম, তাহা না বুঝিলে প্রকৃত ভাবে মনন হইতে পারে না।

"মন" জিনিষটা অতি বৃহৎ, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-যেরূপ মন হইতে উৎপন্ন, তোমার দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও সেই মন হইতে উৎপন্ন, সুতরাং

সেই বৃহৎ মন ও তোমার ক্ষুদ্র মন একই বস্তু। ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান মনের এই তিন-টী শক্তি। তন্মধ্যে অহংতত্ত্বনিষ্ঠ বদ্ধ জীবাত্মার "ইচ্ছাশক্তি" গুণ-বৈষম্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ললাটে মনঃ-রূপে, বিষয় সংকল্প ও চিন্তাদির দ্বারা পরিচালিত; "জ্ঞানশক্তি" হৃদয়ে, চিত্ত বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত এবং "ক্রিয়াশক্তি" নাভিদেশে শ্বাস-প্রশ্বাস ও বৈশ্বানর-রূপে ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক ও রসরক্তাদি দ্বারা জীবনী শক্তির পোষণ, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি করিতেছে। সুতরাং এক মনই নানা স্থানে নানা ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত আছে—

> "মনোমহান্ মতি ব্র্হ্মা পূর্ব্বুদ্ধি খ্যাতিরীশ্বরঃ
> প্রজ্ঞা সম্বিং চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে
> পর্য্যায় বাচকাঃ শব্দা মনসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব

মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পূর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সম্বিৎ, চিতি ও স্মৃতি মনেরই পর্য্যায় বাচক। মনের দুইটী মুখ, একটী বহির্ম্মুখ ও একটী অন্তর্মুখ। ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিরত মনই বহির্মুখী মন; এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিরহিত যে মন, তাহাকেই নিঃসঙ্গ মন বলে। এতাদৃশ স্থির মনই ভগবদ্গীতোক্ত মন। "ঊর্দ্ধমূলম ধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্" ঈদৃশ মন বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত যুক্ত হইলেই "জ্ঞানশক্তি" বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই-জন্যই সাধারণ কথায় বলে, "মনোযোগ দিয়া কাজ কর;" 'মনে প্রাণে ঐক্য কর, ইত্যাদি।

অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় মনের কামনা শক্তি স্বতঃসিদ্ধ। বহির্মুখ বদ্ধ করিয়া অন্তর্মুখী বা আত্ম-জ্ঞানোন্মুখী করার সংকল্পবশে মনের যে

ঘনীভূত অবস্থা, তাহার নামই "ইচ্ছাশক্তি" বা "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি"। ইহা "মহত্তত্ত্বের" কার্য্য।

অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম "তাপ" মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম "স্পন্দন বা কর্ম্ম—" নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবশে ঘনীভূত মনের যে স্পন্দন, তাহাই মনের "ক্রিয়াশক্তি ইহা "অহংতত্ত্বের" কার্য্য। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ত্তৃক ধ্যানযোগে ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত মন, প্রাণাত্মার জ্ঞানরশ্মিউত্তাপে, যতই তাপযুক্ত হইতে থাকিবে, ততই দৃঢ় ও উজ্জ্বল জ্যোতির্যুক্ত হইয়া, "জ্যোতিরীশ্বর পরমাত্মা" বা আত্ম-দর্শন-যোগ্য শক্তি লাভ করিবে এবং ক্রমে পরা-অবস্থায় "সোঽহংতত্ত্বে" মুক্তি বা ব্রহ্মৈকত্বভাবে "সচ্চিদানন্দাবস্থা" প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মনের সাধারণতঃ পরিচয় এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির অভিব্যক্তি।

দিবাকর সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিজালে পৃথিবীর তমঃ বা অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক ধরণীকে নিয়ত বিশুদ্ধ এবং ধারণা শক্তি বর্দ্ধনে ঘনীভূত করিয়া সূক্ষ্মভাবে তাহার ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, আত্মারূপী সূর্য্যও তদ্রূপ জ্ঞানরশ্মি দ্বারা মনের তমঃ (অন্ধকার) নাশ করিয়া, তাহাকে বিশুদ্ধ এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্বরূপ ধারণা শক্তি বলে তাহা ঘনীভূত বা সুদৃঢ় করিয়া ক্রমে অন্তর্মুখে "সূক্ষ্ম-দেহ-গঠন" রূপ ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে ; কিন্তু মন সতত বহির্মুখগামী এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিষয়রূপ "অপরা-প্রকৃতি" বা মায়া-কুজ্ঝটিকাবৃত থাকায় প্রাণাত্মার জ্ঞান-রশ্মি ভূ-তত্ত্বগত মনের উপর সহজে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। তদ্ধেতুই মন সতত অপরা-প্রকৃতি যুক্ত হইয়া স্থূল দেহের কর্ম্ম লইয়াই আসক্ত থাকে এবং সেই আসক্তির প্রবলাকর্ষণে ইন্দ্রিয়-সঙ্গগত অবিশুদ্ধমন, বহিরিন্দ্রিয়-বিষয়-বিমুগ্ধ-বাসনার হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীর গঠন করিয়া অনিত্য শোক-দুঃখ ও মায়া-মোহে অভিভূত হয়। সুতরাং এই স্থূল দেহই মনের "বিকার অবস্থা" এবং সূক্ষ্ম-দেহই মনের "স্বরূপ অবস্থা" যে শক্তি ঐ মায়া-

কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া অপরা-প্রকৃতিগত মনের পরিত্রাণ সাধন করে তাহার নামই "মন্ত্র বা স্তোত্র"। এই মন্ত্রশক্তি বলে, মনকে তাহার স্বাভাবিক অর্থাৎ "আত্মা" বা "স্বরূপ" অবস্থায় সতত জ্ঞানার্গলে বদ্ধ রাখিবার জন্যই চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে ;—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি"

এই প্রার্থনায় প্রথমেই পরাপ্রকৃতিস্বরূপা "অর্গলাদেবীর" স্তুতি দ্বারা মন হইতে, বহির্মুখী কামনা-বাসনাযুক্ত স্থূল দেহভাব, অপসারণ উদ্দেশ্যে ও অন্তর্মুখী পরাপ্রকৃতিযুক্তে সূক্ষ্মভাব গঠনেচ্ছায়, চণ্ডীতে সর্ব্বপ্রথমেই অর্গলাস্তোত্র দ্বারা মনকে ত্রাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অজ্ঞানতা-বশতঃ আমরা ঐ স্তোত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্থূল শাস্ত্রার্থ বা শব্দার্থ জ্ঞানে মুক্তাতে শুক্তিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকি। এরূপ আমাদের প্রায় যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, নিয়ম, আচারানু-ষ্ঠান, ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম প্রত্যাহার সমস্তই সেই আত্মজ্ঞান যোগানু-শীলন পদ্ধতিরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আমাদের সন্ধ্যাপূজাদি নিত্যকর্ম্মের উদ্দেশ্য, অপরাপ্রকৃতিগত, ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিমুগ্ধ, বহির্মুখী চঞ্চল মনকে ত্রাণ করা অর্থাৎ মনকে অন্তর্মুখী পরাপ্রকৃতিযুক্তে, ঘনীভূত করিয়া তাহার "স্ব"-রূপে বা সূক্ষ্মদেহে প্রতিষ্ঠিত করা। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে তাদৃশ প্রণালীতে মনের মুক্তিসাধন ও তাহাকে পরমাত্ম বা ব্রহ্মসদ্ভাবাপন্ন করাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেই স্বধর্ম্মোদ্দেশ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির, যে অবস্থা সম্পাদন হইলে, সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃত তত্ত্ব প্রণিধান করিবার শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় ঐ পরাবুদ্ধির নামই "**আত্মজ্ঞান**।" পরন্তু উক্ত স্বধর্ম্মা-নুযায়ী কর্ম্মের গতি বা ক্রিয়াপরিচালনবিধি, যথাযোগ্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় কি না, নিঃসংশয়রূপে তাহা সপ্রমাণ-উদ্দেশ্যে পূর্ব্বতন যোগি-ঋষিগণের প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞানের যে আদর্শ, তাহার নামই শাস্ত্র। **স্মরণ**

রাখিতে হইবে শাস্ত্র মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রণীত। মানুষ কখনও শাস্ত্র দ্বারা তৈয়ের হয় নাই। মানুষ তৈয়েরের কর্ত্তা "মন," যে শক্তি দ্বারা সেই মনের ত্রাণ বা মুক্তিসাধন হয় তাহার নাম মন্ত্র। মনকে ত্রাণ করার প্রধানতঃ দুইটী পথ, একটী 'গুরু-শক্তি', দ্বিতীয়টী 'মন্ত্র-শক্তি'। মন্ত্রও গুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র নির্ব্বাচিত হয় শাস্ত্রের সাহায্যে, সুতরাং সেই শাস্ত্রের যিনি অধিকারী, অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি আত্ম-দর্শন-যোগ অবলম্বনে আত্ম-তত্ত্বানুশীলন দ্বারা শম দমাদি গুণযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৈরাগ্যবশে স্বীয় মনকে ত্রাণ করিবার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং সেই তত্ত্ব পূর্ব্বতন যোগি-ঋষিগণের প্রদর্শিত শাস্ত্ররূপ প্রমাণের সহিত নিজের কর্ম্ম যোগানুশীলিত পন্থা সপ্রমাণ জন্য সত্যাসত্য বিচার দ্বারা প্রকৃতভাবে সত্যকে আশ্রয় করিয়া নিঃসংশয়রূপে জ্ঞানের পরিপক্কতা বা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ; তিনিই গুরুরূপে অপরকে ত্রাণ করিবার অধিকারী। যিনি নিজের মনকে ত্রাণ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি কদাচ অপরের মনকে ত্রাণ করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার আত্ম-বিষয়ক-জ্ঞান নাই। প্রথমে আত্মজ্ঞান না হইলে শাস্ত্র পাঠ বা অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া-কলাপই সফল হয় না। ভগবান্ পরাশরও তাহাই বলিয়াছেন—

"নির্ব্বেদাদাত্ম-সংবোধঃ সংবোধাচ্ছাস্ত্র দর্শনম্।
শাস্ত্রার্থদর্শনাদ্রাজংস্তপ এবানুপশ্যতি॥" পরাশর গীতা

নির্ব্বেদ অর্থাৎ দেহের নশ্বরতাভাব হইতে আত্মজ্ঞান, **আত্ম-জ্ঞান হইতে শাস্ত্র দর্শন** ও শাস্ত্রার্থ দর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমতঃ আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানে চিত্তের মলিনতা

বিদূরিত না হইলে, কি শাস্ত্রপাঠ কি ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপদেশ কি তদাচারানুষ্ঠান দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না। যথা—মলিন বস্ত্র ধৌত না করিয়া তাহাকে কোন প্রকার রঙ্গে রঞ্জিত করিতে চেষ্টা করিলে, সে যেমন মলিনতা প্রযুক্ত তাদৃশ মনোজ্ঞ ভাবে রঞ্জিত হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বিষয় কর্ত্তৃক মলিনতা প্রাপ্ত মনকেও প্রথমে আত্মজ্ঞানরূপ ক্ষারে সিদ্ধ না করিয়া শাস্ত্র পাঠ, নাম কীর্ত্তন, কঠোর ব্রতোপবাস, বহু দেবতার পূজা, কোটি কোটি স্বর্ণ, রৌপ্য, গজ, অশ্ব ও ধেনু দান, কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ বা অগ্নি হোত্রাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, দেবমূর্ত্তি দর্শন ও প্রতিষ্ঠাদির বাহ্যানুষ্ঠান, মৌনাবলম্বন, ভস্ম-জটা-বল্কলধারী হইয়া সংসারাশ্রম-ত্যাগ, পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চিত্তাদির বাহ্যাড়ম্বররূপ অজ্ঞান প্রস্তরে যতই পুনঃ পুনঃ আঘাত কর না কেন, কিছুতেই মনোমলা অপসারিত হইবে না। সুতরাং অবিশুদ্ধ মনকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের উজ্জ্বল রঙ্গে রঞ্জিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও একমাত্র **আত্মজ্ঞানের অভাবে** তৎসমস্তই পণ্ডশ্রম বা বিফল হইবেই হইবে। তাদৃশ মনের দ্বারা কদাচ আত্ম-দর্শন লাভ হইতে পারে না। ইহা আমাদের সমাজের গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, যজমান, অধ্যাপক, প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক সকলেরই বিশেষ প্রণিধান করা আবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"জ্ঞানাগ্নি দ'হতে কর্ম্ম-ভূয়োঽপি তেন লিপ্যতে
বিশুদ্ধাত্মা হি লোকঃ স পুনর্জ্জন্ম ন ভুঞ্জতে।
জিতং সর্ব্বকৃতং কর্ম্ম বিষ্ণুশ্রীগুরু-চিন্তনম্
বিকল্পো নাস্তি সংকল্পঃ পুন র্জ'ন্ম ন বিদ্যতে।

নানা শাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানা দৈবত পূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্ব কর্ম্ম নিরর্থকম্॥
আচারঃ ক্রিয়তে কোটি দানঞ্চ গিরি কাঞ্চনম্।
আত্মতত্ত্বং ন জানাতি মুক্তির্নাস্তি ন সংশয়ঃ॥
কোটি যজ্ঞকৃতং পুণ্যং কোটিদানং হয়োগজঃ।
গোদানঞ্চ সহস্রাণি মুক্তির্নাস্তি ন বা শুচিঃ॥
ন মোক্ষং ভ্রমণে তীর্থং ন মোক্ষং ভস্ম লেপনম্।
ন মোক্ষং ব্রহ্মচর্য্যং হি মোক্ষং নেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ॥
ন মোক্ষং কোটিযজ্ঞঞ্চ ন মোক্ষং দানকাঞ্চনম্।
ন মোক্ষং বনবাসেন ন মোক্ষং ভোজনং বিনা॥
ন মোক্ষং মন্দমৌনেন ন মোক্ষং দেহ-তাড়নম্।
ন মোক্ষং গায়নে গীতং ন মোক্ষং শিশ্ননিগ্রহম্॥
ন মোক্ষং ধর্ম্ম কর্ম্মেষু ন মোক্ষং মুক্তি ভাবনে।
ন মোক্ষং সুজটাভারং নির্জ্জনসেবনস্তথা॥
ন মোক্ষং ধারণা ধ্যানং ন মোক্ষং বায়ুরোধনম্।
ন মোক্ষং কন্দভক্ষেণ ন মোক্ষং সর্ব্বরোধনম্॥
যাবদ্‌বুদ্ধিবিকারেণ "**আত্মতত্ত্বং**" ন বিন্দতি।
যাবদ্‌যোগঞ্চ সন্ন্যাসং তাবচ্চিত্তং নহি স্থিরম্॥
অভ্যন্তরং ভবেৎ শুদ্ধং চিন্তাবস্থ বিকারজম্।
ন ক্ষালিতং **মনোমাল্যং** কিং ভবেত্তপঃ কোটিষু॥

গর্ভ গীতা

অতএব যিনি আত্মতত্ত্বে অনধিকারী তিনি মৌখিক শাস্ত্র-আবৃত্তি করিয়া অথবা বহু দেবতার বাহ্য পূজা এবং নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মের কেবল মাত্র বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা কখনই প্রকৃত জ্ঞান বা শক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। বাবুই পক্ষী যেমন উচ্চ বৃক্ষে বাসা বাঁধিয়াও চির-জীবন বাহিরে থাকিয়া আতপ-বৃষ্টি ভোগ করে, বাসার ভিতরে তাহাদের প্রাণ স্থির হয় না। প্রাগুক্ত অজ্ঞান কর্ম্মীরাও তদ্রূপ বাবুই পাখীর মত সংস্কারবশে এই দেহরূপ বাসা বাঁধেন কিন্তু চিরকাল বাহিরে থাকিয়া নানা দুঃখ কষ্টই ভোগ করিয়া থাকেন। বাসার ভিতরের সুখ শান্তি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কাজেই মনের অন্তর্মুখী অবস্থা "সহজ ভাবানুভূতি" অথবা মন্ত্র বা মন্ত্রশক্তি তাহারা কিরূপে বুঝিবেন? প্রাপ্য বস্তুর বোধ না হইলে প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হয় না। তদ্ধেতু 'আত্ম-জ্ঞানের অভাবে শিক্ষা দীক্ষার মূল তত্ত্বের উপর জীবের লক্ষ্য স্থির হইতেছে না এবং জ্ঞানলাভেচ্ছাও বলবতী হইতেছে না। সুতরাং প্রাপ্য জিনিষের জ্ঞান না হওয়ায় আমাদের উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মেরও পরিসমাপ্তি হইতেছে না। তন্নিবন্ধন নিত্যধন মোক্ষ ফলের সাধনা ভুলিয়া কেবল মাত্র নশ্বর দেহের অনিত্য ভোগ-সুখের বাসনারূপ ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের শাখা প্রশাখায় আমরা ঘুরিয়া মরিতেছি। জ্ঞানকাণ্ডকে চিরকালই দুরারোহ মনে করিয়া "ব্রহ্মস্বরূপ" উর্দ্ধদিকে বা বেদের মূলতত্ত্বে চাহিয়া দেখি না। এ জন্যই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যরূপা বৈদিকী সন্ধ্যা একমাত্র স্থূলদেহের কর্ম্ম-জ্ঞানে আমরা সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়াম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগানুশীলন-পদ্ধতি অর্থাৎ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ইত্যাদি সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত ক্রিয়া একমাত্র সংখ্যাবাচক আবৃত্তিকর শব্দ সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছি, তজ্জন্য স্থূলার্থে চিরজীবন বহিঃপ্রাণায়াম বা বায়ুশোধন প্রণালীতে মন্ত্রের বিপরীতভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ ফলে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি। তন্ত্র-

শাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদের প্রাণায়ামানুশীলন বা ক্রিয়া পদ্ধতির সহিত বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়ামের ক্রিয়া পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ॥"

গীতা ৪র্থ অঃ।

কেহ "পূরকদ্বারা" অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে এবং "রেচক কালে" প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। সাধকও গাহিয়াছেন—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতি রোধ প্রাণায়াম তারে বলে॥

যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত

প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে যে,—

"স ব্যাহৃতিং স প্রণবঃ গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তঃ প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥"

অমৃত বিন্দু উপনিষৎ

এই বহিঃ প্রাণায়াম প্রথম আদর্শস্থল হইলেও, অন্তঃপ্রাণায়াম ভিন্ন আত্ম-শক্তির কখনও স্ফুরণ হয় না। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ আমরা যে প্রাণায়ামের অনুশীলন করিয়া থাকি, তাহা আমাদের জ্ঞানানুশীলনের পরিপন্থী বা বিপরীত। এইরূপ সন্ধ্যাদি অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্মগুলি অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থান, ধ্যান, গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা উপাসনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বহুদিন হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞানের অভাবে স্থূলার্থে স্থূলদেহের কর্ম্মানুষ্ঠানরূপে

ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পরন্তু তদ্দ্বারা যে আমরা অজ্ঞানীর ন্যায় দুগ্ধের সারভাগ নবনীত ও ঘৃত ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অসার তক্র সেবন করিয়াই দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। * গুরুমুখী বিদ্যারূপে সন্ধ্যার শিক্ষা না হইয়া বটতলার ছাপান পুস্তক দৃষ্টে শাস্ত্র আবৃত্তির ন্যায় **"সন্ধ্যা-গায়ত্রীর" মৌখিক আবৃত্তিই** আমাদের অধঃপতনের কারণ হইয়াছে। আমাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা পূজাদি ক্রিয়াকৌশল অভিজ্ঞ গুরু বা আচার্য্যের মুখে শিক্ষা হইলে, শক্তিশালী আচার্য্য বা গুরু আত্মশক্তিবলে শিষ্যের ভিতরে শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক জ্ঞান-নেত্র উন্মিলন করিয়া আত্ম দর্শনযোগে তাহাদের মনের ত্রাণ করিতে সমর্থ হন। গীতায় গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণও প্রথমতঃ সেইরূপ আত্মশক্তি বলেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই আত্মশক্তির নামই "ইচ্ছাশক্তি"। এতদ্দ্বারাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হইতেছে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে ক্রিয়াকৌশলাবলম্বন করিয়া, মনের সূক্ষ্ম শক্তিকে যে ব্যক্তি যে বিষয় যত পরিমাণ গাঢ় করিতে পারিবেন, সেই বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও তত কার্য্যকরী হইবে। এই শক্তির প্রভাবেই দেবমূর্ত্তিতে চৈতন্যশক্তি বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই শক্তির প্রভাবেই গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যের পুরশ্চরণ বা মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদিত হয়। এই শক্তির প্রভাবেই শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মে, যজ্ঞাদি দৈবকর্ম্মে অভীষ্ট মূর্ত্তিতে সেই সেই ভাবে দেবতার আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ বা আবাহন বিসর্জ্জন প্রত্যক্ষ হয়। এই শক্তি-প্রভাবে পূর্ব্বতন যোগি-ঋষিগণ মধ্যে কেহ কেহ আংশিকভাবে সৃষ্টির অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। এই শক্তি-প্রভাবেই ব্যাসদেব

---

* এই সকল আত্ম-দর্শন-যোগের বিষয় ক্রমে যথাযোগ্য স্থলে যথাসম্ভব রূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইবে। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল মাত্র আত্ম-জ্ঞান, যোগের বিষয়ীভূতভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধহত দুর্য্যোধনাদির সূক্ষ্ম বা আতিবাহিক দেহ আকর্ষণ করিয়া কুরু-কূল-বধুগণের শোকাপনোদন করিয়াছিলেন। একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন কোনও কোনও ইতর প্রাণীর মধ্যেও দর্শন-স্পর্শন-মননভাবে মানসিক ইচ্ছাশক্তির কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়। মৎস্য ডিম্ব প্রসব করিয়া, মননযুক্ত দৃষ্টিশক্তির বলে ডিম্বের মধ্যে চৈতন্যশক্তি সঞ্চার করিয়া, বাচ্ছা উৎপাদন করে। পক্ষীজাতি অণ্ড প্রসব করিয়া মননযুক্ত স্পর্শশক্তি দ্বারা ডিম্বভিতর চৈতন্যশক্তি প্রদানে শাবক উৎপন্ন করিয়া থাকে। কুর্ম্ম নদীতীরে উচ্চ-ভূমিতে ডিম্ব প্রসব করিয়া, গভীর জলে অবস্থানপূর্ব্বক একমাত্র মনের শক্তি দ্বারা ঐ ডিম্বমধ্যে চৈতন্যশক্তি সঞ্চার করিয়া, বাচ্চা উৎপাদন করে। সর্ব্বাপেক্ষা আর একটী আশ্চর্য্য দেখা যায় যে, "কুমারিকা পোকা" নামক একজাতীয় কীটের বাচ্চা হয় না। তাহারা জীবিত "তেলাপোকা" ধরিয়া আনিয়া কোটরে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে; তাহাতেই উক্ত জীবন্ত তেলাপোকাটী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কুমারিকা পোকার দেহ চিন্তা করিতে করিতে তদাকারে পরিণত হয়।

কাশীধাম মুক্তিক্ষেত্রে মুক্তি বিধানের আর একটী দৃশ্য অতীব চমৎকার, বড়ই ভাবোদ্দীপক এবং জ্ঞানের চরম দৃষ্টান্ত স্থল। জ্ঞানবাপীর উত্তরাংশে বৃষরূপে যে নন্দীকেশ্বর শিবটী, দৈনিক লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী যাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন, তাহার বৃত্তান্ত এই যে, ঐ বৃষটী শিবের ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়াত্মক হওয়াতে তাহার দেহ শিবের আকারে পরিণত হইয়াছে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই শাস্ত্রবাক্যের ইহা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং" এইরূপ চিরজীবন ধ্যান করিয়াও ভিতর বাহিরে সেই শক্তি কিছুমাত্র লাভ করিতে পারি না কেন? পরন্তু দিন দিন সংযম ও আচার-ভ্রষ্টই হইতেছি। ইন্দ্রিয়-বিষয়বিমুগ্ধ মনের দুর্ব্বলতা

হেতু অজ্ঞানতাকে আশ্রয় করিয়া, এই বারাণসীধামে জীবন্মুক্তির মহা আদর্শ স্থলেও কিনা মুক্তিবিষয়ে নিঃসন্দিহান হইতে পারি না। আমরা আত্ম-জ্ঞান বা আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে গুরু ও মন্ত্রশক্তির উপর অবিশ্বাসী হইয়া পরমাত্মস্বরূপ ৺বিশ্বনাথকে সর্ব্বত্র দর্শন, স্পর্শন ও মনন করিয়াও আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি, আত্মতত্ত্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে না কেন? গুরুমুখে তান্ত্রিক ইষ্টমন্ত্রলাভ করিয়া, নিত্যকর্ম্ম স্বরূপে প্রথমেই দেহের ভিতরে আত্মভাবে চিরজীবন মানসপূজা করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়ার কারণ কি? আমরা মানবকূলে শ্রেষ্ঠবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া, আত্মত্রাণের অধিকারী সত্ত্বেও অজ্ঞানতাবশে তাহা অবহেলা পূর্ব্বক আত্মঘাতীর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমৃত্যুকে আশ্রয় করে, তাহারাই যে কেবলমাত্র আত্মঘাতী তাহা নহে। আত্মত্রাণের শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীর বংশজাত ব্রাহ্মণগণমধ্যে যাঁহারা আত্মত্রাণের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আধ্যাত্মিক সাধনা বা চেষ্টা না করেন তাঁহারাও আত্মঘাতী। এ সম্বন্ধে মহাভারতে পরিষ্কারভাবে উক্ত আছে, বৃত্রাসুর বধের জন্য বজ্র নির্ম্মাণার্থে দেবগণ যখন মহাভাগ দধীচিমুনির কাছে তাঁহার দেহাস্থি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন উক্ত মুনিবর সম্পূর্ণরূপে আত্মত্রাণের শক্তি লাভে সমর্থ হন নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মণজন্মলাভের দুর্লভত্ব বিষয় বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—

"স্থাবরং লক্ষ বিংশত্যা জলজা নব লক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ॥
পশুজা রুদ্রলক্ষঞ্চ ত্রিংশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ততশ্চ মানবোজাতঃ কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে॥
শূদ্রাণাঞ্চ শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।

উত্তমঞ্চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং।

স্থাবর জন্ম বিশলক্ষবার, জলচর জন্ম নয়লক্ষবার, কৃমিজন্ম এগারলক্ষবার, বানরজন্ম পাঁচলক্ষবার, পশুজন্ম এগারলক্ষবার, পক্ষীজন্ম ত্রিশলক্ষবার, এই চৌরাশীলক্ষবার নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার পর, কুৎসিত মানব জন্ম (গার, চণ্ডাল, ভীল প্রভৃতি) দুইলক্ষবার পরিগ্রহ করিয়া, তৎপর একশত বার শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তৎপশ্চাৎ দ্বিজসংজ্ঞান্তর্গত বৈশ্য, ক্ষত্রিয় দুইটী উত্তমকূলে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর উত্তমের উত্তম ব্রহ্ম-তেজযুক্ত ব্রাহ্মণজন্ম লাভ হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণজন্ম লাভ হইলে তাহার আত্ম-ত্রাণের অর্থাৎ মুক্তিলাভের শক্তি সঞ্চয় হয়; কিন্তু নিজকে ত্রাণ করা সে অবস্থাতেও দুষ্কর; কারণ ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিয়া, স্বধর্ম্মোপযোগী নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে যিনি আত্মত্রাণ বা মুক্তির চেষ্টা না করেন, তিনিই **আত্মঘাতী**। তাহাকে পুনর্ব্বার নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"

অতএব ব্রাহ্মণ জন্ম হইলেই বুঝিতে হইবে যে বহুবার জন্মগ্রহণ করার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মত্রাণের অধিকারী হইয়াছেন। তদনুসারেই শাস্ত্র ব্যবস্থামত তাহার জাত-সংস্কারাদি সম্পন্নপূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কারে তাঁহাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মগায়ত্রী বা ভর্গোজ্যোতির উপাসনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দারা যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের বা স্ত্রীজাতির আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই, একথা বলা হইতেছে না। অধিকারীভেদে মানব মাত্রই যথাসম্ভব আত্মজ্ঞানের অধিকারী এবং সেইরূপ ভাবেই তাঁহাদিগকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা

কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ প্রসঙ্গে রাজর্ষি জনককে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন ;—

"আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধারণা নৃপ।"

পরাশর গীতা।

আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা (বৈরাগ্য) ইহা সকল বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকেও তাহাই বলিয়াছেন।—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্ষয়স্তথা" ॥ গীতা ৯ অঃ

হে পার্থ! যাহারা পাপবংশ সম্ভূত, অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্র, তাহারা আমাকে (আত্মাকে) আশ্রয় করিলে, পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে, আত্মজ্ঞান বশে পরমাগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিলে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় ও শান্তি লাভ করে। দস্যু-রত্নাকর বাল্মীকি মুনি, এবং দুরাচার জগাই মাধাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। স্ত্রীজাতির আত্মজ্ঞান বা যোগানুশীলন সম্বন্ধে পরাশর সংহিতা ও গার্গীর দৃষ্টান্ত প্রণিধান করিলে, সহজেই সংশয় অপনোদন হইবে। ভগবান্ ও অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন।—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

গীতা ৯ অঃ।

এই শ্লোকে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে, হে কৌন্তেয়! আমার (আত্মার) ভক্ত কখনও প্রণষ্ট হয় না। ইহা তুমি নিশ্চিতভাবে জানিবে। দেবাদিদেব মহাদেবও পার্ব্বতীকে এই ভাবেই বলিয়াছেন।—

"চতুরশিতি লক্ষস্য শরীরস্য শরীরিণাং।
ভ্রমণং কুরুতে জীবস্ততো মোক্ষস্য ভাজনং।
এতন্মধ্যে মহাজ্ঞানং যদি স্যাদ্ বীরবন্দিতে।
তদা মোক্ষমবাপ্নোতি ভ্রমণং কস্য বা ভবেৎ॥"

তন্ত্রসার।

হে বীরবন্দিতে! জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মোক্ষলাভের উপযোগী দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। তন্মধ্যে কেহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাকে আর কোন যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। তিনি তখন কৈবল্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্বারা **মনুষ্যদেহ-ধারী মাত্রই যে আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে**। সদ্‌গুরু লাভ হইলে, গুরুদত্ত শক্তিবলে জীবের ভিতরে জ্ঞান সঞ্চার হইতে থাকে; সেই জ্ঞানের শক্তিতে মায়াকুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলেই সে **আত্মদর্শনের অধিকারী হয়**। এজন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন।—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

গুহক চণ্ডাল গুরুদত্ত শিক্ষাবলেই জ্ঞানলাভ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন প্রাপ্তে মুক্তির অধিকারী হইয়াছিল। দুরাচার জগাই মাধাই, যবন হরিদাস, ইহারা সকলেই জ্ঞানলাভ করিয়া, আত্মদর্শনের অধিকারী হইয়াছিল। কোন কারণে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেই সে অনন্য সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, ইহাও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ।"

শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী) এবং তৎপরায়ণ (আত্মপরায়ণ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন।

সুতরাং বর্ত্তমান সংসারাশ্রমে লোক যে আত্মজ্ঞান লাভের অযোগ্য বা অনধিকারী তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইঁহারা কি নরহন্তা দস্যু-রত্নাকর অথবা পাপাশয় জগাই মাধাই অপেক্ষাও অযোগ্য? ইহারা কি সকলেই গুরুবাক্যে ও স্বধর্ম্মে অবিশ্বাসী বা শ্রদ্ধাহীন? ইহারা কি গুরু পুরোহিতের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না? তীর্থবাসী বিশেষতঃ কাশীবাসীগণমধ্যে যাঁহারা মুক্তি-ইচ্ছায় শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে কাশীবাস করিতেছেন, তাঁহারাও কি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তিলাভের অধিকারী নহেন? চিরদিন কি তাঁহাদিগকে কাম্যকর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে? বর্ত্তমান সংসারস্থ মানব আদর্শ ও শিক্ষার অভাবে যদি পাপাচারীও হইয়া থাকে, তথাপিও তাহারা "আত্ম-জ্ঞান" লাভের অধিকারী নয়, এই বিবেচনায় তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের ন্যায়, এই সকল পাপ-নিমজ্জমান্ ব্যক্তিদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করা কি পণ্ডিত, জ্ঞানী বা মহতের কর্ত্তব্য নহে? তাই কর্ত্তব্যবোধে সরলভাবে, কাতর প্রাণে, সকলকে আহ্বান করিতেছি যে, ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে ব্যবসা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত জ্ঞানীর ন্যায় ভগবদ্ভাবযুক্ত হইয়া সমস্বরে বলুন যে,

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥"

গীতা ৪র্থ অঃ।

হে জীব-প্রধান মানব! তোমরা যদি সমুদয় পাপী হইতেও অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত (আত্মজ্ঞান-যোগ)

দ্বারাই সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইবে। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ (তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান) অগ্নি তোমাদের (জন্ম-জন্মান্তরিন্) সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিবে।

অতএব তোমরা শ্রদ্ধাশীল হইয়া দেহাত্ম-জ্ঞান পরিহার কর; একবার চিন্তা করিয়া দেখ তোমরা কে? কোথা হইতে আসিয়াছ, কি কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, অতঃপরই বা কোথায় যাইবে? যে অনিত্য দেহকে "আমি" জ্ঞান করিয়া তুমি সতত ব্যস্ত, তোমার সেই দেহটি কোথায় রাখিয়া যাইবে? এবং তুমিই বা কোন্ দেহ ধারণ করিয়া যাইবে? তোমার সেই আত্মরূপ একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তাহা হইলেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের গতি সুপথে পরিচালিত হইবে। তখন স্থূল দেহের মমত্ব ভুলিয়া জ্ঞানের অনুসরণ পূর্ব্বক আত্ম-দর্শন-যোগ লাভে সমুৎসুক্ হইবে। তখন তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, তুমি স্ত্রী নও, তুমি পুরুষও নও—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌বচ্ছরীর মাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব যে সময় যে দেহে আশ্রয় করে তখন তদ্‌রূপে প্রকাশ পায়। জীব দেহধারী হইলেই আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি অজ্ঞান তাহাকে আশ্রয় করে। সুতরাং জন্মান্তরিন্ ভোগাসক্তিতে বদ্ধ হইয়া তুমি এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ; অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের আসক্তির প্রবলাকর্ষণে এই মানব দেহ ধারণ করিয়া বদ্ধ ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছ। ভবিষ্যতে পুরুষ বা স্ত্রী হওয়া, দেবতা কি গন্ধর্ব্ব হওয়া, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব হওয়া, তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। যদি তুমি বুঝিতে পার যে, তুমি ঐ নশ্বর দেহ নও, তাহা

হইলে তোমার এই জ্ঞান নিশ্চয় হইবে যে তুমি "দেহী" বা "আত্মা।" তখন তুমি ইহাও বুঝিতে সক্ষম হইবে যে তুমি নিজে কোথাও বদ্ধ নও। অবিদ্যা মায়া কুহকিনীর মোহ-আসক্তি বন্ধনে তোমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তন্নিবন্ধন তোমাকে তুমি কখন রাজা, কখন দরিদ্র মনে করিতেছ, কখন জ্ঞানী বা মূর্খ মনে করিতেছ; কখন বালক, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, ইহা যেমন তোমার দেহের অবস্থা, রাজা দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ ইহাও তেমনি তোমার মনের অবস্থা মাত্র। তুমি নিজে কখন সগুণ, কখন নির্গুণ, কখন সাকার, কখন নিরাকার, ইহা সতত উপলব্ধি করিয়াও তোমার মনের প্রণিধান অভাবে "তুমি কি" তাহা বুঝিতেছ না। অতএব নিজের বা আত্মাবস্থা না বুঝিয়া ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ জ্ঞান করা মহাভুল। তুমি নিজে কি তাহা না বুঝিলে, অপরে কি, দেব দেবী কি, ঈশ্বর কি, তোমার ইষ্ট দেবই বা কি, তাহা বুঝিবে কিরূপে? তোমাকে তুমি মনুষ্য-মূর্ত্তিরূপে চিনিয়াছ বলিয়াই ত ঐ প্রকারের আকৃতি দেখিলে তাহাকেও মানুষ বলিয়া চিনিতে পার। নিজ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রথমে চিনিয়াছ বিধায় অপর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনটী কি তাহা তোমার জ্ঞান হইয়াছে। একটী মানব শিশুকে জন্মাবধি একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া তাহার দৃষ্টি সমক্ষে একটা পশু বাঁধিয়া রাখ এবং আবশ্যক মত সেই শিশুর জীবন রক্ষার জন্য তাহার জননী তাহাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আহার দিয়া আসিবেন মাত্র, কোন কথাবার্ত্তা বলিবেন না; দুই তিন বৎসরের মধ্যে দেখিবে ঐ শিশু মানব-সংস্কারাপন্ন না হইয়া পশুসংস্কারাপন্ন হইতেছে। সে পশুর ন্যায় হাঁটিতে, পশুর ন্যায় ডাকিতে ও পশুর ন্যায় অন্যান্য আচরণ করিতে শিখিতেছে। তাহার মনুষ্যত্ব জ্ঞান না হওয়ায় অপর মানবকেও সে মানব বলিয়া চিনিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে অন্য মানব দেখিলে সে, পশুর ন্যায় ভয়ে লুকাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু একটা সদ্যো-জাত পশু-শাবককে পশু-সংসর্গ ছাড়াইয়া,

মানব সংসর্গে রাখিয়া দাও, তাহাকে শিক্ষা না দিলে পশু সংস্কারের সহজে উন্নতি হইবে না। সাধারণ হিংসা বৃত্তির সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে মাত্র। ইহার কারণ উচ্চ হইতে নীচে পতন যত সহজ, নীচ হইতে উর্দ্ধে উত্তোলন তত সহজ নহে। পশুকে মানব প্রকৃতির আদর্শে উন্নত করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা এই তত্ত্ব অনেকটা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সার্কেসে সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বানরের খেলা অনেকেই দেখিয়াছেন। শিক্ষা প্রভাবেই তাহারা নানা প্রকার উন্নত বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছে। বিনা শিক্ষায় পশু ভাবের কর্ম্ম করিয়া কখনই তাহারা তাদৃশ উন্নত বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারিত না। ঐ সকল পশুকে শিক্ষা দিতে যেমন ব্যুৎপন্নশীল শিক্ষক ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক, নীচ প্রকৃতি অজ্ঞানী মানবকে শিক্ষা দিতে হইলেও তাদৃশ ব্যুৎপন্নশীল, অধ্যবসায়-যুক্ত, আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন, শিক্ষকের প্রয়োজন। সেইরূপ শিক্ষকের নামই জ্ঞানদাতা গুরু। যে গুরুর নিজের আত্ম-জ্ঞান নাই বা অধ্যবসায়ী নহেন; তাঁহার, অপরকে শিক্ষা দিতে যাওয়া (গুরু ও শিষ্যের) উভয়েরই বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে তাদৃশ গুরু, শিষ্যেরই শিষ্য হইয়া বসেন। এই জন্যই বর্ত্তমান টোল, চতুষ্পাঠী স্কুল কলেজে আমাদের জ্ঞান শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না। এই জন্যই বিদেশী ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিত আসিয়া আমাদের আর্য্যভাষা সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছেন। এতদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? প্রকৃতভাবে জ্ঞানশিক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ন্যায় হাতে কলমে শিক্ষা। ইঞ্জিনের কোন্ যন্ত্রের কি গুণ, কোন্ যন্ত্রের সহিত কোন্ গুণের কিরূপ যোগ, তাহার কোন্ স্থানে কি প্রকার শক্তি কত খানি প্রয়োগ করিলে, কিরূপ ভাবে তাহার গতি প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার বা চালককে ইঞ্জিন চালাইয়া শিক্ষা

প্রদান করেন। ইঞ্জিনিয়রের পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে ইঞ্জিন না চলিলে যেমন ড্রাইভারের শিক্ষা হয় না, গুরুরূপী ইঞ্জিনিয়ারগণও শিষ্যরূপ নূতন ড্রাইভারকে তাদৃশ ভাবে শিক্ষা না দিলে কেবলমাত্র পুস্তকের "মুখস্থ বিদ্যায়" দেহরূপ ইঞ্জিনের অবস্থা কিম্বা তাহার ক্রিয়া-পরিচালনা শক্তি শিক্ষা হইতে পারে না। বরং পুস্তকের বিদ্যা না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু গুরুদত্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান না পাইলে কিছুতেই কার্য্যকরী শিক্ষা হয় না। সুতরাং আমরা একমাত্র পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণে অপরকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে যাইয়াই ভুল করিতেছি। এজন্য আমাদের এই পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, ইদানীং অনেক শিষ্য-যজমানের, গুরু পুরোহিতের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে। কেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে স্কুল কলেজে অনেকেই উচ্চাঙ্গের লেখাপড়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই, তাঁহারাও পুস্তকের সাহায্যে স্থূলভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া, আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা আমাদের নিকট অবনত স্বীকার করিতে চা'ন না। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিকও নহে। এমতাবস্থায় যাঁহারা বর্ত্তমানে শিষ্য যজমানের ভক্তিশ্রদ্ধা কালমাহাত্ম্যে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া অনুশোচনা করেন, তাঁহারা নিজদের অজ্ঞানতা, অনুপযুক্ততা, ও অসামর্থ্য প্রণিধান না করিয়া, শুধু মদগর্ব্ব বা আত্মাভিমান বিষ-বিদুষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া স্বীয় স্বীয় চিকিৎসা বিধান স্বরূপে, আধ্যাত্মিক বা আত্মশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেই আত্ম-দর্শন-যোগে পুনর্ব্বার তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় রূপে মান, সম্ভ্রম ও পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন। আত্মজ্ঞান আশ্রয় করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহারা আত্ম-দর্শন-যোগ-অনুশীলনে আমার পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয়ের, যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন যে,—

"**শাস্ত্র দ্বারা মানুষ তৈয়ারী হয় নাই, মানুষের দ্বারাই শাস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে**"। "পুঁথিগত বিদ্যা জ্ঞানের বিধায়ক নহে;" বরং "জ্ঞানই ঐ পুস্তকরূপী শাস্ত্রের বিধায়ক।" তবে জ্ঞানের স্থিতি ও বিশুদ্ধিতা সম্পাদনপক্ষে লিখিত শাস্ত্র-গ্রন্থ জ্ঞানের সহায়ক বটে। ইহা না বুঝিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থসাহায্যে, ব্যাকরণের তর্কাশ্রয়ে, ভগবানের সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ইত্যাদি সাধনালব্ধ দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের মৌখিক বিচার দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে যাওয়া, ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ যাঁহারা ঐ সকল তত্ত্বের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও ভাষায় সমস্ত তত্ত্ব সঠিক্‌ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন্ নাই। প্রত্যক্ষ বা অনুভূতিবলে, জ্ঞানের কিয়দংশ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন মাত্র। কারণ যিনি পূর্ব্বাপর অব্যক্ত, তাঁহাকে কি বর্ণের দ্বারা সম্যগ্ ব্যক্ত করা সম্ভব হয়? তদ্ধেতু আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, শাস্ত্রকার অবশেষে বলিয়াছেন যে, তিনি অব্যক্ত, অব্যয়, অচ্যুত, নিত্য ও স্বপ্রকাশ। সুতরাং ইঁহার সকল অবস্থাই প্রকাশের অযোগ্য, প্রত্যুত অনুভব যোগ্য। কিন্তু আমরা সেই ব্যাকরণের "**তত্ত্ববিধি**" অনুশীলন না করিয়া, "**শব্দবিধি**" "**বস্তুবিধি**" দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়াই বিপথগামী হইয়াছি। একবার "তত্ত্ববিধি" খুজিলেই "**আত্ম-বিধি**" **মিলিবে।** "আত্ম-বিধি" বুঝিলে, "পরবিধি" অর্থাৎ তুমি যাহাকে পরভাবে দেবতা অথবা অপর প্রাণীর আকারে ভেদজ্ঞান পূর্ব্বক পর মনে করিতেছ, তাঁহার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিবে। তখন তুমি যে দেহক্ষেত্রকে "আমি" বুঝিতেছ, সেই দেহরূপ "আমিই" তোমার "পর" এবং যে দেবতা বা ঈশ্বরকে তুমি পর বা দ্বিতীয় পদার্থ মনে করিয়া, "এখানে," "ওখানে," "সেখানে" খুঁজিতেছ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে তোমার দেহমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রকৃত "আমি-স্বরূপে" "তোমাকেই তুমি," দেবতা, ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বুঝিবে

পারিবে। তখন জগতে তোমার ন্যায় যত নশ্বর দেহধারী আছে সকলের দেহকেই তুমি নিজের দেহ এবং সকল দেহীকেই আত্ম-স্বরূপে "আমি" বলিয়া জ্ঞান করিবে। কারণ "যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান"। জ্ঞান-চশ্‌মা চক্ষে দিয়া যদি দেহ-ধারী "তুমি" অর্থাৎ তোমার "আত্মাকেই শিবস্বরূপ" উপলব্ধি করিতে পার, তবে সেই জ্ঞান চশ্‌মার গুণে "অপর দেহধারীকেও যে শিবস্বরূপ" তোমার উপলব্ধি হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং তোমার "আত্মারূপ শিব" ও "দেবতা-রূপ শিব" এবং "অপরের আত্মারূপ শিব," **পরস্পর অভেদ-স্বরূপ জ্ঞান হইবে।** পরন্তু সেই **অভেদ জ্ঞান বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ভেদ জ্ঞান, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর ভেদ বা পার্থক্য-জ্ঞান বিদূরিত হইয়া সমস্তই এক আত্মা বা অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" ভাবে জ্ঞান হইবে। এই ভাবে আত্ম-দর্শন-যোগ বলে আত্মজ্ঞানের উচ্চোচ্চস্তর লাভ করিবে। তখন তুমি ইষ্টদেব জ্ঞানে যে কোন মূর্ত্তি-স্বরূপে আত্ম-পূজা কর তদ্দ্বারাই সকল দেবতার পূজা হইবে। একের ভিতরেই সকলকে দেখিতে পাইবে। ঈদৃশ "আত্ম-জ্ঞান" যোগই তোমার ইষ্টদেবতার অভিব্যক্তি।** তখন বুঝিবে, **তোমার আত্মাই শিব, তোমার আত্মাই কালী, তোমার আত্মাই জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু।** তখন আর তোমার ইষ্ট বা উপাস্য দেবতার অনুসন্ধান করিতে এখানে সেখানে, এ তীর্থে সে তীর্থে যাইতে হইবে না।

তখন তিথি বার নক্ষত্র দেখিয়া, এ দেবালয়ে সে দেবালয়ে ঘুরিতে হইবে না। ঘরে বসিয়া, **তোমার দেহরূপ দেবালয়ে সকল দেবতারই দর্শন পাইবে।** ইহাই আত্ম-দর্শনের মূলসূত্র। সুতরাং তোমার সেই **একত্বই লক্ষ্য।** তাহাই তোমার স্বরূপ ও স্থির অবস্থা। আর **বহুত্ব** তোমার মনের বিকার বা চঞ্চলাবস্থা। ঐ যে স্রোতস্বতী গঙ্গা সন্দর্শন করিতেছ, তিনি এক লক্ষ্যেই চলিয়াছেন। প্রকৃতিরূপ-বায়ু-স্পন্দনে গঙ্গাবক্ষে প্রথমে একটীমাত্র তরঙ্গ উত্থিত হওয়ায়, তাহা হইতে শত শত লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে। যাহারা গঙ্গার সেই তরঙ্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, তাহারা কিন্তু গঙ্গার স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছে না। গঙ্গার প্রত্যেকটী তরঙ্গের সহিত তাহাদের মন বা চিত্তেও ঐরূপ অসংখ্য তরঙ্গ খেলা করিয়া, চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাইতেছে। সে চঞ্চল মনে চঞ্চল তরঙ্গ দেখিয়া কেবল চঞ্চলতার মধ্যেই হাবুডুবু খাইতেছে মাত্র; আর গঙ্গাকে তরঙ্গসংকুলা মনে করিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী সে কখনও গঙ্গাকে তরঙ্গসংকুলা ভাবিবে না। সে গঙ্গাকে স্থিরা স্রোতস্বতী মনে করিয়াই গঙ্গার বহিঃস্তরের তরঙ্গ কেবল বায়ু-স্পন্দনজনিত তাহার বিকার অবস্থা মনে করিয়া, বহিঃস্তরের দৃশ্য ছাড়িয়া অন্তঃস্তরে গঙ্গার স্থির অবস্থাই অবধারণ করিবে। সে বাহিরের তরঙ্গরূপে মুগ্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণকে কখনও চঞ্চল করিবে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে স্থিতপ্রজ্ঞ, সেও ঐ প্রকার চঞ্চল মনের দৃশ্যকে ভ্রান্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। অজ্ঞানতাই ভ্রান্তি; আর জ্ঞানই সত্য, সুতরাং সত্যকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, সত্যই যাঁহাদের অবলম্বন, যাঁহারা একমাত্র সত্যময়, পরমাত্ম-তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। **জ্ঞান অর্থে আত্ম-জ্ঞান।** ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞান বা

তত্ত্ব-জ্ঞানের ফল মোক্ষ। আর ইহার বিপরীরত যাহা তাহাই অজ্ঞানতা বা বন্ধন।

"অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

গীতা ১৩ অঃ

অতএব আত্ম-জ্ঞান-যোগে অজ্ঞানতা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই "আত্মদর্শন" লাভ হইবে। অজ্ঞানতা-বন্ধন-মুক্তির একমাত্র উপায়;—

"আত্ম-দর্শন-যোগ"

আত্ম দর্শন যোগ

প্রথমস্তর

তৃতীয় প্রকরণ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন।

আত্ম-দর্শন-যোগে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্ম-জ্ঞানের পরিপক্কতা সাধন-জন্য স্থূল-সূক্ষ্মাদি-দেহ-তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন, নচেৎ দেহাত্মবোধ জনিত ভ্রম বা কুসংস্কারের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নিঃসংশয় রূপে বিদূরিত হয় না। তন্নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে গুরু-শক্তি-বলে, বিশ্বরূপ (আত্মরূপ) দর্শন যোগ প্রত্যক্ষ করাইয়া পরে, অহৈতুকী ভক্তি-যোগ-শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরন্তু বিশিষ্ট রূপে আত্ম-জ্ঞান প্রদান দ্বারা চিত্তের দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধাভক্তি উদ্দীপনা করিবার জন্য পুনর্ব্বার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-যোগে স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ বিষয়ক বিজ্ঞান-যুক্ত আত্ম-তত্ত্বের মৌলিক গবেষণায় অর্জ্জুনের চিত্তে সম্যগ্‌রূপে আত্ম জ্ঞান দৃঢ়ীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রকৃত ভাবে স্বধর্ম্মানুশীলনরূপ কর্ম্মযোগের অধিকারী হওয়া যায় না, কারণ স্থূল বুদ্ধিতে দেহকেই সর্ব্বদা "আমি" "আমি" জ্ঞান করিয়া অধিকাংশ মানব অনিত্য ভোগ সুখের কামনা-বাসনা পুরণ জনিত কুকর্ম্মরাশিকেই ইদানীন্তন একমাত্র কর্ত্তব্য অবধারণে নিয়ত অধঃপতনের পথ দিন দিনই প্রশস্ত

করিতেছেন। তাদৃশ আসুরিক সম্পদ বৃদ্ধির মানসেই পূর্ব্বতন যোগি-ঋষির বংশধরগণ, বর্ত্তমানে আত্মবিস্মৃত; দেহাত্মবোধে বাহ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের আড়ম্বর অনুষ্ঠানকেই জীবন-ব্রত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, স্বধর্ম্মরূপ যোগ-তপস্যা ভ্রষ্ট হইতেছেন। তদ্ধেতু নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্মগুলিও কেবল-মাত্র স্থূল দেহেরই কর্ম্ম মনে করিয়া, অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় অজ্ঞান-অন্ধতা আরও বৃদ্ধি করিতেছেন। এ অবস্থায় সদ্‌গুরূপদিষ্ট "আত্ম-দর্শন-যোগে" স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-তত্ত্ব বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান যুক্ত জ্ঞানানুশীলনে অজ্ঞান তিমির বিনাশ পূর্ব্বক ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে আত্ম-দর্শন লাভের প্রচেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেহ ত্রিবিধ,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। আমাদের এই বাহ্য পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম পার্থিব দেহ বা স্থূল দেহ। সাধারণতঃ ইহাকে "দেহ ক্ষেত্র" বলা হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম অন্নময় কোষ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত ভূত উপাদান শূন্য সর্ব্বত্র গতিশীল বহিশ্চক্ষের অগোচর যে দেহ তাহার নাম সূক্ষ্ম দেহ "সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গ শরীরাণি"

"জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং
বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি ॥ বেদান্তসার

জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চ, মন বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চ ও বায়ু-পঞ্চ, এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট দেহকে লিঙ্গ শরীর (১) বা সূক্ষ্ম-দেহ বলে। সূক্ষ্ম দেহ প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞান ময় এই কোষত্রয় মিলিত।

---

(১) লিঙ্গশরীরাভিমানী অবিদ্যা-উপহিত চৈতন্য ব্যবহারিক জীব। এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণ্য পাপজনিত অদৃষ্টের ফল ভোগ করে এবং লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া, ইহলোক-পরলোক গমন ও জাগ্রত স্বপ্নাদি অবস্থাভোগ করিয়া থাকে।

"এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সং সূক্ষ্মদেহমিত্যুচ্যতে ॥"

বেদান্তসার

এতদতিরিক্ত যে অব্যক্ত পদার্থ তাহাই **"কারণ-দেহ"**। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—"কারণশরীরমব্যাকৃতমজ্ঞানসংজ্ঞকমস্তি।"

অজ্ঞান সংজ্ঞক অব্যাকৃত (অব্যক্ত) যাহা তাহাই কারণ দেহ। প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম দেহের নামই দেহ, আর স্থূল দেহের নাম দেহ-ক্ষেত্র। (২) দেহী বা আত্মা এই উভয় দেহ হইতে পৃথগ্‌ বস্তু। গীতায় ভগবান দেহকে ক্ষেত্র স্বরূপ বলিয়াছেন—

"মহা ভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥"

গীতা ১৩ অধ্যায়

মহাভূত সকল অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত (তাহাদের কারণ ভূত) অহঙ্কার, বুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশেন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয় গোচর পঞ্চ তন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর-জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি রূপা চেতনা ও ধৈর্য্য এই সকলের সমষ্টি দেহ বা ক্ষেত্র নামে কথিত। এই দেহ ক্ষেত্রের অবস্থা বা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে ভূত শুদ্ধি করিবার অধিকার জন্মে না। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ ইহারা কেহই দেহী নহে; দেহী, আত্মা। সেই আত্মাই

স এব জগতাং ভোক্তা নাত্ময়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ।
ইহামুত্র গতী তত্র জাগ্রৎ স্বপ্নাদিভোক্তৃতা ॥ শিবগীতা।

(২) ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। গীতা

নিত্য, সত্য ও দেহের সত্ত্বাংশ; সূক্ষ্ম-দেহ রজঃ অংশ, স্থূল দেহ তমঃ অংশ এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—.

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

গীতা ১৩ অধ্যায়

হে ভারত! সমুদয় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান অর্থাৎ "আত্ম-জ্ঞানই" মুক্তির হেতু। ক্ষেত্র বা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অতীত যে বিরাট পুরুষ তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ, এ সম্বন্ধে সাংখ্য সূত্রে উক্ত আছে—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্,
মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি,
উভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতাণি,
পুরুষ ইতি পঞ্চ বিংশতির্গণঃ॥ ১ সংখ্যসূত্র

সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সমতাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত "পুরুষ"; এই পঞ্চ বিংশতিগণ। উক্ত পুরু ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ইনিই গীতোক্ত বিরাট পুরুষ।—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসস্ত্ত পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥

কঠোপনিষৎ

ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ অর্থাৎ বিষয় শ্রেষ্ঠ, অর্থ অপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ঠ, মনঃ অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ শ্রেষ্ঠ, মহান্ হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; এই পুরুষই সকলের সীমা এবং জীবের পরম গতি বা চরম আশ্রয়। সুতরাং ইনিই পরব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ এবং জগতের আদি কারণ।

উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ড হইতে নিঃসৃত লৌহ কণা সকল যেমন স্বতন্ত্র স্ফুলিঙ্গরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, ঐ বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্ম হইতেও সূক্ষ্ম শরীর, বহ্নিস্বরূপ পরা-প্রকৃতি সংঘটনে তদ্রূপ স্ফুলিঙ্গ আকারে বিনিঃসৃত হয় ও অপরা প্রকৃতিযুক্ত অহংতত্ত্বের গুণ বৈষম্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রপঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চ মহাভূত, অহং তত্ত্ব নিষ্ঠ পুরুষের ইচ্ছায় ঐ অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে সেই বিরাট পুরুষের বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট-রূপে আবির্ভূত হন। (১)

পরিদৃশ্যমান জীব ও জগতের সমষ্টি সূক্ষ্ম তত্ত্বই অহং, ঐ অহং তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বেই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। এই কর্ত্তৃত্বভাবযুক্ত "অহং" এর নামই অহঙ্কার, ইহাই স্থূল সৃষ্টির অভিব্যক্তি। "চরমোঽহঙ্কারঃ" (সাংখ্য) মনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই অহঙ্কার. বৈকারিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত

---

(১) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী বিশ্বস্যধারিণী ॥ কঠোপনিষৎ

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও বিশ্ব ধারিণী পৃথিবী এই সমস্তই সেই বিরাট পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

অহং তত্ত্বের নাম মনঃ, ইহা প্রকৃতির সত্ত্বাংশে উৎপন্ন ও রাজসাংশে পরিবর্ত্তিত অবস্থার নাম বুদ্ধি এবং "অহং" তামসাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া তন্মাত্রাদিযুক্ত ভূত প্রপঞ্চের উৎপত্তি বিধান করে।

আলোক ও অন্ধকার পরস্পর যেরূপ বিপরীত ধর্ম্মী; অহঙ্কারের তৈজস বা রাজসাংশে উৎপন্ন বুদ্ধি এবং মহান্ বুদ্ধি বা জ্ঞানও তদ্রূপ পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী, অর্থাৎ মহান্ বুদ্ধি বা জ্ঞানের সহিত অহঙ্কার রাজসাংশে উৎপন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক বুদ্ধি, পরস্পরের সহিত বিপরীত ধর্ম্মীভাবে পরস্পরে পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া একে অপরকে প্রকাশ করিতেছে মাত্র। একের ক্ষেত্র "পরা" বা বিদ্যা-প্রকৃতি কর্ত্তৃক জীবের মুক্তি বিধান। অপরের ক্ষেত্র "অপরা" বা অবিদ্যা-প্রকৃতি কর্ত্তৃক জীব অষ্টপাশ বন্ধনে বদ্ধ হয়। একের ভাবে "সোঽহং" জ্ঞান, অপরের ভাবে "অহংজ্ঞান" সূচিত হয়। কিন্তু উক্ত অহং জ্ঞানাত্মক বিকৃত বুদ্ধিরও "সোঽহং" জ্ঞানাত্মক অবিকৃত জ্ঞান এবং প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে। তদ্ধেতু মায়া বা অপরা প্রকৃতি গত বদ্ধ জীব, বুদ্ধি বলে সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথ বা প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে প্রাগুক্ত মহদাখ্য-বুদ্ধি বা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি মার্গে গমন করিতে সমর্থ হয়। এই তত্ত্ব জ্ঞান সাধনাই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বোক্ত স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান যোগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সূক্ষ্ম দেহই এই স্থূল দেহের ক্রিয়া নিয়ামক যন্ত্র স্বরূপ এবং স্থূল শরীর উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাঙ্খ্যকার বলেন—

"পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎ কার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য চেতনস্য"

স্থূল শরীর বা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বর্গ এই সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়ে স্থূল দেহের গঠন ও পরিচালনা করে। বাহ্-ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দেহ সতত আমরা দেখিতেছি তাহা স্থূলদেহ বা দেহ-ক্ষেত্র। ইহা সূক্ষ্মদেহের আবরণ বা কোষ। কোষের মধ্যে যে প্রকার শস্য থাকে, সেই প্রকার এই স্থূল দেহ-ক্ষেত্রেও ঐ সূক্ষ্মদেহ রহিয়াছে। বাজিকর-করস্থিত ক্রীড়াপুতুল যেমন চালকের ইচ্ছামত চালিত হওয়ায়, চেতনাশীলের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুক করে সেইরূপ এই সূক্ষ্মদেহ প্রচ্ছন্নভাবে স্থূলদেহের মধ্যে থাকিয়া উহাদ্বারা নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। বাস্তবিক স্থূলদেহের কোন স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি নাই। সূক্ষ্মদেহের ইচ্ছা বা ভাবাবেশে স্থূলদেহ পরিচালিত হইতেছে মাত্র। বুদ্ধি, অহংতত্ত্ব, মন ও দশ ইন্দ্রিয়, স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া উহাদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে, সূক্ষ্মদেহ তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে এবং জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মে স্বচ্ছভাব ও অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, সূক্ষ্মদেহে আরোপ হয় এবং সেই সেই ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পুনঃপুনঃ স্থূল বা ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। জীব যখন ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি আশ্রয় করে, তখন সূক্ষ্মদেহ স্বর্গ বা উচ্চ লোকের অধিকারী হয়; আর যখন অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি অপরা প্রকৃতিগতগুণগুলি আশ্রয় করে, তখন ভোগ-তাপ-দুঃখ-ময় সংসার ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীব অবিদ্যা বা মায়া-মোহে মুগ্ধ হওয়া নিবন্ধন পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি, যাহা সূক্ষ্মদেহে সংস্কার-রূপে স্তরে স্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে চঞ্চল মনে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। পরন্তু এই জন্মে পূর্ব্বস্মৃতি লাভের জন্য বলবতী ইচ্ছা না হওয়ায়, জীব সে চেষ্টায় সতত বিরত থাকে। আত্ম-জ্ঞান-যোগে পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিতে

হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় বৃত্তি রহিত, অন্তর্মুখী স্থির মনকে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত করিয়া, সেই ঘনীভূত মনকে অহংতত্ত্বের উপর স্থাপন পূর্ব্বক, বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির সূক্ষ্মাগ্র তাহাতে নিবদ্ধ করিতে পারিলেই, তাহা হইতে (ফনোগ্রাফের রেকর্ডের ন্যায়) পূর্ব্বস্মৃতি নিবদ্ধ-যাবতীয় তত্ত্ব অনাহত ধ্বনিযুক্তে আকাশতত্ত্বে প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। সেই প্রতিধ্বনি কখনও কখনও সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট বা ধারণাযোগ্য না হইলে আত্মদর্শন-যোগাশ্রয়ে আর একটু চেষ্টা বা কৌশল অবলম্বন করিলেই, জন্মজন্মান্তরিন্-কর্ম্মস্মৃতি বা জগতের অপর যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব সাধক জানিতে ইচ্ছা করুন না কেন, চিদাত্মার জ্যোতিঃ প্রবাহে (বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের ন্যায়) তাহার প্রতিবিম্ব সাধকের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়। এতাদৃশ দৃক্‌শক্তির সূক্ষ্ম-তত্ত্বানুশীলন, চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণা, উহা মোক্ষ-পথের একটু অন্তরায়। পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণ এই শক্তি অবলম্বনে একস্থানে অবস্থান করিয়া, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমার মনে হয়; ইহা মোক্ষপথের বিঘ্নোৎপাদক জ্ঞান করিয়া, মুমুক্ষুগণ সচরাচর ঐ বিষয়ে শক্তি নিয়োগ করিতেন না। তবে জ্ঞানানুশীলন ইচ্ছায় পূর্ব্বস্মৃতির কোন একটা অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, সেই স্তরের অন্যান্য বিষয়গুলি অনেকটা যেন সহজভাবে আকর্ষিত হয়। মনে কর তুমি বহুকাল পূর্ব্বে রামেশ্বরতীর্থে যাইয়া সমুদ্র বেলা ভূমি হইতে চিত্র-বিচিত্র কয়েকখানি ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ; কিন্তু পরবর্ত্তী সময় অন্যান্য ঘটনার কতকগুলি স্তর পড়িয়া অন্যান্য অতীত স্মৃতির ন্যায় তোমার রামেশ্বর গমনের স্মৃতিকেও আবৃত করিয়াছে। সে অবস্থায় হঠাৎ তোমার সংগৃহীত একখানি ঝিনুক, তোমার দৃষ্টি বা লক্ষ্যস্থলে আসিলেই উক্ত ঝিনুকরূপ অভিজ্ঞান বলে ক্রমে তোমার তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবৃত স্মৃতির অধিকাংশ বিষয়েরই আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। এস্থলে

ঐ ঝিনুকখানার সাহায্যে, তোমার চিন্তাশক্তির কম্পনপ্রবাহ যে ভাবে তোমার অতীত স্মৃতিশক্তির আবরণ উন্মোচনে সমর্থ হইয়াছে, সেইরূপ জন্মান্তরের কোন একটী অভিজ্ঞান, কোনরূপে তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিলেই ঐ স্তরের অন্যান্য বিষয়গুলিও তাদৃশ প্রকারে তোমার স্মৃতিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তোমার মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে। কিন্তু অতীত জন্মের অভিজ্ঞান সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, সাধারণ লৌকিক চক্ষুকর্ণের গোচরীভূত হয় না বিধায়, মানব নিত্য নূতন নূতন কামনা-লালসায় অভিভূত হয়। বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানবশে পূর্ব্বস্মৃতির কোনও তত্ত্ব বা অভিজ্ঞানানুসরণে, চিন্তাশক্তির কম্পনপ্রবাহ অন্তর্মুখী ভাবে সূক্ষ্মদেহে প্রবাহিত করিতে পারে না। তন্নিবন্ধন সংসারে অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তির মলিনতা আবরণে সেই পূর্ব্ব স্মৃতিকে আরও স্তরে স্তরে নিয়ত আবৃত করিয়া থাকে। আত্মদর্শনযোগবলে সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলে অর্থাৎ মনকে ইন্দ্রিয়বিষয়-অপরিগ্রহ অবস্থা যোগ্য, অতীন্দ্রিয় কোন উচ্চস্তরে নিবদ্ধ করিতে পারিলেই, যাবতীয় পূর্ব্বস্মৃতি বা জন্মজন্মান্তরের অতীত স্মৃতি লাভে সমর্থ হয়। সে অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় আত্মজ্যোতিঃ, তপোবলে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ায় সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতিই যেন ইচ্ছামাত্র চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানযুক্ত-তপোবলে চিত্ত নির্ম্মল ও বিষয়-অপরিগ্রহ অবস্থা উৎপাদন করিতে না পারিলে কখনই আত্মদর্শন যোগ্য দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হয় না। এ জন্যই অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বা শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম্মের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য আত্ম-জ্ঞানহীন মানবের পক্ষে ধারণা করাও সহজসাধ্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যভাবে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আহার বিহার সমস্ত কার্য্যেই প্রাঙ্মুখ ও উদঙ্মুখ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রে উক্ত থাকিলেও, আমরা তাহার গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া স্থূলদেহ বা স্থূল জগতের হিসাবে পূর্ব্বমুখী ও উত্তরমুখী হইয়া ঐ শাস্ত্র বাক্য পালন করি।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রাঙ্মুখ অর্থে "অন্তরস্থ পূর্ব্বমুখ" অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি পরিহারার্থ মনের দৃক্‌শক্তিকে স্থূলদেহের পূর্ব্বভাব বা সূক্ষ্মদেহ লক্ষ্যে অন্নময় কোষ ছাড়িয়া, প্রাণময় ও মনোময় কোষাভিমুখে পরিচালনের চেষ্টা এবং উদঙ্মুখ অর্থে অন্তরস্থ উত্তরমুখ বা "আত্মমুখ" অর্থাৎ মনোবৃত্তির বহির্মুখ গতি পরিহারার্থ বুদ্ধি বা প্রাণ চৈতন্যযুক্ত "অহংকে" তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তীর্ণস্থল, দেহের সত্ত্বাংশ আত্মা লক্ষ্যে বিজ্ঞানময়কোষে পরিচালনের অভ্যাস করা। এই উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ানুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আসন মুদ্রা ও ভিন্ন ভিন্ন মুখী ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু হায়! আমরা চিরজীবন শাস্ত্রের বহিরর্থ কর্ম্মের বহিরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, ৺কাশীধামের গঙ্গাবাহী ডিঙ্গি নৌকার কাণ্ডারী হীন দাঁড়ির ন্যায়, পশ্চাদ্‌গামী ভাবে ক্ষেপণি পরিচালনা করিয়া, নানাদিকে যাতায়াত করিতেছি। তদ্ধেতু জীবনের সম্মুখের দিকে আর লক্ষ্য স্থির হইল না এবং অন্নময় কোষ ছাড়িয়া, প্রাণময় মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের তত্ত্বও বুঝিলাম না। পরন্তু প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখের অর্থও ইহ জীবনে স্থির হইল না। তন্নিবন্ধন দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থের ন্যায় জীব, এই সংসার মায়া মরুতেই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান, বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অনৈশ্বর্য্যই অর্জ্জন করিতেছে। **জীব স্থূলে মজিয়া সূক্ষ্মকে ভুলিতেছে।** অথচ জীব সূক্ষ্ম হইতেই উৎপন্ন, সূক্ষ্মই তাঁহার গুরুদত্ত বীজ। সূক্ষ্মই তাঁহার রাজবর্ত্ম (সুষুম্না) এবং সূক্ষ্মভাবেই তাঁহার গতি। সূক্ষ্মজপই তাঁহার (অজপা) কর্ম্ম। সূক্ষ্মই তাঁহার ধ্যান। বট-বৃক্ষের ন্যায়, জীবের সূক্ষ্মবীজ হইতেই উৎপত্তি এবং সূক্ষ্ম-বীজেই লয়।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম শরীর দ্বিবিধ, সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে এবং এই জীব দেহে ব্যষ্টিরূপে বিরাজিত। সমষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত

সূক্ষ্ম দেহ চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্য গর্ভ, বা প্রাণ বলা যায়; যেহেতু তিনি সূত্রের ন্যায় সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত এবং জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতাভিমানী। পরন্তু হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এই সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টিকে স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম হেতু সূক্ষ্ম শরীর ও কোষত্রয় বলা যায়। (স্থূল প্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরং বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়ং) এবং জাগ্রৎ বাসনাত্মকহেতু স্বপ্ন বা স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থানও বলা যায়। অপরন্তু ব্যষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত সূক্ষ্ম দেহ চৈতন্য "তৈজস" শব্দে উক্ত হন। যেহেতু তেজোময় অন্তঃকরণ তাঁহার উপাধি। "এতদ্ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং তৈজসোভবতি, তেজোময়ান্তঃকরণোপহিতত্বাৎ।" হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ে সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন। "প্রবিবিক্ত ভুক্ তৈজসমিতিশ্রুতেঃ" অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে "সূক্ষ্ম বস্তুর ভোগী তৈজস ইতি।" সুতরাং এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরস্পরায় অভিন্ন এবং তদুপহিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসও পরস্পর অভেদ; বন ও বৃক্ষতে যেমন অভেদ, বনাবচ্ছিন্ন আকাশে, বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের যেমন অভেদ, জলাশয়তে জলের ও জল গত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত, জলাশয় গত প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন অভেদ, সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত হিরণ্যগর্ভ এবং তৈজসও তদ্রূপ পরস্পর অভেদ।

"সমষ্টিব্যষ্ট্যোস্তদুপহিত সূত্রাত্ম-তৈজসয়োশ্চ
বন বৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জলবত্তদ্গত
প্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদঃ। ইতি প্রমাণঃ। বেদান্তসার

এ সম্বন্ধে বেদান্তসংজ্ঞাবলীতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে;—

দ্বেধা সূক্ষ্ম শরীরং স্যাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদতঃ।
সমস্তৈঞ্চকবুদ্ধিস্থং সমষ্টিঃ স্যাদরণ্যবৎ॥

ভেদ-বুদ্ধি কৃতা ব্যষ্টির্ব্বিজ্ঞেয়া বৃক্ষবত্তথা।
সমষ্টিঃ সূক্ষ্ম দেহানামুপাধিঃ পদ্মজন্মনঃ ॥

সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে সূক্ষ্ম দেহ দ্বিবিধ, সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে এবং প্রত্যেক জীবদেহে ব্যষ্টি রূপে বিরাজিত। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহের উপাধি পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্ম দেহের উপাধি মহত্তত্ত্ব * বা তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ † বন ও বনের বৃক্ষ সদৃশ উভয়ে মূলত অভেদ। অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও জ্ঞান দৃষ্টিতে পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং স্থূল জগতের যিনি বিধাতা পুরুষ তিনিই ব্রহ্মা। আর স্থূল দেহের যিনি বিধাতা তিনিই সূক্ষ্ম দেহ। উভয়ের কর্ম্মই সৃষ্টি। ব্রহ্মা বৃহদ্‌জগতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সূক্ষ্মদেহও সেইরূপ স্থূল দেহক্ষেত্ররূপ ক্ষুদ্রজগতে তত্তাবৎই সৃষ্টি করিয়াছেন, ও নিয়তভাবে করিতেছেন। বৃহদ্‌জগতের সৃষ্ট পদার্থ লৌকিক চক্ষে

---

* "মহানাত্মা মতির্বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চবীর্য্যবান্।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতি র্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥"

মহতত্ত্ব—আত্মা, বিষ্ণু জিষ্ণু, শম্ভু, বীর্য্যবান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি নামে অভিহিত। তদ্ধেতু এই তত্ত্বটী সমস্ত জীব বা জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও আদিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব যাঁহার ভিতরে যে পরিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই পরিমাণ জ্ঞান সম্পন্ন হন। এজন্য শাস্ত্র ইহাকেই "সমষ্টি বুদ্ধিস্বরূপম্" বলিয়াছেন।

† ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদেন মহানাত্মা হিরণ্ময়ঃ।
তং জানন্ ধ্যানতো যোগী মৃত্যুং নৈবাধিগচ্ছতি ॥

ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয় অবস্থা ভেদে মহানাত্মাই (মহত্তত্ত্বই) হিরণ্যগর্ভ রূপে কথিত হইয়াছে। যোগিগণ এই হিরণ্যগর্ভকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলে জন্ম মৃত্যুর অতীত হইতে পারেন।

দৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্ট পদার্থ লৌকিক চক্ষে দৃষ্ট হয় না। বৃহদ্-জগতে যেমন তল অতলাদি সপ্ত পাতাল, ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক, চতুর্দ্দশ ভুবন এবং জীব সমষ্টিতে পরিপূর্ণ, এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, জীবলোক এবং জীবসমষ্টিতে পরিপূর্ণ। বৃহদ্জগতে যেরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ, নদী, পাহাড় পর্ব্বত, ও কাশী, গয়া, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ আছে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই বিদ্যমান আছে—

"ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্॥

তস্যা মধ্যগতাং সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকাদিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ॥

দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কুলাক্ষরাঃ।
স্বর-মন্ত্র-পুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ॥

বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

উত্তর গীতা।

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপিণী যে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহার শিখাতেই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মক বিশ্বতোমুখ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মজ্যোতিঃ অবস্থিত রহিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই সুষুম্নানাড়ী জগতের বীজস্বরূপ। পরমব্রহ্ম নিরন্তর ইহাতে অবস্থিত আছেন, ইহা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিস্থান। এজন্য ইহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে। চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, পরমেশ্বর, পঞ্চভূত, চতুর্দ্দশভুবন, দশদিক্, বারাণসী প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্র, সপ্তসাগর, মেরু প্রভৃতি অচল, বজ্রশীলা, সপ্তদ্বীপ, সপ্তনদী, সপ্তনদ, চতুর্ব্বেদ, চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণ,

ষোড়ষ স্বর, মন্ত্রবর্গ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, নাগাদি পঞ্চবায়ু এই সমস্তই ঐ সুষুম্নাতে অবস্থান করিতেছে।

অতএব বৃহদ্‌জগতে যাহা আছে, এই ক্ষুদ্র দেহ-জগতেও তাহাই বর্ত্তমান আছে। সূক্ষ্মদেহের শক্তিতে জীব একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া, দেহক্ষেত্র মধ্যেই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। জীব, এই সূক্ষ্মদেহের শক্তি না জানিয়াই, স্থূলদেহকে "আমি" জ্ঞান করিয়া নিজকে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মনে করিয়া থাকে। কিন্তু এই সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ হইতে বহুগুণ শক্তিশালী। সৃষ্টির প্রাক্কালে অব্যক্ত অংশ হইতে প্রত্যেক জীবাত্মার এক এক সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়াছে।

"বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকী শ্রুতিঃ॥"

পঞ্চদশী।

অগ্নি হইতে বহুস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া দূরদূরান্তরে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইলেও, তাহারা যেমন অগ্নি ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্য বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রাণাগ্নি হইতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গবৎ সূক্ষ্মদেহ বিনির্গত হয়। কর্ম্ম পরিপাক বা জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূলদেহ-আবরণে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট। এমন কি সে অগ্নি, জল ও প্রস্তর মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে। একটু নিবিষ্টভাবে ব্রহ্মচর্য্যশীল বা যোগাবলম্বন করিতে পারিলে সূক্ষ্মদেহের অলৌকিক গতিশক্তি মানব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং সেই উপলব্ধিকৃত ধারণাবশে অপর কোন ব্যক্তির দেহত্যাগ সময়ে, তাহার সূক্ষ্মদেহের গতি ও পরিণতি, তাদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বানু- সন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ইহা আম সম্পূর্ণ

বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে আমার যে টুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তন্মধ্যে নিজ দেহ সম্পর্কে একটী প্রত্যক্ষ বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আমি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিলাম। (১) নিজের দেহের ভিতরে সতত যেন নিজের একটা ছায়া ছায়া ভাব প্রত্যক্ষ হইত। সেই ছায়া ভাবটী আমার নিজের অবয়ববিশিষ্ট হইলেও স্থূলদেহাপেক্ষা অনেকটা ক্ষুদ্র ও জ্যোতির্যুক্ত ছিল। উপনয়নের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত স্বীয় অভ্যন্তরে নিজের এই অবস্থা অনুভব করিলেও ইহার কোন তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শিশু, দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেরূপ আনন্দে মুগ্ধ হয়, অথচ সে আনন্দের বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে পারে না, আমার অবস্থাও তাদৃশ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ ভাব লইয়া একাকী নিবিষ্টভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতে আমি ভাল বাসিতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় ঐ প্রকার চক্ষু মুদ্রিত ভাবে থাকার জন্য সময় সময় অভিভাবকগণের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি; সুতরাং তিরস্কারের ভয়ে অনেক সময় চক্ষু মুদিত ভাব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও সেই ভাব অধিকক্ষণ ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে যেন বড়ই কষ্ট জনক বলিয়া বোধ

(১) গ্রন্থকর্ত্তা মাতৃগর্ভ হইতে লৌকিক চক্ষে মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রায় একঘণ্টাকাল তিনি জীবিত কি মৃত তাহা লইয়া, নানারূপ পরীক্ষা হইতে থাকে। তাঁহার দেহের উপর পাঁচ ছয় কলসী জল ঢালা সত্ত্বেও যখন চেতনাশক্তি সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তাঁহাকে মৃত সিদ্ধান্ত করিয়া, অনাবৃত ভাবে সুপারী বৃক্ষের একখানা খোলার উপরে শয়ন করাইয়া, দূরে রাখিয়া, তাঁহার পরমারাধ্যা জননী প্রভৃতি পরিবারবর্গ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। এই ভাবে প্রায় আরও একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া, গৃহ মুক্ত করাই ব্যবস্থা হইলে, সমাধির জন্য তাঁহাকে অপরের হস্তে দেওয়ার সময়, তাঁহার ধাত্রীমাতা বলিলেন যে, "ফেলিয়াইত

হইত। অতঃপর পাঠ্যারম্ভায় পুস্তক পড়িবার ভান করিয়া মনে মনে নিজের ভিতরে সেই মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতাম। কিন্তু শব্দ করিয়া না পড়ার জন্য সময় সময় লাঞ্ছনাও সহ্য করিতে হইত। কাজেই তখন অনন্যোপায় হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে নিজের পাঠ্য অপেক্ষাও কিছু বেশী পাঠ মুখস্থ করিয়া শিক্ষক ও অভিভাবকের তিরস্কার ও লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম। এই সময়ে অন্য একটি ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। আমাদের বাড়ীতে যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা করা হইত, তন্মধ্যে একটী মূর্ত্তিকে আমি বাল্যকাল হইতেই প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতাম। কিন্তু সে মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া তাহার বিসর্জ্জনে হৃদয়ে বড়ই ক্লেশানুভব হইত; এমন কি অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতাম। নিজেই মাটী দ্বারা ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিতাম বটে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়া নিবন্ধন মনে বড়ই দুঃখানুভব করিতাম। এই ভাবে হঠাৎ একদিন ঐ মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া "অভিমানযুক্ত ব্যাকুল প্রাণে" আমার নিজের অন্তরস্থ আত্মরূপ দর্শনেচ্ছায় যেমন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি, অমনিই অভ্যন্তরস্থ ঐ নিজের অবয়ব সঙ্গে সেই প্রিয় দেবমূর্ত্তিটী যেন সংযোজিত দেখিয়া

দেওয়া হইবে, তবে একবার নাড়ীটা পোড়াইয়া দেখি", এই বলিয়া গৃহস্থিত অগ্নিকুণ্ডের উপর একখান মাটীর খোলা রাখিয়া, তাঁহার নাভিমূলস্থ কাঁচা নাড়িটী ঐ উত্তপ্ত খোলায় ছেঁকা দিতে আরম্ভ করেন। দুই তিনবার ছেঁকা দেওয়ার পর, তিনি 'ওঁয়া,' 'ওঁয়া,' 'ওঁয়া,' বলিয়া তিনটী শব্দ করিয়া উঠিলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্যলাভ করায় সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর সমাধির অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। তাই আমরা মৃত মনে করিয়াছিলাম।" যাহা হউক তিনি তাঁহার ধাত্রীমাতার উপস্থিত বুদ্ধি বলেই হউক অথবা তাঁহার শুভ প্রাক্তন বশতঃই হউক, তখন মৃত্তিকাসাৎ হন নাই। (জীবনকথা)

প্রাণে এত আনন্দানুভব করিয়াছিলাম যে তাহা আমি প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ক্রমে ঐ স্বীয় মূর্ত্তির কোন কোন অংশ সেই দেব মূর্ত্তির অবয়বে, কোন কোন অংশ স্বীয় অবয়বে দেখিতাম; অথবা ঐ উভয় মূর্ত্তির যেটী যখন পূর্ণভাবে দেখিবার ইচ্ছা হইত, তাহাই দেখিতে পাইতাম; কিন্তু লণ্ঠনের মধ্যস্থ আলোর ন্যায় উহা একটা আবরণে আবৃত দেখিতাম। এ ভাবটী প্রথম হইতেই ছিল। শিশু দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে ধরিতে না পারায়, যেমন ক্ষুব্ধ হয়, আমার অবস্থাও সময়ে সময়ে সেইরূপ হইত। ক্রমে আমি অন্য কোন দেব মূর্ত্তির সন্নিধানে যাইলে, ইচ্ছামাত্র সেই দেব মূর্ত্তিকেও ভিতরে নিজের প্রিয় দেব মূর্ত্তির সঙ্গে জড়িত দেখিতাম। কিন্তু তাহা ক্ষণ প্রভার ন্যায় অতি অল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ নিজের প্রিয় মূর্ত্তিটীর হাসি কটাক্ষে যেন একটা বিদ্যুচ্চমকিত হইয়া অপর মূর্ত্তি তাহার সঙ্গে জড়িত দেখাইয়াই মিলিয়া যাইত। এমতাবস্থায় আর অন্য মূর্ত্তি দেখিবার বড় ইচ্ছা হইত না। ইহার পর উপনয়ন সংস্কারের দিন আচার্য্যদেব স্বয়ং আমাকে বৈদিক সন্ধ্যা করাইতে প্রবৃত্ত হন। আমার আচার্য্যদেব একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক প্রাচীন ও নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। আপোমার্জ্জনের পর, তিনি যখন আমাকে সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত প্রাণায়াম শিক্ষাচ্ছলে বাহিরের বায়ু আকর্ষণে পূরক কুম্ভকাদি ক্রিয়া কৌশল দেখাইতেছিলেন, তখন আমি কিন্তু দক্ষিণ নাসায় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করামাত্রই ভিতরের বায়ুই যেন চলনশীল ঊর্দ্ধগামী বলিয়া অনুভব হইল। সূর্য্যোপস্থানের সময় অন্তরস্থ নিজের দেহের সহিত জড়িত সেই প্রিয় দেব মূর্ত্তিটীর দেহ জ্যোতিঃই যেন সূর্য্যাকারে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান হইল। ধ্যান কালেও ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপ ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তি আমি ধারণা করিতে পারিতাম না এবং এখনও পারি না। গায়ত্রী জপের সময়ে বহিরঙ্গুলে জপ শিক্ষা করিতেছি, হঠাৎ কতকগুলি বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আমার অন্তরস্থ দেহের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে

এক একবার মিলিয়া যাইত। রুদ্রোপস্থানের সময়ে ভিতরে যে কেমন একটা ভাব অনুভব করিতাম, তাহা তখন আমি ধারণা করিয়াই উঠিতে পারি নাই; তবে শিহরিয়া উঠিতাম। তখন আমার পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বলিলেন, বাবা! অন্যান্য সকলেই (১) মনোযোগ পূর্ব্বক সন্ধ্যা করিতেছে, তুমি এত অন্যমনস্ক কেন? তদুত্তরে সমস্ত কথা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না। যেটুকু মাত্র বলিতাম, তাহা শুনিয়াই তিনি কিছুক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতেন ও শেষে চক্ষু দিয়া জল ছাড়িয়া দিতেন, এবং এই মাত্র বলিতেন যে বাবা! তোমার ভাবেই তুমি সন্ধ্যা করিও, এ বিষয়ে তুমি অপর কাহারও কোন শিক্ষা গ্রহণ করিও না; পরন্তু তোমার এই ভাব দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত অপরের সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনাও করিও না। তজ্জন্য আমি আমার অন্য ভ্রাতাগণের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করি নাই। তাহারা তিন দিনে দণ্ড ভাসাইতে জেদ্ করিয়াছিল, কিন্তু আমার দৃঢ়তাবশেই সকলে দশ দিন ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাধীনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। উপনয়ন সংস্কারের পর অন্যূন বিশ বৎসর কাল আহার বিহারে প্রায় তাদৃশ প্রকার সংযমরক্ষা করিয়াছিলাম। এই সময়ে অনেকেই আমাকে 'বিধবা বা নিরামিষ মানুষ' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। যাহা হউক, এই সকল বিষয় বেশী আলোচনা করা আমার ইচ্ছা নয়।

তখন যদিও আমি তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করি নাই সত্য, তথাপি যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, সেই বৈদিক সন্ধ্যার প্রথম যোগানুষ্ঠান অর্থাৎ সপ্ত ব্যাহৃতিযুক্ত প্রাণায়াম অনুশীলন করিয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইতাম। কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করায় সাধারণের চক্ষে আমি প্রাণায়াম শিক্ষার অধিকারী ছিলাম না; সুতরাং একমাত্র সন্ধ্যা-কাল ভিন্ন

(১) আমার সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ ও খুড়াত তিন ভ্রাতার একত্র উপনয়ন হইয়াছিল।

অন্য সময় গোপনে আমাকে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইত। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমান হয় যে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণ জাতি আত্ম-জ্ঞান-ভ্রষ্ট হওয়ায় বৈদিকানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আপামর সাধারণের ন্যায় একমাত্র তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানকেই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করায়, দ্বিজগণ, বিশেষতঃ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে ক্রমে যোগ-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমি বৈদিকী দীক্ষামতে গোপনে যোগানুশীলন করিয়া প্রাণে যেমন শান্তি পাইতাম, তেমনই অন্তরস্থ সূক্ষ্ম দেহের গতিবিধি সম্বন্ধে নানা অলৌকিক তত্ত্ব সন্দর্শন করিতাম। কিন্তু সমস্ত তত্ত্ব হয় ত তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না ; এজন্য কোন কোন সময়ে কি যেন একটা অপূর্ণ ভাব আমার প্রাণকে উদাস করিয়া তুলিত। একদিন আমি সেইরূপ উদাস প্রাণে অন্তরস্থ সূক্ষ্ম দেহের উপর লক্ষ্য করিয়া যেন একটু বেশী নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম ; কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম জানি না। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ হইল, যেন আমার অন্তরস্থ সেই প্রিয় দেবমূর্ত্তিটী পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়রূপে আমার সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছেন এবং আমার সূক্ষ্ম দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার সেই জ্যোতিঃ বহির্গত করিতেছেন। তাঁহার আকর্ষণে আমি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ণনাভের সূত্র বন্ধনে ঊর্দ্ধে উঠার ন্যায় (সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহের ব্রহ্মরন্ধ্রের সহিত সূক্ষ্ম সূত্রে সম্বন্ধ রাখিয়া) ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছি। পরন্তু নিম্নস্থ স্থূল দেহটাকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতেছি বটে, কিন্তু তখন আমিত্ব ভাব সূক্ষ্মদেহেই নিবদ্ধ ছিল। স্থূল দেহটাকে একটা খোসার মত জ্ঞান হইতেছিল মাত্র। এই ভাবে আমি যতই ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলাম ততই যেন আমাকে প্রভূতশক্তিমান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলাম এবং আমি ক্রমশঃই আনন্দে অভিভূত হইয়া আকাশ পথে ইতস্ততঃ বিচরণশীল অনন্ত ক্ষুদ্র দেহধারীর মধ্য দিয়া হেলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিলাম। আকাশ মার্গে বিচরণশীল যত ক্ষুদ্র দেহ আমার দৃষ্টি পথে

পড়িতেছিল সকলই যেন দর্শন মাত্র আমার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিল। আমি যাঁহাকে অবলম্বনে ও যাহার উপর আসন করিয়া উঠিতেছি, সেটী একটী জ্যোতির্ম্মুক্ত পদার্থ। সেই জ্যোতিঃটী আমার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে উত্থিত হইয়া বামাবর্ত্তে আমাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মূলাধারের নিম্নে আমাকে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া উর্দ্ধমূখী কোন অনন্ত জ্যোতিঃর সহিত যুক্ত হইয়াছে ; অথবা উর্দ্ধস্থ মহাজ্যোতিঃ হইতে একটী জ্যোতিঃ-প্রবাহ আগত হইয়া আমার সূক্ষ্ম দেহস্থ মস্তকের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। * কিন্তু সেই জ্যোতির যেন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে এবং তাহারই বলে আমি উর্দ্ধে উঠিতেছি। এই ভাবে যেন এক একটী স্তর অতিক্রম করিয়া অন্যস্তরে পৌঁছিতেছি। এবং প্রত্যেক স্তরের অবস্থা যেইরূপ বিভিন্ন তেমনি তত্রত্য দেহধারিগণের আকার প্রকার অবস্থা ও গতিবিধিও পরস্পর বিভিন্ন। যতই উর্দ্ধে উঠিতেছিলাম ততই যেন তাহাদের আকৃতি জ্যোতির্ম্মুক্ত, মানসিক ভাবও অপেক্ষাকৃত শান্তি পূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। পরন্তু নিম্নস্তরের দেহগুলিকে যেরূপ ছায়া ছায়া লঘু ও ধূম্রবর্ণের মত দেখিতেছিলাম, যতই উপরে উঠিতেছিলাম ততই যেন সেই ধূম্রবর্ণের বপুগুলি গাঢ় ও তেজোযুক্ত মনে হইতেছিল। নিম্নস্তরের জীবগুলি যেরূপ দীন-ভাবাপন্ন উর্দ্ধস্তরের জীবগুলি যেন অপেক্ষাকৃত শান্তি ভাবাপন্ন। নিম্নস্তর নিষ্প্রভ অর্থাৎ কুয়াসার মত অন্ধকার যুক্ত এবং দূরবর্ত্তী চতুঃপার্শ্ব-মধ্যে কোন কোন স্থানও গাঢ় অন্ধকার যুক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু

* পুস্তক সঙ্গীয় গ্রন্থকারের হাপটোন চিত্র দেখ। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার কতিপয় শিষ্য ও ভক্ত বন্ধু ইঁহার একখানা ফটোগ্রাফ্ বা আলোক চিত্র গ্রহণের চেষ্টা করেন কিন্তু ইনি বরাবরই স্থূল দেহের প্রতিকৃতি প্রদানে অসম্মত ছিলেন। অবশেষে উক্ত বন্ধুবর্গের অনুরোধে সম্মত হন, একদিন ইঁহার ধ্যান ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ফটোগ্রাফ্ লওয়ার সময় একটী উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নেগেটিভে দৃষ্ট হয়। পরে ফটো

আমি ঐ সকল স্তরের অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাইতেছি কি না, ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই; যেহেতু আমাকে যে জ্যোতিঃ-প্রবাহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতেছিল, সেই জ্যোতিঃ হইতে দশ দিকেই যেন মণ্ডলাকারে জ্যোতিঃ বিস্তৃত। কখনও কখনও বা ষ্টীমারের সম্মুখস্থ বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় এক এক দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত জ্যোতীরেখা দেখা যাইতেছিল। আমার যেদিক্ যখন দেখিতে ইচ্ছা হইত, সেই দিকই ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন ঐ জ্যোতিঃ-প্রবাহ প্রসারিত হইত। এই ভাবে যে দিকে যখন জ্যোতিঃ-প্রবাহ বিস্তৃত হইত, সেই দিকের জীবগুলি যেন আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া এক প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিত উহা আমি ঠিক বুঝিতাম না বটে, তবে সকল দিকের ধ্বনি যে এক প্রকার শব্দ যুক্ত নয়, অথচ উৎফুল্লতা ব্যঞ্জক তাহা আমি বেশ বুঝিতাম। এইরূপ নানাভাব-বিমুগ্ধ মনে এমন একটী স্তরে পৌঁছিলাম, যেখানে একটা আশ্রয় লইয়া অনেক জীব অবস্থান করিতেছে, তথায় নানারঙের অসংখ্য খুঁটা পোতা রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটীর সঙ্গে ঘটিকা যন্ত্রের স্প্রিংএর ন্যায় বহু ভাবের, বহু রঙে, চিত্র-বিচিত্র এক একটী স্প্রিংএ বহু জীবদেহ জড়িত, তাহারা নানা প্রকার গতিশীল; কেহ বা স্প্রিংএর

ছাপা হইলে সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হন, কারণ ফটো অনুরূপ শুভ্রকান্তি পিঙ্গল বর্ণ জটা গ্রন্থকারের স্থূল দেহে নাই। ইনি কখনও জটা রাখেন নাই। বাল্যে জটা ছিল, মাতৃগর্ভ হইতে একটি জটা নিয়া ভুমিষ্ঠ হন। পরে আর এ পর্য্যন্ত জটা হইতে দেন নাই, অথবা ভস্মও মাখেন না, অথচ ফটোগ্রাফে যে বিভূতিমণ্ডিত পিঙ্গল জটা নাদবিন্দু সহ মহান্ জ্যোতির্যুক্ত প্রণব বিজড়িত চেহারা উঠিয়াছিল, তাহা ইহার সূক্ষ্ম দেহে ভ্রমণ সম্বন্ধে বর্ণিত জ্যোতিঃরই প্রতিবিম্ব, আলোক চিত্রে উঠিয়াছে ইহা একটী আশ্চর্য্য বিষয় সন্দেহ নাই। তজ্জন্য পুস্তক মধ্যে আমার ঐ আলোক চিত্রের হাফটোন চেহারা সন্নিবেশ করিলাম। (অত্র গ্রন্থের ধ্যান প্রকরণে ও পরিশিষ্ট খণ্ডে দেহ হইতে জ্যোতিঃ নির্গমণের ক্রিয়া যোগ বর্ণিত আছে।) (জীবনকথা)

মধ্যে থাকিয়া ধীর গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বীয় স্বীয় দেহটীকে জড়িত করিতেছে। কেহ বা দ্রুত গতিতে এমন ভাবে পাক দিতেছে যে, মনে হইতেছিল যেন তদ্দ্বারা তাহাদের অস্থি মাংস নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে। কাহারও দেহ হইতে অজস্র রক্ত ধারা নির্গত হইতেছে, তবুও বিরাম নাই, আরও পাক্ দিতেছে। কেহ কেহ বা পাক্ খুলিতেও চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা এক পাক্ খুলিতেছে, দুই পাক্ বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা উহার মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কি কৌশলে ডিগ্‌বাজি খাইয়া কখন বা উপরে উঠিতেছে কখন বা নীচে দুলিতেছে। ঐ প্রকার ঘোরাফেরা ও নিষ্পেষণের ফলে, কাহার কাহার দেহের অবস্থাও বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা দেহের কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই সকল অত্যদ্ভূত ব্যাপারের সকল বিষয় লিপি বদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত এবং তাহা উদ্দেশ্যও নহে। আমি এ স্থলে কেবলমাত্র "সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব" এবং তাঁহার কর্ম্ম পরিপাক ও অপ্রতিহত গতি শক্তির বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব। পূর্ব্বোক্ত ভাবে একে একে বহুস্তর বিচরণ করিয়া বুঝিলাম যে, আমরা ঊর্দ্ধে যে সকল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র রাজি অবলোকন করিয়া থাকি, সমস্তই যেন এক একটী জীবলোক। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষি-তপস্বিগণ জ্যোতির্ম্ময় দেহে সেই এক একটী জীব লোকের আধার স্বরূপ ও সকলেই পূর্ণানন্দভাব প্রাপ্ত। আমি সেই ঋষি-মণ্ডলে যাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অভ্যর্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া আমার সূক্ষ্মদেহটীও যেন তাঁহাদের ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে বুঝিলাম এবং তাঁহারা আমাকে আরও ঊর্দ্ধলোকে যাইতে অনুজ্ঞা ও অঙ্গুলিসঙ্কেতে অনেক স্থানের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহাদের পরিচয়মতে বুঝিলাম যে আমি তখন দেবলোক ছাড়িয়া অনেক ঊর্দ্ধে আসিয়াছি। এইরূপে আরও বহুস্তর অতিক্রম করিয়া, এমন একটী স্থানে পৌঁছিলাম, যেখানে পৌঁছান মাত্র আমার সূক্ষ্মদেহের আকার ক্রমে যেন

বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছে। পলকে কি যেন কেমন এক অব্যক্ত অবস্থা সংঘটন হইয়া গেল বুঝিলাম না। আমার তখন মনে হইল, সেই স্থানে গেলে সূক্ষ্মদেহের মুক্তি বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে অব্যক্ত অংশের কোন তত্ত্ব আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এইভাবে অব্যক্ত জগতের সহিত মিশিয়া যাইতেছি—ইহারই মধ্যে যেন আমার সূক্ষ্মদেহের সহিত নিবদ্ধ কর্ম্মসূত্রের হঠাৎ আকর্ষণে একেবারে এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম যে, সেখানে আসিবামাত্রই আমার সেই পূর্ব্ব প্রিয় দেবমূর্ত্তিটী সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত এরূপ একটা বৈদ্যুতিক ভাবের আদান প্রদান হইল যে, আমি তাঁহার সহিত মিশিয়া গেলাম, অথবা তিনি আমার সহিত মিশিয়া গেলেন, তাহা আর ধারণা করিতে পারিলাম না; অর্থাৎ অভেদ ভাবে আমাকেই আমি সেই আকারে দেখিতে লাগিলাম এবং সেই রূপের সদৃশ আরও বহুমূর্ত্তি দেখিলাম। তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। এইখানে তাঁহার সহিত আমার অনেক বাক্যালাপ হইল; কিন্তু তাহা যেন মানুষের ভাষায় নহে। অনেক তত্ত্বানুসন্ধান পাইলাম। প্রকৃতি পুরুষের অভেদত্ব বিভিন্নত্ব আমি এইস্থানেই প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর আমাকে অন্য একটী স্তরে লইয়া যাওয়ায় আমিও যেন সেই স্তরের দেবদেহ-রূপ প্রাপ্ত হইলাম এবং সেই আকৃতির বহুমূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু সকলের মধ্যেই যেন এক একজন প্রধান। এইভাবে উপর্য্যুপরি কয়েকটী স্তরই দেখিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি আমার সেই নব দেবদেহ সঙ্গে বিযুক্তভাবে বিচরণপূর্ব্বক এমন একস্থানে আসিলেন যে, সেখানে সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ রূপ এবং অতীব মনোহর। সে স্থান হইতে একটী জ্যোতিঃ-প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া বহুদূরে আমার স্থূলদেহ দর্শন করাইবামাত্রই আমি পুনর্ব্বার স্থূল অবয়বে সূক্ষ্মদেহ লাভ করিলাম। তিনিও আমার অন্তরে মিশিয়া গেলেন। তখন আমি

স্থূলদেহের সহিত যে সূত্রে বদ্ধ ছিলাম, সেই সূত্র অবলম্বনে স্থূলদেহের আকর্ষণে আসিয়া স্থূল দেহগত হইয়া পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলাম।

"আমি স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পুনর্ব্বার পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের ন্যায় দুঃখে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তখন আমার জনক জননী ও অন্যান্য অনেকে আমার কাছে আসিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাত্রিকাল. সমস্ত রাত্রি সকলে মিলিয়া আমার শুশ্রূষা করিলেন। সময় সময় একটু সংজ্ঞা হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হইত। এইভাবে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। আহার, নিদ্রা, কি কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তির কোন কর্ম্মে, আমার জ্ঞান ছিল না। বিশেষ চেষ্টা করিয়া, বাহিরে আমার চৈতন্যশক্তি ক্ষণকালের জন্য আসিলেও আমার বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আসিত না এবং কাহাকেও চিনিতে পারিতাম না; অথচ অনেক অলৌকিক ও ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিয়া ফেলিতাম। পরে শুনিয়াছি; সেই অবস্থায় অনেকের ইষ্টমন্ত্র ও অনেক গুহ্য কথা, আমি অনায়াসে বলিয়া দিয়াছি। এই অবস্থায়, কেহ কেহ আমাকে ভূতে পাইয়াছে বা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে বলিয়া ঝাড়া ফোঁকা ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই যখন দেহ আরোগ্য হইল না, তখন অনেকেই আমার জীবনাশায় হতাশ হন্। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব একজন সাধক পুরুষ ছিলেন, (১) তিনি আমার অনেক তত্ত্ব জানিতেন। তিনি পাঁচটী বিল্বপত্র মন্ত্রপূত করিয়া, আমাকে খাইতে দেন; আমি তাহা খাওয়ার পর আমার মহাগুরু মাতৃদেবীর শ্রীপাদপদ্ম আমার বক্ষে রাখিতে ইঙ্গিত করি এবং তাহাতেই

(১) আমার পিতা ৺গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন প্রথিত নামা যোগিপুরুষ ৺রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৩০৭ সালের ১০ই কার্ত্তিক দেহত্যাগ করেন।

আমি ক্রমে প্রকৃতিস্থ হই (১) কিন্তু সময় সময় পূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম; তখন আমাকে তান্ত্রিক দীক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুদেবকে আনান হয়। তিনি একজন মহাপণ্ডিত। তিনি আসিয়াই অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, কিন্তু আমার সেই অবস্থায় প্রাগুক্ত অলৌকিক তত্ত্বের একমাত্র ভাব ভিন্ন, বিবরণ সম্বন্ধে কোন স্মৃতি ছিল না। ভাবের বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দেওয়া স্থির করিয়া আমার রাশি-নক্ষত্রানুসারে মন্ত্র নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বরাত্রে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, "তুমি উহার দীক্ষা দেওয়ার অধিকারী নও, একমাত্র উহার মা ভিন্ন অপর কেহ গুরু হইবে না এবং মন্ত্র তাহার মাতাই বলিয়া দিবে।" আমার মাতাঠাকুরাণী ও আমি, উভয়েই ঐ ভাবের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হই; অধিকন্তু যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষা দিতে হইবে, মাতাঠাকুরাণী স্বপ্নযোগে সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন্। তিন জনের স্বপ্নবৃত্তান্ত একই রূপ হওয়ায় আমার মহাগুরু মাতৃদেবী স্বীয় স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে আমাকে দীক্ষা প্রদান করেন। তদ্দ্বারা আমি বেদ ও তন্ত্রের গূঢ়রহস্য প্রণিধানে সমর্থ হই এবং আমার ভিতরের একটা আবরণ যেন উন্মুক্ত হইয়া গেল, এরূপ জ্ঞান হইয়াছিল।

ভগবৎ কৃপায় বাল্যকাল হইতেই আমার হৃদয়ে একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কোন প্রকার কার্য্যে, ব্রতী হইবার পূর্ব্বে আমি চক্ষু মুদিত করিয়া, আমার সেই অন্তরস্থ মূর্ত্তি প্রদীপ্ত না দেখিলে, লৌকিক চক্ষে সেই

---

১) আমার মাতৃদেবীও একজন বিশিষ্ট তপঃ পরায়ণা ছিলেন, তিনি গত ১৩১৩ সনের ৯ই আশ্বিন মহানবমী পূজার দিন জগন্মাতার মহাপূজার দক্ষিণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইহলোকের কর্ম্মদক্ষিণা শেষ করিয়া, জগজ্জননীর অনুগামিনী হন। আমার পিতামাতার স্বধর্ম্মপরায়ণতাবলেই আমি বহুদিন ব্রহ্মচর্য্যভাব রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

কার্য্য যতই করণীয় হউক না কেন, কদাচ তাহাতে অগ্রবর্ত্তী হইতাম না। অপরন্তু যে কার্য্যে আমার অন্তর প্রদীপ্ত দেখিতাম, তদনুষ্ঠানে দুঃখ কষ্ট বা বাহ্য কোনরূপ নিন্দা বা গ্লানির কারণ হইলেও, তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। বর্ত্তমানেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানবের এই "আত্ম-ধ্যান" কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও শক্তিবর্দ্ধক। এই শিক্ষার অভাবে, লোক "অহংজ্ঞানে" কর্ম্ম করিয়া, ভোগ-সুখে বদ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, নানা কারণে আমি সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক বৃত্তান্তটী ধারণা করিয়া রাখিতে পারি নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে আমি যেন "অনন্ত বিস্তৃত" এইরূপ জ্ঞান হইত এবং কি যেন একটা ভাব খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মনে হইত। * * * *

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার পর হঠাৎ আমি মদীয় মাতুল মাতুলানীর সঙ্গে (১) "চন্দ্রনাথ তীর্থে" যাইতে বাধ্য হই। সেটীও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। যেন ভগবৎ প্রেরণায় আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেখানে তিন দিন মাত্র ছিলাম, ইতি পূর্ব্বে আর কখনও আমি তথায় যাই নাই; কিন্তু পাহাড়ে বিচরণ করিতে করিতে কোন কোন স্থান যেন আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একটী স্থানে যাইয়া আমি বিশেষভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন সঙ্গীয় সকলকে বিদায় দিয়া সেই স্থানে উপবেশন করায় কিরূপ একটা আনন্দভাব যে উপস্থিত হইল, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ; হঠাৎ চন্দ্রশেখর তুল্য এক মহাপুরুষ (যাঁহাকে আমি সূক্ষ্মদেহে বিচরণ অবস্থায় কোন স্থানে দেখিয়াছি) আমার নিকটে আসিয়া আমার শিরে হস্ত প্রদান করিলেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমার যেন

(১) বরিশাল-রহমৎপুর নিবাসী স্বনাম ধন্য স্বর্গীয় ৺রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয়া পত্নী।

কি একটা শক্তির আদান প্রদান হইয়া গেল। দুই একটী কথা দ্বারা আমার পূর্ব্ববৃত্তান্তের কোন কোন অংশ তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার দেহে দুই একটী চিহ্ন দেখাইলেন। তদ্দর্শনে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন আমার অতীত স্মৃতির একটা আবরণ খুলিয়া গেল। পরন্তু ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া, যাহা দেখাইলেন, তাহা যেন আমার পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ। আমি আমার সূক্ষ্মদেহে তাহার স্বরূপ বা বিভূতি যেন পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম। এ ব্যাপার বাহিরে কি ভিতরে হইল বুঝিলাম না। চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, সন্ধ্যা অতীত প্রায়। আমার অনুসন্ধানে লোক আসিয়াছে। বাধ্য হইয়া বাসায় গেলাম। ভয়ে কোন কথা বিশেষভাবে কাহাকেও কিছু বলিলাম না। সেই হইতে আমার পূর্ব্বস্মৃতি যেন একটু একটু করিয়া জাগরিত হইতে লাগিল। অতঃপর আমি ৺কাশীধামে আসিবার জন্য আমার অন্তরস্থ প্রিয় মূর্ত্তিটী কর্ত্তৃক সততই যেন আদিষ্ট হইতাম, এবং নানারূপ অলৌকিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা সকল সন্দর্শন করিতাম। কিছু দিন পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ৺কাশীধামে আসিতে বাধ্য হই ও বিবিধ প্রকারে আত্ম-বিভূতি সকল উপলব্ধি করি। তন্মধ্যে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় দর্শন করিয়া, আনন্দে অভিভূত এবং তৎসঙ্গে আমার পূর্ব্বোক্ত লুপ্ত স্মৃতি সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। পরন্তু আত্ম-দর্শন-যোগ সম্বন্ধেও নানা জটিল তত্ত্ব যেন ৺বিশ্বনাথের কৃপায় সহজে সমাধান হইয়া গেল। এ সকল যেন পূর্ব্ব হইতেই আমাতে সঞ্চিত ছিল বলিয়া উপলব্ধি হইত। কোন স্থানে কোন বিষয়ে দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান হইলে, বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের ন্যায় যেন সেই সকল বিষয় কেহ আমাকে ইচ্ছামাত্র প্রদর্শন করাইয়া আনন্দে অভিভূত রাখিতেন। বর্ণিত আত্ম-দর্শন-যোগ তাঁহারই করুণা-প্রসূত। যাহা হউক, এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,

পূর্ব্বস্মৃতির কোন একটা অভিজ্ঞান কোনরূপে প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে সেই স্তরের অন্যান্য সকল তত্ত্বই যেন সহজে আসিয়া পড়ে। পরন্তু প্রাপ্য বস্তুর বোধ বা জ্ঞান হইলে, তখন প্রাপ্তির ইচ্ছাও বলবতী হইয়া থাকে এবং তাহার পন্থাও সহজ হইয়া আসে। সেই ভাবে আমার হারান-স্মৃতি অনেক কুড়াইয়া পাইয়াছি ও পাইতেছি। এতৎ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা করিতে যাইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন সম্বন্ধে কর্ম্মজীবনে যাহা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকা সাধনবলে যাহাতে আত্মোপ-লব্ধি করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে মদীয় এই "**আত্ম-দর্শন-যোগ**" তাহাদের পথপ্রদর্শক হইবে আশা করি। প্রাক্তন ফলে কিম্বা গুরুকৃপাবলেও আত্মদর্শন (সুহূর্দর্শমিদংরূপং) লাভ হইতে পারে। "**আত্ম-ধ্যান**" অভ্যাসেই এই শক্তি লাভ হয়। দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত মনের শক্তিতে আত্ম-জ্ঞান বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান অবস্থা ধারণা করিতে পারিলেই, পন্থা সহজ হয়। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"প্রাবৃত্য কম্বলং শুক্লং যোগী তস্মান্মনোময়ম্।
চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বা তৎ প্রবণং মনঃ॥"

যোগিগণ মনোময় শুক্ল কম্বলে সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া, মনকে পরব্রহ্মে সংযুক্ত রাখিয়া একান্ত মনে তাঁহারই চিন্তা করিবেন।

"যোগযুক্তঃ সদাযোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সূক্ষ্মাস্তু ধারণাঃ সপ্ত ভূরাদ্যা মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥"

অল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয়, যোগপরায়ণ যোগী, সকল সময়েই ভূরাদ্যা সপ্ত সূক্ষ্ম ধারণাকে মস্তকে ধারণ করিবেন।

"সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি।
তস্মিংস্তস্মিংল্লয়ং সূক্ষ্মে ভূতে যাতি সুনিশ্চিতম্॥"

যোগী এই সপ্তবিধ পদার্থ অতিক্রম করিলে ইচ্ছানুসারে সেই সেই সূক্ষ্মেতে বিলীন হইতে পারেন; ইহা সুনিশ্চিত জানিবে। এই সূক্ষ্ম ধারণাযোগে অণিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়। তখন যোগী নানাবিধ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন।

"অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাংস্তথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্রঃ পরং নির্ব্বাণসূচকান্॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽণীয়ান্ শীঘ্রত্বং লঘিমাগুণঃ।
মহিমাঽশেষ পূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ॥
প্রাকাম্যস্য চ ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ।
বশিত্বাদ্বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ॥
যত্রেচ্ছাস্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা।
ঐশ্বর্য্য কারণৈরেভির্যোগিনঃ প্রোক্তমষ্টধা॥" দত্তাত্রেয়

হে নরশ্রেষ্ঠ! অধিক কি, অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্যত্ব, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব এই অষ্টপ্রকার নির্ব্বান সূচক ঐশ্বরিক গুণ, সাধক লাভ করিতে পারেন। উক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য মধ্যে যে অবস্থায় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইতে পারা যায়, তাহার নাম অণিমা। যদ্দ্বারা শীঘ্রকারিতা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম লঘিমা। যাহা দ্বারা জগতের সর্ব্বস্থানে সমাদৃত হইতে পারা যায়, তাহার নাম মহিমা। যে শক্তিবলে সমস্ত দ্রব্য ইচ্ছামাত্র লাভ হয়, তাহার নাম প্রাপ্তি। যে অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী হওয়া যায়, তাহার নাম

প্রাকাম্যত্ব। যে অবস্থায় সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর হইতে পারা যায়, তাহার নাম ঈশিত্ব। যে অবস্থায় সকলে বশীভূত হয়, তাহার নাম বশিত্ব। যাহা দ্বারা যে স্থলে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করা যাইতে পারে, তাহার নাম কামাবসায়িত্ব। সাধক এই প্রকার সাধনবলে অষ্টবিধগুণ অর্জ্জন করিয়া ইচ্ছামাত্র সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন এবং সূক্ষ্মদেহে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। (পরিশিষ্ট দেখ) অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান যোগ সাধকের পক্ষে নিশ্চয় "**আত্ম-দর্শন**" লাভের সহজ ও প্রকৃষ্ট পন্থা।

আত্মদর্শন যোগ

প্রথমস্তর

চতুর্থ প্রকরণ।

কর্ম্মযোগে আত্ম-দর্শন।

কর্ম্ম-যোগে আত্ম-দর্শন লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, তাহা ভাল করিয়া বিচার করা আবশ্যক। যে কর্ম্ম মুক্তির পথ প্রদর্শক তাহাই কর্ম্ম, আর যাহা মুক্তির পরিপন্থী বা বিপরীত তাহাই অকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। কর্ম্মযোগের প্রারম্ভে ঐ মুক্তি অর্থে ইন্দ্রিয়-বিষয় বা কর্ম্ম-ফলাসক্তির বন্ধন হইতেই মুক্তি বুঝিতে হইবে। ভোগাসক্তিরূপ মলিনা বাসনা হইতে মুক্ত হওয়াই কর্ম্মের উদ্দেশ্য, তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারাই স্বধর্ম্মপালন ও শান্তি লাভ হয়। প্রথমে আত্ম-জ্ঞান শ্রবন-মনন ব্যতীত, কর্ম্মযোগ-সাধনোপযোগী অবস্থা কদাচ লাভ হইতে পারে না। এ নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুধাময়ী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় **"সাংখ্য বা আত্ম-জ্ঞান যোগের"** পর কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু অর্জ্জুন নিতান্ত অবোধ বা অজ্ঞানীর ন্যায় সেই উপদেশ তখনই প্রতিপালন করেন নাই। অষ্টাদশাধ্যায় গীতা শ্রবণান্তর অর্থাৎ মোক্ষযোগ শ্রবণের পর, সম্পূর্ণ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া, অবশেষে কর্ম্ম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিয়াছেন।—

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

গীতা ১৮ অধ্যায়।

হে অচ্যুত! আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমি তোমার শাসনে স্থিত হইলাম, আমি সংশয়শূন্য হইয়াছি, এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব, অর্থাৎ তোমার আদিষ্ট স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধ করিব। সুতরাং গীতা পাঠে আমরা স্থূলভাবে কয়েকটী উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই যে,—মায়া-মোহ-বিষাদিত অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ নানাভাবে আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ ও দৃঢ় মননযুক্ত হইয়াই নিদিধ্যাসন বা কর্ম্ম না করিয়াও, একমাত্র গুরুকৃপাবলে বিশ্বরূপ বা "আত্মদর্শন-যোগ" প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ ব্রহ্মাবতার শ্রীকৃষ্ণরূপী গুরু কর্ত্তৃক স্বধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে মোক্ষ বা সন্ন্যাস-যোগ শ্রবণ দ্বারা, চিত্ত বিশুদ্ধ অর্থাৎ দৃঢ় ভাবে আত্ম-জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ধের ন্যায় তিনি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। পরন্তু গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য শিষ্যের প্রতি রুষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করেন নাই অথবা ক্রোধোত্তেজিত ভাবে সেই ধর্ম্মযুদ্ধরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে অর্জ্জুনরূপী শিষ্যও কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে যতই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াছেন, গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণও ধীরভাবে এক একটি করিয়া তাহার সদুত্তর দিয়াছেন। অধিকন্তু অর্জ্জুন যে সকল বিষয় প্রশ্ন করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজে সেই সকল বিষয় উত্থাপন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের চিত্ত হইতে সংশয়রূপ অজ্ঞানতার মূলোৎপাটন করিবার জন্য যে সাধারণভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াই গুরুর কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাই নহে। তিনি আত্ম-শক্তিবলে শিষ্যকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত এবং প্রত্যক্ষভাবে অন্তর বাহিরে

আত্ম-দর্শন বা সর্ব্বভূতে বিশ্বরূপ-দর্শন করাইয়া শিষ্যের হৃদয়স্থ বদ্ধমূল কুসংস্কার বা অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ব্বক স্বধর্ম্মযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রতি বিশ্বাস অবিচলিত ও তাহা সুদৃঢ় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কারণ গুরুর কর্ত্তব্য তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অর্জ্জুনের হৃদয়স্থ বদ্ধমূল দেহাত্মবোধ-রূপ কুসংস্কার বা অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপ বিদূরিত করিয়া, তথায় "আত্ম-জ্ঞান" সুদৃঢ় করিতে না পারিলে, অনিত্য মায়া-মোহ নিরাশ ও কর্ম্ম সিদ্ধি-রূপ যুদ্ধে জয়লাভ কদাচ তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তদ্ধেতু তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জুনের বদ্ধমূল কুসংস্কার অপনোদন করিয়া, চিত্তশুদ্ধিজনিত পুরুষকার উদ্রেক ও আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সেই পুরুষকারলব্ধ আত্ম-শক্তির অনুবলে কুরুক্ষেত্র-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহামহারথীগণকে পরাস্ত করাইয়া, অবিশ্বান্ধ (মনঃস্বরূপ) ধৃতরাষ্ট্রকে পর্য্যন্ত সত্যমণ্ডিত স্বধর্ম্ম ও গুরুর মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাইয়াছিলেন যে,—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

গীতা ১৮ অধ্যায়।

যেস্থানে আত্মশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপ পরম জ্ঞানী গুরু এবং যে স্থানে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিষ্য, সে স্থলে কর্ম্মযোগ-সিদ্ধিরূপ বিজয়শ্রী, অচলাসম্পৎ ও স্থিরা নীতি, ধ্রুবসত্যরূপে বর্ত্তমান আছে।

অতএব গীতা পাঠে আমাদের প্রথমতঃ এই একটী স্থূল জ্ঞান লাভ করিতে হইবে যে, সংসার মায়াভিভূত শিষ্যকে কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশে, তাহার মন হইতে অনিত্য-মায়া-মোহজনিত অজ্ঞান বা বদ্ধমূল কুসংস্কার অপসারিত করিয়া,

যে কোন উপায়ে শিষ্যের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এতদর্থে উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকুল স্বরূপে যে সকল বিষয়ে সাধকের চিত্ত কামনা-বাসনাজনিত অনিত্য পদার্থের মায়ামোহে আকৃষ্ট আছে, বিশেষ ধীরতা সহকারে তাহা সতত পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের দোষানুদর্শন করাইয়া. আত্মজ্ঞান প্রদানে ঐ সকল বাহ্য বিষয় হইতে তাঁহার চিত্তকে ফিরাইয়া সংযমানুগামী বা আত্মাভিমুখী করা উপদেষ্টার প্রধান কর্ত্তব্য। ভগবদ্গীতায়ও তাহাই উক্ত আছে—

"অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥"

গীতা ১৩ অধ্যায়।

অধ্যাত্ম বা আত্ম-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, এতদ্ ভিন্ন যাহা, তাহা অজ্ঞান। এইরূপে সর্ব্বাগ্রে শিষ্যের অজ্ঞান জনিত কর্ম্মাসক্তি দূরীকরণার্থ পুনঃ পুনঃ তাহার কৃতকর্ম্মের দোষানুদর্শন করাইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা করিতে হইবে। (১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "স্বধর্ম্মত্যাগ দোষকর," কেবলমাত্র এতাদৃশ নীতিবাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অর্জ্জুনের দেহাত্মবোধরূপ কুসংস্কার-মূলক অজ্ঞানতা নিবন্ধন, স্বধর্ম্মে উপেক্ষাজনিত কাপুরুষতার জন্য, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনা দ্বারা দোষানুদর্শন করাইয়া, তাঁহার

(১) গীতায় এতৎসম্বন্ধে অমানিত্বাদি বিংশতি প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ আছে যথা—আত্মশ্লাঘারহিত, দম্ভহীনতা, পরপীড়া ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তর্ব্বাহ্যশুচিতা, প্রাণেরস্থিরতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন, দার-পুত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি (তাহাদের মায়ায় অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না হওয়া) ইষ্ট ও অনিষ্টে ধৈর্য্যশীলতা, আত্মাতে অনন্য যোগ, অর্থাৎ

মোহাবসন্ন-বিষাদিত মনে নানাভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করিয়াছেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অর্জ্জুন! তুমি নিষ্কাম ও যোগযুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া যোগী হও, তাহা হইলে কর্ম্মফল বা আসক্তিতে তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।" তিনি (গীতার ৩য় অধ্যায়ে) প্রথমে যে কর্ম্ম-যোগ বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগ নহে। তাহা জীবন্মুক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ উপযোগী ভাবে চিত্ত নির্ম্মল করিয়া যুদ্ধরূপ সাধন সমরে প্রবৃত্ত করাইবার পন্থাস্বরূপ মানস ক্ষেত্র কর্ষণ মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান নাশকারী রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র কাম-ক্রোধ রিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত যে সকল কর্ম্ম বা কর্ম্মবীজ মানসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাদি নিয়মযুক্ত ভাবে দশ ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি এই দ্বাদশটী কামপীঠ হইতে সেই দুর্নিবার কামশত্রুকে সর্ব্বাগ্রে পরাজয় করিবার নিমিত্ত, জ্ঞানযোগ প্রদান পূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাস যোগের উপদেশ দ্বারা যোগবলে তপঃসিদ্ধির জন্য সতত চিত্ত মার্জ্জনের উপায় স্বরূপ অভ্যাস যোগ উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই "**কর্ম্মযোগ অবস্থা**" লাভ করিবার প্রথম সোপানরূপ 'নিত্য-কর্ম্ম' বা 'অভ্যাস যোগ'। ঈদৃশ অভ্যাস যোগে মানসক্ষেত্র পরিষ্কার ও তাহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি না হইলে নিষ্কাম-কর্ম্মবীজ তাহাতে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। পরন্তু অজ্ঞান বা কুসংস্কারের আগাছায় মানসক্ষেত্রকে

সর্ব্বত্র আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা "অব্যভিচারিণী ভক্তি," ইন্দ্রিয়-বিষয়-সঙ্গ-বিরহিতরূপ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি, দেহাত্ম-বোধি-মনুষ্য-সমাজে বিরাগ, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গত্যাগ এবং সেই দেহাত্ম-বাদী-সমাজের নিন্দা প্রসংশার ভয়ে বিচলিত না হওয়া এবং আত্ম-জ্ঞান পরায়ণতা ও তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ বা জীবন মুক্তি, সতত জ্ঞান নেত্রে ইহাই দর্শন। এতদ্ভিন্ন যাহা, এই জ্ঞানের বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। শিষ্য যজমানকে এই জ্ঞান প্রদান করাই শাস্ত্রোপদেশ।

এরূপভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, কামনা-বাসনার মাকালফল ভিন্ন তাহাতে মোক্ষফল লাভের আর আশা থাকে না। এই নিমিত্ত মানসক্ষেত্রের, উর্ব্বরতাশক্তি-বৃদ্ধি-জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুধাময়ী গীতায় প্রথমে নিত্য-কর্ম্মস্বরূপ অভ্যাস যোগেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের সহজ বোধগম্য-জন্য তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"একাকী একান্তে বসি যোগী সর্ব্বক্ষণ,
সযতনে দেহ মন করি সংযমন,
বাঞ্ছা ছাড়ি সর্ব্ব চিন্তা করি পরিহার,
অবিচল করিবেন মন আপনার।" ১০

"দেহ-মধ্য শির গ্রীবা করিয়া সরল,
দৃঢ় যত্নে রহিবেন হইয়া নিশ্চল,
নাসামূলে ভুরুদ্বয়-মাঝে দৃষ্টি রাখি,
স্থিরনেত্রে অন্যদিকে কিছু নাহি দেখি।" ১৩

"হইয়া প্রশান্ত আত্মা ভীতি পরিহরি,
রহিবে যতনে ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি,
সংযত মানস করি আত্মাতে অর্পণ,
আত্মাতেই যুক্ত ভাবে রবে যোগিজন।" ১৪

"চিত্তের চঞ্চল ভাব করি পরিহার,
সতত আত্মাতে মন সমাহিত যাঁর,
মূল শান্তি সে নির্ব্বাণ লাভ তাঁর হয়,
যে শান্তি আত্মাতে সদা বিরাজিত রয়।" ১৫

"সংযত হইয়া চিত্ত আত্মগত যাঁর,
সর্ব্ব কর্ম্মে স্পৃহা শূন্য—"যুক্ত" নাম তার।" ১৮
"অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়,
আত্মদরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় সুখে মগ্ন মন ॥"
"আত্মদরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই "যোগ" বলে তাকে।" ২০।২১
"সদানন্দ যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই—"যোগ" নাম তার।" ২২
"কষ্ট সাধ্য বলি যেন অযত্ন না হয়—
কাতরতা শূন্য চিত্ত করি ধনঞ্জয়,
যোগের ব্যাঘাত-কারী কামনা ছাড়িয়া,
ইন্দ্রিয় সংযম করি মনোবল দিয়া,
গুরু উপদেশে বুদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
করিবে সে যোগাভ্যাস পাণ্ডুর তনয়।" ২৩।২৪
"ধারণা বুদ্ধির বশে হে শ্বেতবাহন,
অচঞ্চল মন আত্মায় করিলে স্থাপন,
ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে ভুলিবে সংসার—
কিছু মাত্র চিন্তা যেন নাহি আসে আর।" ২৫

"স্বভাব চঞ্চল মন অতীব অস্থির,
যে যে বিষয়েতে ধায় হইয়া অধীর,
সে সব বিষয় হ'তে বলে ফিরাইয়া,
রাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া।" ২৬

"আপনার "আত্মা" যার "আত্ম"-বশে নয়,
সে (ই) "আত্মাই" তার পক্ষে শত্রুবৎ হয়।" গীতা ৬অঃ

ভগবৎ মুখ পদ্ম বিনিঃসৃত গীতারূপ মহাশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম গুরু বা আচার্য্যের উপদেশে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্রযোগে সেই আত্মতত্ত্ব মনন এবং গুরূপদিষ্ট বিধানে সংযমী হইয়া তাহার ক্রিয়া অনুশীলন করিতে হইবে। এই সংযমের অর্থ, সম্যক্ প্রকারে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করা। "সম্ পূর্ব্বক যম ধাতু (ভাব বাচ্যে) অল্ প্রত্যয়ে" সংযম শব্দ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ নিয়মাধীন থাকিয়া সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে নিবৃত্তি মার্গে অন্তর্মুখী করার নামই প্রকৃত সংযম। ইহার অভ্যাসেই প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়, নচেৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে তালে তালে ঘুরাইয়া শুধু একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিলেই সংযমী হওয়া যায় না। পরন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। বর্ণিত প্রকার সংযম অভ্যাসের জন্যই আধ্যাত্মিক ভাবে সন্ধ্যা পূজাদি (**মানসপূজা**) নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। ইহারই নাম স্বধর্ম্ম। দৈনন্দিন ভাবে এই স্বধর্ম্মরূপ নিত্য কর্ম্মের অনুশীলন করার নামই অভ্যাস যোগ বা সন্ধ্যা পূজা। এই অভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধভাবে মনের একাগ্রতা এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম মানস কর্ম্মের দ্বারাই ঐ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে বিধায়, শাস্ত্র ও গুরূপদেশে **প্রথমেই মানস কর্ম্ম বা মানস-পূজার বিধান হইয়াছে।** ভগবান্‌ও গীতায় অভ্যাস যোগে, সংযম

অভ্যাসেরই উপদেশ করিয়াছেন এবং কর্ম্ম যোগেও নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ—

"সর্ব্বাগ্রে সংযম করি ইন্দ্রিয় নিচয়,
পাপ রূপী "কাম শত্রু" কর পরাজয় ;
সে (ই) "পাপই" মানেবের হৃদি করি বাস।
"শাস্ত্র-জ্ঞান" "আত্ম-জ্ঞান" করে সব নাশ।" ৪১

গীতা ৩ অধ্যায়

কি উপায়ে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া কামনারূপ পাপ শত্রুকে জয় করা যায়, অভ্যাস যোগে তাহার যে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহাও মানস পূজারূপ নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানেরই নামান্তর মাত্র। গীতা বলিয়াছেন "যোগ," তন্ত্র বলিয়াছেন "পূজা" এই মাত্র প্রভেদ। মূলে যোগও যাহা পূজাও তাহাই। "ঈশ্বর পূজন" বা শিব পূজা যোগেরই একটি অঙ্গ মাত্র। সুতরাং প্রভেদ নাই ; শ্রীকৃষ্ণ যোগে বলিয়াছেন যে, তুমি একাগ্রভাবে মনকে আত্মায় যুক্ত রাখিয়া যতকিছু কর্ম্ম আমাতেই সমর্পণ কর। আমারই ভক্ত হইয়া আমাকেই নমস্কার কর।

"হোম দান সর্ব্ব কর্ম্ম যা কর ভোজন,
সমস্ত "আমাতে" তুমি কর সমর্পণ।" ২৭

গীতা ৯ অধ্যায়

"আমাতেই প্রাণমন, কর তুমি সমর্পণ,
আমারই ভক্ত হও সর্ব্ব তেয়াগিয়া।
"আমার" অর্চ্চনা আর "আমাকেই" নমস্কার,
বারংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া।" ৬৫

গীতা ১৮ অধ্যায়

অপরন্তু পূজার ভাবে মহেশ্বরও তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তোমার আত্মাকে শিবরূপ কল্পনা করিয়া দশ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু, এই ষোড়শ উপচার দিয়া আমার পূজা দ্বারা অভেদ ভাবে মনকে আমাতে লয় কর। সুতরাং দেখা যায় যে, যোগ ও পূজা উভয়েরই অর্থ এক। কর্ম্মও প্রায় একই। গীতায় উক্ত আছে, সুকৌশলযুক্ত কর্ম্মই যোগ। **মানস-পূজা** সেই সুকৌশলযুক্ত কর্ম্মেরই অভিব্যক্তি মাত্র। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা পূজা বলিতে স্থূল বাহ্য পূজা অর্থাৎ কামনাযুক্ত ফুল-দুর্ব্বাদ্বারা পূজা বুঝিয়া নিষ্কাম **মানস-পূজা ভুলিয়া গিয়াছি,** তদ্ধেতু "যোগানুষ্ঠান একটা বৃহৎ কর্ম্ম;" "বর্ত্তমান কলিতে তাহা দুর্জ্জেয়," বলিয়া অসার তর্ক দ্বারা সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকি, একমাত্র আত্ম-জ্ঞানের অভাবেই আমাদের এই দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে—

"আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্।"

যাহাদের "আত্মতত্ত্ব," "বিশ্বতত্ত্ব," "শিবতত্ত্ব," বা "পরমাত্মতত্ত্বে," এমন কি স্থূল "দেহতত্ত্বেও" কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারা সন্ধ্যা পূজাদি স্বধর্ম্মযুক্ত নিত্যকর্ম্মরূপ সংযমানুষ্ঠান ব্রহ্মচর্য্য বা যোগানুশীলনের মর্ম্ম কি করিয়া বুঝিবে? মানব প্রকৃতভাবে জ্ঞান না পাইয়া, অজ্ঞান হইতেছে; সুতরাং ইহা সমাজের দোষ নহে। জ্ঞানী শিক্ষাদাতার অভাবে সমাজ অজ্ঞান সাগরে ডুবিতেছে। ইহা আমার পুনঃ পুনঃ বলিবার কারণ এই যে, অজ্ঞানতা এতদূর অস্থি মজ্জাগত হইয়া কুসংস্কারে ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আবৃত করিয়াছে যে, এখন বারংবার যথাস্থানে আঘাত না দিলে, তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই কঠিন। রোগীর যদি ব্যারামের প্রতি লক্ষ্য না হয়, তবে সুচিকিৎসকের অন্বেষণ প্রয়োজন হয় না। মূর্খ চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া রোগ আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, আরও জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া

পড়িতেছে। কুসংস্কাররূপ মহা-অজ্ঞানতা-ব্যাধির অনুভূতি করাইবার জন্যই এক একটি প্রাণ সন্ধিতে "আত্ম-জ্ঞান-অঙ্কুশের" আঘাত দিয়া "প্রাণের সাড়া" উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ভরসা করি, জ্ঞানিগণ আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। নানাস্থানে এক কথা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের জন্য কেহ আমাকে অপণ্ডিত বা অসাহিত্যিক মনে করিলে, আমি তাহাতে দুঃখিত হইব না। (১) যেহেতু আমি পুস্তক লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে প্রয়াসী হই নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্কারের চেষ্টাই আমার জীবনব্রত।

চিত্তশুদ্ধি ও মনকে একাগ্রকরিবার জন্যই নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাস-যোগের বিধান। এখন দেখা আবশ্যক, ইহা কি সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম, কি স্থূলদেহের কর্ম্ম অর্থাৎ মানস বা অন্তঃকর্ম্ম, না চিরজীবন স্থূল বা বহিঃকর্ম্মভাবেই ইহার অনুষ্ঠান চলিবে? বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহার আচারানুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি বিধান হইতেছে কি অবনতি সাধিত হইতেছে? জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষানুভূতভাবে ইহা অবগত আছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে আত্ম-অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেই এই তত্ত্ব প্রণিধান করিতে পারেন। আমরাও তজ্জন্যই নিত্যকর্ম্মের আচারানুষ্ঠানের যথাশাস্ত্র সমালোচনা দ্বারা কুসংস্কারের নাশ ও ভ্রান্তি দূর এবং আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানবিধানের চেষ্টা করিতেছি।

এ বিষয়ে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে, আমাদের স্বধর্ম্মযুক্ত নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানগুলি যথাশাস্ত্রভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না, ইহাই

---

(১) আবৃত্তি রসকৃদুপদেশাৎ॥ সাংখ্য সূত্র ৪র্থ অঃ

বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে; সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্যকতা হেতু আত্ম-দর্শন-যোগে তাদৃশ ভাবেরই এককথা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে ; এবং যদি কোন স্থানে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে মনে হয়, যদি কোন স্থানে অজ্ঞান বা কুসংস্কারের আগাছা জন্মিয়া কুফলপ্রসব বা প্রসবোন্মুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও চিত্ত নিবৃত্তি-অনুগামী না হইয়া, প্রবৃত্তি কুহকিনীতে মুগ্ধ হইয়া, যদি **"চিত্তশুদ্ধির"** পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র **"ভেদবুদ্ধি"** আশ্রয় করিয়া থাকে ; যদি **"সংযমের"** পরিবর্ত্তে **"অসংযম"** ভাবই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার আশু সংস্কারসাধন জন্য ঐ সমস্ত অজ্ঞান বা কুসংস্কারমূলক আচারানুষ্ঠানের দোষানুদর্শন করাইয়া বিজ্ঞানমূলক গীতোক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানোপদেশ প্রদানে আত্মদর্শন যোগের পথে আনিতেই হইবে। **"আত্মদর্শন-যোগ"** ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই। এই মুক্তি কেবলমাত্র "মরণান্মুক্তি" অর্থ বিজ্ঞাপক নহে, এই মুক্তি **"জীবন্মুক্তি"**। জীবিত অবস্থায়ই অনিত্য দেহাত্মবোধজনিত ভোগ-সুখ-কামনা-লালসার বন্ধন হইতে মুক্তি ; এই মুক্তি অনিত্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তিজনিত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়াসক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি। দেহ বর্ত্তমানে এই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিতে পারিলে, ইহকালে সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত এবং পরকালে ইচ্ছানুরূপ পরমশান্তিময় মোক্ষফল লাভ হয়। সুতরাং মানসিক কুসংস্কার নাশ করিয়া, তপস্যা লাভের উপযোগীভাবে চিত্তশুদ্ধি ও চঞ্চলতা রহিত করিবার জন্যই ইহা **"কর্ম্মযোগের"** সূচনা মাত্র। প্রথমাবস্থায় এই পন্থানুসরণ ভিন্ন অনাসক্তভাবে কর্ম্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণও তাদৃশ জীবন্মুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী পুত্রাদি-পরিবৃতভাবে সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ফলাসক্তি রহিত নিষ্কামকর্ম্মই যোগপদবাচ্য। তাহাই স্বধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মই মানবের পক্ষে কর্ত্তব্য।

তদ্দ্বারাই মনুষ্যত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। গুরূপদেশ মত "আত্ম-দর্শন-যোগ" অভ্যাস দ্বারাই কর্ম্মফলস্বরূপ জ্ঞান বা তাদৃশ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। তখনই ভোগ-সুখ-মায়া-মোহ-মুক্ত-অবস্থায় যোগী সংসারে কোন কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার অনুবাদ—

"কর্ম্মফল ফেলি দূরে, শুধু চিত্ত শুদ্ধি তরে,
যোগিগণ কর্ম্মপরায়ণ ॥" ৫ম অঃ

শাস্ত্রানুসারে দেখা যায় যে, মন স্থির ও চিত্ত সংযমের জন্যই যাবতীয় কর্ম্মের ব্যবস্থা। অসংযমী মানব দেহত্যাগের পর সংযমপুরী বা যমলোকে যাইয়া নানাবিধ দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয় বেদান্তদর্শন বলেন,—

"সংযমনেত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ ॥"

যে স্থানে সংযমহীন ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহকে যমদূতগণ লইয়া যায় ও সংযমের শিক্ষাবিধান জন্য বিড়্মূত্রাদি পান করায় এবং প্রহারাদি করে, তাহার নাম সংযমনীপুরী বা "প্রেতলোক"। যিনি সংযম শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহার নাম যম; তিনিই, প্রেতত্ব প্রাপ্ত জীবের বিচার করিয়া থাকেন। অসংযমিগণই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেতত্ব প্রাপ্ত জীবগণ মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের সংযম ভঙ্গ করিয়াছে, সে সেই প্রকারে দণ্ডিত হয়। সুতরাং এই দেহে সংযম অভ্যাসের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য; অন্যথায় মানবদেহ আর পশুদেহে কোন গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদ থাকে না। কারণ অজ্ঞানী পশুগণও আহার বিহার সন্তানোৎপাদন করে, মনুষ্যেরও যদি সেই সেই কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন উচ্চ জ্ঞান না থাকে, তবে সেই মানব আবার দেবতা সমক্ষে পশু বলি প্রদান করিয়া তাহার পশু-আত্মা দূর করিবার

অধিকার আছে বলিয়া গর্ব্ব করে কেন? যে নিজেই পশ্বাচারী সে কি কখনও অন্য এক পশুর আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে? যে নিজে অসংযমী বা নিজের আত্মার মুক্তি বিধান করিতে অসমর্থ, সে কি কখনও অপরকে সংযম অভ্যাস করাইতে কি অপরের আত্মার মুক্তি বিধান করিতে সমর্থ হয়? যিনি গুরুদত্ত মন্ত্রানুশীলনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে আত্মযুক্ত বা ত্রাণ করিতে না পারিয়াছেন, অপরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদানে তাঁহার কি অধিকার আছে? যে ব্যক্তি চৈতন্যশীল স্বীয় দেহ মধ্যে আত্মা বা দেবতার সন্ধান কিম্বা অনুভূতি প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অচৈতন্য জড় বা ভৌতিক পদার্থ মধ্যে দেবতার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে চৈতন্য শীল করিতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নহে? এইজন্য আত্ম-সংযমী হইয়া **"মানস-পূজা" বা "আত্ম-দর্শন-যোগ" অনুশীলনদ্বারা মনের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বাহ্য পূজায় সেই শক্তি নিয়োগ কর, তাহা হইলেই কর্ম্ম শেষের দক্ষিণা স্বরূপ "শান্তি" প্রাপ্ত হইবে** এবং অপরেরও শান্তি বিধানে সমর্থ হইবে। সেই শান্তির উদ্দেশ্যেই প্রথমে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত নিত্য-কর্ম্মযোগে মনোবৃত্তি সংযম পূর্ব্বক মহেশ্বর বা শিবকে মানসক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত **"ব্রহ্মচর্য্যশীল"** হইয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮ অঃ

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়াদ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত সকলকে (সূত্রধরের ন্যায়) তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্ব ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে "পরমা শান্তি" ও "নিত্যস্থান" প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমেই গুরুতত্ত্ব জানা আবশ্যক। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণরূপী গুরু কৃপাতেই আত্ম-জ্ঞানযুক্ত স্বধর্ম্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক দীক্ষামতে গুরু পূজা, শিব পূজা ও ইষ্ট পূজার বিধি আছে। ইহা সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য বিধানের বিশিষ্ট সহায়ক। শিক্ষার ত্রুটীতে অজ্ঞানতা বশতঃই মানব কেবলমাত্র ফল কামনা রাখিয়া, অথবা "ইহা না করিলে পাপ হইবে" "ইহা করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে" এরূপ মনে করিয়া, চিরজীবন ভয় ও প্রলোভনবশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। তদ্ধেতু গুরু, ইষ্টদেবতা ও শিবপূজার ফল যে কি, তাহা বুঝিতে পারে না এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানও প্রাপ্ত হয় না; কাজেই তদ্দ্বারা কেবল কামনা বাসনাই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, গুরুর উপর নির্ভর করা ভিন্ন সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সাধন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্ব প্রযত্নে গুরুশরণ, গুরুধ্যান ও গুরুপূজা আবশ্যক; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিসংবাদিত রূপে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। একমাত্র গুরু কৃপাতেই শিষ্য সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যশীল হইতে পারে, এজন্য "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব গুরুকে দান কর, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যে শিষ্য তাঁহার সর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিতে পারেন, সেই শিষ্যই ধন্য; তাঁহার অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল তাঁহার করতলগত হয়। অনেকে হয় ত আমার এই কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিবেন যে,—এ যে ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতার কথা দেখি; যথাসর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিয়া কি শেষে গাছতলাবাসী সন্ন্যাসী হইতে

হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য যে, সর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিয়া "গাছতলাবাসী" হইতে না পারিলে সংযমী বা সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। "সন্ন্যাসী" হইতে না পারিলে তোমার মুক্তি বা সুখের সম্ভাবনা কোথায়? পরন্তু তোমার "যথাসর্ব্বস্ব" দান গ্রহণ করিবার অধিকারী একমাত্র গুরু ভিন্নই বা আর কে আছেন? এজন্যই প্রাচীন যুগের মানব এই ভাবে "যথাসর্ব্বস্ব" গুরুকে দান করিয়া সংযমী বা সন্ন্যাসী ভাবে "গাছতলাবাসী" হইতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করিতেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার "সর্ব্বস্ব" কি? অর্থ সম্পত্তি? সে ত অনিত্য বাহিরের বস্তু। বাহিরের বস্তুতে কি তোমার কোন অধিকার আছে? তুমি কি তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছ? না তাহা তোমার স্বোপার্জ্জিত বস্তু? তুমি কি তাহা দেহ ত্যাগের সময় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে? সুতরাং "যথা সর্ব্বস্ব" বলিতে শুধু অর্থ সম্পত্তি বুঝিবে কেন? তাহা ত পরস্ব; তোমার সঙ্গী ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের ভোগ সুখের উদ্দেশ্যে কতক দিনের জন্য উহা সঞ্চয় করিয়াছে মাত্র। অতএব কোন প্রকারেই তুমি তাহার মালিক হইতে পার না। সুতরাং তোমার দেহরূপ ব্যষ্টি মধ্যে যাহা আছে তুমি তাহারই অধিপতি এবং তাহাই তোমার জীবনের সর্ব্বস্ব। তোমার সেই অন্তরস্থ কাম ক্রোধাদি রিপুগণ পরিচালিত **ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি-রূপ "সর্ব্বস্ব"** শ্রীগুরুকে দান কর। শ্রীগুরুও তাহার প্রতিদানে তোমাকে "অনন্ত-জ্ঞান" রূপ মহারত্ন প্রদান করিবেন।

"দীয়তে জ্ঞানমনন্তং ক্ষীয়তে পাপ সঞ্চয়ঃ।"

যদ্দ্বারা জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত আসক্তিরূপ পাপরাশি ক্ষয় হইয়া অনন্ত জ্ঞান লাভ হয়, সেই দীক্ষারূপ মহারত্ন তোমাকে প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় লোকালয় পরিত্যাগ করাইয়া, **"বৃক্ষ-মূলে"** তোমার

বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। অজ্ঞান মানব! ভয় করিও না। সেই বৃক্ষমূল আশ্রয় জন্যও তোমাকে বাহিরে বা বনে যাইতে হইবে না। তাহাও তোমার দেহমধ্যেই আছে। গীতায় ভগবান্ তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণের বোধগম্যজন্য গীতা শ্লোকের বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল।—

"দেহকে অশ্বত্থতরু বলে জ্ঞানিগণ—
ঊর্দ্ধ মূল অধো দিকে শাখা অগণন;
পুনঃ পুনঃ জন্মে যেন অন্ত নাই ভবে,
জ্ঞানচক্ষে দেখ বৃক্ষে বেদপত্র শোভে।
হেন অশ্বত্থের তত্ত্ব-জ্ঞান যাঁর কাছে,
বেদজ্ঞ তাঁহার মত আর কেবা আছে?" ১
"সে বৃক্ষের সবিশেষ শুন ধনঞ্জয়,—
অধঃ ঊর্দ্ধ ভাবে ধায় শাখা সমুদয়;
দেবলোকে যান যাঁরা ঊর্দ্ধ শাখা তাঁরা,
অধঃ শাখা অধোগামী পাপী তাপী যারা;
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের জল,
সেচনে তাহার শাখা বাড়িছে কেবল;
বিষয় বাসনারূপ শাখাগ্র পল্লবে,
কিবা শোভা মনোলোভা অপরূপ ভাবে।
ঊর্দ্ধে মূল ব্রহ্মরূপ সর্ব্ব মূলাধারে,
তথাপি সহস্র মূল নেমেছে সংসারে,
পশিয়া মনুষ্য লোকে প্রবৃত্তির মূল,
কর্ম্ম পাশে অনায়াসে বান্ধে জীবকুল।" ২

"শরীর-বৃক্ষের রূপ জানা নাহি যায়,—
আদি অন্ত স্থির তার কে জানে কোথায় ?
অবিচল বৈরাগ্যের কুঠার মারিয়া,
বদ্ধমূল এ অশ্বত্থে ছেদন করিয়া।" ৩
মূলস্থিত সেই বস্তু কর অন্বেষণ,
জনম হবে না আর লভিলে যে "ধন"। (শিবস্থ)
যে আদি পুরুষ হ'তে নিঃসৃত সংসার,
একান্ত নির্ভর করি উপরে তাঁহার,
ভক্তি যোগে অন্বেষণ করিবে সে ধন—
দেবতা বাঞ্ছিত মোক্ষ অমূল্য রতন।" ৪
"আত্মনিষ্ঠ যাঁরা—মোহ অহঙ্কার নাই,
ইন্দ্রিয় আসক্তি শূন্য নিষ্কাম সদাই,
সুখ-দুঃখাতীত সদা যাঁদের হৃদয়,
তাঁহারা সে নিত্য পদ পান ধনঞ্জয়।" ৫
যে পদ লভিয়া পার্থ মহাযোগিগণ
না করেন এ সংসারে পুনরাগমন—,"
পাবক, শশাঙ্ক, সূর্য্য প্রকাশিতে নারে,
সে মম পরম ধাম ভবার্ণব পারে।" ৬ গীতা ১৫ অঃ

অতএব যাঁহারা বলেন যে, গৃহে থাকিয়া ভগবানের পরমপদ লাভ হয় না ; বিষয় সম্পত্তি ও লোকালয় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া গাছ তলায় গিয়া বসিতে না পারিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায় না ; সে কথা আমি আংশিক সত্য বলিয়া

স্বীকার করিলেও, তাহাদের বহিরর্থ ভাবকেই আমি একমাত্র উপায় স্বরূপ, স্বীকার করি না। কারণ সংযমী বা ইন্দ্রিয়-বিষয়-আসক্তিরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে না পারিলে, অসংযত মনে লোকালয়ই ছাড়, আর গৃহ ত্যাগই কর, লোটা কম্বল চিম্‌টা লইয়া বিভূতি চড়াইয়া সন্ন্যাসীই সাজ, কোথাও শান্তি বা সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। আর যদি আমার পূর্ব্ব বর্ণিত জ্ঞানী গুরুর উপদেশে তোমার ইন্দ্রিয়-বিষয়-আসক্তিরূপ "সর্ব্বস্ব" শ্রীগুরুকে দান করিয়া গুরুদত্ত জ্ঞান বা গুরু কৃপা লাভ করিতে পার, তবে আর বহির্দৃষ্টি ভাবে গৃহ ত্যাগও করিতে হইবে না, লোকালয়ও ছাড়িতে হইবে না, সন্ন্যাসীও সাজিতে হইবে না, পাহাড়ে জঙ্গলে গাছতলাও অন্বেষণ করিতে হইবে না। তখন তুমি শ্রীগুরুর কৃপায় বুঝিবে যে **"আসক্তি বা কামনাত্যাগই তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ।" "ভূর্লোক বা মুলাধার ত্যাগই তোমার গৃহ ত্যাগ।" "দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের তল বা মুল লক্ষ্যেই উদ্দ্ধ দিকে স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য, সহস্রার** বা ভূ-র্লোক ভুবঃ লোক, স্বর্লোক, মহঃ লোক, জনঃ লোক, তপঃ লোক, সত্যলোক, ছাড়িয়া সেই পরমাত্মা বা ইষ্টদেবের "মূলতত্ত্বে" একবার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, তখনই তুমি "পরম সন্ন্যাস" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া "সোঽহং" বা অভেদ ভাবে গুণাতীত পরম অব্যয় পদ লাভে সমর্থ হইবে। তখন আর তোমার "ভস্মরূপ বিভূতি মাখিয়া নিজেকে "রূপহীন" করিবার প্রয়োজন হইবে না। তখন ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ ও প্রাণযজ্ঞ, ইত্যাদি সমস্ত যজ্ঞ বিভূতি, অর্থাৎ ভূতগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, প্রাণযজ্ঞকারী ঋষিগণ প্রভৃতি ভগবৎ-বিভূতি সকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া তোমার আত্ম-বিভূতি ভাবে নিয়ত তোমাকেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপে স্তুতি করিবে।

এতদাদর্শে জ্ঞান বা মুক্তির সাধন উদ্দেশ্যেই তোমার মানব জীবনে ব্রহ্মচর্য্যরূপ সংযম এবং সন্ধ্যা পূজারূপ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

সাধকের মনোবৃত্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিধানে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্যশীল করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানী গুরুর প্রয়োজন। পুস্তক পাঠ অথবা যার তার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা মন্ত্রশক্তি কার্য্যকরী হয় না। কারণ সিদ্ধগুরুদত্ত মন্ত্রের সঙ্গে গুরুর সাধন-বল-যুক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি, শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া মন্ত্রকে শক্তি সম্পন্ন করে। যিনি দীক্ষা প্রদান করিবেন, তিনি যদি সেই মন্ত্রের শক্তি নিজে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান লাভের শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তিনি তাদৃশ মন্ত্রের দ্বারা অপরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান শক্তি বিধানে সমর্থ হইতে পারেন। যে কৃষকের নিজেরই ক্ষেত্রতত্ত্ব জ্ঞান নাই, কর্ষণের অনভিজ্ঞতা হেতু নিজের ক্ষেত্রই পতিত পড়িয়া আছে, সে অপরের ক্ষেত্র কিরূপ ও তাহা কি ভাবে কর্ষণ করিলে আগাছা নষ্ট হইয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার হয় এবং কোন সময় কি প্রকার বীজ বপন করিলে তাহাতে শস্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপ ফল প্রসব করে, তাহা যেমন সে জানে না, সেইরূপ অজ্ঞানী গুরুও স্বীয় মানব জীবনরূপ কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষরূপে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের অভাব হেতু, অপরের জীবন ক্ষেত্র কি ভাবে কর্ষণ করিলে, "কুসংস্কার"রূপ "আগাছা" নষ্ট হইতে পারে, এবং কোন সময়ে কি প্রকারের "বীজ" তাহাতে বপন করিতে হয় কি ভাবে বেড়া দিলে তাহা রক্ষা হইয়া থাকে, কি ভাবে নিত্য-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে জ্ঞান-শস্য উৎপন্ন এবং তাহার বৃদ্ধি ও ফলশালী হয়, সে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রযুক্ত, কুসংস্কাররূপ আগাছাই আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কোন দেশে নারায়ণ বাবু নামে এক ভূ-স্বামী বাস করিতেন। তিনি মোহনবাঁশী নামক এক কৃষক সন্তানের পিতা পিতামহের কৃষিবিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে নিজের ক্ষেত্র আবাদের ভার দিয়াছিলেন। আবাদকারী মোহনবাঁশী, কৃষকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সত্য. কিন্তু অমনোযোগ হেতু পিতা পিতামহের ন্যায় কৃষি বিদ্যায় তাদৃশ গুণের অধিকারী হইতে পারে নাই। পিতা পিতামহের অভাবে মোহন দুই তিন বৎসর নিজের জমি আবাদ করিয়া অনভিজ্ঞতা বশতঃ যখন পূর্ব্ব মত শস্য উৎপাদন করিতে পারিল না, তখন জোত জমি বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চালাইল, ক্রমে অবস্থা নিঃস্ব হওয়ায় হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তদ্দ্বারা হাল গরু খরিদ করিয়া সংসার চালাইতে মনস্থ করিল এবং নারায়ণ বাবুর এক খণ্ড জমি আবাদের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে ধান্য বীজ বপন করিয়া আসিল। কিন্তু ঐ জমির আর কোন তত্ত্বাবধান অর্থাৎ ক্ষেত্র পরিষ্কার, কি বীজ রক্ষার কোন ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী না হওয়ায়, ক্ষেত্রস্থ মূল বীজ নষ্ট হইয়া, আগাছাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নারায়ণ বাবুর নিকট মোহনের পারিশ্রমিক বাবদ কিছু অর্থ পাওনা ছিল। কয়েকদিন পরে ঐ পারিশ্রমিকের অর্থ জন্য মোহন, নারায়ণ বাবুর নিকটে যাওয়ায়, নারায়ণ বাবু তাহাকে জমির অবস্থা দেখিয়া আসিতে বলেন। মোহনবাঁশী ক্ষেত্র নিকটে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, ক্ষেত্রে ধান্য গাছের পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার গাছ জন্মিয়া সমস্ত ক্ষেত্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান ভিন্ন দুই একটি ধান্য গাছও তাহাতে দেখা যায় না। মোহন আগাছার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এ নিশ্চয়ই তিল গাছ জন্মিয়াছে। তিলের মূল্য সাধারণতঃ ধান্যের মূল্যাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাহার আবাদের গুণে ক্ষেত্রাধিপতির যথেষ্ট লাভ হইবে। কাজেই তাহার ন্যায় কৃতিবান্ কৃষক সন্তানের কৃতিত্বেই ধানের স্থলে যখন তিল গাছ জন্মিল, তখন সে পারিশ্রমিকও

অন্ততঃ তিনগুণ বেশী পাইবার অধিকারী। ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে নিজেকে সে কতই বাহাদুর জ্ঞান করিতে লাগিল এবং একান্ত প্রফুল্ল ভাবে নারায়ণ বাবুর বাড়ী যাইয়া বলিল, "কত্তা! তোমার খুব সুবুদ্ধিই ঐয়েছিল; যে আমাকে দিয়ে তোমার ক্ষেত আবাদ করাইছিলে। আমার বাপ্ দাদার মতন কিরষান্ এ পরগণায়ও ছিল না, আমি তাইন্ গো ব্যাটা। কত্তা! তোমার সুবুদ্ধির ফল এহন দেহি যাও। তোমার ক্ষেতে ধান বুনাইছিলাম; পরমেশ্বরের দোয়ায় সব জমিনে তিলের গাছ জম্মিছে। ধানের পাঁচ দুনো লাভ অবে।" নারারণ বাবু শুনিয়া অবাক্ হইলেন ও তাড়াতাড়ি মোহনের সঙ্গে ক্ষেত্রে যাইয়া শস্যের গাছ দেখিয়া মোহনের কথামত তিল গাছ বলিয়াই বুঝিলেন এবং মনে মনে বড় খুসী হইয়া মোহনকে বারংবার প্রশংসা করিয়া পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলেন; পরন্তু ক্ষেত্রের চারিদিকে ভাল করিয়া বেড়া দিয়া শস্য রক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন। মোহনও তাহাই করিল। ক্ষেত্রের চারিদিকে গবাদি পশু দূরে থাক, কোন মনুষ্য আসিলেও পাছে তার দৃষ্টি লাগিয়া, শস্য খারাপ হয় এজন্য মোহন বিশেষ সতর্ক থাকিত। কয়েক মাস পরে তিল গাছে ফসল জন্মিল। ফসল রুদ্রাক্ষের ন্যায় গোটা হইতেছে দেখিয়া মোহন মনে করিল যে, কি কপাল! তিলের গাছে রুদ্রাক্ষ ফলিতেছে। এজন্য মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল। অতঃপর কিছু দিন গতে নারায়ণ বাবুর আদেশ মতে মোহন তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আনন্দে গদ গদ ভাবে বলিল "কত্তা! তোমার কপাল ভাল আমার হাতে জমিন্ দিয়িছ তোমার ঘরে টাহা ধর্‌বি না। তোমার জমিনে রুদ্রাক্ষি ফল্‌ছে। বিশ্ মনের কমে নাম্‌বি না কত্তা। রুদ্রাক্ষির যে দাম, উত টাহার গাছ ঐইছে।" নারায়ণ বাবুর স্ত্রী তখন কাছে ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি এবারে কর্ত্তাকে জমির কাছে যাইতে না দিয়া মোহনকে বলিলেন, মোহন! কেমন রুদ্রাক্ষ, কয়েকটা গোটা নিয়ে এস দেখি; মোহন বলিল

"মা টাক্‌রোন্! আর কয়টা দিন সবুর কর; সবই মোহন তোমার বাড়ীতে আগে আন্ দেবে। এহন ওহা আঁবাতি। ওর পাঁচটা গোডা ভাঙ্‌লে দশটা টাহা লোকসান হ'বে।" কিন্তু গৃহিণী যখন সে কথায় নিরস্ত হইলেন না। মোহন তখন অগত্যা দুইটী রুদ্রাক্ষের ছড়া লইয়া আসিয়া কর্ত্তার নিকট হাজির হইল। কর্ত্তা ও গৃহিণী তখন উভয়ে দেখিয়া বুঝিলেন যে এত রুদ্রাক্ষ নয়, এ যে "হাগ্‌রাগোটা।" গৃহিণী'ত হাসিয়া ব্যাকুল; কর্ত্তা তখন মোহনবাঁশীকে ধরিয়া আচ্ছামত কিল চড়্ মারিতে লাগিলেন। অবস্থা দৃষ্টে গৃহিণী কর্ত্তাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, উহাকে অনর্থক মার কেন? উহার দোষ কি? উহার পিতা মাতা যখন উহার নাম মোহনবাঁশী রেখেছে, তখনই বুঝিতে হইবে উহার নিজের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। অপরের বিনা ফুকারে বাঁশী কখনও বাজে না। তুমি বাঁশী নাম শুনিয়াই ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু ফু-দিয়া দেখ নাই, কাজেই বাঁশী ধান্য বপন করিয়া তিলের গাছ জন্মাইয়াছে এবং পরে 'হাগ্‌রাগোটা দেখিয়া রুদ্রাক্ষ বুঝিয়াছে। ও বেটা রুদ্রাক্ষের গাছ জন্মেও দেখে নাই। কি করিবে? কিন্তু তুমি ধান্যের আবাদি জমিতে তিলের গাছ বিশ্বাস করিয়া অসম্ভব আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলে কেন? তুমি যদি তখন তোমার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিতে তাহা হইলে তোমার দুরাশার ফল স্বরূপ রুদ্রাক্ষের পরিবর্ত্তে আজ হাগ্‌রাগোটা লাভ হইত না। তুমিই যে মূলে ভুল করিয়াছ। তোমার ন্যায় ক্ষেত্রাধিকারী ও বাঁশীর মত কর্ষণ কারীর যোগে "অপরা প্রকৃতিগত" "মানব জমিনেও" এতাদৃশ ফলই লাভ হইয়া থাকে। দৈবাৎ কাহারও বুদ্ধি কোনও প্রকারে প্রকৃতির পরাংশগত হইলেই, তখন সেই বুদ্ধি জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া, ধান্য বীজে তিলগাছ উৎপত্তির ভ্রম দূর করিয়া দেয়। সংসারে তোমার মত কর্ত্তা ও বাঁশীর মত কৃষাণ অনেক আছে; বাঁশীকে ছাড়িয়া দাও। জমিতে এইরূপ "আগাছা" উৎপাদন অপেক্ষা জমি পতিত রাখাও ভাল। পরা

প্রকৃতি স্বরূপা গৃহিণীর এতাদৃশ বাক্যরূপ জ্ঞান ও "জ্যোতিঃতে" নারায়ণবাবুর জ্ঞান উদয় হইল। বাঁশী ইত্যবসরে মনে মনে কর্ত্তাকে অজ্ঞানী নির্ব্বোধ বলিতে বলিতে প্রস্থান পূর্ব্বক মনের দুঃখে গাহিয়াছিল ;—

"বুন্‌লাম ধান্ জন্মিল তিল,
ফল্‌লো রুদ্রাক্ষি খাইনু কিল ॥"

বর্ত্তমানে আমাদের ব্রাহ্মণ জাতিরও সেইরূপ কিল খাবার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ দর্শন বা বিজ্ঞানের অভাবে পুঁথিগত ধর্ম্ম-কর্ম্মের বাহ্য-অভিনয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই অজ্ঞান বা কুসংস্কারে পরিণত হইতেছে। তদ্ধেতুই ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কারে ব্রহ্ম বা ভর্গোজ্যোতিঃর উপাসনাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকরূপ ধান্য বীজ বপন করিয়া, তাহাতে আগাছারূপ কাম্যকর্ম্মযুক্ত অপর বহু মূর্ত্তির বাহ্য-পূজারূপ তিলগাছ জন্মিয়াছে দেখিলে, আমরা তাহাকে সংক্রিয়াবান্ বলিয়া কতই প্রশংসা দ্বারা রুদ্রাক্ষ ফলাইবার আশা করিয়া থাকি। তান্ত্রিক দীক্ষার বিধানমতে সাধনক্ষেত্রে ইষ্টমন্ত্ররূপ ধান্যবীজ বপন করিয়া সেই ক্ষেত্রে কামনা বাসনাজনিত বহুমূর্ত্তি স্বরূপ তিলগাছ গজান দৃষ্ট হইলে, ভবিষ্যৎ প্রলোভনের দুরাশায় মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া, আসক্তিরূপ হাগ্‌রাগোটা লাভে স্বধর্ম্মরূপ রুদ্রাক্ষ ভ্রম করিয়া থাকি। এরূপ আমাদের মধ্যে অনেকেই সাধনাক্ষেত্রে, অথবা ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত স্বধর্ম্ম রক্ষার অনুষ্ঠানে, নিত্য বা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা বা সংশয়চিত্ত হইয়া, পাপের ভয়ে নামমাত্র রীতিরক্ষা করিয়াই, পুণ্য বা ফলের আশায় বারমাসে তের পার্ব্বণরূপ কাম্য-কর্ম্মের আড়ম্বরে স্বধর্ম্মের প্রতিকূল আসক্তি-রূপ হাগ্‌রাগোটা লাভ করিয়া স্বধর্ম্ম বা সমাজের কল্পিত উন্নতিরূপ রুদ্রাক্ষ ভ্রম করিয়া থাকেন। কাজেই আমাদের অজ্ঞানতাই আজ আমাদের কিল্ খাওয়ার পথ সৃজন করিতেছে। তাহা না বুঝিয়া, তাদৃশ

মোহনবংশীগণ, নারায়ণরূপী দেশশুদ্ধ লোকের মাথা বিগ্‌ড়াইতেছে ও দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। অথচ আমাদের সংযম হীনতা ও জ্ঞান-বিস্তারের অভাবেই যে ঈদৃশ কারণ সংঘটন হইতেছে, তাহা অনেকেই চিন্তা করেন না বিধায়, তৎপ্রতিবিধানে আমাদের আত্মজ্ঞান-যুক্ত সমবেত চেষ্টা নাই। এজন্যই গুরুতা ও পৌরহিত্য জ্ঞানী ছাড়িয়া অজ্ঞানীর ব্যবসারূপে পরিণত হইতেছে। এই শ্রেণীর গুরু সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

গুরুগীতা।

হে দেবি! শিষ্যের বিত্তাপহরণ করে এমন গুরু অনেক আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হরণ করেন এমন গুরু অতি দুর্ল্লভ। সুতরাং এতাদৃশ লোভী ও অজ্ঞানী গুরুর দ্বারা ফলেও হাগ্‌রাগোটা উৎপন্ন হইতেছে। রুদ্রাক্ষ ভ্রমে যাঁহারা হাগ্‌রাগোটার বনে একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সহজে নিষ্কৃতির উপায় নাই। চারিদিক হইতে হাগ্‌রাগোটা তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিতেছে। এজন্য হাগ্‌রাগোটার অপর এক নাম "বন্ধগোটা"। **এই বন্ধগোটার আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়ার পথ "আত্ম-দর্শন-যোগ"।** মুক্তির পথে যাইতে হইলে, লোভ ছাড়িয়া ব্রহ্মচর্যানুশীলন বা সংযমের পথে যাইতে হইবেই হইবে। সুতরাং যাঁহারা মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন, তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিগণের রক্ষা বা সেবাইত জ্ঞানে সংসার-আশ্রমে বাস করাইয়া, আসক্তিরূপ লোকালয় সংশ্রব ত্যাগ করাইতে এবং তাদৃশ বাসনা-কামনাত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় **"স্ব-দেহস্থ অশ্বত্থ-**

বৃক্ষমূলে” আশ্রয় লাভের সন্ধান বলিতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত গুরু। এতাদৃশ জ্ঞানী গুরুরই শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। এ প্রকার সদ্‌গুরু চিনিয়া লইবার জন্যই স্বয়ং মহাদেব গুরু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"স এব সদ্‌গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিত্তমঃ" ॥

গুরুগীতা।

যিনি ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেই ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব জানেন তিনি "সদ্‌গুরু"। তাদৃশ গুরুই শাস্ত্রমতে গুরুপদ বাচ্য। গুরু শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও মহাদেব বলিয়াছেন ;—

"'গু' শব্দ শ্চান্ধকারঃ স্যাদ্'রু' শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারো নিরোধিত্বাদ্‌গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥"

গুরুগীতা

"গু" শব্দে অন্ধকার, "রু" শব্দে অন্ধকার-নিবারক অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তেজ, (যিনি আত্মশক্তিরূপ তেজ বা জ্ঞানজ্যোতির্বলে শিষ্যকে দীক্ষা-প্রদানকালীন, শিষ্যের হংসাখ্য জীবনীশক্তি, আত্মশক্তি সঞ্চারণের ক্রিয়াকৌশলে স্থূলদেহযন্ত্রস্থ (ফুস্ ফুস্) ঈড়া, পিঙ্গলা হইতে ফিরাইয়া সুষুম্নায় সঞ্চারিত করিয়া দেন এবং সেই অন্ধকার-নিবারক ব্রহ্মতেজ সব্যাহৃতিযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামে প্রাণকে বিনম্র অর্থাৎ প্রণবাকারে প্রাণ-প্রবাহে আত্মশক্তি শিষ্যের ভিতরে প্রত্যক্ষানুভূত করাইয়া সঞ্চিত পাপক্ষয় পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানরূপ জ্যোতির্বিকাশে অন্ধকার নাশ করেন, তাহার নামই গুরুশক্তি সঞ্চার। "সদ্‌গুরু" ব্যতীত এই কৌশল অপরে পরিজ্ঞাত নহে।— অতএব জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার যিনি নিরাকরণ করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে 'গুরু' শব্দে অভিহিত করিয়াছে। সেইরূপ জ্ঞানদাতা গুরুকেই প্রণাম করা শাস্ত্র-ব্যবস্থা। যথা—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধব্যক্তির জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিতে পারেন, সেই পরাৎপর জ্ঞানরূপী শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচর বিশ্বপরিব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রদর্শিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

"অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে ।
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

গুরুগীতা

যিনি আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান দ্বারা বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মপাশ-বদ্ধ জীবের কর্ম্ম-বন্ধন বিমুক্ত করেন, সেই পরাৎপর শ্রীগুরুকে নমস্কার। সুতরাং যিনি অজ্ঞান নিবারক, তেজোবিধায়ক শক্তিতে শিষ্যকে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছাদিত অন্ধ শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অখণ্ডমণ্ডলাকারে এই বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত ভগবানের বিশ্বরূপ ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করাইয়া, শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ কর্ম্মবন্ধনপাশ মুক্ত করিতে পারেন, শাস্ত্রমতে তিনিই গুরুপদবাচ্য। যিনি ধর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষেত্রে শিষ্য বা ছাত্রকে যে যে বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সেই ক্ষেত্রের জন্য তাঁহাকে সাধারণতঃ গুরু বলা যায়। অপরন্তু যিনি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত নিজেই অন্ধ, তিনি কি প্রকারে অপর অন্ধের গুরুরূপে পথপ্রদর্শক হইবেন? যে ব্যক্তি অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিশ্বব্যাপ্ত মহেশ্বর বা পরম ইষ্টদেবের পরম-

পদতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত বিধায়, ভেদবুদ্ধিতে খণ্ডভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন দেবতা কল্পনায়, ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যভিচার সাধন দ্বারা, কামনা-বাসনা-জালে বদ্ধ হইয়া চিরজীবন বহুনাম-রূপবিশিষ্ট দেবতাদিগের স্থূলমূর্ত্তির সেবা বা বাহ্য পূজায় রত থাকিয়া, শিষ্যের প্রাণেও কামনা বাসনা সঞ্চার এবং ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া ইষ্টদেবতাকে উপেক্ষা প্রদর্শনে অপর নানা দেবমূর্ত্তির বাহ্য পূজার উপদেশ দিয়া থাকেন; যিনি নিজেই আত্ম-জ্ঞানের অভাবে নিজেকে অসংযমী পাপী মনে করিয়া, "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ" বলিয়া পরিত্রাহি ডাকে যার তার পদে লুণ্ঠিত হইয়াও, আসক্তিপ্রযুক্ত নিজের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না, তিনি শিষ্যকে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-দ্বারা শিষ্যের জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে কিরূপে মুক্তিবিধানে সমর্থ হইবেন? যিনি শিষ্যের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পাপাসক্তিরূপ সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া, শিষ্যকে স্বোপার্জ্জিত ও অনন্তজ্ঞানের অধিকারী করিতে না পারেন তিনি কিরূপে গুরুপদবাচ্য বা প্রণম্য হইবেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এতাদৃশ অনেক অজ্ঞানী গুরু, শিষ্যকে জ্ঞান দিতে যাইয়া শিষ্যেরই শিষ্য হইয়া থাকেন। অবশেষে স্বজাতি ও নিজের আত্ম-সম্মান নষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হন্ যে, "দেখহে! ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল এজন্মে কিছু হইবে না—পরজন্মে; এই কলিকালে এসব কিছুই ফলিবে না। কলিতে একমাত্র হরিনামই সার"। এই বলিয়া—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নিজের বিজ্ঞতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। ঈদৃশ বিজ্ঞতার ফলে ইন্দ্রিয়-সংযম-বিরহিত "মৌখিক হরি নামের" প্রাধান্যরূপ এক সহজ পথ ইদানীং অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহা

পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধযুগের সময় যখন হিন্দুদের বহু দেবমূর্ত্তির ধ্বংস-সাধন হইতে থাকে ; যখন যুগযুগান্তরের সঞ্চিত হিন্দুসর্ব্বস্ব হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থরাশির বহু অংশ অগ্নিসাৎ হইয়াছিল ; সেই সময় একাকারে হিন্দুধর্ম্মকে সহজভাবে একেশ্বর-বাদী বৌদ্ধাকারে পরিণত করিবার জন্য হরিনামকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়া কলিতে সার্ব্বজনীনভাবে একটিমাত্র ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে বিধর্ম্মী কালাপাহাড় ও কালাপাহাড় সদৃশ বিধর্ম্মীগণের পুনরভ্যুদয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারের পুনরভিনয় হইতে আরম্ভ হইলে, যখন অনেক হিন্দু বিপন্ন হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাপ্রাণ চৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মের এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া, সঙ্গীত-সুধাকণ্ঠে একমাত্র হরিনাম প্রচারের দ্বারা ভীতি বিহ্বল হিন্দু জন-সাধারণকে ভক্তি-প্রেমসূত্রে একতাবদ্ধ করিবার জন্য একমাত্র হরিনামের প্রাধান্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন্। তাঁহার ন্যায় অনন্য চিত্ত ভক্তের মুখে, প্রাগুক্ত বৌদ্ধ বিপ্লব সাময়িক একেশ্বরবাদ অর্থাৎ "কলিতে একমাত্র হরিনাম ভিন্ন অন্যগতি নাই," এই বাক্যকে কেহ হতাশের অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিলেও, অথবা ঈদৃশ প্রকারে কলিতে একমাত্র হরিনামের প্রাধান্য কোন পৌরাণিক গ্রন্থে প্রক্ষিপ্তভাবে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও, তাহাকে আমরা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের জন্য বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-কর্ম্মবিধি ক্ষুণ্ণ করা হয়। বিশেষতঃ কলির প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ বা কলির জীবের ত্রাণজন্য ব্রহ্মবিদ্যারূপে যে গীতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকালের জন্য পৃথক্ কোন অনুষ্ঠান বা "একমাত্র হরিনাম ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই" একথা তিনি কোন স্থানে স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বেদ বা গীতার আদেশ ও আদর্শ ছাড়িয়া যাঁহারা

পুরাণ বা কাব্য গ্রন্থের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকে একাকার করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিজেকে ও সমাজকে বিপথগামী করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের বিচার-বিবেচনার ত্রুটীতেই কলিতে ঈদৃশ মৌখিক হরিনামের প্রাধান্য স্বরূপ বেদ-বিগর্হিত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থারূপ এক সংক্রামক ব্যাধি. আজ কল্পিত শাস্ত্রমতে, কলির প্রাধান্যহীন স্বয়ং বিশ্বনাথ রক্ষিত মহামুক্তিপ্রদ বারাণসীক্ষেত্রবাসিগণকেও আক্রমণপূর্ব্বক ক্রমে ভেদবুদ্ধি উৎপাদনে, ভক্তি, বিশ্বাস ও মনের একাগ্রতা হীন করিয়া তুলিতেছে; ইহাই অতীব দুঃখের বিষয়। যেহেতু পঞ্চক্রোশির বাহিরের সংস্কারবশে যাঁহারা কাশীতে বাস করিয়াও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যদৃচ্ছা আচরণ করুন আপত্তি নাই। কিন্তু বিশ্বনাথ-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রতত্ত্ব বিচার না করিয়া, যাহারা এই মহাক্ষেত্রে ঐরূপ হরিনামেরই একমাত্র প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়া—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

৺কাশীধামেও "হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই" এই ভাব ঘোষণা করিয়া পৃথক্ অনুষ্ঠানে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য ৺বিশ্বনাথ ও হরিতে ভেদজ্ঞান উৎপাদনের পন্থা যে প্রশস্ত করিতেছেন তাহাই পরিতাপের বিষয়। ৺কাশীধাম আত্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভাধিবেশনেও বাহিরের কতিপয় বক্তার ঈদৃশ উক্তির খণ্ডনার্থ সরলভাবে ২।১টী কথা বলা, এস্থলে আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তাঁহাদের বিবেকের শরণাপন্ন হইতেছি। যে বারাণসীক্ষেত্রে বিশ্বনাথ ভিন্ন ভেদবুদ্ধিতে অন্য দেবতার নাম করাও নিষিদ্ধ; যেখানে সমস্ত দেবতাগণ আগমন করিয়া এক বিশ্বনাথের প্রাধান্য স্বীকারে, প্রায় সকলেই বিশ্বনাথ (শিব) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেহ বা কাশীপুরীকে রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ("দেবানাং দেবব্রজনং" ইতি প্রমাণং।) যে বারাণসীক্ষেত্রে

ত্রিকালজ্ঞ মহাতপা ব্যাসদেব আসিয়া বিষ্ণুর প্রাধান্যভাবে হরিনাম করায়, তাঁহার বাক্য ও হস্ত স্তম্ভন হওয়া নিবন্ধন স্বয়ং বিষ্ণু ব্যাসদেব সমীপে উপস্থিত হইয়া "কাশীতে একমাত্র শিবই সর্ব্বপ্রধান" বলিয়া ব্যাসদেবকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; যেখানে অদ্যাপিও ধর্ম্মেশ্বর, কর্ম্মেশ্বর, কেশবেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ সকলেই "বিশ্বেশ্বর"রূপে বিরাজিত ও একত্বভাবে বিশ্বেশ্বরের প্রাধান্যই জ্ঞাপন করিতেছেন; যেখানে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম অদ্যাপিও বিশ্বনাথ (শিব) সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মফল বিশ্বনাথে সমর্পিত হইয়া আসিতেছে; মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভারতের নানাতীর্থে হরিনাম প্রচার দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি বিশ্বনাথক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া কখনও হরিনাম প্রচার কি হরিনামের প্রাধান্যভাবে ভেদবুদ্ধিতে অন্য কোন পৃথক্ অনুষ্ঠান করেন নাই। ৬বিশ্বনাথ স্বরূপ শিববাক্য অনুসারেও যে পঞ্চক্রোশী পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে যুগমাহাত্ম্য, কালমাহাত্ম্য নাই; সুতরাং শাস্ত্রমতে পাপ কলির অধিকারও নাই; যে ক্ষেত্রে "বম্-বম্-বিশ্বনাথ" স্মরণে জীবন্মুক্তি বিরাজিত। আজ সেই ত্রিদিব পূজিত নিত্য-মুক্তিপ্রদ বারাণসীধামে, বিশ্বনাথক্ষেত্রে, ভেদজ্ঞানে নানাভাবে নানা অনুষ্ঠানে অর্থলালসায় হরিনামকীর্ত্তন ও সঙ্গীতাদিতে অনায়াসে প্রচার করা হইতেছে যে,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

"কলিতে একমাত্র হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই।" ইহাই কি শাস্ত্র-সম্মত? যে ৬কাশীধামে একমাত্র বিশ্বনাথই মুক্তিদাতা, (—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য্য,—) সে ক্ষেত্রে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই,

ইহা বলা বাতুলতা মাত্র। তবে অর্থলোভে যাঁহারা ঐরূপ বলেন বা কীর্ত্তনাদি সঙ্গীত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা হরিনামের উপর তাদৃশ ভক্তি শ্রদ্ধাশীল ; হরিই যাঁহাদের ইষ্টদেবতা, তাঁহারা হরিনামই করুন্। যে কোন লক্ষ্যে মনের একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতাই সাধনার প্রথম সোপান। সেই ভাবে এক হরিনামের উপর নির্ভর করিতে পারিলে, সে ত উত্তম কথা ; কিন্তু কলিতে "হরিনাম" ভিন্ন অন্য গতি নাই, এই কথা সমাজে ঘোষণা করিয়া, যাঁহারা অনন্যগতিতে সেই হরিনামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না ; সংশয়িতভাবে আরও নানা দেবতার পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের হরিনামের উপর একনিষ্ঠত্ব কোথায় ? তাঁহাদের মতে কলিতে যখন একমাত্র হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই, তখন একনিষ্ঠভাবে হরিনামের উপর নির্ভর করিয়াই বলুন যে,—

'জলে হরি স্থলে হরি, অন্তরে বাহিরে হরি।
অনলে অনিলে হরি, হরি আমার সর্ব্বময়॥'

সেরূপ বিশ্বাস, সেরূপ ভক্তি, সেরূপ একাগ্রতা ও সেরূপ নির্ভরতা আছে কি ? যদি তাহাই ঠিক্ থাকে, তবে তাঁহাদের আবার তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার কি কাজ ? তাঁহাদের আবার পাপক্ষয়ের জন্য পতিত পাবনীর শরণাপন্ন হওয়া কেন ? কলিতে হরি নাম ভিন্ন যখন অন্য গতি নাই ; তখন মহামারির আক্রমণ দেখিয়া সেই হরি নাম উপেক্ষা করিয়া, তাঁহারা বারোয়ারী কালী-পূজা, শীতলাপূজাতে বদ্ধ পরিকর হন কেন ? কাজেই তাহাদের ভাব ;—

"মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি
প্রেম বারি চোখে আসে না"

গুরুদত্ত ইষ্টদেবের নামের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি না রাখিয়া মুখে হরি হরি করিলাম। কলিতে হরি নাম ভিন্ন গতি নাই বলিয়া, বেদোক্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকুলে ধর্ম্ম কর্ম্মের একাকার সাধন-সহায়তায়, সমাজকে দুষিত করা বিবেকানুমোদিত নহে। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাবে ঐ অগতির গতি হরি নামের উদ্দেশ্য নিরূপণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, ঐ মৌখিক হরি নামের অর্থ কেবল ভোগ সুখের লালসায় ইন্দ্রিয় সংযম পরিত্যাগের কৌশল মাত্র; ব্রহ্মচর্য্য ও নিত্যকর্ম্মরূপ সন্ধ্যা-পূজা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা যোগানুষ্ঠানের প্রকৃত সাধন-মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তির ব্যভিচার ও বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম এবং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাদন করার নামান্তর মাত্র। পরন্তু গুরু পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া যথেচ্ছাচারী ভাবে ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখে অর্থব্যয়ের কৌশল মাত্র। অথবা শাস্ত্র, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মের একাকার করা ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। অপরন্ত আপাততঃ তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে, আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ বল আধ্যাত্মিক শক্তির বিনাশ সাধনের সহায়তা করা মাত্র। যাহা হউক যদি তোমরা বাহ্যভাবে মুঁখে "হরিবোল হরিবোল" করিয়া, নিত্যসুখ বা শান্তিলাভ করিতে পারিতে, যদি তোমরা যথার্থ প্রেমিক ভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে পারিতে, যদি তোমরা মনের মলিনতারূপ দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি পাপ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিতে, তবুও বুঝিতাম যে, ঐ "হরিনামে" তোমাদের আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে। কিন্তু নিজেই নিজের বুকে হাত দিয়া একবার নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, তোমাদের চিত্ত কতদুর বিশুদ্ধ হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে,—

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে,
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।

চৈতন্য চরিতামৃত

সুতরাং ঐ হরিনাম কীর্ত্তনাদিতে যদি পূর্ব্বোক্ত দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতাদি মনোমলাগুলি অপসারিত না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনা জনিত অসংযম ভাব, ক্রমশঃই বৃদ্ধি ও আত্ম-অবনতি এবং সমাজের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়া প্রতীয়মান হয়, তবে টিয়া পাখীর বোলির ন্যায় মৌখিক হরি হরি করিলেই প্রকৃত "হরিনাম" করা হয় না, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন সাধক গাহিয়াছেন—

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

"হরি হরি ক'রে (ওরা) মিছে ব'কে মরে,
ব'লে থাকে হরি হৃদয়ের ধন।
(সে যে) বাঙ্মন অতীত, ধ্যানেতে বিদিত,
বচনেতে লাভ না হয় কদাচন ॥
কলিতে কলুষ (বটে) হরিনামে যায়,
ত্রিতাপের জ্বালা নামেতে জুড়ায়।
(যদি) প্রাণায়ামে নাম, গুরু ব'লে দেয়
তবে হয় হরির তত্ত্বনিরূপণ ॥
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত মুখে হরি বলা,
না জুড়ায় তাতে ভববিষ জ্বালা।
না হয় হরণ, পাপ মনোমলা,
হরি যিনি সর্ব্ব করেন হরণ ॥

কাঁদিতে তরিতে হরিনাম সার,

সেই "ইষ্ট নাম," প্রাণায়াম সার।

জানায় নিকটে বুঝিয়া ব্যাপার,

"অজপায়" জপ কর জীবগণ ॥"

(যোগ-সঙ্গীত)

শাস্ত্রমতে গুরুদত্ত দীক্ষা ভিন্ন কোন মন্ত্র বা নামের শক্তি লাভ হয় না। কিন্তু তোমরা কলির "অনন্য গতি" যে হরিনামের কথা বলিতেছ ; সে কোন হরি ? অভিধানে 'হরি' শব্দের যে সব অর্থ দেখা যায়, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, সিংহ, ব্যাঘ্র, বায়ু, অশ্ব, সর্প, ভেক ইত্যাদি অনন্ত নামে ব্যবহৃত। ইহার মধ্যে তোমাদের হরির কি আকার ? তোমরা যে, হরি বুঝিতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের নন্দলাল, শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপবালাগণের হৃদয়বিহারীকেই একমাত্র হরি ভাবিয়া সেই মধুর ভাবেই,—

"মজালে কনকলঙ্কা, মজিলে আপনি"

সেই মধুর ভাব ভিন্ন কি তাঁহার অন্যভাব নাই ? এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রূপ গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

"ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার ;

'শান্ত'রতি 'দাস্য'রতি 'সখ্য'রতি আর।

'বাৎসল্য'রতি, মধুর'রতি এ পঞ্চ বিভেদ।

রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চ ভেদ ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ "শান্তের" দুই গুণে,

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তগণে ॥

"শান্তের" স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন,
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥" চৈতন্য চরিতামৃত।

ভক্ত ভেদে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্ত রস ভক্তির প্রথম সোপান। শান্তরসের দুইটী গুণ, "ঈশ্বরে নিষ্ঠা," এবং "সংসার বাসনা ত্যাগ।" এই দুই গুণই ভক্তির পত্তন। শান্তরসের এই গুণ দ্বয়, অন্য চারিটী ভাবেই আছে। সুতরাং প্রথমে শান্তভাব ভিন্ন অন্য চারি ভাব আসিতেই পারে না। শান্তরসে ঈশ্বরে মমতা হয় না কেবল তাহার স্বরূপ জ্ঞান হয় মাত্র; অর্থাৎ তিনি যে পরব্রহ্ম, "পরমা স্বরূপ" ইহাই জ্ঞান হয়। আত্ম-জ্ঞান যোগে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান না হইলে, "শান্তভাব" বা "ভক্তির উদয়" হয় না। হরি ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার ধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥
ভাগবত ১১স্কন্ধ ২য় অঃ

শান্তভাবের সাধনায় যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, পিপাসা, কষ্ট, প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিমুহ্যমান হন না, তিনি যথার্থ ভক্ত।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ভাঃ ১১।২ অঃ

যাঁহারা চিত্তে বাসনা জনিত কর্ম্মের বীজ জন্মাইতে পারে না। একমাত্র বাসুদেব প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি থাকেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত।

এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানযোগে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সংযমরূপ কর্ম্মযোগ-অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত "শান্ত"ভাবের ভক্ত হওয়া যায় না শান্তভাবের প্রোক্ত দুইটি গুণকে আশ্রয় না করিয়া সর্ব্বোচ্চ মধুরভাবের তত্ত্ব অনুসরণ করিতে গেলে, তাহার পরিণতি কলুষ বৃত্তিকেই আশ্রয় করে। দূর দর্শিতার অভাবে প্রথমস্তর ছাড়িয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চস্তরের মধুর ভাবাবলম্বন করিতে যাইয়াই আমাদের পতন ঘটিয়াছে। হরি বলিতে কি একমাত্র বৃন্দাবনের রাধা, চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে? এবং সেই রূপেরই গুণ গান করিতে হইবে? কেন? তাঁহার কি অন্য কোন রূপ নাই? যে একমাত্র দ্বিভুজ মুরলীধারী ত্রিভঙ্গ বাঁকার যৌবন কালের মধুর লীলায় বিমুগ্ধ হইয়া, অজ্ঞানী সকাশে সেই হাব, ভাব, রঙ্গ, রসের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা সংযমহীন সমাজে বিশদভাবের পরিবর্ত্তে অসদ্‌ভাবের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা হইতেছে কি না; তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয় কি? মুক্তি ক্ষেত্রে, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ভাবকে' টানিয়া আনিয়া, বৈধব্য-সন্তাপ-বিদগ্ধা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী মা ভগিনীগণকেও সেই শ্রীবৃন্দাবনের ভাবের বন্যায় ভাসাইয়া, সংযমহীন অবশীকৃত কাঁচা মনকে আরও কাঁচা করিয়া দেওয়া হইতেছে কি না? শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীগণ বা সংযম অভ্যাসকারি-গণের পক্ষে স্ত্রী পুরুষের মিথুনভাব জ্ঞাপক চরিত্র বর্ণনাদি শ্রবণ নিষিদ্ধ তথাচ প্রমাণ—

"স্ত্রীধন-নাস্তিক-বৈরি-চরিত্রং ন শ্রবণীয়ং।"

নারদ ভক্তি সূত্র।

স্ত্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাব, ভাব প্রভৃতির বর্ণনা, নাস্তিক, ধনী ও শত্রুর চরিত্রাদি বর্ণনা-শ্রবণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ তদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তি নানাভাবে উত্তেজিত হইয়া সংযম ও একাগ্রতা নষ্ট করে। সুতরাং

এতদ্বারা ৺বিশ্বনাথের উপর অবিচলিত ভাবে আত্ম সমর্পণের প্রতিকূলতা আচরণ বলে, সংযম ও মোক্ষলাভের অন্তরায় সংঘটন করা হইতেছে কি না? এবং অজ্ঞানদিগের ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন করা হইতেছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? যে—একমাত্র বৈষ্ণব কবিগণের কল্পনা প্রসূত কাব্যকেই বেদ বাক্য-স্থানে, নিম্নস্তর গোপ সমাজের মাধুরী আনিয়া বেদোক্ত চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করায়, তদ্দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে? যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে গোপকুলে থাকিয়া কংস ভয়ে নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে, গোপজাতির আচারানুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই মথুরায় যাইয়া ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া, কিংবা পুনরায় অন্য কোন স্থানে গোপ জাতির আচারানুষ্ঠান বা শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপবালাগণের সহিত ইহ জীবনে আর কখনও **কি মধুর মিলন সংঘটন করিয়াছেন?** কিম্বা সেই বৃন্দাবনের ধড়া-চূড়া আর কখনও ব্যবহার করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপিনীগণকে অনায়াসে মথুরায় আনয়ন করিয়া পরেও সেই মধুর লীলা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কেননা, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজের নিম্নস্তর মধ্যে অবস্থান কালে যেই সকল আচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, **সমাজের উচ্চস্তরে সেই ভাব প্রদর্শন করিলে, সমাজের উচ্চ আদর্শ নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিবে।** পরন্তু ঐ সকল কার্য্যকে পরবর্ত্তী কালে তিনি নিজেই যে নৈতিকভাবে উন্নত মনে করিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় না। বরং **তাদৃশ মধুর ভাবের সাধন ভজনাদি যে সমাজের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে অনুকূল নহে, পক্ষান্তরে সংযমানুষ্ঠান ও উচ্চ আদর্শের প্রতিকূল;**

সম্ভবতঃ তিনি তাহাই মনে করিয়া শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপিনী-গণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে এবং সেইভাবে অন্যত্র নিজের আত্ম-পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। ইহা তাঁহার স্ব মুখের বেদবাণী তুল্য গীতার বাণীতেও প্রমাণ আছে। তিনি কলির জীবের মুক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা বা গীতা প্রচার দ্বারা সর্ব্ব প্রথম আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-সংযম পরন্তু নিষ্কাম-কর্ম্ম, বিশুদ্ধা-ভক্তি, ত্রিবিধগুণ, ও ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বৃন্দাবনের ভাবকে কোনও স্থলে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা দূরে থাক্, বরং তাহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি ব্রহ্মভাবে বিভূতিযোগে "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" বলিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থলেই তিনি গোপবংশের কানাই, বা শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলীর প্রাণধন হরি বলিয়া নিজের আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও স্বকৃত ভাবে যাহা সমাজের নিম্নস্তরের কার্য্য, তাহা উচ্চস্তরের আদর্শনীয় নহে মনে করিয়া, সর্ব্বতোভাবে সে সংস্রব পরিত্যাগ, এমন কি নাম গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। আর আমরা সমাজের উচ্চস্তরে সেই নিম্নস্তরের আদর্শে, সেই ভাবের পূজা ও নানাভাবে বিকৃত ব্যাখ্যায় গুণ গান করিয়া আসিতেছি। কেন, শ্রীকৃষ্ণের কি অন্য কোন ভাব নাই? দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবগণ, বিদুর, ভীষ্মের, কৃষ্ণভক্তির কি তুলনা আছে? একমাত্র "দ্বিভুজ মুরলীধারী"

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের মধুর ভাব ভিন্ন কি অন্যভাবে হরিনাম হয় না? শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মুখে ব্যক্ত সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-রূপ গীতা কি আমাদের জীবনের আদর্শ নহে? হরিনাম সম্বন্ধে কোন সাধক গাহিয়াছেন ;—(১)

*　　*　　*　　*　　*

(তার) ঐ দ্বিভুজ মুরলীধারী রূপের শেষ ভাবিস্ নারে।
(সে ত) শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ধরে ॥
(যিনি) মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ নৃসিংহ বামন হরে।
(হ'লেন) রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি দশ্ অবতারে ॥
(সে যে) "অহমাত্মা" রূপে সদা সর্ব্বভূতে বাস করে।
(সদা) 'অহং' 'অহং' অহং' ভাব, সেই 'অহং কে?' ভাব্লি নারে
(সে ত) সর্ব্বস্ব বুদ্ধি রূপেণ জীব হৃদে বিরাজ করে।
(ছেড়ে) দ্বেষ-হিংসা-স্বার্থ-মোহ, জ্ঞানের চ'ক্ষে দেখ তাঁরে ॥

---

(১) নগর সঙ্কীর্ত্তন।

(আমার যায় যেন জীবন চলে—গানের সুর)

বল জয় হরে শ্রীমুরারে।
(বিনে) সেই কৃপাসিন্ধু, জীবের বন্ধু, আর কে আছে দুস্তরে ॥
(জীব) অনিত্য সংসারে এসে, রইলিরে মায়ার ঘোরে,
(দেখ) ভাই বন্ধু দারা সুত, সাথের সাথী কেউ নারে ॥
(যদি) শমন দমন ক'র্তে চাও মন, ডাক সেই পরাৎপরে।
সদা তারক-ব্রহ্ম-শ্রীহরিনাম, বলরে বদন ভরে ॥
বল হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
বল হরেরাম, হরেরাম, রাম রাম, হরে হরে ॥

(ঐ) হরিহর "অভেদাত্মা," ভ্রান্ত প্রভেদ বিচারে।
(সে যে) ত্রিভাবে ত্রিরূপধ'রে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে॥
(ও যে) কখন কৃষ্ণ, কখন কালী, ওরে চিন্‌তে কে পারে ?
(আবার) কৃষ্ণ মাতা হলেন "কালী", অশ্বাসুর বিনাশ তরে॥
(আত্ম-) জ্ঞানের আলো পেয়ে "উমা" দেখে সেইরূপ "ওঁ"ঙ্কারে।
(বল) "নমস্তস্যৈ" "নমস্তস্যৈ" "নমস্তস্যৈ" "মা" হরে॥

যোগ সঙ্গীত

ঐ "বিশ্বরূপ" হরিই যদি তোমাদের সেই হরি হন, তবে সেই হরিনামের অর্থ ভববন্ধন হরণকারী অর্থাৎ যিনি নানাভাবে জীবের পাপ তাপ-হরণ করেন তিনিই হরি। সুতরাং হে ব্রাহ্মণ! তোমার ভর্গোজ্যোতীরূপ "গায়ত্রীই" তোমার হরি। শাক্ত! তোমার স্ব স্ব ইষ্টদেবতারূপ "মহাশক্তি"ই একমাত্র তোমার হরি। শৈব! তোমার সর্ব্বমঙ্গলদাতা "শিবই" তোমার হরি। সৌর! সেই জ্যোতির্ম্ময় "সূর্য্যনারায়ণ" তোমার হরি। গাণপত্য! তোমার লম্বোদর "গণপতিই" তোমার হরি। ভক্তি বিশ্বাস অচল রাখিয়া গুরুদত্ত উপদেশ মতে যার যার ইষ্টদেবতার নামরূপ "হরিনাম" জপ কর, তিনিই তোমাদের জন্মজন্মান্তরের পাপ-তাপ-হরণ করিয়া, মুক্তির বিধান করিবেন। প্রাণায়ামযোগে তোমার সেই "ইষ্টমন্ত্র"রূপ নাম স্মরণ কর, তাহা হইলেই হরিনাম জপ হইবে এবং সেই ইষ্টদেবতার নামই তোমার হৃদয় হইতে "কলি"ভাব দূর করিয়া, সত্য প্রস্ফুটিত করাইয়া দিবে। সেই "হরিনাম" ভিন্ন তোমাদের অন্য গতি নাই। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই কালী, তিনিই দুর্গা, তিনিই জগদ্ধাত্রী একমাত্র তিনিই "প্রাণাত্মা"রূপে এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই তোমার **"আত্ম-স্বরূপ নারায়ণ," "প্রাণরূপ বিষ্ণু," "তোমার আত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম অভেদ শ্রীহরি"**

তিনিই জ্ঞানীর নিকট স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানীর নিকট (ভেদ বুদ্ধিতে) চিরদিন অপ্রকাশ। তজ্জন্যই অজ্ঞানীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই মুক্তি দিতে পারেন না। যোগ-বাশিষ্ঠও সেই কথাই বলিয়াছেন। সাধারণের বোধগম্য জন্য তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"আত্মানারায়ণ হরি ভিন্ন কভু নয়।
প্রহ্লাদেরও সেই হরি জানিও নিশ্চয়॥
কুসুমে সৌরভ আর তিলে তৈল যথা।
আত্মা আর নারায়ণ সম্বন্ধও তথা॥
যিনি আত্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি জনার্দ্দন।
বৃক্ষ, তরু, বিটপীও পাদপ যেমন॥
এক আত্মা মহাশক্তি দিয়া আপনার।
আপন-প্রহ্লাদ-আত্মা করেন উদ্ধার॥
হরি, হর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ঈশ্বর মহান্।
মূর্খে না করেন কেহ জ্ঞান-মুক্তি দান॥
আত্মা দিয়া রঘুবর "আত্ম-পূজা" কর।
আত্মা দিয়া আত্মাতেই স্থিতি-পদ ধর॥
বিরাজ করেন বিষ্ণু নিখিল অন্তরে,
অন্তরস্থ বিষ্ণু ছাড়ি ঘোরে যে বাহিরে;
কেমনে হইবে বল বিষ্ণুসেবা তার?
শুধু "বাহ্যভাবে পূজা" অজ্ঞান আঁধার॥
হৃদয়ে চৈতন্য যাঁহা সেই শুদ্ধ সত্ত্ব।
আত্মার শরীর সেই সনাতন তত্ত্ব॥

শঙ্খ-চক্র-গদাধারী "গৌণ মূর্ত্তি" তাঁর।
"মুখ্য" ছাড়ি "গৌণ" ধরা নহে তত্ত্বসার॥
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পূজা করি ধ্যানে।
ক্রমে লোক বহুজন্মে মুক্তি-তত্ত্ব জানে॥"

উপ সঃ ৪৩ স্বর্গ।

অতএব সর্ব্বাগ্রে মানস ক্ষেত্রে সেই পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীহরির অনুভূতি লাভের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট সেই "আত্ম-তত্ত্ব" জানিয়া লও। তাহা হইলেই তোমার সকল তত্ত্ব মিলিবে। সেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরু ভিন্ন গত্যন্তর নাই—তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

বাউল সুর।

"বল এই ভব সাগরে, কেমন ক'রে, তর্‌বে গুরুসঙ্গ বিনে।
কুসঙ্গে কু-প্রসঙ্গে, রইলে রঙ্গে, ভ্রম তরঙ্গে, ভব-তুফানে—
যত যা' করেছ ভবে, পড়ে রবে, বারেক ভেবে দেখ মনে।
পেয়ে ঐ মানবদেহ, তাতেও মোহ, সন্দেহ যাবে কেমনে—
আশী লাখ জন্ম পরে, ঘুরে ফিরে, এলে কেবল অচেতনে॥
এসেছ যেখান হ'তে, তথায় যেতে, পথের খবর লও হে জেনে—
জীবনের সঙ্গে ধর্ম্ম "আত্মকর্ম্ম" দিলেন যিনি জেনে শুনে॥
তুমি যাঁর তত্ত্ব ভু'লে, বুলি ব'লে, ক্ষীণ হ'তেছ দিনে দিনে—
বিনা সেই "আত্মতত্ত্ব" সব অনিত্য, "অজপা" কি আছে মনে?
যেতেছে "একুশ হাজার, ছয় শত বার" আরও কত রাত্র দিনে—
তোমার যা' পুঁজি ছিল, ফুরায়ে এল, ঠিক্ দিয়ে তায় দেখ মনে॥

দেহে "প্রাণ" আছে ব'লে, হেসে খেলে, বেড়াচ্ছ ভাই নানা স্থানে—
"প্রাণ" তোমার থাক্‌বে কিসে, তার উদ্দেশে, ঘুরেছ কি কোন স্থানে॥
প্রাণ রাখার কেমন বিধি, জান্‌বে যদি, "সদ্‌গুরুকে" ধর চিনে—
যাঁহাদের কৃপাবলে, পায় সকলে, দেখতে স্পষ্ট আত্মধনে॥"

যোগ-সঙ্গীত।

তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, গুরুই তোমার সর্ব্বভয়ত্রাতা, ইহা শিব বাক্য—

"মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বাশাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুরক্ষতি পার্ব্বতি॥" গুরু গীতা।

হে পার্ব্বতি! যদি কেহ মুনিগণ বা দেবতাগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়, অথবা সর্পগণ কর্ত্তৃক দংশিত হয়, অথবা কাল সম্মুখে দেখিয়া মৃত্যুভয়ে অভিভূত হয়, তথাপি গুরুভক্ত ব্যক্তিকে গুরুই সর্ব্বদা রক্ষা করেন। সুতরাং সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে কার্য্য কর। গুরুদত্তশক্তিবলে তুমি অনায়াসে সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যশীল হইতে পারিবে। দৃঢ় বিশ্বাসে তুমি সদ্‌গুরুর পদে আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার অনন্ত জ্ঞানলাভ হইবে। সাধক গাহিয়াছেন—

ভজন।

"মনুয়া চল্‌রে গুরুধাম্।
মনুয়া চল্‌রে গুরুধাম্॥

তীরথ্ তীরথ্ ঘুমি হোতা, কাহে তু হায়রাণ্।
কাশী মক্কা ঢোঁড়ি ফিরো, ভয়া ন কুছ্ কাম্।
পীর পয়গম্বর সব্ কুছ্ মিলে, পোঁছে গুরুঠাম্॥"

রাম রহিম্ বোলি বোলো. তিস্ মে ন কুছ্ কাম্।
এ্যয়'সা বোলি বোলো জিস্ মে, পাওয়ে গুরুস্থান॥

ধরম্ করম্ কর্ত্তে ফিরো, পিয়াসন্ ফল্‌কে নাম।
ক্যা করেগা করম্ তেরা, নহি যব্ নিষ্কাম॥
ঘট্ ঘট্ সব্‌কে ঢোঁড়ি দেখো, সব্‌মে বিরাজে রাম।
রাম রহিম সো একহী হ্যায়, যো জুদা খালি নাম॥

এ্যয়সা রাম বিরাজে দেখো, যা'কে গুরুধাম।
তিনকো পূজা ছোড়ি কিয়া, তুম্‌নে কিত্‌না ভাণ॥
গুরুপূজন্ সো সব্ কুছ্ হোতা, মুরত্ পূজে ক্যা কাম।
উন্‌কো ভলা কভি ন হোতি, জিন্‌কো গুরু বাম্॥
মিট্টি পত্থর ছোড়ি দে কে, কর্‌না আসল্ কাম
গুরু যো বত্‌লাবে তুঝ্‌কো, সোহি করে নিষ্কাম॥"

যোগ সঙ্গীত।

গুরু বা তাদৃশ ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র পিতা মাতা বা স্বামীরূপ মহাগুরু এবং আচার্য্য বা শিক্ষাদাতা দ্বারাই সহজ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম বা "আত্ম-দর্শন-যোগের উপায় স্বরূপ, কর্ম্মযোগানুশীলন হইতে পারে। উঁহাদের প্রসন্নতাই-ব্রহ্মচর্য্য, অনুশীলন বা সংযমরূপ "কর্ম্মযোগের" প্রধান সহায়ক।

দ্বিতীয় সহায়ক জ্ঞান; সেই জ্ঞান লাভোদ্দেশ্যেই গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতা বা উপাস্য দেবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসে, নিত্য-পূজা-অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগ অভ্যাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্বারা মনের একাগ্রতা আরও দৃঢ়তর হয়। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। এ স্থলে সংক্ষেপে একটি মাত্র বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি অকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

কোন দেবতার ষোড়শোপচারে বাহ্যপূজা করিয়া পূজোপচার তৎক্ষণাৎ পুরোহিত বাড়ী প্রেরণ করা হয় ; তাহার কোন একটি উপচারের প্রতি যাহাতে লোভ দৃষ্টি নিপতিত না হয়, কোন জিনিষ নিজ বা নিজ পরিবার মধ্যে ভোগ তছরূপে না আসে। সামান্য কিছু দেবতা প্রসাদ ভাবে নিজেদের ভোগাধিকারে আসিলেও তাহা দৈবী সম্পদ রূপে পবিত্র জ্ঞানে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিতে পার ; অবশিষ্ট কোন বস্তুতেই তোমার যেমন অধিকার নাই।— যদি এইকথা সত্য হয়, তবে মানস-পূজায় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী তুমি ধ্যান যোগে দেহ মধ্যস্থ আত্মাতে মহেশ্বর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তোমার দেহাভ্যন্তরস্থ দশ ইন্দ্রিয় ও ষড় রিপু এই ষোড়শটিকে, "আসনং স্বাগতম্ পাদ্যং" ইত্যাদি ষোড়শোপচার ভাবে যাহা মহেশ্বর পদে উৎসর্গ করিয়াছ এবং অবশেষে—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর॥

এইরূপে দশ ইন্দ্রিয়, ষড় রিপু তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া আত্মাকে পর্য্যন্ত যাঁহারা চরণে নিবেদন পূর্ব্বক "হে মহেশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র গতি" বলিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাক, পরে সেই আত্মায় পুনর্ব্বার ভেদ জ্ঞানে অন্য দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার তোমার কি অধিকার আছে? (১) এবং তৎপদে নিবেদিত মানস পূজোপচার, অহং জ্ঞানে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার, তোমারই বা কি অধিকার থাকিল? তুমি কেন তাহা বাহ্য পূজোপচারের ন্যায় (তোমার ইন্দ্রিয় বিষয় ও রিপুগণকেও নিবেদিত

(১) এ স্থলে গুরু পূজা, ইষ্ট পূজা, বা শিব পূজায় গুরু-ইষ্ট-শিব অভেদ জ্ঞানে দেবতা-মন্ত্র অভেদ ভাবে ধারণা করিতে হইবে। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন "গুরু মন্ত্র দেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া" অর্থাৎ বুদ্ধি বিনিয়োগে, গুরু, মন্ত্র, ও দেবতায় ঐক্য ভাবনা করিয়া কার্য্য করিবে।

বস্তু জ্ঞানে) অন্তর্মুখে সেই মহেশ্বরের অন্তঃপুর সদৃশ পরা প্রকৃতি সদনে প্রেরণ কর না? অর্থাৎ প্রবৃত্তি মুখো ইন্দ্রিয় বিষয়াদিরূপ আসুরিক সম্পদকে অন্তর্মুখে প্রত্যাহার ভাবে দৈবী সম্পদে পরিণত করিয়া, তোমার আত্মাকেও সেই মহেশ্বর রূপ পরমাত্ম-পদে সমর্পণ কর; "আমিত্বের অহঙ্কার" ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমার আত্মাশুদ্ধ সমস্তই মহেশ্বর স্বরূপে জ্ঞান হইবে। তাই সাধক গাহিয়াছেন—

রামপ্রসাদী—সুর।

"মন থেকোরে আত্মবশে, তুমি যেওনা ইন্দ্রিয় পাশে।
ইন্দ্রিয়গণ করুক কর্ম্ম,—তুমি থাক হৃদাকাশে॥
হইলে স্বধর্ম্মেরত, আনন্দ পায় অবিরত;
ওরে, পরধর্ম্মেরত হয় যে, হত হয় সে অবশেষে॥
রূপেতে পতঙ্গ মুগ্ধ, আপন দোষে হয় সে দগ্ধ,
(ওরে) তেমনি তোমার ঘট্‌বে দশা, না থাকিলে আপন বশে
মন তোমারে বলি শুন, আত্মা ব্রহ্ম অভেদ জেনো
অন্য মতি কর্‌লে পরে, পড়্‌বে ফাঁদে হারাবে দিশে॥
প্রত্যক্ষ বোধ হবে যবে, গণ্ড গোল সব মিটে যাবে।
(তখন) বিমল আনন্দ পাবে "মহেশ্বরে" যাবে মিশে॥"

যোগ সঙ্গীত।

তোমার স্থূল দেহটা যাহাকে এখন তোমার মনে করিতেছ, জীব যে স্থূল দেহের ভোগ সুখের আসক্তিতে আত্মহারা হইয়া সতত প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসদ্বৃত্তি অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইতেছে না; "অহং" সহ সেই প্রবৃত্তি মুখো ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলি যদি একবার ভগবৎ পদে সমর্পণ করিয়া

সর্ব্ব শ্রান্ত হইতে পার, তখন ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে তোমার ও তোমার পরিজনবর্গের স্থূল দেহ রক্ষার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। কারণ তখন "তুমি" স্বীয় দেহস্থিত মহেশ্বরের ন্যায় অন্যান্য সকলের দেহ মধ্যেও মহেশ্বর রূপ সন্দর্শন করিবে এবং প্রয়োজন মত দৈবী সম্পদ দ্বারাই পরমানন্দে একমাত্র সেই সর্ব্বব্যাপি মহেশ্বরের সেবা করিয়া মানব দেহকে ধন্য মনে করিবে। কিন্তু সাবধান! মহেশ্বরের পদে সমর্পিত তদীয় অন্তরস্থ কোন দৈবী সম্পদকে কখনও লোভ বা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া "অহংজ্ঞানে" তোমার বলিয়া জ্ঞান করিও না। কারণ অনিত্য আসক্তি প্রসূত প্রবৃত্তি-মার্গের যে কোন ক্ষেত্রে, ঐ প্রদত্ত বস্তু উপভোগ করিলেই দত্তাপহারী হইতে হইবে। লোভ বা আসক্তির বশবর্ত্তী হইলেই মানব দত্তাপহারী হয়, তন্নিবন্ধন পতিত হইয়া থাকে। লোভ হইতেই ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি, ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি-বশেই মনুষ্যের অধঃপতন হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

গীতা ২য় অঃ

ইন্দ্রিয়-বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা, কোন কারণে সেই কামনা প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধের উৎপত্তি হইলেই "সম্মোহ" অর্থাৎ হিতাহিত-জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন ঐ সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম; (আত্ম-বিস্মৃতি) স্মৃতি-বিভ্রম হইলেই বুদ্ধিনাশ হয়। এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই (মৃত্যু সদৃশ) অধঃপতন হইয়া থাকে। সুতরাং লোভ বা আসক্তিকে জয় করিবার জন্যই

সন্ধ্যা ও মানস পূজারূপ নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা। উহার নামই কর্ম্মযোগ। ইন্দ্রিয় সংযম বা মানস কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হয় না। এ নিমিত্ত আসক্তি বা লোভের বশে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মানস পূজোপচারাদির উপরও কদাচ "অহঙ্কারের" আধিপত্য স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ দুর্জ্জয় লোভ ও কাম, অহঙ্কারেরই সেনাপতি। আত্ম-জ্ঞান-যোগে উহাদিগকে পরাস্ত করিবার পন্থা বিস্মৃত হইয়া অজ্ঞানাসক্ত বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইলেই, তাহা হইতে "রক্তবীজের" ন্যায় "তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ" ভাবে কাম, ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া তোমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। তদ্ধেতু তুমি আত্মরূপী মহেশ্বরের দর্শন, স্পর্শন, ও পূজারূপ আত্ম-দর্শনের অধিকারে বঞ্চিত হইবে। এ জন্য ভগবান্ তোমাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

গীতা ১৬ অঃ

কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার। ইহারা "আত্ম-জ্ঞানের" নাশক, এজন্য এই তিনটী সতত পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-অনুষ্ঠান করিবে। এ সম্বন্ধে সাধক গাহিয়াছেন—

রাগিনী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম ক্রোধ বিষম অরি।
(তারা) দুষ্পূর অতীব উগ্র সাধন পথের বিঘ্নকারী॥
ধূমেতে বহ্নি যেমন, মলেতে যথা দর্পণ,
কামনায় "আত্ম-জ্ঞান" ঢেকেছে তেমনি করি॥
অজ্ঞানী সাধন বিনে, (তাদের) সাধ্য কি রাখে শাসনে,
গুরু লঘু নাহি মানে, এরা ভয়ঙ্কর অরি॥

বদ্ধ জীবের অন্তরে, এ দুই পাপী বিরাজ করে,
সামান্য বায়ু সঞ্চারে, (ওরা) উঠে উগ্র মূর্ত্তি ধরি ॥

*   *   *   *   *

(হ'য়ে) "আত্ম-দর্শন-যোগেরত, এ দুই শত্রু কর হত,
(পাবে) গুরু কৃপা অবিরত "যোগে" জানে যোগেশ্বরী—
যোগ সঙ্গীত।

অতএব যতদিন তুমি মহেশ্বরের অন্তঃপুরে সেই পরা-প্রকৃতি-সদনে, মানস পূজোপচার প্রেরণ করিতে না পার, ততদিন দশরথাত্মজ ভরতের ন্যায় সংযমী হইয়া "আত্মারামের" দেহরাজ্য অনাসক্ত ভাবে পালন ও সুশৃঙ্খলায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যাও। যখন মহেশ্বররূপ "আত্মারামের" দর্শন পাইবে, অর্থাৎ আত্ম-দর্শন লাভ করিবে তখন তাঁহার বস্তু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তুমি মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং মহেশ্বরের "সামীপ্য বাসরূপ" "উপবাস-যোগে" মহেশ্বরের স্থূল দেহ তত্ত্ব বিদিত হইয়া "তৎপরায়ণ" অবস্থায় তোমার অবিদ্যারূপ অজ্ঞানতা বিদূরিত হইবে। পরন্তু তখনই তুমি বাহ্যপূজার অধিকারী হইবে। মানসিক কর্ম্মযোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়; অতঃপর সেই আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্ত জ্ঞানে বাহ্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে "সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ" সিদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহারা চিরজীবন বাহ্যপূজা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বাহ্য-পূজা কত কঠিন। কঠিন বলিয়াই, মানস পূজা শিক্ষা করিয়া, তৎপর বাহ্যপূজার বিধান হইয়াছে। মানস কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত সংযম না করিয়া অসংযত বা অস্থির চিত্তে শুধু কেবল কামনা-বাসনার আকর্ষণে পুষ্প দুর্ব্বায়, বাহ্যপূজার আবশ্যকতা বা কোনরূপ ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার একথার উত্তরে কেহ কেহ অপ্রণিধান বশতঃ বলিতে পারেন যে, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পত্র, পুষ্প, ফল, জল দ্বারা বাহ্যপূজা করা সম্বন্ধে গীতায় উপদেশ করিয়াছেন ; তদুত্তরে বলা আবশ্যক যে, তাঁহার ঐ উপদেশের ভাবার্থ দেহাত্মবাদিগণের ভোগাসক্তির অনুকূল নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" গীতা ৯ অঃ

যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি **সেই প্রযতাত্ম বা সংযতাত্ম**-ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি গ্রহণ করি। সুতরাং আত্ম-জ্ঞান-যোগে মানস কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ ইন্দ্রিয়-সংযম ভিন্ন, মন কখনও "প্রযতাত্মঃ" হইতে পারে না। সংযত আত্ম হইতে না পারিলে তাহার সামীপ্য বাসরূপ উপবাস সিদ্ধ হয় না, সামীপ্য বাসরূপ উপাবাস যোগে আত্মা বা ইষ্ট দেবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না ঘটিলে, বিশুদ্ধা ভক্তিরূপ তৎপরায়ণতা লাভ হয় না, বিশুদ্ধা ভক্তিরূপ তৎপরায়ণতা লাভ না হইলে, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দ্বারা বাহ্যপূজার অধিকারও জন্মে না ; কারণ অসংযতাত্ম ব্যক্তির চিত্ত কখনও বিশুদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে না। এ নিমিত্তই ভগবান্ "সংযতাত্মযুক্ত" "ভক্তির" কথা ঐ পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদিযুক্ত বাহ্য-পূজা-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে বলিয়াছেন ; কারণ চিত্ত বিশুদ্ধা (অহৈতুকী) ভক্তিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অসংযমী ব্যক্তির প্রদত্ত সেই পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভগবৎপদে না পৌছিয়া, তাহার কোনটী বা কামের, কোনটী বা ক্রোধের, কোনটী বা লোভের, কোনটী বা মায়া-মোহের, কোনটী বা অহঙ্কারের ইত্যাদি প্রকার **ভোগ-লালসার শ্রীপাদ পদ্মেই বাহ্যপূজার পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়া থাকে।** সুতরাং এতাদৃশ বাহ্যপূজারূপ

অকর্ম্মের দ্বারা কোটি কোটি জন্মেও চিত্ত-শুদ্ধি বা জ্ঞান হয় না। তাহা হস্তি-স্নান তুল্য বৃথা।

"অবশেন্দ্রিয়চিত্তানাং হস্তিস্নানমিবাক্রিয়াঃ। যোগদীপিকা।

যাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত নয়, তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান হস্তি-স্নান তুল্য শীঘ্রই নিস্ফল হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সংযমাদি দ্বারা "অহংজ্ঞান" শুদ্ধ হইলেই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মযোগে-আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সংযম ভিন্ন চিত্ত চাঞ্চল্য রহিত হয় না, চিত্ত চাঞ্চল্য রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অধিকার জন্মে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রকার কর্ম্মই "কর্ম্মযোগপদ" বাচ্য নহে। যেহেতু **দেহাত্মবোধে স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বাহ্যকর্ম্ম আত্মযুক্ত না হইলে তাহাকে কর্ম্মযোগ বলা যায় না।** অতএব সদ্গুরূপদিষ্ট ভাবে, কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিতে পারিলে তাদৃশ **কর্ম্মযোগেই আত্ম-দর্শন লাভ হয়।**

এবং বুদ্ধেঃ পরংবুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দূরাসদম্॥ গীতা কর্ম্মযোগ

আত্মদর্শনযোগ

প্রথমস্তর

পঞ্চম প্রকরণ।

মানস-পূজা-যোগে আত্ম-দর্শন।

(শিব-পূজা)

শিবপূজা আমাদের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, এবং "আত্ম-দর্শন-যোগ" লাভের উদ্দেশ্যে ইহা সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। সুতরাং পূজার বিষয়টি কি তাহা সকলেরই পক্ষে বিদিত থাকা আবশ্যক। অধুনা আত্ম-বিস্মৃতিবশে পূজা বলিতে অনেকে কেবলমাত্র স্থূলভাবে বাহ্য-অনুষ্ঠানই বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। পূজা মানসক্ষেত্রেরই কর্ম্ম; মনের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তির সহযোগিতা ভিন্ন যেমন মানস-ক্ষেত্রের কোন কর্ম্মসাধন হইতে পারে না, সেইরূপ কোন বহিরনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইতে পারে না। বাহ্যভাবে যে নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে পূজা নহে; উহা দৃঢ়ভাবে মনের একাগ্রতা সম্পাদনের প্রথম সোপান স্বরূপে, পূজায় অভ্যাস মাত্র। সুতরাং চিরজীবন যে, কেবল মাত্র অজ্ঞানান্ধকারে থাকিয়া দেহাত্মবোধে ঐ স্থূল ভাবের অভ্যাস-যোগানুশীলিত ক্রিয়াগুলিকেই জীবন সম্বল করিয়া রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের

উদ্দেশ্য তাহা নহে। দুর্ল্ভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, চিরকাল কোন কর্ম্মই অভ্যাসের জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। একমাত্র আত্মজ্ঞানের অভাবেই প্রকৃত কর্ম্ম ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই চিত্তশুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভেদবুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক বদ্ধনৌকার দাঁড় টানার ন্যায় কর্ম্ম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তন্নিবন্ধন চিরজীবন সন্ধ্যাপূজারূপ নিত্যকর্ম্ম অভ্যাস করিয়াও জ্ঞানোদয় না হওয়া প্রযুক্ত. ইহ জীবনে অভ্যাসযোগ শেষ হইতেছে না। মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মের উদ্দেশ্য মুক্তি; তাহার পন্থা মানসপূজা বা "আত্ম দর্শন-যোগ"। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবৃত করা হইয়াছে। চিরকাল ফলশ্রুতিমূলক কামনা-বাসনা পরতন্ত্রভাবে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে রত হইয়া কেবল মাত্র বাহিরের পূজোপকরণ অর্থাৎ ফুল, দুর্ব্বা, বিল্বপত্রের পোকা বাছিলেই, পূজার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। নিজের ভিতরের পোকাগুলি. পূর্ব্বে ভাল করিয়া বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিলে, ফুল বিল্বপত্রের পোকা আপনা হইতেই অনেকগুলি সরিয়া পড়িবে। এতদ্দ্বারা যে আমি বাহ্য-পূজানুষ্ঠান একবারেই পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি তাহা নহে, তবে বাহ্যাড়ম্বর বেশী না হয়। কারণ পূজার প্রথম ও প্রধান অঙ্গই মানসপূজা। গুরুদেব প্রথমেই সেই মানসপূজার উপদেশ দিয়াছেন এবং ইহাই শাস্ত্র ব্যবস্থা। সুতরাং গুরুদত্ত বিধানমতে মানস পূজাই প্রথমতঃ ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। মানস-পূজা ঠিক্‌ভাবে অভ্যস্থ না হইলে, বাহ্য পূজার অধিকার হইতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। যাঁহারা বলেন বাহ্যপূজার অভ্যাস করিতে করিতে মানস পূজার অধিকার জন্মে, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। অপরন্তু এই ভাবের মিথ্যা জ্ঞান প্রচার করিয়া, সমাজকে এমনভাবে দূষিত করিতেছেন যে, এখন পূজা বলিতে বাহ্যপূজা ভিন্ন— 'মানসপূজা যে শ্রেষ্ঠপূজা' এই জ্ঞান মানুষের আর ইহ জীবনে হয় না।

চিরজীবন "বাহ্যপূজাধমাধম" লইয়াই মানব আত্মবিস্মৃত হইতেছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥"

শিবসংহিতা।

ব্রহ্মসদ্ভাব বা উপাস্য উপাসকের অভেদত্বজ্ঞান উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতি ও জপ ভাব অধম এবং বাহ্যপূজা অধমেরও অধম। সুতরাং ইহা হইতে চারি ভাবের পূজা শাস্ত্রে ব্যবস্থা দেখা যায়। উত্তম, মধ্যম, অধম ও অধমাধম। এরূপ স্থলে আমার বিশ্বাস যে, চারিটী বর্ণের জন্য, চারি প্রকার পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্মণের জন্য ব্রহ্মসদ্ভাব, (১) যাহা গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভর্গো জ্যোতির উপাসনা। ক্ষত্রিয়ের জন্য ধ্যান, বৈশ্যের জন্য স্তুতি ও জপ এবং শূদ্র ও শূদ্রভাবাপন্নদের জন্য শারীরিক সেবা বা বাহ্য পূজা। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মগায়ত্রী দীক্ষিত ব্রাহ্মণ্ ব্রহ্মসদ্ভাবযুক্ত ভর্গোজ্যোতির উপাসনা উপেক্ষা করিয়া, চিরকাল ভেদজ্ঞানে আপামর সাধারণের ন্যায় তন্ত্রোক্ত ভাবের পূজামধ্যেও যাহা নিকৃষ্ট, সেই অধমের অধম বাহ্যপূজা করিয়া, তাঁহারা কি শূদ্র বা নিকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন না? এতদ্দ্বারা কি স্বধর্ম্ম ত্যাগ হইতেছে না? ইহা কি তাঁহাদের আত্মজ্ঞান হীনতার পরিচায়ক নহে? ইহা প্রণিধান করিয়া এতাদৃশ পতনের অবস্থা হইতে আত্মশক্তিবলে পুনরুত্থানের চেষ্টা করা ব্রাহ্মণজাতির

(১) "অহংব্রহ্মাস্মি", "সোঽহমস্মি", "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের জ্ঞান লাভই "ব্রহ্মসদ্ভাব।" ইত্যাকার জ্ঞানই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য ও স্বাভাবিক। সুতরাং স্থূল বা বাহ্য পূজা অর্থাৎ পূজ্য, পূজক ভাব ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম "আত্ম-দর্শন-যোগ" বা ব্রহ্মসদ্ভাব।

কর্ত্তব্য নহে? এ বিষয় দেশের কৃতবিগু শাস্ত্রাধ্যাপকগণ স্বধর্ম্মের দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্রানুসারে উত্তমবর্ণের জন্য উত্তমভাবে স্বস্ব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম বিধান করিতে কি বদ্ধপরিকর হইবেন না? সর্ব্বসাধারণের ন্যায় তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান কি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য? ঈদৃশ ভেদজ্ঞানের প্রবর্ত্তনে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজ কি স্বধর্ম্ম বা বৈদিকী সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি নিষ্কাম কর্ম্মের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীন হইতেছেন না? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করিয়া নিজেরাই ভেদজ্ঞানের প্রবর্ত্তক হইয়াও অনেকে কথায় কথায় "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না। তদ্দ্বারা অপরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া, চিরকালের জন্য তাহাদিগকে কি অধঃপতনের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে না? একবার আত্মজ্ঞানযোগে স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন। যেই তান্ত্রিকভাবে বর্ত্তমানে আপনারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই তান্ত্রিকমতেই বা মূল ইষ্টদেবতার প্রতি আপনাদের কতদূর বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা দৃঢ়তর আছে? দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলে কি সেই ইষ্টদেবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, ভেদজ্ঞানে অন্য দেবতার বাহ্যরূপে আকৃষ্ট হইতেন? তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই আজ ধর্ম্ম-বারিধিতে মানসপূজা-তরণী যে, ডুবু ডুবু প্রায় হইয়াছে। একবার চিন্তা করুন, মানস-পূজা ভিন্ন আত্মশক্তি অন্য কিরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে? বৈদিকী দীক্ষামতে সন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনাই, ব্রাহ্মণসন্তানগণের পক্ষে মানস-পূজা বা যোগ বলিয়া উক্ত; তাহা উপেক্ষা করিলেই ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী। তান্ত্রিক বিধানমতে মানসপূজায় সকলেরই অধিকার, সে অবস্থায় তন্ত্রোক্ত ভাবেও আত্মাকে দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া দেহাভ্যন্তরে তাঁহার মানসোপচারে পূজা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। পূজা প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।—

"স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্য দেহে কদাচন।
স্বদেহোপায়মজ্ঞাত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ ॥"

গীতাসার

আপনার দেহস্থ দেবতার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, কখনও অন্য দেবতার পূজা করিতে নাই। যে ব্যক্তি স্ব দেহস্থ বিষয় (অজ্ঞাত্বা) অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বাহিরের দেবতা লইয়া কালাতিপাত করে, সেই দুর্ম্মতির গৃহে অন্নাদি খাদ্য থাকিলেও ভ্রমবশতঃ ভিক্ষার্থ সে বৃথাই পর্য্যটন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহাদেবও তাহাই বলিয়াছেন,

"আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥"

শিবসংহিতা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিব ও কৃষ্ণ উভয়েরই বাক্য এক। সুতরাং স্বদেহেই যে দেবতা আছেন ইহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য্য। শ্রীগুরুও সেই ভাবেই প্রথমে ধ্যান করিয়া "স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা" অর্থাৎ নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং ভগবদ্বাক্য বা শাস্ত্রানুসরণে দেহের মধ্যে দেবতা না খুজিয়া চিরকাল কেবল বাহিরে বাহিরে ঘুরিলে কি দেবতা দর্শন হয়? না গুরূপদেশ পালন করা হয়? এ সম্বন্ধে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবোদেবঃ সদাশিবঃ ॥"

গীতাসার।

দেহীর দেহই দেবালয়, ও "**জীব সদাশিব তুল্য**" সুতরাং শ্রীগুরু মানসপূজা উপলক্ষে যেপ্রকার কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা তোমাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, ভেদজ্ঞানে কেবল

দূরে দূরে তাঁহাকে খুঁজিলে কোটি কোটি জন্মেও যে তুমি আত্ম-জ্ঞান বা মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে কি না, একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। সে যে তোমাকে ছাড়িয়া দূরে নাই, সে যে তোমার দেহের ভিতরে আছে। এ সম্বন্ধে একটী সাধন-সঙ্গীত নিম্নে লিখিত হইল।

বিষয়-পূজা।

রাগিণী—সুরট মল্লার, তাল—ঝাঁপ।

যাঁরে তুমি খোঁজ দূরে, (আছে) সে তোমার ঐ দেহপুরে—
ত্যজেদ্ অজ্ঞান নির্ম্মাল্যং, "সোঽহং" ভাবে পূজ তাঁরে ॥

(পূজার) উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো, ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ,
(আর) স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো, (ঐ) বাহ্যপূজাধমাধমঃ,—
(তাই) অজ্ঞান-নাশন-তরে, (পূজ) আত্মজ্ঞানে মহেশ্বরে
(কর) উত্তম মানস-পূজা (যা) গুরু দিয়াছেন তোমারে ॥

(সেই) আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা, (ম'জে) লোভ-কাম-অহঙ্কারে
(নিয়ে) অধমাধম বাহ্যপূজা, (আর) ঘুরবে কত এ সংসারে—
(সং) গুরুর কাছে বুঝ ভাই, (তোমার) এ ঘুরার কি শেষ নাই
(কেন?) ঘরে রত্ন থাক্‌তে তুমি, (সদা) ভিক্ষা কর দ্বারে দ্বারে ॥

(তাঁর) অভেদ দর্শনং ধ্যানং, জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ান্তরে,
অক্রিয়ৈব পরা পূজা, মৌনভাবে জপ তাঁরে—
নিশ্চিন্তই পরো যোগ, অনিচ্ছাই পরম্ সুখ
"সোঽহমিতি" পরং মন্ত্র, ন দেবশ্চাত্মনঃ পরে ॥

তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন, যোগযুক্তে ভজ তাঁরে,
যোগি-ঋষি-মুনিগণ, "অজ্ঞানেতে" ভাবে যাঁরে—

যোগেশ্বরী রূপে ভাবে সেই, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যেই
(যিনি) স্থূলভাবে বিশ্বব্যাপ্ত, অথণ্ডমণ্ডলাকারে॥ যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত।

অতএব যে তোমার ঘরের ধন এবং যাহা তোমার অতি নিকটের বস্তু, তাঁহাকে ঘরে ভাল করিয়া না খুজিয়া, দূরে পরের কাছে ভিক্ষা করিতে যাও কেন? গুরুদেব তোমাকে দেহের মধ্যেই তাঁহার সন্ধানও বলিয়া দিয়াছেন। তুমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহাকে ঘটে, পটে, মৃত্তিকায় প্রস্তরে, শিলায়, কাষ্ঠে ও ধাতব পদার্থের ভিতর চিরদিন তাঁহার অস্তিত্ব কল্পনায় ব্যভিচারী হইতেছ, অথচ তোমার শ্রীগুরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তোমার দেহ-দেবালয়ে যে ইষ্টদেব নিত্য বিরাজিত তাহা বিশ্বাস করিতেছ না। তজ্জন্যই দেবতা-সহিত দেহরূপ দেবালয়কে পুনঃ পুনঃ এর পদে, ওর পদে তার পদে লুণ্ঠিত করাইতেছ। ইহা কি তোমার প্রকৃত বিশ্বাস না প্রকৃত ভক্তি? তুমি প্রকৃত দেবতাকে দেবতা জ্ঞান না করিয়া, ভূতকে দেবতা বলিয়া চিরকাল ভূতের পূজা করিয়া নিজেও ভূত হইয়া, ভৌতিক চক্ষে পরম ইষ্টদেবতাকে অপদেবতা জ্ঞান করিয়া, আত্ম-বিশ্বাস হারাইতেছ! একবার অন্তঃপ্রাণায়ামযোগে সেই ভূতের ভূতশুদ্ধি করিয়া দেখ তখন "আত্ম-দর্শন-যোগে" সকল তত্ত্ব অবগত হইবে এবং মদ্বর্ণিত কথার গুরুত্ব ও সারবত্তা বুঝিতে পারিবে। তখন তোমার ভৌতিকজ্বর ছাড়িয়া যাইবে এবং তখন তুমি তোমার দেহস্থ পঞ্চভূতের মধ্যেই আত্মা বা মহেশ্বর অভেদরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইবে। তখনই তুমি সর্ব্বভূতে দেবতা দর্শন করিয়া, "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" "রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি বাহ্যরূপে ভগবদ্বাক্যানুযায়ী—

"ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" গীতা ৭ অঃ।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্টরূপে বিভক্ত আমার যে প্রকৃতি, তাহাই অষ্টমূর্ত্তি নামে খ্যাত। সেই অষ্টমূর্ত্তিই উপাস্য দেবতার স্থূল বা বাহ্য মূর্ত্তি বলিয়া যখন তোমার জ্ঞান হইবে। তখনই তুমি বাহ্যপূজার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে।

এই তত্ত্ব "আত্ম-দর্শন-যোগে" ভূতশুদ্ধি ক্রমে অবগত হইতে পারিলেই, তখন তুমি বাহ্যপূজার অধিকারী হইবে। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় যাহারা মানস-পূজাপেক্ষা বাহ্যপূজাকে সহজ বলেন, তাহারা বাহ্যপূজার তত্ত্ব কখনও অবগত হইতে পারেন নাই; ইহাই বলিতে হইবে। আমার মতে মানসপূজাপেক্ষা বাহ্যপূজা আরও কঠিন বিধায়, শাস্ত্রে প্রথমে মানসপূজার বিধান হইয়াছে। যেমন ভিতরে আনন্দ ভাব উদয় না হইলে বাহিরে মুখে হাসি বিকাশ পায় না; সেইরূপ মানস-পূজার অধিকারী না হইলে বাহ্যপূজার জ্ঞান হইতে পারে না। মানসক্ষেত্রের "আত্মতত্ত্ব" "বিষ্ণুতত্ত্ব" ও "শিবতত্ত্ব" জ্ঞান না হইলে বাহ্য দেবমূর্ত্তির ভিতরে তুমি কি করিয়া তত্ত্ব সঞ্চার করিবে? নিজের প্রাণের আয়াম করিতে না পারিলে, তুমি কি করিয়া জড় মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অধিকারী হইবে? তোমার ভিতরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ না হইলে তোমার মুদ্রা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? এবং বাহিরেই বা কি করিয়া আবাহন, স্থিরীকরণ, সম্মুখীন করণাদি মুদ্রাশক্তির সাহায্যে স্থূল দেবমূর্ত্তির ভিতরে দৈবীশক্তির আবাহন স্থিরীকরণ ও সম্মুখীকরণে সমর্থ হইবে? স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে দৃঢ় জ্ঞান না হইলে, আসন ও মুদ্রা, জলশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ন্যাস, প্রাণায়াম, ধারণা ধ্যানাদি কোন্‌টী কোন্ দেহের কি ভাবের ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার শক্তি কি, তাহা কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে? শাস্ত্রে বহু আসন ও মুদ্রা লিখিত আছে সত্য, কিন্তু মনে রাখিও তাহা বাজিকরের ভেল্কি প্রদর্শনের জন্য নহে। প্রাচীন যোগি-ঋষিগণ

আত্ম-দর্শন যোগে সেই তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া যথাযোগ্যভাবে তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা গরুড়াসন, সিংহাসন, ভুজঙ্গাসন, বৃষাসন, বজ্রাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি এক এক প্রকার আসন ও এক এক প্রকার মুদ্রা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা শক্তিকে জ্ঞানযুক্ত ক্রিয়াকৌশলে জগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বশ্রেণীর অবস্থা, সর্ব্বপ্রকার প্রাণিগণের ভাষা, ও প্রাণিতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, প্রাণযজ্ঞ, ও মুক্তিযজ্ঞেও পৃথক্ পৃথক্ আসন মুদ্রার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব একমাত্র পুস্তক পাঠেই কখনও বোধগম্য হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জল শুদ্ধ করিতে অঙ্কুশ মুদ্রার ব্যবস্থা হইল কেন? এ বিষয় ভাল ভাল লোকের সহিত আলোচনা করা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলেই কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে কেহ কেহ অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় একটা উত্তর দিয়া থাকেন মাত্র। অঙ্গুলি বাঁকা করিয়া "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জল নাড়িলেই যে, জল শুদ্ধি হইল, ইহা শাস্ত্র প্রণেতাগণের অভিপ্রায় নহে। জল শুদ্ধির উদ্দেশ্য কি? তাহা জ্ঞান না থাকিলে, জল শুদ্ধি হইল কি না, তাহা কিরূপে বুঝিবে? এবং ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদনাদিরই বা উদ্দেশ্য কি? ঐ সকল সাঙ্কেতিক ক্রিয়ার সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বা ভিতরের কোন সম্বন্ধ আছে কি? না বহিরঙ্গের ক্রিয়া প্রদর্শন মাত্র? এই তত্ত্ব গুরুমুখী ভাবে ভিন্ন, পুঁথিগতভাবে চিরজীবনেও প্রাপ্ত হইতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। যে ব্যক্তি কোন দিন বরফ দেখে নাই, তাহাকে যদি বরফ প্রস্তুত করিতে বলা হয়, তবে সে যেমন, কি ভাবে জলের কত খানি তাপ নিষ্কাসন করিলে জল জমিয়া বরফ হয়, পরন্তু বরফের কি অবস্থা তাহা জ্ঞান না থাকায়, জলের কোন অবস্থাকে বরফ বলে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহা সে চিরজীবনেও বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ পুঁথিগত

বিদ্যা দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিকেও সেই অবস্থায় পরিণত করিয়াছি। তজ্জন্যই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনেকেই নিত্যশুদ্ধ গঙ্গোদককে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নদী ও কূপ জলের ন্যায় "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে "জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু" গঙ্গাকে "শুদ্ধ" করিতে থাকেন। মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে গঙ্গোদকেই শবরূপী শিব স্নান করাইবার সময় গঙ্গাহীন দেশের বিল, তরাগাদির জলের ন্যায়, "গয়াদীনিচ তীর্থানি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণে নিত্য শুদ্ধ গঙ্গা, শুদ্ধি করিয়া থাকেন। কোথায় বসিয়া, কি ভাবে, কি উদ্দেশে তিনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখেন না। যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, অঙ্কুশ মুদ্রায় জল শুদ্ধির ব্যবস্থা হইল কেন? অঙ্কুশ মুদ্রার ভাব কি? ভিতরে কি অবস্থা উদয় হইলে বাহিরে অঙ্কুশ মুদ্রা প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা জলেরই বা কিরূপ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? অপরন্তু কি প্রকার কার্য্য সমাধানে সেই শক্তি কি পরিমাণ সহায়ক; ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ভিতরের অবস্থাই দেখিতে হইবে। বাহিরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং বাহ্য পূজা যে কত কঠিন, এই দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

স্থূল দেহের কোনও স্বাধীন শক্তি নাই, সূক্ষ্ম দেহের শক্তিতেই যে এই স্থূল দেহ চালিত হইতেছে তাহা পূর্ব্বে প্রমাণ সহযোগে বুঝাইয়াছি। উহা প্রণিধান করিলে বুঝিবে যে, স্থূলদেহটা সূক্ষ্ম দেহের প্রলেপ মাত্র। দিহ্-ধাতু+অল্ প্রত্যয়ে "দেহ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দিহ্ ধাতুর অর্থ—প্রলেপ, সুতরাং তোমার স্থূল দেহটা একটা প্রলেপ মাত্র। স্থূল দেহের যে দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, উহারা প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে, উহারা এক একটী দ্বার স্বরূপ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি ভিতরে। ভিতর হইতে ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে বহিরিন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ঘটিকা যন্ত্রের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম "হেয়ার স্প্রিংটী"

অচল হইলে, যেমন বহিঃস্থ ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, কাঁটা গুলিও অচল এবং সচল অবস্থায় চলাচল হয়; অপরন্তু ভগ্ন বা স্থানান্তরিত হইলে অন্যান্য সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ বা মৃত্যু সাধিত হয়; তোমার স্থূল দেহেও সেইরূপ অন্তরস্থ সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বে সজীব ও তাহার অভাবেই নির্জীব বা মৃত্যু। সুতরাং সূক্ষ্মদেহই যে তোমার স্থূল দেহের গতি শক্তির কারণ, তাহা ঠিক বুঝিয়া তুমি সূক্ষ্ম দেহের উপরেই লক্ষ্য স্থির রাখ। সেই সূক্ষ্মদেহে তোমার মনকে স্থির রাখার উদ্দেশ্যেই তোমার সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্ম্মের ব্যবস্থা, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের এই গূঢ়তত্ত্ব না বুঝিয়া সন্ধ্যা পূজাকে একমাত্র বাহ্যানুষ্ঠান মনে করে, তাহারাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট এবং বিপথগামী হইয়া শেষে প্রবৃত্তি মার্গে ইন্দ্রিয় বৃত্তির পদে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জ্ঞানী গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াকৌশলে, যেই তুমি সূক্ষ্মদেহকে অচল করিতে পারিবে, অমনি "ক্লরোফরমের" শক্তির ন্যায় স্থূলদেহ স্পন্দন রহিত হইয়া সাধারণ চক্ষে ইহা নশ্বর অন্নময় কোষরূপে পরিগণিত হইবে। এই পন্থা-অনুসরণের ভাবই প্রকৃত সাধন-অবস্থা। মনে রাখিও ক্লরোফরম্ নামক ঔষধের শক্তিতে তোমার শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের স্পন্দন রহিত পূর্ব্বক শক্তি কিয়ৎ কালের জন্য স্থগিত থাকে মাত্র; তখন মনের বহির্ম্মুখী গমনের দ্বারটি অবরুদ্ধ হওয়ায় তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-জনিত অনুভূতি সহ, স্থূল দেহের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় স্থূলদেহে অস্ত্রোপচার বা কোন অংশ ছেদন করিয়া ফেলিলেও মনের স্পন্দন রহিতো যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-যুক্ত স্থূল দেহের কোনও অনুভূতি থাকে না; সেইরূপ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের শক্তিতে মনকে স্পন্দন রহিত করিতে পারিলেই, অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনুভূতি শক্তি স্থূল দেহ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম দেহকেই আশ্রয় করে। তদ্ধেতু স্থূল দেহের স্পন্দন বা অনুভূতি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়। ইহার একটি সহজ উপায়ও আছে; তাহা এই যে, যে কোন

উপায়ে, মনকে তুমি ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারিলেই, মন স্পন্দন রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ স্থূল দেহের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সম্বন্ধ রহিত হওয়ায়, স্থূল দেহ আপনা হইতেই অক্রিয় অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এ বিষয়, আমি সাধারণ একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

মনে কর কোনও নবযুবতীর বিদেশগত স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও, হঠাৎ তাহার মৃত্যুসংবাদসূচক একটী মিথ্যা টেলিগ্রামরূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই, সে শোক-সন্তপ্তা হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল; সে অবস্থায় তাহার শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় কিছুই জ্ঞান নাই, দেহ স্পন্দন রহিত; অথচ দেহ প্রাণহীন নহে। জড়বিজ্ঞানমতে ক্লরোফরম্ নামক ঔষধের শক্তিতে দেহের যে অবস্থা উৎপাদন হয়, তিনিও তাদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ক্লরোফর্মের শক্তিতে দেহের যেরূপ অনুভূতি শক্তি তিরোহিত হয়, স্বামীর বিয়োগবার্ত্তাজনিত বিস্ময়, ভীতি ও শোক একসঙ্গে ঐ যুবতীটীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দবাহী তন্ত্রীতে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় এতাদৃশ আঘাত বা সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিয়াছে যে, তাহার তড়িৎ-প্রবাহে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মূলতত্ত্বে প্রতিঘাত হওয়া মাত্রই, মনের স্পন্দন রহিতাবস্থা উৎপাদন করায় সুখ. দুঃখ, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি মনোবৃত্তিগুলির অনুভূতি জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে রহিত করিয়াছে। ইহাকে ভাব-প্রলয় বলে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

সুখ কি দুঃখ হইতে যে ইন্দ্রিয় চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ পায়, তাহার নাম "প্রলয়" ইহাতে হঠাৎ ভূমিতে পতনাদি লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হয়। ক্লরোফরম্ ঔষধ, যে প্রকার গন্ধবাহী তন্ত্রীতে ক্রিয়াশীল,

বিস্ময়, ভীতি, শোক ও আনন্দ, সেই প্রকার শব্দবাহী তন্ত্রীতে ক্রিয়াশীল। ইহা দেহের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন অংশে বিভক্ত। বর্ণিত প্রকারের মিথ্যা শোকসূচক শব্দপ্রবাহে, যে ভাবে প্রাগুক্ত যুবতীটীর মনের স্পন্দন-শক্তি দেহের তমঃ-অংশে রহিত করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদীর মুখে, "অশ্বত্থামা হত ইতি;" সংবাদরূপ বিস্ময়সূচক শব্দ প্রবাহে, দেহের রজঃ-অংশে দ্রোণাচার্য্যের মনের স্পন্দনশক্তি সেই ভাবে রহিত করায়, তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সাধন-সময়ে, রূপরসাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয়যুক্তেও ঐরূপ মনের স্পন্দন অবস্থা রহিত হইতে পারে; পরন্তু সেই শক্তি মানসক্ষেত্র যত ঘনীভূত হইবে, তাহার ক্রিয়াশক্তিও তদনুপাতে স্থায়ী হইবে। হর্ষ বিষাদ উভয় প্রকার অবস্থাতেই ইহা কার্য্যকরী এ সম্বন্ধে মহেশ্বর বলিয়াছেন।—

"সুখং দুঃখঞ্চ বিষয়ৌ বিজ্ঞেয়ৌ মনসঃ ক্রিয়াঃ।
স্মৃতিভীতিবিকল্পাদ্যা বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥

শিবগীতা ৯ অধ্যায়।

সুখ, দুঃখ মনের বিষয়, স্মৃতি-ভয়-বিকল্পাদি মনের ক্রিয়া এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি মনের বুদ্ধি, অহংবৃত্তি মনের অহঙ্কার। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মনের ঐ সকল বিষয়, ক্রিয়া ও বৃত্তিকে, যোগ বা মানস-পূজার অনুষ্ঠানে আয়ত্ত করিতে পারিলে, দেহের সত্ত্বাংশে মনের স্পন্দন রহিত অর্থাৎ নিশ্চিন্ত যোগের অবস্থা, ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিমুক্ত জ্ঞানের অবস্থা, স্থূলদেহের নিষ্ক্রিয়রূপ পূজার অবস্থা, মৌনরূপ জপ-অবস্থা, "সোঽহং" ইতি মন্ত্রের অবস্থা, আত্মা ও দেবতার অভেদ-অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া সাধক বা যোগী "আত্ম-দর্শন-যোগে" বিভোর হইবে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটী প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে যে, প্রাগুক্ত যুবতীটী, স্বামীর মিথ্যা-মৃত্যুজনিত শোকে এবং পরোক্ত দ্রোণাচার্য্য

অশ্বত্থামার মিথ্যামৃত্যু সংবাদজনিত বিস্ময়ে, স্থূলদেহের একই প্রকার অনুভূতিশক্তি হীন-অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, যুবতীটী দৃঢ়জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে পতির অনিত্যপ্রেমে মনোবৃত্তির ঘনীভূত অবস্থারূপ, দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল এবং দ্রোণাচার্য্য, শিব-বাক্যের উপর প্রকৃতির রজঃ-অংশে দৃঢ় জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, পুত্রের অমরত্ব বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ছিলেন। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থাৎ একজন দেহের তমঃ-অংশে, অপরে, দেহের রজঃ-অংশে যোগসূত্রে মনকে ঘনীভূত করায় তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং আমরাও যদি সেই প্রকার অবিচলিত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, সাধন অবস্থায় একমাত্র ইষ্ট বা উপাস্য দেবমূর্ত্তির সহিত, মানসপূজারূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বা যোগানুশীলনে, মনোবৃত্তিকে দেহের সত্ত্বাংশে ঘনীভূত অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির সাহায্যে, আমরা ইচ্ছামাত্র মনকে ঘনীভূত করিয়া, স্থূলদেহের অক্রিয় অবস্থা উৎপাদনে সমর্থ হইব না কেন? এবং সেই ঘনীভূত অবস্থা হইতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রমে আরও স্ফুরণ করিয়া, জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগে মনের স্পন্দন বা চঞ্চল অবস্থা তিরোহিত করিতে ও তাদৃশ মনের একাগ্রতা বলে সম্বিৎ মার্গে পরম ইষ্ট বা উপাস্য দেবতার অভিমুখে তাহাকে যোগযুক্ত করিতে পারিব না কেন? তদুদ্দেশ্যেই যখন বেদে ও তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের জন্য একমাত্র উপাস্য বা ইষ্টদেবের ভাব বা মূর্ত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন জ্ঞানযুক্ত নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বা মানসপূজারূপ যোগানুষ্ঠানে মনের ইচ্ছাশক্তি যতই অচঞ্চল ও একাগ্র করিতে সক্ষম হইব, ততই আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি বা যোগ-সিদ্ধির অবস্থা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইব। বানান ও যুক্তবর্ণ লিখিতে লিখিতে যেমন হাতের অক্ষর পাকা হইয়া গেলে, শেষে যত বিষয় লিখ না কেন, তাহাই অনায়াসে লিখিতে পারাযায়!

তদ্রূপ তুমি সদ্‌গুরূপদিষ্ট একটিমাত্র উপাস্য বা ইষ্ট দেবতাতে লক্ষ্য স্থির করিয়া সন্ধ্যা বা মানসপূজারূপ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে, তোমার কাঁচা মনের জ্ঞানশক্তিকে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে যতই ঘনীভূত ও একাগ্র করিতে পারিবে, ততই তোমার ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হইয়া, কাঁচা মনকে পাকা ও দৃঢ় করিয়া তুলিবে। সেই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত পাকা মন একটি মাত্র স্থিরলক্ষ্যে প্রকৃতির সত্ত্বাংশে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে একবার আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিতে পারিলে, তাহার একাগ্রতা কখনও কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। তখন তুমি অপর যে কোন অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কোন দেবতা লক্ষ্য করিয়া, তোমার সেই পাকা মনের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে কুর্ম্ম ও সঞ্চালনীশক্তিযোগে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ বা আবাহন বিসর্জ্জন অবস্থাগত, যে কোনরূপ বাহ্যপূজানুষ্ঠানে নিয়োজিত কর না কেন, সে তখন রাজা জন্মেজয়ের অনুষ্ঠিত সর্পনাশক যজ্ঞের "স ইন্দ্রায়" "স তক্ষকায়" মন্ত্রের ভাবে, অপ্রতিহত গতিতে কার্য্যশীল হইয়া, নিজের বা শিষ্যযজমানের পরম মঙ্গল ও শান্তিবিধানে সমর্থ হইবে। ইহাই শিবপূজার মূলতত্ত্ব বা মানস পূজা। এতাদৃশ ভাবে মানসিকশক্তি বৃদ্ধির অনুশীলনে, "আত্ম-দর্শন-যোগ" অবস্থা লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই শিবপূজা নিত্যকর্ম্মস্বরূপে শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে। পরন্তু যোগ-শাস্ত্রেও "ঈশ্বর-পূজন" বা "শিবপূজা" অন্যতম যোগ বা যোগাঙ্গ স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহা এবং বাহ্যপূজা-তত্ত্ব যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

প্রথম হইতেই মনকে আত্ম-দর্শনোপযোগী একাগ্রতাশীল ও পাকা করিবার চেষ্টায় মানসপূজার পন্থাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ হইতে তাহার সারভাগ ঘৃত নিষ্কাসন করিয়া লইলে, ঘৃত যেমন পুনর্ব্বার সেই দুগ্ধের সহিত কোন অবস্থাতেই মিলিত হয় না, তদ্রূপ মানস কর্ম্মানুষ্ঠানে বহির্মুখগামী

ইন্দ্রিয়সঙ্গ হইতে মনকে অতীন্দ্রিয় ভাবে নিষ্কাসন করিয়া লইলে, তাহার পক্ষে আর কখনও পুনর্ব্বার সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়সঙ্গে মিলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঈদৃশ প্রকারে মনের পরিপক্ক অবস্থা ও একাগ্রতা ভিন্ন কোন কর্ম্মই সম্পন্ন বা সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। চঞ্চল মনে সামান্য কারণেই বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে। মনের একাগ্রতা ভিন্ন সে বিক্ষোভ প্রতিহত করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। এ সম্বন্ধে যোগ-শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—

'দুঃখ-দৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাস-প্রশ্বাস-বিক্ষেপ-সহভুবঃ ॥"

পাতঞ্জল দর্শন।

দুঃখ বা মন খারাপ হওয়া, শরীর সঞ্চালিত হওয়া, অনিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়া, এই গুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা এই সকল দোষ পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। **একাগ্রতায় দ্বারাই মন স্থির ও শান্তি প্রাপ্ত হয়।** মৌনভাবে **অজপা** গায়ত্রীতে মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক ধ্যান যোগে মহেশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই মনে নববল ও দৃঢ়তা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে সাধক গাহিয়াছেন—

তুক্ক।

অজপা পবন, কররে স্মরণ, ত্রিতাপ হরণ, তবে হবে।
পড়ি মোহজালে, তাঁরে পাশরিলে, জনম বিফলে, তোমার যাবে।
ইন্দ্রিয় তাড়না, সংসার যাতনা, বুঝে তা দেখনা, কেমন লাগে ?—
পাও এত যাতনা, তবু ত ছাড় না, বুঝালে বুঝনা, অহঙ্কারে—
আশী লক্ষবার, যাওয়া আসা সার, বল কত বার, আর আসিবে ?—
কেন কর হেলা, জপ এই বেলা, অজপার মালা, তরবে ভবে।

বিষয়-বিভব, কিছু নহে তব, সকলি পড়িয়া রবে—
পুত্র পরিবার, ভাব আপনার "মুখে নুড়ো" জ্বেলে দিবে ॥
প্রাণ আছে ব'লে, আত্মীয় সকলে, আপনার তোমায় বলে—
"প্রাণ" যবে যাবে, স্বজন বান্ধবে, অনায়াসে রবে ভুলে।
মায়ার ভ্রমেতে, এ ছার জগতে, মিছে কাল কাটাইলে—
চক্ষু থেকে কাণা, বুঝালে বুঝনা, "পরমায়ু" যায় যে চলে।
কহি তব হিত, প্রাণে রাখ চিত, প্রাণ সম বন্ধু নাই—
সে আছে তোমাতে, তুমি নাই তাতে, অশান্তিতে মর তাই।
প্রাণের সাধনে, নাশিলে অজ্ঞানে, মিটিবে সকল আশা—
"শিবত্ব" লভিবে "অমর" হইবে ঘুচিবে ভবে যাওয়া আসা ॥

যোগ সঙ্গীত।

জীবিত-অবস্থায় এই "শিবত্ব" লাভের জন্যই একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে। একাগ্রতা সাধনে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন। এই একাগ্রতা ভিন্ন কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। মনকে একাগ্র করিবার জন্যই নিষ্কাম ভাবে ইষ্ট মূর্ত্তির মানসপূজার পরে বাহ্যপূজার অবতারণা। কিন্তু উদ্দেশ্য কামনাযুক্ত হেতু ভেদ বুদ্ধিতে মন বহু "অগ্র" পরিণত অর্থাৎ বহু শাখা যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে মনের চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। কারণ প্রথমেই মানসপূজার ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মন সুগঠিত ও পরিপক্ক না হইলে কাঁচা মন লইয়া নানাদিকে নাড়াচাড়া করিতে যাওয়ায়, মন আর গাঢ় ভাবে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। এ জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥" গীতা ৬ অঃ

যোগী একান্তে অবস্থিত হইয়া একাকী সংযতচিত্ত সংযতাত্মা এবং আকাঙ্ক্ষাও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া, মনকে সমাহিত করিবেন। সুতরাং চিত্ত স্থির ও একাগ্র করিবার জন্যই যে প্রথম মানস পূজার ব্যবস্থা, তাহা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যথা সম্ভব ব্যক্ত করা গিয়াছে। সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ভিন্ন সেই মানস পূজা সিদ্ধ অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত ভাবে "সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন" বা বাহ্যপূজার অধিকার লাভ হইতে পারে না। সুতরাং শিবপূজা ও প্রোক্ত ভাবে অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। "আত্ম-দর্শন-যোগ" অবলম্বনে সর্ব্ব-প্রথমে মানসপূজার তত্ত্বই অষ্টাঙ্গ যোগের আদর্শে অনুশীলন করিতে হইবে। তদ্দ্বারাই কর্ম্মযোগ সিদ্ধি স্বরূপ সমাধি ও মোক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী স্তরে অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় বিবৃত করা হইবে।

অতএব প্রত্যেক আর্য্য সন্তানগণের পক্ষে **শিবপূজারূপ নিত্য-অনুষ্ঠেয় "মানস-পূজাই" আত্ম-দর্শন-যোগের উপায় বা আত্ম-দর্শন-যোগ।**

আত্ম দর্শন যোগ

দ্বিতীয় স্তর

ষষ্ঠ প্রকরণ

—:*:—

অষ্টাঙ্গ-যোগ ও তাহার সাধন প্রণালী।

যোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দৃষ্টান্তযুক্তে বলা গিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা পূজাই (মানসপূজা) যে, যোগস্বরূপ, "আত্ম-দর্শন-যোগে" তাহাই সপ্রমাণ করা যাইতেছে। যোগ সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, পদ্মযোনি ব্রহ্মার উপদিষ্টভাবে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই বিবৃত করা হইতেছে।—

"জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥"

"জ্ঞানকেই যোগাত্মক" বলিয়া জানিও। জ্ঞানযুক্ত-কর্ম্ম ভিন্ন কদাচ "যোগ" লাভ হয় না। এই যোগ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানী গুরুর উপদিষ্টভাবে আমাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা ও মানসপূজাই যোগপদবাচ্য। সন্ধ্যা ও

মানসপূজা অনুশীলনেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ স্বরূপ "আত্ম-দর্শন" লাভ হইয়া থাকে। যোগের উদ্দেশ্য "আত্ম-দর্শন," মানস পূজার উদ্দেশ্যও "আত্মদর্শন"। তদর্থে মানসপূজাও "আত্ম-দর্শন-যোগ" বলিয়া মনে করিতে হইবে। যোগসাধনে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন, মানস-পূজানুশীলনেও সেই সেই কর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজন। উহার একটির অভাবেও মানসপূজা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং মানসপূজা ও যোগে কোন পার্থক্য নাই। যোগ অষ্টাঙ্গ, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মা বলিয়াছেন।—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সুপ্রকীর্ত্তিতঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

(১) যম। (২) নিয়ম। (৩) আসন। (৪) প্রাণায়াম। (৫) প্রত্যাহার। (৬) ধারণা। (৭) ধ্যান। (৮) সমাধি। এই অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গ বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে যম ও নিয়ম প্রত্যেকে, দশ দশ প্রকার। অতঃপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।

সাধারণতঃ লোকসমাজে "আচার নিয়ম" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, উক্ত যম বা সংযমের নামই আচার বা আচরণ। তদনুসারে স্থল বিশেষে আমি সংযমের কোনও কোনও বিষয়ের সহিত আচরণ শব্দ, যোগযুক্তে ব্যবহার করিব। তদর্থে সংযম আচরণই যোগের প্রধান সোপান। অন্তর ও বাহির অর্থাৎ মানস ও বাহ্য দ্বিবিধ ভাবেই সংযম আচরণ শাস্ত্র বিধান। তন্মধ্যে মানসিক ভাবে সংযম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিলে, অজ্ঞান ভাবে কেবল মাত্র বাহিরের আচরণ দ্বারা সংযমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে

পারে না। যে কার্য্যই করা হউক তাহা যদি (মনঃ) সংযমযুক্ত না হয়, তবে তাহা সুসিদ্ধ হয় না। এই মনঃ-সংযমই সর্ব্বকর্ম্মের মূল। মন ঠিক্ হইলে বহিরিন্দ্রিয়-বিষয় আপনা হইতেই সংযতভাবে ঠিক্ হইয়া আসে। এজন্য মানসিক সংযমই, সংযমের বিধায়ক এবং বহিঃস্থ সংযমাচরণ সহায়ক স্বরূপে বলা গিয়াছে। উভয়ই যোগযুক্ত ভাবে, অর্থাৎ স্থূলদেহের সংযমাচরণও আত্মযোগযুক্তভাবে অনুশীলন করিতে পারিলে, সংযম দ্বারাই **"আত্ম-দর্শন-যোগ"** লাভ হয়। তজ্জন্যই শাস্ত্রে সংযমকে যোগাঙ্গ স্বরূপে বলা হইয়াছে। সুতরাং সংযমাচরণযোগ, "আত্ম-দর্শন" লাভের অন্যতম উপায়।

আত্ম-যজ্ঞও সংযম আচরণের প্রধান সহায়ক। এজন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমিই (অজপারূপ) "জপযজ্ঞ" কিন্তু গুরুদত্ত জ্ঞান-যোগ ভিন্ন জপযজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। কেবলমাত্র বাহ্যভাবে মন্ত্রের আবৃত্তি ও দ্রুতগতিতে করাঙ্গুলি সঞ্চালনে, অথবা তাদৃশ ভাবে শুধু দ্রব্যযজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞের উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযম হইতেছে না। সর্ব্বপ্রথমে গুরুদত্ত সন্ধানে জ্ঞানযজ্ঞে সম্যক্ অধিকারী না হইলে, পূর্ব্বোক্ত ভাবে জপযজ্ঞই কর আর দ্রব্য-যজ্ঞই কর, সে ভস্মাহুতি মাত্র। তদ্দ্বারা সূক্ষ্মদেহের কোন কার্য্য সাধিত হয় না। একমাত্র প্রাগুক্ত জ্ঞানযজ্ঞ-যোগেই প্রাণযজ্ঞ; এবং প্রাণযজ্ঞ-যোগে অন্য সমস্ত যজ্ঞ সিদ্ধ হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন।—

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতিজ্ঞানদীপিতে॥ ৪র্থ অঃ

কেহ কেহ জ্ঞান দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও প্রাণ-কর্ম্ম হোম করেন। প্রাণ-কর্ম্মই প্রাণ-যজ্ঞ, প্রাণ-যজ্ঞে সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষেরই অধিকার আছে।

সূক্ষ্মদেহের সংযম বিধায়ক উক্ত প্রাণযজ্ঞ ভাব পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র স্থূলদেহের ক্রিয়ারূপ সহায়কভাব দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে যাইয়াই আমরা ভুল করিতেছি। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম স্তরে বলা হইয়াছে। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞানযুক্ত আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ-যোগে, মননযুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে মনকে সংযত করিতে পারিলে, স্থূলদেহের সংযম আচরণ আপনা হইতেই যোগযুক্ত-ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিবে। তখন আর বাহিরের কঠোরতা বা স্থূল-দেহের উপর বল প্রয়োগ করিতে হয় না ; এতাদৃশ প্রণালীতে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত মানসকর্ম্মের বিধান দ্বারাই "সংযমাচরণ-যোগে আত্ম-দর্শন" লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর তাহার সাধনপ্রণালী ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে। **"জ্ঞানই যোগাত্মক"** ভগবান্ ব্রহ্মার এই মহান্ উপদেশ সতত স্মরণ রাখিয়া জ্ঞানেরই অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। **"আত্ম-দর্শন-যোগেরও"** ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভায়ন্তর

সপ্তম প্রকরণ।

সংযম-যোগে আত্ম-দর্শন।

সংযম, যোগের প্রধান অঙ্গ। কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি রাজ-যোগ ইত্যাদি যে কোন প্রকার যোগ হউক না কেন সংযম ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সাহায্য ভিন্ন সংযমও সিদ্ধ হয় না। চিত্ত সংযম না হইলে "আত্ম-দর্শন যোগ" লাভও কদাচ সম্ভবপর নহে, কারণ চঞ্চল চিত্তে যে একাগ্রতা বা লক্ষ্য স্থির হয় না, তাহা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। এ নিমিত্ত প্রত্যেক কর্ম্ম প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমেই সংযম অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। **ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্যগ্‌ভাবে সংযত করিয়া, চিত্তবৃত্তি দমন ভিন্ন, কেবল মাত্র একবেলা আতপান্ন গ্রহণ করিলেই সংযম সিদ্ধ হয় না।** দুঃখের বিষয় ইদানীং এই ভাবেরই একটা সংযমের অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। **প্রকৃতভাবে সংযমানুষ্ঠান**

হইলে কাম্যকর্ম্ম থাকিতে পারে না। এ জন্যই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, আত্ম-জ্ঞান-যোগে মানসকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি সংযত না হইলে বাহ্য-অনুষ্ঠানযুক্ত-কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সাধারণ অশিক্ষিতা রমণীগণ পর্য্যন্ত নিয়ত দেখিতেছেন যে, সংযম, (যম) নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ইহার কোন একটি কর্ম্ম ভিন্ন বাহ্যভাবে ব্রতপূজাদি কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে না। মানস-কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল বিষয়গুলিতে পরিপক্ক না হইলে, কিরূপে বাহ্যপূজা ব্রতাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে? এই সাধারণ মোটা কথাটা দেশের কৃতবিদ্যগণও যে প্রণিধান করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। চিরজীবন অসংযত চিত্ত ও অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ লইয়া, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার অভাবে বাহ্য-ব্রতপূজাদির একটা প্রহসন দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজ, বর্ত্তমানে যে কতদূর অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তৎপ্রতি অনেকেই লক্ষ্য করেন না। কাজেই ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্যবসায়ে পরিগণিত হইয়া স্বেচ্ছামত কেবল-মাত্র বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম বলিয়া যে একটা পদার্থ, কোন বর্ণ বা কোন আশ্রমের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মধ্যে, শাস্ত্রের অনুশাসনভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ত্তমানে অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও লৌকিক চক্ষে প্রায় পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আত্মজ্ঞান বিস্মৃতি ইহার একমাত্র কারণ। একমাত্র আত্মজ্ঞানের অভাবই, সংযম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাদি, অবশ্য পালনীয় নিত্যকর্ম্মগুলি মধ্যেও, নানা প্রকার অপকর্ষরূপ ভেজাল প্রবেশ করায়, যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেই ভাবেই আচরণ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে একমাত্র —

"টাকা স্বর্গঃ টাকা ধর্ম্মঃ টাকাহি পরন্তপঃ।
টাকায়াং পরিতোষেণ প্রীয়ন্তে ধর্ম্ম দেবতাঃ॥"

যেহেতু সংযম তিতিক্ষা তাহাও আজকাল টাকার বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে সকলকে একটি মাত্র কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, **পরকালের গতি টাকার জোরে হইবে না।** এই দেহে যাঁহারা সংযমী না হইবেন, পরকালে তাঁহাদিগকে সংযমনী পুরীতে (যম-পুরীতে) যাইয়া যমদূতগণের কঠোর পীড়নে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। মরণান্তে বহু টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদির অভিনয়ে সে যন্ত্রণার পরিহার হয় না; ইহা শাস্ত্র বাক্য। ঐ সকল পারলৌকিক কার্য্য যদি যথা শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হয়, তবে সংযমনীপুরী গমনের ক্লেশ কিয়দংশ নিবৃত্তি হয় বটে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঐ সকল পারলৌকিক অনুষ্ঠাতাগণও অসংযমী, সেই সকল কর্ম্মের ফলও তথৈবচ। কারণ অসংযমী দ্বারা কখনও অসংযমীর ত্রাণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেই বন্ধন দশাগ্রস্ত, সে ব্যক্তি কি অপরের বন্ধন মোচন করিতে কদাচ সমর্থ হয়? নিজের ত্রাণের পন্থা নিজের হাতে, নিজে নিজের ত্রাণের অধিকারী না হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও তাহাকে ত্রাণ করিতে পারেন না; ইহাও শাস্ত্র বাক্য। "আত্ম-দর্শন-যোগের" প্রথমস্তরে ইহার শাস্ত্র যুক্তি যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা দেহ বর্ত্তমানে অসংযমী ভাবে কর্ম্মের অভিনয় করিয়া অথবা দেহান্তে তাদৃশ অসংযমী পুত্র কলত্রাদির কর্ম্ম প্রহসনে উদ্ধার হইবেন বাসনা করিয়া, সংযমানুশীলনে বিরত হন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলা যাইতেছে—

"পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥"

মনু ১২ অঃ

মরণের পর অসংযমী পাপিগণের যমযাতনা ভোগের উপযুক্ত অন্য শরীর এই পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"যে নিষ্ক্রিয়া নাস্তিকাশ্রদ্দধানাঃ
পাপাত্মানঃ ইন্দ্রিয়ার্থে নিবিষ্টাঃ।
যমস্য যে যাতনাং প্রাপ্নুবন্তি—" ইত্যাদি

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

যাহারা স্বধর্ম্মযুক্ত ক্রিয়াহীন, নাস্তিক, শ্রদ্ধাশূন্য, পাপী (দেহাত্মবোধী) ও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-বিষয় চরিতার্থতায় নিবিষ্ট, অর্থাৎ অসংযমী তাহারাই যমযাতনা প্রাপ্ত হয়। ইহারা সংযমনী পুরীতেও পৌঁছিবার অধিকারী না হইয়া "বৈবস্বত সদন" নামক নিকৃষ্ট প্রেতগণের জন্য যে পুরী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতেই অবস্থিতি করিয়া যমযন্ত্রণা ভোগ করে। অসংযমিগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা প্রেতত্ব লাভ করে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে—

"লভতে নাত্মবিদ্যঞ্চ সুতীর্থে বিমুখাশ্চ যে।
ব্রহ্মস্বঞ্চ স্ত্রীধনানি লোভাদেব হরন্তি যে॥
বলেন ছদ্মনাবাপি ধূর্ত্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ।
নাস্তিকাঃ কুহকাশ্চৌরা যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ॥
ব্যাধাচরণসম্পন্না বর্ণাদিধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
অসৎকর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্বপাতকপাপিনঃ॥
গীতবাদ্যরতোনিত্যং মদ্যপঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ।
বৃথারেতা বৃথামাংসো বৃথাবাদী বৃথামতিঃ॥
পিতৃমাতৃস্নুষাপত্যস্বদারত্যাগিনশ্চ যে।
পাষণ্ডধর্ম্মাচরণা নাস্তিকা ধর্ম্ম দূষকাঃ॥
মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে।
পরদ্রোহরতা যে চ তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ॥

পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতাগুরুনিন্দকাঃ।
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ॥
প্রেতরাক্ষসপৈশাচ্যতির্য্যগ্‌জাতিষু নান্যথা।
ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহলোকে পরত্রচ॥"

পদ্মোত্তর খণ্ড।

যে ব্যক্তি আত্ম-বিদ্যা (আধ্যাত্মিক বিদ্যা বা আত্ম-জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা) গ্রহণ না করে, যাহারা সুতীর্থে বিমুখ, (মহাতীর্থমাত্মজ্ঞানমিতি) যাহারা ব্রহ্মস্ব ও স্ত্রীধনাদি হরণ করে, যাহারা বল পূর্ব্বক বা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অথবা ধূর্ত্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অপরকে বঞ্চনা করে, যাহারা নাস্তিক, (আত্মবিশ্বাসহীন) যাহারা কুহক বিদ্যা বা মায়া জালে মুগ্ধ করিয়া স্বার্থ উদ্ধার করে, চৌর্য্য ধর্ম্মপরায়ণ, বক ধর্ম্মশীল, (যাহারা প্রকাশ্যে প্রিয়কারী ধার্ম্মিক ভাব, ধার্ম্মিকের বেশভূষাধারণ করে, অপ্রকাশ্যে অনিষ্টকারী, অধর্ম্মেরত, পরন্তু বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া অথবা চাটুকারিতাবশে লোক মুগ্ধ করে এবং স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারাই বক ধর্ম্মশীল।) এতাদৃশ ব্যক্তি নিকৃষ্ট প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা ব্যাধ ধর্ম্ম পরায়ণ অর্থাৎ সতত পর হিংসা করে, যাহারা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শাস্ত্রমর্ম্ম জানিয়াও যাহারা শাস্ত্রবিগর্হিত অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত, যাহারা দেহাত্ম-বোধভাবে একমাত্র দেহের সুখ ভোগার্থ পাপ কার্য্যে সর্ব্বদা রত, যাহারা পাষণ্ড (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ দ্বারা পরমর্ষণ করিয়া থাকে) যাহারা খল (**পর নিন্দা পরের অনিষ্ট আচরণ যাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম**) যাহারা পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, বালক, অবিবাহিতা বালিকা ও অনাথা ভগিনীকে পোষণ না করিয়া ত্যাগ করে, শাস্ত্রানুসারে ত্যাগের অযোগ্যা স্ত্রীকে যে স্বামী অথবা তাদৃশ স্বামীকে যে

স্ত্রী ত্যাগ করে, যাহাদের কদর্য্য স্বভাব, যাহারা কদর্য্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, যাহারা স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া গীতবাদ্যরত থাকে, যাহারা মদ্যপায়ী, যাহারা বৃথারেতা, অর্থাৎ কাম বৃত্তির আশ্রয় করিয়া অস্বাভাবিক রেতঃ পাত করে, যাহারা বৃথা মাংস ভোজন করে, যাহারা বৃথা কার্য্যে অনুরক্ত, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলাপ ও কুতর্ক করে, যাহারা মহাতীর্থাদিতে প্রতিগ্রহ করে, এবং **যাহারা পরের অনিষ্ট সাধন পর নিন্দা ও** পরের মিথ্যাপবাদ কীর্ত্তন করে, বেদনিন্দা, গুরুনিন্দা, অপরকে দ্বেষ, ইত্যাদি অন্যান্য কুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রতিগ্রহ করে, তাহারাই অসংযমী, তাহারাই রাক্ষসত্ব, প্রেতত্ব, পিশাচত্ব লাভ করে ও কীট পতঙ্গাদি যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

উক্ত প্রকার সংযমহীন কর্ম্ম করিয়া **যাহারা প্রেতত্ব, পিশাচত্ব লাভ করে,** তাহাদের আকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বিকরালং মুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশং।
উর্দ্ধ মূর্দ্ধা চ কৃষ্ণাঙ্গং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলং॥
চলজ্জিহ্বাঞ্চ লম্বোষ্ঠং যমদূতমিবাপরঃ।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরং॥ ইত্যাদি

পদ্মোত্তর খণ্ড।

প্রেতের মুখ করাল সদৃশ ও দীন ভাবাপন্ন, নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, জঙ্ঘাদেশ হইতে মস্তক বেশী উর্দ্ধে অবস্থিত, অর্থাৎ লম্বগ্রীব। শরীর কৃষ্ণবর্ণ যমদূতের ন্যায় ভয়ঙ্কর দৃশ্য, জিহ্বা চঞ্চল, অধরোষ্ঠ লম্বিত ও বিশুষ্ক জঙ্ঘা, দীর্ঘ মস্তক, আকুলিত অঙ্ঘ্রি (চরণ) দীর্ঘ, চক্ষু গভীর, (গর্ত্ত নির্ব্বিশেষ) দেহ শুষ্ক, (যেন কঙ্কালময়)। এই প্রকার প্রেতগণ দর্শন করিয়া, মহর্ষি

কৌণ্ডিন্য ইহাদের ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, প্রেতগণ উত্তর করিয়াছিল।

"শৃণু আহারমস্মাকং সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতং।
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষেণ যোষিতাস্তু মলেন চ॥
গৃহাণি ত্যক্ত শৌচানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ।
বলিমন্ত্রবিহীনানি দ্বিজদুষ্টানি যানি চ।
নিয়মব্রতহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ॥" ইত্যাদি

পদ্মোত্তর খণ্ড।

সত্ত্বগুণবর্জ্জিত দ্রব্যই **প্রেতগণের খাদ্য**। শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, ঋতুমতী কামিনীগণের রজঃ ও শৌচাদি কার্য্যে যে জল পরিত্যক্ত হয়, তাহা এবং যেই দ্রব্য মন্ত্রহীন, যেই দ্রব্য ব্রহ্মযজ্ঞ স্বরূপে অর্পিত না হয়, অর্থাৎ লোভের বশবর্ত্তী ভাবে যে দ্রব্য লোকে আহার করে এবং সংযম নিয়ম ও ব্রতহীন মনুষ্য যাহা ভোজন করে, ইত্যাদি প্রেতের খাদ্য। এই সকল প্রেতই "আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভাবে" অবস্থিতি করিয়া থাকে।

বিচরন্ত্যশরীরাস্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভৃশম্। (গারুড় ২০ অঃ)

অশরীর অর্থাৎ বায়ুভূতদেহে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বাতাসের সহিত বিচরণ করে। ইহাদের তৃপ্তিজন্য প্রেতপিণ্ড দান সময় আম মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে জল মিশ্রিত দুগ্ধ প্রদান করিয়া বলা হয়, "ইদং নীর-মিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব" ইহা সকলেই অবগত আছেন।

যে সকল কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না, সেই সকল কর্ম্মের নামই সংযম। তৎসম্বন্ধে পশ্চাৎ বলা যাইতেছে। পরন্তু স্থান মাহাত্ম্যে যে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না, তৎসম্বন্ধেও শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা—

"বারাণস্যাং মৃতোযস্তু স মুক্তঃ নাত্র সংশয়ঃ।" পাতাল খণ্ড।

অবিমুক্ত বারাণসী (৺কাশীধাম) মহাক্ষেত্রে যাহাদের দেহত্যাগ হয়, তাহাদের প্রেতত্ব হয় না। ইহা সত্য বটে, যোগবলে দেহ মধ্যস্থ বরুণা অসি নাম্নী দ্বিদল আজ্ঞা পদ্মে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে তাহার জীবন্মুক্তি ও দেহত্যাগেও নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু "আত্ম-দর্শন-যোগ ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। বহির্জগতের ৺কাশীধামে যাঁহারা দেহত্যাগে মুক্তি লাভ করিতে চান, তাঁহারা যদি কাশীধামকে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া স্থির বিশ্বাসে পরমাত্মা স্বরূপ একমাত্র বিশ্বনাথে ভক্তি রাখিয়া, কাম সংকল্প বর্জ্জিত ভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযম করিয়া প্রারব্ধক্ষয় সাপেক্ষে, কেবলমাত্র স্বধর্ম্মযুক্ত নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রত থাকেন, পরন্তু নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ নিজকে শিব স্বরূপ মনে করিয়া বাসনা কামনা পরিহার করেন, তাঁহাদের প্রেতত্ব লাভ হয় না। যদি বারাণসীধাম মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া স্থির বিশ্বাস থাকে, পরন্তু দেহত্যাগের পর যদি প্রেত পিণ্ড ও প্রেত শ্রাদ্ধাদির কামনা না থাকে, অপরন্তু প্রেতভাবে তাহাকে আকর্ষণ করা না হয়, তবে তাহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত। ৺বিশ্বনাথ ও বিশ্বনাথ-ক্ষেত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহাকে ত্রিশ হাজার বৎসর (রুদ্র) পিশাচযোনী প্রাপ্তভাবে রুদ্র লোকে অতি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে মুক্তির অধিকারী

হইতে হয়। কিন্তু সে যন্ত্রণা অতীব কঠোর, শাস্ত্রে তাহাকে "যাঁতা পেশা" বলে। কোন প্রকার পারত্রিক কর্ম্ম দ্বারা তাহার শান্তি হয় না। শিব-বাক্যমতে কাশীর ভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম "বজ্র লেপো ভবিষ্যতি।"

"কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি মুক্ত, তাহার প্রেত-শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য নয়। ইহার উত্তরে আবার কেহ কেহ অদ্ভূত যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যে ব্যক্তি মুক্ত, মন্ত্র শক্তি দ্বারা তাহার আত্মা আকর্ষিত হয় না, সুতরাং কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রেত-শ্রাদ্ধ করা হইলেও তদ্দ্বারা কোন ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই" সে ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, যে কর্ম্মের দ্বারা কোনরূপ ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সেরূপ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজনাভাব; কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপত্তি হয় না, সুতরাং সে ক্ষেত্রে প্রেত-শ্রাদ্ধ অপ্রয়োজন।

"কাশ্যাং বিদেহকৈবল্যং প্রাপ্তেরুত্তরকর্ম্মণাং।
অসম্ভবান্ন বিশ্লেষো বেদিতব্যো বিচক্ষণৈঃ॥" মুক্তিবিবেক

কাশীতে বিদেহকৈবল্য হইলে উত্তর কর্ম্মের অসদ্ভাবতা প্রযুক্ত লিপ্ততার সম্ভব নাই, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জানিবেন। সুতরাং কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পারত্রিক কর্ম্মের প্রয়োজনাভাব। কেহ কেহ বলেন, ইহা পুত্রের কর্ত্তব্য; তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ যে পিতা আত্মশক্তিবলে বা স্থান মাহাত্ম্যে মুক্তির অধিকারী, তাহাকে প্রেতরূপে আকর্ষণ করিয়া "প্রেত-লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক" স্বর্গ কামনায় প্রেত পিণ্ড দান, বৃষোৎসর্গ, তিলকাঞ্চনাদি দ্বারা, পঞ্চ ক্রোশীর বহির্ভূত স্থানের ন্যায়, এক বৎসর প্রেত ভাবে, চতুর্দ্দশ মাসিক প্রেত শ্রাদ্ধ করিয়া সপিণ্ড শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার পিণ্ড বা জীবাত্মা (পিণ্ড কুণ্ডলিনীশক্তি, গুরুগীতা) পিতৃলোকে স্থাপন পূর্ব্বক পিতাকে

মুক্তির পথভ্রষ্ট করা, পুত্রের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। যে পিতা মুক্তির অধিকারী না হইয়া প্রেত-লোকগামী হয়, পুত্র আত্মশক্তি দ্বারা তাহাকে প্রেত-মুক্ত বা স্বর্গ লাভের অধিকারী করিবে ইহাই পুত্রের কর্ত্তব্য? ঊর্দ্ধগামী পিতাকে টানিয়া নিম্নগামী করা কর্ত্তব্য নয়। পুত্রের কর্ত্তব্য এই যে,—

"জীবতে বাক্যপালঞ্চ মৃতাহে ভূরিভোজনং।
গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ ত্রয়েণ পুত্রপুত্রতাম্॥"

পিতা বর্ত্তমানে সতত পিতৃবাক্য পালন করা, মৃত্যুর পরে পিতার তৃপ্ত্যর্থে বহু লোককে উদর পূরণ পূর্ব্বক ভোজন করান, পিতার মুক্তির জন্য শম দমাদি গুণাবলম্বনে গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম অব্যয় পদে পিতার জীবাত্মা স্থাপন দ্বারা পিতার মুক্তি বিধান, এই ত্রিবিধ কর্ম্মই পুত্রের কর্ত্তব্য। যে পুত্র পিতৃবাক্য পালন করে না, পিতা মাতা জীবিত অবস্থায় অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা তৃপ্ত করা কর্ত্তব্য মনে করে না, এতাদৃশ পাষণ্ড পুত্রের পক্ষেও ৺কাশীপ্রাপ্ত পিতা মাতা অর্থাৎ যিনি ৺বিশ্বনাথের কৃপায় স্থান মাহাত্ম্যে মুক্তি লাভের অধিকারী অথবা পুনরাবৃত্তি রহিত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পিতামাতাকে সাধারণ প্রেত কর্ম্ম, প্রেত শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতের ভাবে আকর্ষণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া কথনও পরিগণিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায় না। প্রেত শ্রাদ্ধ শাস্ত্রে, পিতৃশ্রাদ্ধ বলিয়া উক্ত হয় নাই। এ নিমিত্ত প্রেতকাল এক বৎসর মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-সম্বন্ধ উল্লেখ করা হয় না।

মৃত্যুর পর দশপিণ্ড দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ গঠন করা হয়, এ সম্বন্ধে শ্রুতিমূলক উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"প্রথমেনতু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েনতু পিণ্ডেন মাংসত্বক্‌শোণিতোদ্ভবঃ॥"

পিণ্ডোপনিষৎ।

মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড দান করে তদ্দ্বারা ষোড়শ কলার সম্ভব হয়। (পঞ্চভূত পঞ্চ প্রাণ এবং ষড়িন্দ্রিয় ইহাকে ষোড়শ কলা বলে) দ্বিতীয় দিনের পিণ্ড দ্বারা মাংস চর্ম্ম এবং রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"তৃতীয়েনতু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেনতু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জাপ্রজায়তে॥"

তৃতীয় দিনের পিণ্ড দ্বারা বুদ্ধি, চতুর্থ দিনের পিণ্ড দ্বারা অস্থি ও মজ্জা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"পঞ্চমেনতু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরোমুখম্।
ষষ্ঠেন কৃত পিণ্ডেন হৃৎকণ্ঠং তালু জায়তে॥"

পঞ্চম পিণ্ডের দ্বারা হস্তের অঙ্গুলি সমূহ শির ও মুখ, ষষ্ঠ পিণ্ড দ্বারা হৃদি কণ্ঠ ও তালু উৎপত্তি হয়।

সপ্তমেনতু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেনতু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্॥

সপ্তম পিণ্ডের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত ব্যক্তির পরবর্ত্তী দেহ বীর্য্যবান্ হয়।

"নবমেনতু পিণ্ডেন সর্বেবন্দ্রিয়সমাহৃতিঃ।
দশমেনতু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবণস্তথা।
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ড দানেন সম্ভবঃ॥" পিণ্ডোপনিষৎ

নবম পিণ্ড দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয়, দশম পিণ্ডের দ্বারা ক্ষুধা পিপাসার উদ্বোধ হয়। **এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড দানে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটি দেহ গঠিত হয়।** এই অর্থ গরুড় পুরাণেও কথিত আছে। (১) ভগবান্ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন যে, ইহা শ্রুতি মূলক।

এই পিণ্ডদানে গরুড় পুরাণের উক্তির বিশেষত্ব এই যে, দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়. তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ দেহে জীব সঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, অতএব আমিষ পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমিষ বিহীন পিণ্ডে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

শাস্ত্রমতে পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইল। এমতাবস্থায় কাশী-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা শাস্ত্র বাক্যে মুক্ত বলিয়া গণ্য, উক্ত দশ পিণ্ড দানে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ দেহ গঠনের চেষ্টা বৈধ কি না? এবং কাশীক্ষেত্রে এতাদৃশ কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে কিনা? পরন্তু ইহা পুত্রের কর্ত্তব্য কি না? তাহা সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিও বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিয়া কার্য্য করিবেন। শাস্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করাও পাপ, শাস্ত্র-বাক্য অবিশ্বাস করাও পাপ। অতঃপর মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহার জন্য এক বৎসর কাল তাহার চতুর্দ্দশটি মাসিক, প্রেত শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ সম্বন্ধে গারুড় ৬ষ্ঠ অধ্যায় উক্ত আছে।

"যমমার্গগামী" হইয়া যমরাজের, রাজধানীতে উপস্থিত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে, এই দীর্ঘ পথের মধ্যে **ষোলটি বিশ্রামস্থান**

(১) "পিণ্ডজেনতু দেহেন বায়ুজশ্চৈকতাং ব্রজেৎ" (গারুড় ১১ অঃ।)
মরণ মাত্র জাত বায়ব্য দেহের সহিত দশ পূরক পিণ্ড দ্বারা উৎপন্ন দেহ একত্র হইয়া যায়। ৺কাশী প্রাপ্ত সদ্য মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুনর্ব্বার এইরূপ দেহ গঠন মুক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য।

বা পান্থশালা রহিয়াছে, বার মাসে বারটি মাসিক প্রেত শ্রাদ্ধ, তদ্ভিন্ন আদ্য শ্রাদ্ধ, উনষাণ্মাসিক (ষাণ্মাসিক) উনবার্ষিক (দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক) ও সপিণ্ডীকরণ এই চারিটি অতিরিক্ত প্রেত শ্রাদ্ধ সহ মোট প্রেতের জন্য ষোলটি শ্রাদ্ধ করিতে দেখা যায়; এই ষোড়শ শ্রাদ্ধের দ্বারা উক্ত ষোড়শ পান্থশালাতে প্রেতের পান ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ইত্যাদি (ত্রিশূল ১৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

অতএব যাঁহারা কাশী লাভ করিয়া স্থান মাহাত্ম্যে মুক্ত, যাঁহাদের প্রেতত্ব প্রাপ্তি কদাচ সম্ভব নয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এতাদৃশ প্রেত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কি শাস্ত্র-বাক্যে অবিশ্বাস বা মুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না? এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম কি পুত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে? জ্ঞানিগণ ইহার মীমাংসা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কেহ কেহ বলেন যে, কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রেত-শ্রাদ্ধ নিষেধ, ইহা "শ্রাদ্ধতত্ত্বে" লিখিত হয় নাই; ইহা জাগিয়া স্বপ্ন দেখার ন্যায় ভিত্তিহীন। যে স্থানে সর্ব্বশাস্ত্রে অবিসংবাদিতরূপে "কাশী প্রাপ্তিতে নিশ্চয় মুক্তি; ইহাতে সংশয় নাই বলিয়াছেন। যেস্থানে দেহত্যাগ হইলে প্রেতত্ব বা প্রেত যোনি ভোগ হয় না, সে স্থানের জন্য প্রেত-শ্রাদ্ধের বিধি নিষেধের আবশ্যকতা আবার কি থাকিবে? "প্রয়োজন-অভাব"; এই বাক্যটীও শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। যে জাতির চক্ষু নাই, তাহাদের চক্ষের চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদে বিধান হয় নাই; এজন্য চিকিৎসকগণ কি সর্ব্বসাধারণ জাতির ন্যায় ঐ জাতিরও চক্ষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন? মুক্তিবিবেকে পরিষ্কার লিখিত আছে যে, কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উত্তর কর্ম্মের অসদ্ভাব হেতু লিপ্ততার সম্ভাবনা নাই (২১৫ পৃষ্ঠা দেখ) যাঁহারা ইহাতে নিঃসন্দিহান না হইবেন তাঁহারা "অধ্যাত্মবিদ্যা" অনুশীলন করুন। তখন "আত্ম-দর্শন-যোগলব্ধ" দিব্য নেত্রে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সে পিতার জন্য পুত্রের শ্রাদ্ধাদি কোন কর্ত্তব্য নাই। ("অনুব্রজন্নাশ্রমাপাতয়েৎ" ইতি শ্রুতি।) কিন্তু **তাহার মুক্তি অনিশ্চিত**; যেহেতু; সন্ন্যাস, ধর্ম্ম হইতে কোন কারণে ভ্রষ্ট হইলে, তাহার পক্ষে মুক্তি অসম্ভবও হইতে পারে। পরন্তু যিনি কাশীতে দেহত্যাগ সংকল্প করিয়া কাশীবাস করিতেছেন, তিনি কি পার্থিব সংসার ত্যাগ করিয়া আসেন নাই? তিনি কি পূর্ণ সন্ন্যাসী নহেন? তাঁহার পক্ষে কি পূর্ণ সংযম অনুষ্ঠেয় নহে? তাঁহার ইহকাল পরকাল জন্য কি কোন প্রকার কাম্যকর্ম্ম বিধান হইতে পারে? তিনি কি কাশীবাস করিয়া, কেবলমাত্র প্রারব্ধক্ষয়-সাপেক্ষে দেহধারণ করিতেছেন না? তাঁহার ভাগ্যে কাশীলাভ ঘটিলে, শিববাক্যানুসারে তাঁহার কি সংসারে পুনরাবৃত্তির কোন সম্ভাবনা আছে? ৺কাশীপ্রাপ্ত বা বিশ্বনাথপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কি প্রেত বা প্রেতাধিপতি যমের কোন প্রকার অধিকার হইতে পারে? ইহা কি কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে? **কাশীর পঞ্চক্রোশিমধ্যে কি যমের কোন অধিকার আছে?** কাশীক্ষেত্রতত্ত্ব কি? ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞান যোগে কাশীতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, কাশীর প্রত্যেক পরমাণুই ৺বিশ্বনাথ বলিয়া কি সিদ্ধান্ত হয় না? কাশীতে দেহত্যাগ করা মাত্রই সেই শবদেহ কি গঙ্গা বিল্বদলে "নমঃ শিবায়" মন্ত্রে শিবরূপে অর্চ্চিত হইতেছে না? মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ কি বারাণসী নাম্নী কাশীক্ষেত্রে লয় বিধান হইতেছে না? দেহভস্ম কি সদ্যমুক্তিদায়িনী গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে না? এতদবস্থায়ও **কাশীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তি কি সুনিশ্চিত নহে?** অপরন্তু কাশী কি অপার্থিব-ক্ষেত্র নহে? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সপ্তদ্বীপা সাম্রাজ্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া, কাশী অপার্থিব জ্ঞানে, দানের বহির্ভূত জানিয়া, কাশীক্ষেত্রে আসিয়া কি

বাস করেন নাই? সুতরাং সাধারণ পার্থিব মৃত ব্যক্তির প্রেত-কর্ম্মানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, কি কাশীতে প্রযুজ্য হইতে পারে? অতএব কাশীপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের সুনিশ্চিত মুক্তিতে সংশয় করিয়া, যাহারা প্রেতপিণ্ড ও প্রেত-শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহারা কি সাধারণ পার্থিব ক্ষেত্রের সহিত মহামুক্তিপ্রদ ৺কাশীক্ষেত্রকে **একাকারে** পরিণত করিতেছেন না? এবং তাহা কি ঘোর শাস্ত্র অবিশ্বাসের পরিচায়ক নহে?

আত্ম-জ্ঞান অভাবে অর্থাৎ দেহাত্মবোধে যাঁহারা সংসারান্ধ; তাহারা "কাশীপ্রাপ্ত পিতামাতা বিশ্বেশ্বরে লয় পাইয়াছেন" দৃঢ় বিশ্বাসে, প্রেত-পিণ্ড বা প্রেত শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে শম দমাদি সংযম নিয়মের বশবর্ত্তী ভাবে কেন কাশীনাথ **বিশ্বনাথেরই অর্চ্চনা করিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করুন্ না**; তিনি বিশ্বেশ্বর তৃপ্ত্যর্থে (পিতা মাতার নাম রূপের ভাব পরিত্যাগ করিয়া) সর্ব্বসাধারণকে অন্নবস্ত্র দান করুন্ না, বিশ্বনাথ জ্ঞানে ব্রাহ্মণভোজন, ভূমিদান, জলদান; (যেস্থানে জলাভাব তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া জলদানের ব্যবস্থা) করুন্ না। অন্ন, বস্ত্র, হাতি, ঘোড়া, যাহা ইচ্ছা দান করুন্, ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকমণ্ডলী পোষণার্থ উত্তমরূপ দানের ব্যবস্থা করুন্। পরন্তু শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে গুরু পুরোহিতের প্রাপ্যের চতুর্গুণ অর্থদানে তাঁহাদের তুষ্টিবিধান করুন্ না। তদ্দ্বারা কি কাশীপ্রাপ্ত পিতামাতার শ্রাদ্ধ বা বিশ্বনাথের তৃপ্তিসাধন হয় না? সে বিশ্বাস, সে জ্ঞান, না থাকিলে আর "**তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টঃ**" এ কথার সারবত্তা কি থাকে? ভগবদগীতোক্ত ভগবদ্বাক্যটীর উপর সংশয় ত্যাগ করিয়া, উহা একমাত্র ৺কাশীপ্রাপ্ত পিতামাতার পারত্রিক কার্য্যে নির্ভর পূর্ব্বক গীতাবাক্য ও ৺শিববাক্য পালন করুন না, গীতাবাক্য এই যে,—

"পিতামহস্যজগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥" গীতা ৯ অঃ

আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা এবং পিতামহ, আমি জ্ঞাতব্য পবিত্র ওঁঙ্কার ঋক্, সাম এবং যজু, "স্বধাহমহমৌষধম্" স্বরূপে আমিই পিত্রর্থ "শ্রাদ্ধাদি" ঔষধ মন্ত্র সবই আমি। সুতরাং কাশীতে ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মার স্বরূপ বিশ্বনাথের পূজা করিয়া শাস্ত্র বাক্য পালন করুন না। কিন্তু ভগবদ্বাক্যে দৃঢ়তা না রাখিলে, কাশীক্ষেত্রে পিণ্ডদান, প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বারা পিতামাতাকে প্রেতভাবে আকর্ষণ করা, এক বৎসর প্রেত করিয়া রাখা, সপিণ্ডীকরণ ইত্যাদি মুক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে অন্যস্থানের সহিত কাশীকে একাকারে পরিণত করা, পরন্তু গীতা শিববাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র বিশ্বনাথ ও কাশীর প্রতি অবিশ্বাস করা হয় তাহা নহে, অপরন্তু সর্ব্বসাধারণের চিত্ত হইতে কাশীলাভে মুক্তির বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পরিণামে ধর্ম্মবিপ্লবে সমাজ দূষিত হওয়া অসম্ভব নহে।

যাঁহারা বলেন, মুক্ত ব্যক্তির আত্মা প্রেতশ্রাদ্ধের আকর্ষণে আকর্ষিত হইতে পারে না, তাঁহাদের উক্তিমতে বলা আবশ্যক যে, বিনা কারণে প্রেতশ্রাদ্ধের যে, কোন প্রয়োজন থাকে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যে মন্ত্রশক্তিবলে উর্দ্ধগতি বিধান হইতে পারে, সেই মন্ত্রশক্তিতেও যে অধোগতির ভাবে আকর্ষণ করা যায়. তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ আবাহন-বিসর্জ্জনের ক্রিয়া, সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্মশক্তি যে মন্ত্র বা ইচ্ছাশক্তিবলে আকর্ষিত হইতে পারে, অতঃপর তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে—যাঁহারা মুক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন,

অর্থাৎ বারাণসী বা আজ্ঞাচক্র স্বরূপ দ্বিদল পদ্ম হইতে নাদশক্তি অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বোচ্চ-লোকে "ব্রহ্মবিন্দুতে" লয় প্রাপ্ত হওয়ার-উপযোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি-তত্ত্ব বা "কৈবল্য মুক্তির" অবস্থা, যোগবলে, যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, "নাদ" বা "মায়ার" অধিকার যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্তই **যোগীর আকর্ষণ ও পুনরাবৃত্তির সম্ভব**। শাস্ত্রেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

"এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ে, এক আত্মাই বিরাজ করিতেছেন; যিনি ঐ স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া আত্মার তুরীয় অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না! সুতরাং জীব সেই "নাদপীঠ" অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত পুনরাগমন রহিত নির্ব্বাণ-মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। তারকাসুর বধের জন্য দেবগণ সেই পরাৎপর ব্রহ্মশক্তির স্তব করিলে, সেই "শ্রুতিবোধিতম্" জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মশক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

"চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈ র্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতম্।
কোটিসূর্য্য প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্॥
বিদ্যুৎকোটি সমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ।
নৈব চোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ॥
আদ্যন্তং রহিতং তত্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্।
ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্॥"

অরুণবর্ণ সেই পরম তেজ কোটি বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী, কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত, কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল। ইহার চতুর্দ্দিকে

চারিবেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্তব করিতেছে। এই তেজোরাশির ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব ও মধ্যদেশ পরিচ্ছিন্ন হইল না। উহা আদি অন্ত রহিত। ইহার হস্তাদি অঙ্গবিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকার নাই। দেবগণের তপস্যা বা একান্ত আরাধনায় সেই **জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মশক্তি প্রাদুর্ভূত হইলে,** দেবগণ শিবপত্নীরূপে তাঁহাকে প্রার্থনা করায় ঐ তেজ ব্রহ্ম হইতে—

"তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্।
অতীব রমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্॥"

দেবীগীতা।

তৎক্ষণেই সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর **রমণীরূপে আভাসিত** হইল। সেই রমণী মনোরমাঙ্গী নবযৌবনা কুমারী। দেবগণ তাঁহাকে **"তত্ত্বমসি"** মহাবাক্যের দ্বারা স্তব করিলে. সেই তখন পরিতুষ্টা হইয়া বলিলেন যে, আমার যে শক্তি হিমালয়ে গৌরীরূপে আবির্ভূতা হইবেন, তিনিই শিবের নিকট প্রদেয়া অর্থাৎ শিবানী হইয়া পুত্রোৎপত্তি পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তারকাসুর বধরূপ তোমাদের কার্য্য সম্পাদন করিবে। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মশক্তিও আকর্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি বলে. প্রার্থিত ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিতে যখন বাধ্য হন, তখন ব্রাহ্মণের মন্ত্র বা ইচ্ছাশক্তি বলেও যে, কাশীপ্রাপ্ত মুক্ত ব্যক্তির আত্মা, নাম রূপের আকারে, প্রেতদেহে আকাশস্থ নিরালম্বভাবে, মুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া আকর্ষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?

এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার আপত্তিকারিগণের সকল প্রকার আপত্তিই প্রমাণাদি যোগে খণ্ডন করা গেল। **শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যুক্তি যুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও, তাহা গ্রহণ যোগ্য।—**

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

যোগ বাশিষ্ঠ।

যুক্তিযুক্ত বাক্য যদি বালকেও বলে তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। যে ক্ষেত্রে নীচভাব ত্যাগ করিলে উচ্চভাব রক্ষা হয় অর্থাৎ প্রেতভাব ত্যাগ করিলে মুক্তিরূপ উচ্চভাব রক্ষা হয় সে ক্ষেত্রে উচ্চভাবই গ্রহণযোগ্য, ইহা শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং ইহার পরেও যাঁহারা কুতর্ক করিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে বাক্‌চাতুর্য্য কিম্বা কাগজ কলমের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কিছু দিন সংযমযুক্তে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে চিত্রগুপ্ত সকাশেই সহজে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা হইবে।

যাহা হউক আমি "সংযম-যোগে আত্ম-দর্শন" বিবৃত করিতে যাইয়া মুক্তিমার্গের কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন করিতেছি কেন? কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, **সংযমই আমাদের "কর্ম্মযোগের" প্রারম্ভ; পরন্তু মুক্তিই তাহার লক্ষ্য। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।** আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে, ইন্দ্রিয়-বিষয় আসক্তিই বন্ধন, অনাসক্তিই মুক্তি। সংযম, সেই মুক্তির সোপান। মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে বাস করিয়াও যদি আত্ম-জ্ঞান-যোগে কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযমী না হয়, চিত্তচাঞ্চল্য হেতু সে কখনও একমাত্র বিশ্বনাথের উপর নির্ভর করিতে পারে না। তন্নিবন্ধন তাহার রুদ্র পিশাচত্ব প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অপরন্তু কাশীর বহির্ভূত স্থানে থাকিয়া যদি ইন্দ্রিয়সংযমী না হয়, তাহারও মুক্তি নাই, তাহার পক্ষেই প্রেতত্ব প্রাপ্তি। তবে **কাহারও**

গতি উত্তর দিকে পুনরাবৃত্তি রহিত রুদ্রলোকে, কাহারও গতি দক্ষিণ দিকে পুনরাবর্ত্তনশীল যম বা প্রেতলোকে; এই মাত্র তফাৎ। সুতরাং সংযম সকলের পক্ষেই আচরণীয়। সংযম দ্বারাই ইহপরকালের সুখস্বরূপ আত্ম-দর্শন লাভ হয়। আমাদের কৃত ধর্ম্ম-কর্ম্ম কেবলমাত্র পরকালের মুক্তির জন্য নহে, উভয় কালেই তাহার প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে, যে কার্য্য দ্বারা ইহকালে প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ইন্দ্রিয়-সংযম-জনিত সুখ লাভ না হয়, সে কর্ম্ম কথন পরকালেও সুখপ্রদ হয় না। ইহাও শাস্ত্র বাক্য—

"উভয়ত্র সুখোদর্ক ইহ চৈব পরত্র চ।
অলব্ধা নিপুণং ধর্ম্মং পাপঃ পাপেন যুজ্যতে॥

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব।

ইহ ও পর, উভয়লোকেরই পরম মঙ্গলসাধন হইতেছে ধর্ম্ম, যাহারা সেই ধর্ম্মকে লাভ করিতে অসমর্থ, তাহারাই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত হইয়া নানা প্রকার কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। উাহারাই পাপী বলিয়া কথিত হয় এবং ইহকালে তাহারা নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করে। পরকালেও তাহারা প্রেত-পিশাচ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ নিবন্ধন, পরিত্রাহি ভাবে চিৎকার করিয়া থাকে। পরন্তু স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, বন্ধু, বান্ধবকে উদ্দেশ্য করিয়া, অনুশোচনা করে যে, কেন তোমরা আমাকে পাপকার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টিত হও নাই।

"হা মাতর্হা পিতর্ভ্রাতঃ সুতা হাহা মম স্ত্রিয়ঃ।
যুস্মাভির্নোপদিষ্টোঽহমবস্থাং প্রাপ্ত ঈদৃশীম্॥" গারুড়

হা মাতঃ, হা পিতঃ, হা ভ্রাতঃ, হা পুত্রগণ, হা স্ত্রীগণ, তোমরা কখনও সম্মুখের এই দুর্দ্দশার কথা আমাকে জানাও নাই, তাহাতেই আমার এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিল।

ঈদৃশ শোচনীয় পরিতাপের বিষয় চিন্তা করিয়া, আমি এই জগৎ সংসারস্থ পুরুষ-প্রকৃতি-বাচক প্রত্যেক নরনারীগণের পুত্র ভ্রাতা বন্ধুস্বরূপে আমার সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধব ও পুত্র কন্যাতুল্যব্যক্তি-গণকে পূর্ব্বোক্ত অন্তিম দুর্দ্দশার কথা কর্ত্তব্যবোধে স্মরণ করাইয়া সতর্ক হওয়ার জন্য "আত্ম-দর্শন-যোগে" যথাযোগ্য প্রার্থনা বা অনুরোধ করিতেছি যে, সময় থাকিতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ থাকিতে, সদ্‌গুরুপ্রদিষ্ট আত্মজ্ঞানবলে, ইন্দ্রিয়বিষয় সংযমানুশীলনে, আপনারা "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয় করুন্; ইহপরকালে আপনাদের শান্তি লাভ হইবে। "পুরুষকারই" সংযম সিদ্ধির উপায়। মানবের স্বধর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে যোগ। সংযমই তাহার প্রথম অঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং "সংযমই" যোগপদবাচ্য। একমাত্র সংযম অভ্যাসেই ইহকালে সুখ ও পরকালে প্রেতত্ব পরিহার হয়। এ সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত আছে।—

"জিতক্রোধো মদৈশ্বর্য্যতৃষ্ণাসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষমোহক্রোধঃ সুশীলশ্চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥" পদ্মপুরাণ

যাঁহারা ক্রোধ, মত্ততা, অহঙ্কার, অনিত্য ঐশ্বর্য্য লিপ্সা অর্থাৎ বাসনা জয় করিয়া আসক্তি শূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সুশীল, অক্রোধ, ক্ষমাশীল, তাঁহাদের প্রেতত্ব হয় না। সুতরাং পুরাণমতেও দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমাভ্যাস করিতে পারিলেই ঐহিক ও পারত্রিক ভাবে মঙ্গল সাধিত হয়। এই অবস্থায় কি কি কর্ম্মের অনুশীলন করিলে, সংযম রক্ষা হইতে পারে, তাহাই দেখা আবশ্যক। সংযম দশপ্রকার যথা—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচস্ত্বেতে যমাদশ ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

(১) অহিংসা। (২) সত্য। (৩) অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য্য। (৪) ব্রহ্মচর্য্য। (৫) দয়া। (৬) আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্য। (৭) ক্ষমা। (৮) ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য। (৯) মিতাহার বা পরিমিত আহার। (১০) শৌচ। এই দশবিধ আচরণের নাম সংযম। ইহার অভ্যাসেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম হয়। আত্মজ্ঞান আশ্রয় ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে সংযমাচরণ হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন।—

"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়-গ্রাম সংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ॥"

একমাত্র **ইষ্টদেবতা বা ব্রহ্মই সর্ব্বময়**, এইরূপ জ্ঞান হইলে, বিষয় সমূহের অভ্যাসজন্য ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতেই সংযত হয়; এই ইন্দ্রিয়-সংযমই যম নামে প্রসিদ্ধ। এই সংযম দৃঢ় করিবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে। সুতরাং সংযম অভ্যাসের জন্যই আমাদের নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। একমাত্র সংযম আচরণই নিত্যকর্ম্ম, সংযম-বলে ইন্দ্রিয়গণ আত্মবশীকৃত হইলেই **আত্ম-দর্শনরূপ** পরমা শান্তি লাভ হয়; ইহপরকালে দুঃখ প্রাপ্তির কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহাই সুখ দুঃখের অভিব্যক্তি।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥" হিতোপদেশ।

দ্বিতীয়স্তর

অষ্টম প্রকরণ।

অহিংসা-যোগে আত্ম-দর্শন।

অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। অহিংসাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, (মা হিংস সর্ব্বভূতানি) ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অহিংসা-বিষয়টি কি তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুরানন ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশ-জননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতকে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়াকে অহিংসা বলে। সুতরাং আত্ম জ্ঞান ভিন্ন কায়মনোবাক্য, ইহাদের পরস্পর একত্বযোগে কোন কর্ম্ম সম্পাদন হইতে পারে না। দেহাত্মবোধ থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই হিংসা ভাব বিদূরিত হয় না। মানব দৈহিক সুখের জন্যই অসংযমী, দৈহিক অনিত্য ভোগ তৃষ্ণার জন্যই স্বার্থান্ধ। সুতরাং পরার্থজ্ঞান অধিকাংশের মধ্যেই প্রায় স্থায়ীভাবে দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়বিষয়-

বৈরাগ্য ভিন্ন প্রকৃতভাবে পরার্থভাব কখন সঞ্চার হইতে পারে না। কে কাহার অপেক্ষা বড় হইবে, এই চিন্তাতেই সতত ব্যস্ত; কিন্তু সেই বড় হওয়ার ইচ্ছাও প্রতিযোগিতা বা বর্দ্ধন-আকাঙ্ক্ষামূলক নহে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসা-মূলক। অর্থাৎ হিংসুক ব্যক্তি যাহাকে নিজ অপেক্ষা বড় মনে করে, তাহা ধনে হউক, মানে হউক, কুলে হউক, ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি যে কোন প্রকারে হউক না কেন; কিরূপে তাহার নিন্দা করিয়া, কিরূপে তাহার অনিষ্ট করিয়া, কিরূপে জনসমাজে তাহার মিথ্যা অপযশ বাহির করিয়া, নিজকে সর্ব্বতোভাবে বড় প্রতিপন্ন করিবে, সেই চেষ্টাতেই সতত বিব্রত থাকে। হিংসুক ব্যক্তি অধিকাংশ স্থলে যে কেবল সেইরূপ চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে, দুরাকাঙ্ক্ষা সম্পূরক দারুণ হিংসাবৃত্তির প্রবল তাড়নায়, কোন কোন সচ্চরিত্র সদাশয় ব্যক্তিকে বিনা কারণে শারীরিক লাঞ্ছনা, এমন কি জীবনান্তের চেষ্টা করিতেও ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহাই হিংসা-মূলক বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা। প্রতিযোগিতা-মূলক বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তির হিংসা নাই; সে একমাত্র পুরুষকারকেই আশ্রয় করে। সে জানে, পুরুষকাররূপ সাধন বলেই সমস্ত লাভ করা যায়, কিন্তু হিংসা দ্বারা একমাত্র অন্তর্দাহ ভিন্ন অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। হিংসুক ব্যক্তি আসুরিকগুণবিশিষ্ট; তাহারা ইহকালেই যে সতত মানসিক সন্তাপ ভোগ করে, তাহাই নহে, পরকালেও তাহারা অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

গীতা ১৬ অঃ।

আমি আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারে অশুভ তির্য্যগ্ যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি; পরন্তু সেই সকল

মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরিক-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে না পাইয়া আরও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

আমাদিগকে সততই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক দূষিত নহে, ইহারা সকলেই দৈবী সম্পদ। কাম-ক্রোধ- লোভ-রিপুত্রয়-সংসর্গে উহারা দ্বেষ-হিংসা-অহঙ্কারাদির গুণ-ধর্ম্মে ক্রূর ও উগ্র কর্ম্মা হইয়া আসুরিক সম্পদে পরিণত হয় এবং জীবকে দেহাত্ম-বুদ্ধিতে বিমোহিত করিয়া ভ্রান্ত পথে পরিচালন করে। সুতরাং দেখা যায় যে, কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি রিপুগণই হিংসাদি বৃত্তির মূল। এ অবস্থায় যদি আমরা আত্ম-বিশ্বাসরূপ পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, সেই পুরুষকাররূপ আত্ম-জ্ঞানবলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুশীলন করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ "কামশত্রু" সহজে দুর্ব্বল হইয়া, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই দ্বাদশটী ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে হিংসাবৃত্তিও সেই পন্থা অনুসরণে বাধ্য হইবে। তখন ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক ভাব অর্থাৎ আত্মযুক্তভাবে অন্তর্মুখী হইয়া স্বভাবতঃ সংযমানুরাগী হইবে। একমাত্র আত্ম-বিশ্বাস বা পুরুষকারবলেই আসুরিক সম্পদ বিনাশ হইবে। প্রত্যুত—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥

গীতা ১৬ অঃ

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাশূন্যতা সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অহঙ্কার-রাহিত্য কুকর্ম্ম প্রভৃতিতে লজ্জা, চাপল্য-শূন্যতা প্রভৃতি দৈবী-সম্পদগুলি লাভ হইবে। অতএব আত্ম-বিশ্বাস বা পুরুষকারই মানবের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন; মানব পুরুষকারবলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইতে পারে, পুরুষকারবলেই ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত হইতে পারা যায়, পুরুষকারবলেই কশ্যপ, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মশক্তি লাভ হইতে

পারে ; এমন কি, পুরুষকারবলেই, "ইন্দ্রত্ব" পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। এজন্য সংসারে প্রত্যেক মহাপুরুষই কায়মনোবাক্যে হিংসা বা পরপীড়া ত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুগণ দ্বারাই হিংসা-বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে।

"বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা—
লোভক্রোধমোহপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা।
দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনং।" "পাতঞ্জল"

বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি, কৃত, কারিত অথবা অনুমোদিত, উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ অথবা মোহ, অর্থাৎ অজ্ঞান ; তাহা অল্পই হউক, মধ্যমই হউক, অথবা অধিকই হউক, উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ। উহাদের প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারাই ঐ সকল রিপু দমন হয়।

একমাত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই হিংসার প্রতিপক্ষ সুতরাং সদ্‌গুরূপদিষ্ট ভাবে আত্ম-জ্ঞান আশ্রয় ভিন্ন হিংসা-বৃত্তি কদাচ জয় করা যায় না। হিংসা-বৃত্তি জয় করা ভিন্ন আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকার লাভ হয় না। দয়া আচরণ যোগে আত্ম-দর্শন প্রকরণে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

নিয়ত সচ্চিন্তা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ আলোচনা, সৎসংসর্গ, এবং তৎসঙ্গে সাত্ত্বিক-ভাব-বর্দ্ধক আহার হিংসাবৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট অবলম্বন। অহিংসা আমাদের নিত্য ধর্ম্ম ; অতএব একমাত্র অহিংসা-যোগেও **আত্ম-দর্শন** লাভ হইতে পারে।

আত্ম দর্শন যোগ

দ্বিতীয় স্তর

নবম প্রকরণ

——ঃ*ঃ——

সত্য-যোগে আত্ম-দর্শন।

সত্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল। সত্যই নিত্য পদার্থ। তদর্থে আত্মাই একমাত্র সত্য, সুতরাং আত্মাই নিত্য পদার্থ। আমরা সেই সত্য হইতে আসিয়াছি, পুনর্ব্বার সত্যেই যাইব। অতএব সত্যের অনুসরণ বা আচরণ করিতে হইলে নিজকেও সেই সত্যময় আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "পুরুষ এবেদং বিশ্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" "নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং" ইত্যাকার ভাবে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে "তৎ" পদের লক্ষ্য সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য, "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যক্ চৈতন্য, উভয় অভিন্ন পদার্থ জ্ঞানে, "ত্বং" পদের প্রতিপাদ্য জীবাত্মাকে "তৎ" পদের প্রতিপাদ্য "সত্য" স্বরূপ পরমাত্মায় লয় বা যোগ অভ্যাস দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে সত্য-আচরণ বা সত্যের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতাদৃশ সত্যানুশীলন দ্বারাই সত্যবলে প্রাণিগণের হিত সাধন করিবার শক্তি লাভ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এতাদৃশ সত্যই সংযম বিধায়ক যোগাঙ্গ স্বরূপে আচরণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন—

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্ ॥

যাহা প্রাণিগণের হিতকর সেই বাক্যই সত্য, কেবল যথার্থ ভাষণকেই সত্য বলে না। তাদৃশ সত্যানুশীলন জন্যই উপযুক্ত সদ্গুরুর নিকট সংযম নিয়মাদিযুক্ত যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যথা অভিধানের সাহায্যে শব্দার্থ কণ্ঠস্থ দ্বারা যোগ শিক্ষা হয় না। যোগ-শিক্ষা-দাতা গুরু সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বৈশিষ্ট্য ভাব দৃষ্ট হয়।

"শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধনঃ ইবানলঃ ॥" বেদান্ত সংজ্ঞা

শ্রোত্রিয় অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন উদার চিত্ত, আশা রহিত, ব্রহ্মবেত্তা, ব্রহ্মেতে উপরত, ইন্ধন বিহীন অনলের ন্যায় শান্ত, এবম্প্রকার সদ্গুরূপদিষ্ট ভাবে আত্ম-দর্শন-যোগ আশ্রয় করিবে। তাদৃশ গুরুকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাঁহাকে তোষণ করিতে পারিলেই, সেই গুরু কৃপালব্ধ জ্ঞান বলে, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি অবস্থা লাভ করিতে পারিবে।

উপরোক্ত প্রকার গুরুপ্রসন্নতাবশে মনঃসংযমদ্বারা সত্যের মূলতত্ত্ব মানসক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে পারিলে, বাহ্যভাবে সত্যানুষ্ঠান আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতে থাকে। তখন আর "মিথ্যাচরণ করিও না" "মিথ্যা কথা বড় দোষ" ইত্যাকার "রাধাকৃষ্ণ বুলি" পড়াইতে হয় না। সত্যের মূলতত্ত্ব অভাবে ইদানীং মানব-সমাজ-মধ্যে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই "সৎসাহস" লোপ পাইয়া মিথ্যামিশ্রিত, এক কাল্পনিক সত্যের উদ্ভব দেখা যাইতেছে। তদ্ধেতু, অধুনা সত্যবাক্য বলাও একপ্রকার নিষিদ্ধ বাক্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আজ কাল অনেকেই কথায় কথায় বলিয়া বসেন যে, "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" অর্থাৎ সত্য বলিবে বটে, কিন্তু তাহা প্রিয় হওয়া চাই, অপ্রিয় সত্য কখনও বলিবে না। ইহার অর্থ

হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। সমাজে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল, যাহারা দেহাত্মবোধে অতিমাত্র ভোগ-সুখ-পরায়ণ, যাহারা হিংসুক, যাহারা কপটাচারী, যাহারা পরনিন্দুক, যাহারা কাম-ক্রোধ-লোভ-পরায়ণ, যাহারা অসংযমী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, যাহারা ব্যসনাসক্ত, যাহারা শাস্ত্র পাঠ করিয়াও স্বার্থপরতা-বশে অশাস্ত্রযুক্ত কার্য্যে রত, যাহারা মিথ্যাবাদী, যাহারা কাপুরুষ, যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারভাবে আহার বিহারে আচার ভ্রষ্ট, অর্থাৎ ব্যভিচার পরায়ণ ইত্যাদি নানা প্রকারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টোন্মুখ মানবদিগের হিত সাধনোদ্দেশ্যে মানসিক উৎকর্ষ বিধান অথবা ধর্ম্ম বা সমাজের শৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য এবং যাহাকে লইয়া একান্নবর্ত্তী ভাবে বা এক সমাজে অবস্থান করিতে হইবে এরূপ ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ উপরোক্ত প্রকারে সদাচার ভ্রষ্ট হইলে, সরলভাবে তাহাদের কৃত কর্ম্মের দোষ দর্শাইতেও কি অপ্রিয় সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতে হইবে? ইহা কি সত্যানুমোদিত না শাস্ত্রানুমোদিত? একটা অজ্ঞানী বালক পরিণাম না বুঝিয়া এক ঢেলা আফিং খাইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য ক্লেশ হইতে পারে; পরন্তু কোন ব্যক্তি এমন কোন অবৈধ কর্ম্ম করিতেছে, যদ্দ্বারা তাহার সংক্রামকতায় সমাজ বিষ বিদুষ্ট হইতে পারে; সে ক্ষেত্রেও কি তাহাদের প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব চিন্তা করিয়া, সত্যবাক্যে বা সত্য আচরণে তাহাদিকে নিবৃত্তি করিতে পরাঙ্মুখ হইতে হইবে? ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বিশ্রবানন্দন রাবণ, সীতা হরণ করায় তদনুজ ধার্ম্মিক প্রবর বিভীষণ; ধর্ম্ম, কুল ও সমাজ শৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য সত্যবাক্যে তাঁহাকে অপ্রিয় হইতে হইবে জানিয়াও কি রাবণকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন নাই? স্বীকার করি, তজ্জন্য বিভীষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু লাঞ্ছনার ভয়ে, কি তিনি সত্য মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব প্রবর মহাধার্ম্মিক বিদুর কি কখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকে সত্যবাক্য বলিতে অপ্রিয় ভয়ে

কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন? ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য কি নিয়ত ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের দোষানুদর্শন করান নাই? না অপ্রিয় ভয়ে শকুনির ন্যায় প্রিয়বাক্যই বলিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ (সামান্য মানবের কথা দূরে থাকুক) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ন্যায় ত দোষানুদর্শন করাইতে কি কখনও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইয়াছেন? ভগবান্ বশিষ্ঠ কি তীব্রবাক্যে দশরথ বা রামচন্দ্রের দোষানুদর্শন করান নাই? রামদাস স্বামী কি ছত্রপতি শিবাজীর দোষানুদর্শন করাইতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কি অপ্রিয় সত্য বলিতে কদাচ ভীত হইতেন? মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র কি তাদৃশ প্রকার সত্যের অনুবর্ত্তী নহে? উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পদে অভিষিক্ত থাকিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথিত যশা ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ভারতরত্ন মহামান্য স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষ লর্ডলিটনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ব্যপদেশে যে অপ্রিয় সত্য বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারত সন্তানের ঘরে ঘরে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকা আবশ্যক। ইহা কি সত্য প্রিয়তা ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন সৎসাহসের পূর্ণ আদর্শ নহে? তিনি ত "ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" ভাবে সত্যের মর্য্যাদা হানি করেন নাই? এ ক্ষেত্রে গবর্ণর-লর্ডলিটনের সত্যপ্রিয়তাও প্রশংসনীয়; যেহেতু, তিনি এতাদৃশ অপ্রিয় সত্য শুনিয়াও ক্রুদ্ধ হন নাই; এজন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে "অপ্রিয়শ্চ পথ্যশ্চ বক্তা শ্রোতাচ দুর্ল্লভঃ" অর্থাৎ অপ্রিয় অথচ পথ্য এরূপ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। এ ক্ষেত্রে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত আশুবাবুর আর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্য পরবর্ত্তী কালে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলে অকুণ্ঠিত চিত্তে ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাহা সংশোধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেও যে প্রয়াসী, তাহাও বোধ হয় অনেকেই বিদিত

আছেন। ইহার নামই প্রকৃত সত্য-আচরণ। যেহেতু, বিবেক সাহায্যে কেবলমাত্র মনে মনে সত্যাসত্য বিচার বিবেচনা দ্বারাই সত্যপ্রিয় হওয়া যায় না। দৃঢ়তার সহিত যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে যতই লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভয় বা নিজের মিথ্যা সম্ভ্রম (প্রেষ্টিজ্) ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকুক না কেন, যিনি তাহাতে বিচলিত ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সত্যপ্রিয় বা সত্য-আচারী। অধুনা ভারতীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে নানা গুণে বিভূষিত দেশমান্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যেও আমি এমন অনেক বিষয়ে সত্যপ্রিয়ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবেন, তাহাতে অটল। তাঁহার ন্যায় একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক হইলেও, তাঁহার সত্য-আচরণে আমি মুগ্ধ। এতদ্ভিন্ন স্বর্গীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিবান্ পুত্র রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, (বর্ত্তমানে ইনি পরলোকগত) ইহাঁর সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুবর্ত্তী সূচক সদ্গুণাবলী চিরদিন ইহাঁকে এই কর্ম্মজগতেও অমর করিয়া রাখিবে। আর একটি মহাত্মার নামও আমি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইনি বরিশালের শিক্ষাগুরু বিশ্ববিখ্যাত আমার পরম শ্রদ্ধেয় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত। ইনি অল্পদিন হয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর পূত অর্ঘ্য লইয়া অনন্তধামে গিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর সদ্গুণ ও সত্যপ্রিয়তা দেশবাসীর চির আদর্শ থাকিবে। অতঃপর আমি আর একটি মনীষী ব্যক্তির নাম করিব. যিনি সাত আটটী ভাষাতে সুপণ্ডিত হইয়াও একান্ত স্বধর্ম্ম পরায়ণ, অথচ নীরব কর্ম্মী ও সত্যের আদর্শ মূর্ত্তি, ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় বেদ বাচস্পতি। আমি ইহাঁকে সত্যপ্রাণ বলিয়াই মনে করি। ইনি মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ নামা মহাপুরুষ রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের

ভূতপূর্ব মন্ত্রী। জমিদার ষ্টেটে কার্য্য করিয়া দৃঢ়তার সহিত সত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা আমার জীবনে দ্বিতীয় আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে নিজে একজন সত্যভাষী কেবলমাত্র তাহাই নহে, তিনি নিজে সত্যাচারী, সত্যরক্ষক ও সত্যপালক। তিনি সত্যের লাঞ্ছনা কখন সহ্য করিতে পারেন নাই; তজ্জন্য সময় সময় তিনি অনেকের নিকটেই অপ্রিয়রূপে গণ্য হইয়াছেন সত্য কিন্তু নির্ভীক। এজন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের আর্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ নষ্ট করিয়া, শেষ জীবনে দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন; তথাপি নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি জানিয়াও জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সত্য হইতে বিচলিত হন নাই এবং অপর কেহও তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে অপর কোন সত্যাবলম্বীকে রক্ষাজন্য মিথ্যার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সত্যকে জয়যুক্ত করিতে সততই বদ্ধপরিকর দেখিয়াছি। পরন্তু কোনক্ষেত্রে নিজের কোনরূপ ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, অম্লানবদনে ভ্রম স্বীকার করিয়া, তাহা সংশোধন করিতেও কদাচ কুণ্ঠিত দেখি নাই। এজন্য আমি তাঁহাকে একজন সত্যবীর বলিয়া অদ্যাপিও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। এতাদৃশ সৎসাহসী লোক সংসারে প্রকৃতই নমস্য। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামখ্যাত নির্ভীক দান-বীর (রাজা) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সত্যপ্রিয়তা জগৎবিখ্যাত; কিন্তু ঐ মহীরুহ পার্শ্বে আর যে কয়েকটী পাদপ পরিশোভিত আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণপুর অধিপতি স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের সত্যপ্রিয়তা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যনির্ভীকতা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় সরল 'মিষ্টভাষী ও অমায়িক' বিশেষতঃ সত্যপোষক এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে আর্য্যসন্তানগণ মধ্যে পুনর্ব্বার যাহাতে আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রেরণা সঞ্চার হইয়া, আত্ম-শক্তির

অভ্যুদয় হয়, তন্নিমিত্ত সুরেন্দ্র বাবুর উৎসাহ অধ্যবসায় মদীয় এই "**আত্ম-দর্শন-যোগের**" সহিতও বিশেষ ভাবে জড়িত। স্বধর্ম্মরক্ষাকল্পে আধ্যাত্মিক রত্ন আবিষ্কারের চেষ্টায় এবং তাঁহার ঐ সত্যানুরাগ-রঞ্জিত সদ্‌গুণাবলী সর্ব্বত্র আদর্শনীয়। অবশ্য এরূপ আরও বহুলোক অদ্যাপিও সংসারে নিশ্চয় বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু আমি কার্য্যকারণে যাঁহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, এ স্থলে তাঁহাদেরই ৪।৫ টী নাম করিলাম মাত্র। আমাদের মা ভগিনীগণ মধ্যেও যে এতাদৃশী সদ্‌গুণ সম্পন্না প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী না আছেন তাহা নহে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতি ও পরবর্ত্তী যুগের মহারাণী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী যাঁহারা মাতৃনামের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাশক্তি সম্পন্না। তাঁহাদের সত্যমণ্ডিত সংযম, তিতিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যাদি যোগানুষ্ঠানে আমাদের মাতৃভূমি গৌরবান্বিতা। ইহাঁদের সত্যাচরণের মহিমা সকলেই অবগত আছেন। এ স্থলে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া-গণ মধ্যে আমি আর একটি মহাবিদ্যা স্বরূপিণী মহীয়সী মহিলার প্রাতঃ-স্মরণীয় পবিত্র নামও সত্যের আদর্শরূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। তিনি প্রগুক্ত রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের রত্নগর্ভা জননী রাণী ৺বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরাণী। তাঁহার সংযম, তিতিক্ষা, দান ও স্বধর্ম্মপরায়ণতা মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতীব প্রগাঢ়। সত্যবাক্য, সত্য ও সত্যাবলম্বীকে রক্ষা তাঁহার জীবন ব্রত ছিল। তাদৃশ সত্য রক্ষণে তিনি যে সকল চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আদর্শনীয়। পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকালে বর্ণিতা রাণী মাতার সদ্‌গুণরাশি যে মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় হিরণ্ময়-জ্যোতিঃতে সমধিক ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সেরূপ

মণি-কাঞ্চনযোগ সচরাচর সম্ভবে না। অধুনা আর্য্যসন্তানগণ মধ্যে অধিকাংশ নরনারী সেই সত্যের আদর্শ যেন ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছেন। ইহা দুঃখের বিষয়; তদ্ধেতু—বর্ত্তমান অবস্থায় আমি আর একটি পুণ্যপূতা তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণা জননীর নাম, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিতেছি। কারণ ইহাঁদের সত্যমণ্ডিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের অনেক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। মানবের, বিশেষতঃ মাতৃজাতির অনুকরণ প্রিয়তা স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য আদর্শে যেমন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সংযম ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আত্ম-সুখ ও বিলাসিতাকে আশ্রয় করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহারা উচ্চ আদর্শ পাইলে, তাহার অনুকরণেও যে, সহজে সংযমী হইয়া, ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন, ইহা আমি ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কেহ কেহ হতাশ ভাবে বলিয়া থাকেন যে, নানা প্রকার চেষ্টা বা সভা সমিতি করিয়াও যখন সমাজ সংস্কার হইতেছে না, যখন দেশের অধিকাংশ নরনারীগণের অধঃপতনের গতিরোধ করা যাইতেছে না, তখন শেষ সীমায় না পৌছান পর্য্যন্ত ইহাঁদের গতিরোধ করা অসম্ভব। আমি এই হতাশবাক্যে কখনও আস্থা, স্থাপন করিতে পারি না। যদিও পুরুষগণের পক্ষে বিজাতীয় কু-শিক্ষার সংক্রামকতায় কোন কোন স্থানে ঐ উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন হইতেছে সত্য বটে, তথাপি মাতৃজাতি আর্য্যরমণীগণের উদ্দেশ্যে ঐ প্রকার উক্তি কোন মাতৃ-সন্তানই প্রযুজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন ইহা আমি মনে করি না। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা যদি কোন সত্য পদার্থ অবলম্বনে ভবিষ্যৎ বিপদসূচক ঐ অধোগতি রোধের চেষ্টা করিয়া না থাকি, তবে আমরা কাহারও উপর দোষারোপ করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। একখানা রেলগাড়ী ৺কাশীধাম হইতে মোগলসরাই ষ্টেশন অভিমুখে দ্রুতগতিতে

ছুটিয়াছে। মধ্যপথে ঐ ট্রেণখানির গতিরোধ করার জন্য ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি যত চেষ্টাই কর না কেন, যত পাপ-পুণ্যের বাক্যই বল না কেন, সে ট্রেণের গতি কিছুতেই রোধ হইবে না। পক্ষান্তরে আরোহিগণের নিকটেও উপহাস্যাস্পদ হইবে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদবার্ত্তা-সূচক যদি একটি লাল রঙের নিশানরূপ "সত্য" অভিজ্ঞান ট্রেণের সম্মুখে কেহ ধরিতে পার, তবেই দেখিবে ট্রেণের গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আরোহিগণও তখন ভীতিবিহ্বলচিত্তে সেই ট্রেণ হইতে নামিয়া তোমার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা-সূচক সতর্কতার জন্য তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিবে। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজরূপ ট্রেণও যখন বহু আরোহী লইয়া দেহাত্মবোধ বা অসংযমের পথে দ্রুত-গতিতে ছুটিয়াছে, যদি প্রকৃতভাবে কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক যে, **আমাদের হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজরূপ ট্রেণ, কাশীরূপ মুক্তিক্ষেত্র ছাড়িয়া, মোগলসরাই-রূপ বিধর্ম্মীভাব-অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটিয়াছে ;** সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য প্রলোভন বা ভয়সূচক কেবল মৌখিক শাস্ত্রবাক্য বলিলে উহার বিপথগামিনী গতি কখনই নিবৃত্ত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিত্য সত্যপদার্থ **"আত্মজ্ঞান" নিশানরূপ নিবর্ত্তক অভিজ্ঞান সম্মুখে ধর,** দেখিবে সমাজের বিপথগামিনী গতি বন্ধ হইয়া যাইবে। আরোহিগণও তখন প্রবৃত্তিমুখগামী ট্রেণ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তোমাদের নিকট আসিয়া, তোমাদের প্রদর্শিত ঐ নিবর্ত্তক অভিজ্ঞান দৃষ্টে তোমাদিগকে পরিত্রায়ক-স্বরূপ জ্ঞানে, কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ প্রদান করিবে ; সুতরাং নিত্যসত্য আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-রূপ নিবর্ত্তক নিশান সংগ্রহ না করিয়া, ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, শাসন-সংস্কার ইত্যাদি যে কোন 'সংস্কার' 'সংস্কার' বলিয়া

মৌখিক চিৎকার কর না কেন, যত সভা, সমিতি, মজলিশ, প্রতিষ্ঠা কর না কেন, তাহা অসত্য বা অন্তঃসার বিহীন। অর্থাৎ সংযম তিতিক্ষা হীন অবশীকৃত ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া, কেবলমাত্র বাহ্যধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃতভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে। মেঘ সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সূর্য্যকে দীপ্তিমান করিতে পারে না। সেইরূপ মিথ্যাও সত্যকে আবরণ করিয়া কিছুকাল রাখিতে পারে বটে, কিন্তু মিথ্যা সত্যকে প্রকাশিত করিতে পারে না। সুতরাং সত্য নিদর্শনরূপ '**আত্ম-জ্ঞান**' বলেই নিবৃত্তিমূলক সংযম-তিতিক্ষা উদয় হইয়া পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা মুক্তিলাভ হয়।

বর্ত্তমান সময় যিনি অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আত্মজ্ঞান-পরায়ণ, হইয়া হিন্দুসমাজমধ্যে প্রাচীন যোগিঋষিগণের আদর্শে সেই আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের পুনরভ্যুদয় চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। ৺কাশীধামে তদুদ্দেশ্যে "**আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা**" ও হিন্দু বিধবাগণের জন্য "**যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম**" প্রতিষ্ঠা যাঁহার অতুলকীর্ত্তি। এজন্য যিনি যথা সর্ব্বস্ব, বহু মূল্যবান সম্পত্তি, দেবোত্তর স্বরূপে অর্পণ করিয়া স্বয়ংও ব্রহ্মচারিণী ভাবে ঐহিক সমস্ত সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, সামান্য বল্কল (অলখেল্লা) যাঁহার অঙ্গাবরণ, কম্বল যাঁহার শয্যা ও উপাধান; আত্ম-দর্শন-যোগ আদর্শে সর্ব্বদা যিনি যোগানুশীলনে নিরতা হইয়াছেন, তাঁহার নাম "যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী"। (১) ইনি মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদারগণ মধ্যে অন্যতমা ধনশালী জমিদার গৃহিণী। ইনি জমিদার স্বরূপে যে সকল দান ও ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতীয় প্রায় সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ও তদানুষঙ্গিক ভাবে ৺কাশীধামের

---

(১) ১২৭৪ সালের ২৮শে আশ্বিন রবিবার লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিনে ইঁহার জন্ম হয়।

পাণ্ডাকে হাতি দান, এবং অন্যান্য তীর্থে ও অন্যান্য ভাবে যে সকল মহত্তর দানাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম আমি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য মনে করিতেছি না। কারণ তদপেক্ষাও বৃহত্তর দান বহু রাজা, মহারাজ, ধনী, ধনবান গৃহিণী, অনেকেই করিয়া থাকেন ও করিতেছেন। কিন্তু তিনি রাজরাণী স্বরূপা জমিদার বা জমিদার গৃহিণী হইয়াও যে, ত্যাগের আদর্শে আধ্যাত্মিক বা আত্ম-জ্ঞানের পথে সংযম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয় পূর্ব্বক সতত যোগানুশীলনে নিরতা হইয়াছেন, পরন্তু জীবের ঐহিক পারত্রিক দুঃখ নিবৃত্তির পন্থাস্বরূপ "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" সভা ও "যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন যোগিঋষিগণের আদর্শে, শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে আর্য্য নর নারীগণকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা যোগ শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিতা হইয়া, উক্ত প্রকারের জ্ঞানানুশীলকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদানের মহদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন এবং তদর্থে আত্মশক্তি সম্যগ্‌রূপে সমর্পণ পূর্ব্বক যিনি অচল অটল নির্ভীকভাবে একমাত্র সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যোগবল-আশ্রয়ে, সত্যানুসরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; তাঁহার সেই সত্য নির্ভরতা ও সৎসাহসের জন্যই প্রাতঃস্মরণীয়া স্বরূপে এস্থলে তাঁহার নাম সত্যের আদর্শে উল্লেখ যোগ্য মনে করিয়াছি। কারণ তাঁহার ঐ সকল সত্যানুষ্ঠানে বর্ত্তমান সময় আর্য্য-জাতি-মধ্যে এক নব যুগের সূচনা হইয়াছে। ইহা কেবল আমার বাক্য নহে; দেশ বিখ্যাত ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় উক্ত যোগেশ্বরী মাতাকে লক্ষ্য করিয়া, অনেকদিন পূর্ব্বেই আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভায়, এই সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "মা! তোমার ন্যায় মহাশক্তি যখন আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব বা যোগানুশীলনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, আত্ম-জ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, পুনরায় আধ্যাত্মিক যুগেরই সময়

আসিয়াছে।” উল্লিখিত বিষয় সেই মহাপ্রকৃতির বর পুত্রেরই শুভাকাঙ্ক্ষা বা বাক্য সফলতা। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আর্য্য নর নারী বিশেষতঃ মাতৃগণকে এতাদৃশ মহান্ সত্য প্রবর্ত্তনের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তি নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই আত্ম-দর্শন-যোগে সত্যের এই আদর্শ একটু বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করার জন্য আমি কতিপয় মহাত্মা কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু এস্থলে তাহা সম্যক্‌প্রকটিত করা অসম্ভব। তাঁহার স্বাভাবিক গুণাবলী পূর্ব্বে যে সকল বিষয় মহাজনগণ কর্ত্তৃক নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপে “আদর্শ যোগ জীবন” খণ্ডে বিবৃত হইবে।

বর্ত্তমানে সত্যবর্জ্জিত আত্মাভিমানীর সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। “প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয় ; কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।” ঐ সকল কাপুরুষগণ সত্যের ভাব, সত্যের আদর্শ, সংযমের মহিমা, সৎসাহসের অপ্রতিহত শক্তি, বিস্মৃত হইয়া, অতি সামান্য বিষয়ের জন্যও মিথ্যা বাক্যে, মিথ্যা-আচরণে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে, কিছু মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। মিথ্যায় তাহাদিগকে এমন ভাবে আবৃত করিয়াছে যে, সত্য বলিয়া যাহা মনে মনে বিশ্বাস করেন, তাহাও কার্য্যতায় বা আচরণে কিম্বা মৌখিক বাক্য দ্বারা স্বীকার করিতেও যেন তাহারা সতত কুণ্ঠিত। এই ভাবে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে, অথবা সৎসাহসের অভাবে, জানিয়া শুনিয়া জ্ঞান বিশ্বাস মতে তাহারা যে কত প্রকারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে—অধর্ম্ম, কর্ম্মের পরিবর্ত্তে অকর্ম্ম, সত্যের পরিবর্ত্তে—অসত্যের আচরণ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই দিনের জন্য অনিত্য মানব দেহ ধারণ করিয়া যাঁহারা অসভ্য পরায়ণ ও অসংযমীভাবে দৈহিক ভোগ-লালসার মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, যাঁহারা আত্মভ্রম বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, অথবা বুঝাইলেও বুঝিতে বা ভ্রম সংশোধন করিতে প্রয়াসী হন না, তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই মনে রাখিবেন যে,

"এই ভোগ দেহাবসানে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে একদিন কৃত কর্ম্মের হিসাব নিকাশ দিতে হইবেই হইবে।" সেখানে বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলিয়া কেহ পরিত্রাণ পাইবেন না। সত্য ও সংযমের অভাবে সেখানে দেহের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার সর্ব্ব প্রকার অহঙ্কারই চূর্ণ হইবে। সে সংযমনী পুরী ; সেখানে সত্যের নামে মিথ্যাচরণ করিয়া নিস্তার পাইবার জন্য "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" ইত্যাদি খাটিবে না। সেখানে সত্য গোপনোদ্দেশ্যে দুর্ব্বলকে পীড়ন বা পীড়নের ভয় প্রদর্শনে নিস্তার পাওয়া যাইবে না।

"বৈবস্বতী সংযমনী জনানাং
যত্রানৃতং নোচ্যতে যত্র সত্যম্।
যত্রাবলা বলিনং যাতয়ন্তি ॥"

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

জীবদিগের সংযমন জন্য যমরাজের যে স্থান আছে, সেখানে কোন প্রকার মিথ্যা কথিত হয় না। সর্ব্বদা সত্য বিরাজমান রহিয়াছে, যথায় প্রবলগণকে দুর্ব্বলেরা যাতনা দিতে পারে। অতএব দেহ বর্ত্তমানে সেই সত্যকে আশ্রয় করিলে, সেই সত্যের অনুগামী হইলে, সেই একমাত্র সত্য স্বরূপ পরমাত্মার চিন্তায় দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমস্ত উৎসর্গ করিতে পারিলে, একমাত্র সেই পরম সত্যবলেই ইন্দ্রিয়-বিষয় ও চিত্ত-বৃত্তি আপনা হইতে সংযত হইয়া, "আত্ম-দর্শন-যোগ"-যুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন যাহা চিন্তা করিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে ; যে কোন বাক্য বলিবে, যাহাকে আশীর্ব্বাদ অথবা অভিসম্পাত, যাহা করিবে তাহা সত্যে পরিণত হইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তির রোগ মুক্তি বা দীর্ঘায়ু

সূচক বাক্য বলিলে তাহা সফল হইবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্" যোগ সূত্র।

যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের বা অপরের জন্য কোন কর্ম্ম না করিয়াও ইচ্ছামাত্র সমস্ত ফল লাভ হয়। সুতরাং প্রকৃতভাবে সত্যের মূলতত্ত্ব অবধারণ জন্য "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, লোকের হিতকল্পে সত্য সম্বন্ধে যে সকল বর্জ্জিত বিধি আছে, তাহা অবশ্য পালনীয় বিধায় নিম্নে প্রকটিত হইল—

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"

স্ত্রীলোকদিগের রক্ষাকল্পে, রাজরোষে, বিবাহকালে, কোন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা কল্পে, কাহারও সর্ব্বস্ব হরণ হইতেছে এরূপ কালে, এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় অনৃতবাক্য প্রয়োগে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। ইহাও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশেরই অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রাণিগণের হিতোদ্দেশ্যেই ইহা শাস্ত্র-বিধান বলিয়া গণ্য। অতএব সত্যই আমাদের বল, সত্যই আমাদের রক্ষক, সত্যই আমাদের পালক, পরন্তু সত্যই আমাদের সমহারক বা লয় কারক। সুতরাং আমাদের অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—

"সত্যং বলং কেবলম্॥"

তাহা হইলে একমাত্র সত্য-যোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হইবে।

আত্ম দর্শন যোগ

দ্বিতীয় স্তবক

দশম প্রকরণ।

—— ঃ*ঃ ——

অস্তেয়-যোগে আত্ম-দর্শন।

"অস্তেয়" সংযমের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহার অপর নাম অচৌর্য্য। মন পবিত্র ও ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযত না হইলে অচৌর্য্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। পরন্তু কায়মনোবাক্যে অচৌর্য্য ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলেও "আত্ম-দর্শন-যোগ" লাভ হয় না। মানসিক পবিত্রতা রক্ষাই অস্তেয় বা অচৌর্য্য সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বিষয় বৈরাগ্য ভিন্ন মানসিক পবিত্রতা রক্ষা বা অস্তেয় সাধনা সম্ভব হয় না। এ নিমিত্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বাহ্যবিষয় হইতে অন্তর্ম্মুখে আত্ম লক্ষ্যে একাগ্র করিতে হইবে। কামনা-লালসা-যুক্ত কর্ম্মদ্বারা মন একাগ্র এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি কখনও বশীভূত হইতে পারে না।

"বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তৌতু শান্তায়াং বিষয়েষু হি।
রাগ ঔৎসুক্য মাত্রেণ তৃতীয়ং যত্র চেতসি॥
ইহত্য এব যো ভোগঃ দিব্যো ভোগশ্চ যো মহান্।
বশীকারাখ্য বৈরাগ্যং বৈতৃষ্ণ্যং তত্র তত্র যৎ॥"

সাংখ্যকারিকা।

বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইলে, যখন রাগ (অনুরাগ) কেবল চিত্তে একমাত্র আত্ম-লক্ষ্যে ঔৎসুক্যরূপে থাকে, তাহাকেই একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলা হয়। পরন্তু ইহলোকের যে সমস্ত অনিত্য ভোগ অথবা মহান্ দিব্য ভোগ, তাহাতে যে সম্যক্ বৈতৃষ্ণ্য তাহার নাম বশীকার বৈরাগ্য। একমাত্র আত্ম-লক্ষ্যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির এতাদৃশ একাগ্রতা ও বশীকারিতা স্থিত হইলেই অস্তেয় (অচৌর্য্য) যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া. প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য বলে "আত্ম-দর্শন-যোগ" লাভ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র অপরের টাকা পয়সা ও জিনিষ পত্র চুরি না করিলেই যে অচৌর্য্যভাব রক্ষা হইল তাহা নহে। অপরের তাদৃশ জিনিষের প্রতি লোভ জন্মিলেও তাহা মানসিক চুরি বলিয়া গণ্য। **যাহারা মিথ্যা ভাবে অপরের নিন্দা কুৎসা করে তাহারাও চোর।** যেহেতু তাহারা অপরের সুনাম অপহরণ করিতেছে। কোন উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার না করাও চৌর্য্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য। কারণ তদ্দ্বারা উপকারী ব্যক্তির সদ্গুণ অপহরণ করা হইতেছে। ক্রোধ-রিপুর উত্তেজনা দ্বারা অপরের শান্তিই যে অপহৃত হয়, কেবলমাত্র তাহাই নহে, তদ্দ্বারা স্বীয় আত্মার শান্তিও অপহরণ করা হয়। একমাত্র মিথ্যাবাক্যদ্বারা যে কত লোকের কত প্রকারের সম্পদ অপহরণ করা হইতেছে ও হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রানুসারে স্বধর্ম্মোচিত ভাবে যত প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ সকল কর্ম্মেরই মূল "আত্ম-জ্ঞান"। সেই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান আশ্রয় ব্যতীত যাহারা স্বেচ্ছাচার ভাবে শূন্যে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ স্বরূপ কর্ম্মের আড়ম্বরানুষ্ঠান করিয়া মানবের স্বভাবজ কর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ করেন ; যাহারা ইষ্ট বা উপাস্য দেবের প্রতি লক্ষ্য ও একাগ্রতার প্রতিকূলে ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিমুগ্ধ কর্ম্মের অনুগামী হন, তাহারা ধর্ম্মাপহারী। চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াও তাহারা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। **তত্ত্ব-জ্ঞান ভিন্ন "অচৌর্য্য বা অস্তেয়"**

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা মাত্র। তত্ত্ব-জ্ঞান প্রভাবেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া, ব্রহ্মতেজে ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিরত চিত্তের সুসংস্কার সাধন করে। এ জন্য প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা আত্ম-জ্ঞান-যোগ-পরায়ণ তাঁহারা সহজেই চিত্তজয়ী হন্। কোনরূপ কলুষ-বৃত্তি তাঁহাদের চিত্তকে আশ্রয় করিতে পারে না। তন্নিবন্ধন যোগিগণের অন্তঃকরণ আধ্যাত্মিকসন্তাপে স্বাভাবিকই অচৌর্য্য বৃত্তি-সম্পন্ন। যেহেতু আধ্যাত্মিক ভাবোদয় ভিন্ন যোগী হইতে পারে না। পরন্তু আধ্যাত্মিক ভাবোদয় হইলে ইন্দ্রিয়-বিষয়-অপরিগ্রহ অবস্থা সততই প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্দ্বারাই **চিত্ত জয় বা মনোনাশ হইয়া থাকে।** এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

> "অধ্যাত্ম-বিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এবচ।
> বাসনা-সংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্।
> এতাস্তু যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্ত জয়ে কিল॥"
>
> যোগ বাশিষ্ঠ।

অধ্যাত্মবিদ্যায় দৃঢ়তর অভ্যাস, সাধুসঙ্গ, বাসনাত্যাগ, এবং প্রাণ নিরোধ (প্রাণায়াম) এই সমস্ত অবিচ্ছেদ ভাবে নিয়ত অভ্যস্ত হইলে তাহার **চিত্ত জয় বা মনোনাশ** সংসাধিত হইয়া থাকে।

> "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" পাতঞ্জল দর্শন।

তাহা হইতেই চিত্ত প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়, এই ক্ষয়ের নামই রজস্তমোগুণ নাশ। সুতরাং রজস্তমোগুণ নাশ হইলেই চিত্ত সাত্ত্বিক ভাবে উজ্জ্বল হওয়ায়, তাহাতে সমস্ত জ্ঞানের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখন আর ইন্দ্রিয়গণ অনিত্য বিষয়, পরিগ্রহ করিতে পারে না। তদবস্থায়

নির্ম্মল চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি বা পর দ্রব্যের প্রতি স্পৃহারও কোন আশঙ্কা থাকে না। উহার নামই অস্তেয়। অস্তেয় সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা পর দ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

কায়মনোবাক্যে **পরদ্রব্যের প্রতি যে নিস্পৃহ',** তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই অস্তেয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং কোন কার্য্য কায়মনোবাক্যের সহিত অনুশীলন করিতে হইলে দৈহিক বল প্রয়োগে কেবল মাত্র সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বাক্যবন্ধ করিলেই কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। মনে রাখিতে হইবে ঐ উভয়ত্র কর্ম্ম পরিচালকই "মন"। সুতরাং মনকেই সর্ব্বাগ্রে ঈপ্সিত কর্ম্মানুগামী করিবার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে মনঃ সংযম করা শাস্ত্রোপদেশ। মন সংযত হইলেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ আপনা হইতে সুসংযত হইয়া আসিবে। এ নিমিত্ত জ্ঞানেচ্ছুগণ "মনকে" আত্মযুক্ত ভাবে সংযত করিতেই বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন।

"মনোবৃত্তিং সুসংযম্য পরমাত্মনি পণ্ডিতঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তদানঘে ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

হে অনঘে! পণ্ডিত ব্যক্তি পরমাত্মাতে মনোবৃত্তি সুসংযত করিয়া অর্থাৎ সংযমাচরণ-যোগযুক্ত হইয়া মূর্দ্ধ্ন্যাস্থানে ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিবেন। সুতরাং সদ্‌গুরূপদিষ্ট ভাবে মনোবৃত্তি পরমাত্মায় যোগ-যুক্ত করিবার কৌশল অবগত না হইয়া, **দেহাত্মবোধে কেবল দেহের উপরে বল প্রয়োগে কোন প্রকার সংযম-আচরণ সিদ্ধ হয় না।** অতএব আত্ম-জ্ঞানযুক্ত

কর্ম্মই চিত্ত সংযমের মূলতত্ত্ব। আত্ম-জ্ঞানযুক্ত দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি বলেই মনে অচৌর্য্য-বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবস্থায় সাধক বা যোগীর নিত্য আবশ্যকীয়কোন বিষয়ের জন্যই চিন্তা করিতে হয় না; তখন ভগবান্ স্বয়ং তাহার "যোগক্ষেম" বহন করিয়া থাকেন। এ জন্যই যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্" যোগ সূত্র।

অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই যোগীর নিকট ইচ্ছা মাত্র সমস্ত ধন রত্ন আসিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা উদরের চিন্তার জন্য সকল অকার্য্য করিতে বাধ্য হন এরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করিয়া কায়মনোবাক্যে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সংযমী হইতে চেষ্টা করুন। "আত্ম-দর্শন-যোগ" লাভ করিতে পারিলে তাহাদের আর কোন বিষয়ের জন্যই চিন্তা করিতে হইবে না। আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রার্থিগণ মনে একটি কথা বিশেষ ভাবে দৃঢ় রাখিবেন যে, আত্ম-দর্শন-যোগপথে, যতই তাঁহারা সেই ব্রহ্মবিন্দুস্বরূপ, পরমপুরুষের সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন, প্রকৃতি ততই তাঁহাদের অনুগামিনী হইয়া সেবিকার ন্যায় স্বীয় অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যথাবশ্যকীয় বস্তু প্রদানে, নিয়ত তাঁহাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবেন। এইটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং যোগী প্রকৃতি হইতে যতই বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন, প্রকৃতি ততই তাঁহাকে বিমুক্ত রাখিতে বদ্ধপরিকর হইবে। কিন্তু প্রকৃতি যখন দেখিবে যোগী আর তাঁহার অপরা বা অবিদ্যা শক্তিতে অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে কিছুতেই মুগ্ধ হইতেছেন না, তখন সে পরা বা মহাবিদ্যারূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া যোগীর "আত্ম-দর্শন-যোগের" সহায় স্বরূপে, স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় চিৎ-শক্তি, এমন ভাবে সাধকের মানসক্ষেত্রে উদ্ভাসিত করিয়া দিবে যে, তাঁহার ঐ দিব্য জ্যোতিঃশক্তিতে যোগী সহজে

"আত্ম-দর্শন" লাভের অধিকারী হইয়া "সচ্চিদানন্দময়" ভাবে বিভোর হইবেন। ইহাই অস্তেয়-আচরণের চরমোৎকর্ষ তত্ত্ব।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আমরা নিবৃত্তিপথে যাইব। সুতরাং প্রবৃত্তি যাহাতে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রবৃত্তি-মার্গের বিরুদ্ধ ভাব অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গের শমদমাদি ভাবগুলি কায়মনোবাক্যে দৃঢ়ভাবে আমাদিগকে ধারণা করিয়া, অবশ্যই রাখিতে হইবেই হইবে। ইহারই নাম মনের উপর শক্তি পরিচালনা। এই প্রকার মনের উপর শক্তি-পরিচালনা করিয়া সতত মনকে স্থির রাখিতে পারিলেই, আমাদের সর্ব্বপ্রকার সংযম আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া, চিত্ত অস্তেয়-যোগে অবিরত ভাবে "**আত্ম-দর্শন-যোগের**" অনুগামী থাকিবে।

দ্বিতীয়স্তর

একাদশ প্রকরণ।

ব্রহ্মচর্য্য-যোগে আত্ম-দর্শন।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট ভাবে একমাত্র আত্ম-তত্ত্ব-অনুশীলনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, মৈথুন একমাত্র ইন্দ্রিয়-বিশেষের কার্য্য নহে। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, "ন মোক্ষং শিশ্ননিগ্রহং" সমুদায় রিপু ও ইন্দ্রিয়গণেরই মৈথুন আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ, গাত্র, দন্ত, ওষ্ঠ এবং কাম ক্রোধাদি রিপুগণ যে যে বিষয়েতে অনিত্যসুখের আসঙ্গ লিপ্সায় আসক্ত, তাহার পক্ষে তাহাই মৈথুন তুল্য। অনিত্য মায়া, মোহ, স্নেহ, ভালবাসা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভাবে

মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত সতত যুক্ত থাকিয়া কার্য্যশীল হওয়ায়, মন সর্ব্বত্র মৈথুনাসক্ত। ইহাই মানবের মৈথুনাবস্থা। আত্মজ্ঞানযুক্ত সংযম অভ্যাসে মনকে ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত করিয়া, একাগ্রভাবে সতত আত্মযুক্ত রাখিতে পারিলেই মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের মৈথুন ত্যাগ হয়। এই জন্যই মনের বহির্ম্মুখটি বন্ধ করিয়া, অন্তর্ম্মুখে পরমাত্মতত্ত্বে বা ব্রহ্মে বিচরণশীল করার নামই ব্রহ্মচর্য্য বা স্বধর্ম্ম রক্ষা। এই উদ্দেশ্যেই নিষ্কাম ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনযোগে সন্ধ্যা-পূজা প্রভৃতির অভ্যাসরূপ নিত্য-কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। মানস-কর্ম্ম ভিন্ন কেবলমাত্র স্থূল বা বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে কোটি কোটি জন্মেও মনঃসংযম সাধিত হয় না। মনঃসংযম ভিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম কিছুতেই হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম ভিন্ন নিষ্কাম বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা, দুরাশা মাত্র। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনোরূপ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিতে পারিলেই, দেহরূপ কুরুক্ষেত্রে, সাধনসমরে জয়লাভ হয়। একমাত্র মনঃসংযম করিবার জন্যই যত কর্ম্ম। অর্থাৎ আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানাদি অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস-যোগে মন স্থির করিতে পারিলেই, **"সমাধি-ভাবে আত্ম-দর্শন"** লাভ হইয়া থাকে। তখন মন আত্মযুক্ত-অবস্থায় আধ্যাত্মিক তাপে সন্তপ্ত হইয়া "ভর্জ্জিত বীজতুল্য" পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে আর অপরাপ্রকৃতিযুক্ত অর্থাৎ বহির্ম্মুখগামী ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আকর্ষণে মুগ্ধ হয় না। সুতরাং মন ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিও যথেচ্ছাচারীভাবে আর বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে পারে না। পরন্তু আধ্যাত্মিক তাপযুক্ত মনের সন্তাপে ইন্দ্রিবৃত্তি আপনা হইতেই সংযত হইতে বাধ্য হয়। ইহাই "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" ইহার নামই প্রকৃত সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যশীল জিতেন্দ্রিয় অবস্থা। এজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহিরঙ্গ সংযম, ব্রহ্মচর্য্যানুশীলনের বিধায়ক নহে; তবে আংশিক সহায়ক বটে। কিন্তু

একমাত্র দৈহিক কঠোরতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। আত্ম-জ্ঞান-যোগে মানব ব্রহ্মচর্য্যশীল হইতে চেষ্টা করিলে বাহিরের সংযম আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। আর বাহিরের অনুষ্ঠান লইয়া থাকিলে চিরজীবনেও ব্রহ্মবিচরণশীল হওয়া যায় না। সুতরাং মানসকর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্য অনুশীলনের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ম্ম। মন ঠিক্ হইলেই সমস্ত ঠিক হইবে। জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, আলো জ্বালিলেই অন্ধকার দূর হয়; বাহ্য-অনুষ্ঠানদ্বারা অন্ধকার নিবৃত্তি করিয়া, অন্তরে জ্ঞানালোক জ্বালিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। এ নিমিত্ত মানস-পূজা দ্বারা সর্ব্বাগ্রে মনকে আত্ম-যোগযুক্তে সমাহিত করিবার চেষ্টারূপ সন্ধ্যা-পূজাদি নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। মানস-কর্ম্মের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা জীব কামনাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিবধ্যতে ॥"

গীতা ৫, অঃ

ব্রহ্মযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্না শান্তি প্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা-প্রবৃত্তিহেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত কর্ম্মে বদ্ধ হয়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে আত্মযুক্ত হইবার জন্য নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে মানস-কর্ম্মরূপ যোগানুশীলন দ্বারা, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম করিয়া, অনাসক্তভাবে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবেন। নিষ্কামকর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। যে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাহাই অকর্ম্ম, সুতরাং কি কর্ম্ম এবং কি অকর্ম্ম, স্বধর্ম্ম-দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিয়া, কর্ম্ম করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া হইল,—

"কিবা কর্ম্ম কি অকর্ম্ম পণ্ডিত সকল,
না পারি করিতে স্থির বিহ্বল কেবল।
যে কর্ম্ম জানিলে হয় বিমুক্ত বন্ধন,
সে কর্ম্ম তোমাকে পার্থ বলিব এখন॥" ১৬

"কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা চাই তারে,
বিকর্ম্ম-আসক্তি ত্যাগ বুঝিবে সংসারে।
অকর্ম্ম-সকাম যাহা করে জ্ঞানহীন,
নিগূঢ় কর্ম্মের গতি বুঝিতে কঠিন॥" ১৭

"কর্ম্মেতে-অকর্ম্ম যেই করে দরশন,
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম আর দেখে যেই জন।
সেই বুদ্ধিমান ভবে জ্ঞান অধিকারী,
সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত সংসারী॥"
"ব্রহ্মে থাকি কর্ম্ম করে নিস্কাম ধীমান্।
কর্ম্মাকর্ম্ম তার কাছে সকলি সমান॥" ১৮

"যজ্ঞপাত্রে ঘৃতে যার ব্রহ্মবোধ হয়,
ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মহোম দেখে ব্রহ্মময়।
ব্রহ্মলাভ হয় তার ব্রহ্মে লক্ষ্য রাখি,
সর্ব্বদাই ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে থাকি॥"

গীতা ৪ অঃ

এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মচর্য্যলাভের উত্তম আদর্শ। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভাগবতে উক্ত আছে—

"এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিবোজ্জ্বলম্ ।
মদ্ভক্তস্তীব্র তপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ ॥
অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগম ।ঃ
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্ব্বনুমোদিতঃ ॥
গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ।
গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্‌বহেদজুগুপ্সিতাং ॥" ১৭।১১

"এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা বিষয়-বাসনারূপ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও জিতেন্দ্রিয়ভাবে ব্রহ্মতেজে অগ্নির ন্যায় যখন জ্বলিতে থাকিবেন, তখন ব্রহ্মচর্য্যের পরে কোন আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা থাকিলে বেদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরে গুরুকে দক্ষিণা প্রদানে গুরুর অনুজ্ঞানুসারে, হয় গৃহস্থ অথবা বনাচারী কিম্বা পরিব্রাজক হইবেন। ইচ্ছা করিলে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করিবেন, পরন্তু "মদ্‌গত প্রাণ" অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বে মনঃ-প্রাণ অর্পণ করিয়া যে কোন আশ্রমী হইবেন ; কদাচ আশ্রমহীন হইয়া থাকিবেন না। যিনি গৃহস্থাশ্রম ইচ্ছা করেন, তিনি অনিন্দিতা আপনার সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবেন।

ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের এই শরীর ক্ষুদ্র কামনার জন্য উৎসৃজ্য নহে, ইহা ইহকালে কষ্টকর তপস্যার এবং পরকালে অসীম সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। **ব্রাহ্মণ অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিয়াই** মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবেন ; পরন্তু ভাগবতে আরও উক্ত আছে যে, ব্রাহ্মণ সতত আমাতে (আত্মাতে) উপরত হইয়া শিলা বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তত্রাচ নীচ সেবা করিবেন না। ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য বশতঃ অবসন্ন হইলে সদ্ভাবে বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য দ্বারাই আপদ উত্তীর্ণ হইবেন। তাহাতেও

আপদের শান্তি না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারাই উত্তীর্ণ হইবেন। তথাপি কখনও নীচ সেবা করিবেন না। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অন্যান্য তত্ত্ব, বিস্তৃতভাবে "ব্রত বা বিন্দুধারণ-যোগে আত্ম-দর্শন" প্রকরণে বিবৃত করা হইবে। এ স্থলে আর একটী বিষয় উল্লেখ আবশ্যক যে, ছাত্রজীবনই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের প্রকৃষ্ট সময়। পুরাকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-বংশোদ্ভব-বালকগণ শৈশব হইতেই স্বগৃহে সংযম ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে স্বাভাবিক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। অতঃপর উপবীত সংস্কারের পরেই দ্বাদশবর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া, গুরূপদিষ্টভাবে ব্রহ্মচর্য্যানুশীলন দ্বারা আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমপূর্ব্বক "আত্ম-দর্শন-যোগ" অনুশীলনই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার মূল। আত্মজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত কি প্রাচ্য শিক্ষালয় (টোল চতুষ্পাঠী) কি পাশ্চাত্য শিক্ষাগার (স্কুল কলেজ) কোথাও বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষার আদর্শ নাই। এ নিমিত্ত আর্য্যসন্তানগণের অধঃপতনের কারণ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজসন্তানগণ উপনয়ন-সংস্কারে অন্ততঃ দশদিন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন। উক্ত দশদিনকাল স্বধর্ম্মোচিতভাবে সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি আবৃত্তি বা অনুশীলন করিতেন, তদ্দ্বারাও অন্ততঃ সন্ধ্যার মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ হইত; কিন্তু হায়! ইদানীং তিন দিন; অধিকাংশ স্থলে একদিন বা "সপ্ত দণ্ড" ভাসাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মকর্ম্মে এরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি সেইভাবে কার্য্য করিয়া শাস্ত্রব্যবস্থা পদ-দলিত করিতেছেন। এই ভাবে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মক্ষেত্র বর্ত্তমানে দেহাত্মবোধিগণ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাচারপূর্ণ একটী অশাসিত রাজ্যে পরিণত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল অমুকল্প ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাও যে, কোথা হইতে এরূপ ব্যবস্থা সৃষ্টি করিলেন তৎসম্বন্ধে কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। পরন্তু এতদ্দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা সাধন হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করেন না।

কাজেই আর্য্যদেশ হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। টোল চতুষ্পাঠীতে যে শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রাণহীন। কারণ স্বধর্ম্মোচিতভাবে শাস্ত্র-তত্ত্বানুশীলন বা শাস্ত্রবাক্য পালনের কোন ব্যবস্থা, আজকাল প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষাগার স্কুল কলেজে যে ছাত্র-বোর্ডিং আছে, তাহার মধ্যে পরধর্ম্মানুশীলনের যথেষ্ট বিধি-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু স্বধর্ম্ম শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই; অভিভাবকগণেরও সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই। কাজেই বর্ত্তমান শিক্ষা অর্য্যসন্তানগণের পক্ষে আত্ম-বিধ্বংসীকর হইয়াছে। এজন্য সমস্ত শিক্ষাগারেই স্বধর্ম্ম বা "আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান" শিক্ষার বীজ বপনের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় নাই। যে শিক্ষায় আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, চিত্ত স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার নামই "জাতীয় শিক্ষা"; এতদ্ভিন্ন যে শিক্ষা তাহা কু-শিক্ষা মাত্র।

পুরুষের পক্ষেই যে ব্রহ্মচর্য্যানুশীলন কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতির যে ব্রহ্মচর্য্য-অনুশীলনের আবশ্যকতা নাই তাহা নহে; সংযম-ব্রহ্মচর্য্য সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। রমণীগণ বাল্যকাল হইতে ব্রত নিয়মাদির তত্ত্বানুশীলনে আত্ম-বুদ্ধি সম্পন্না না হইলে, তাঁহারা মায়া, মোহ, বিলাসিতা ইত্যাদি কু-বৃত্তি-রাশির এক একটি, মাল-গুদাম আকারে পরিণতা হন। পরবর্ত্তীকালে উহাকে সদ্বৃত্তির তোষাখানা বা দেবমন্দিরে পরিণত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এনিমিত্ত বর্ত্তমানে অধিকাংশ পরিবারের মধ্যেই অশান্তি-দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের ধ্বংস সাধন করিতেছে।

হিন্দুবিধবাগণ শাস্ত্রমতে নিত্য ব্রহ্মচারিণী। বৈধব্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, হয় তাঁহারা তখনই মৃতপতির অনুগমন করিবেন, নচেৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাব-লম্বন করিবেন, হিন্দুবিধবাগণের পক্ষে এই দুইটি নিয়ম ব্যবস্থা।

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥"

পরাশর সংহিতা।

স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন। সুতরাং আর্য্যবিধবাগণ স্বামীর মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলেও, তাহারা ব্রহ্মচারীর গতি প্রাপ্তা হন। (১) বর্ত্তমান যুগেও আর্য্যবিধবাগণের মধ্যে সেই সনাতন নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ভোগ বিলাসাদিতে, তাঁহাদের জন্য নিত্য সংযম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কামনা লালসার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে চিরজীবন কাম্যকর্ম্মে নিয়োগ করা শাস্ত্রবিগর্হিত, সন্দেহ নাই। কামনা-লালসার অনুগমনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত নষ্ট হয়। অতএব আত্মজ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ, তদ্দ্বারাই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম হইয়া "আত্মদর্শনলাভ" হয়। (২)

(১) আর্য্যবিধবাগণকে ব্রহ্মচর্য্যাধীনে থাকিয়া ৺কাশীবাস ও স্বধর্ম্ম পালন উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার বিখ্যাত ভূম্যধিকারিণী তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণা যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া ৺কাশীধামে একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহা "যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামে অভিহিত। তিনি সমগ্র আর্য্যদেশে ইহার শাখাআশ্রম প্রতিষ্ঠার অভিলাষিণী। ভগবান্ বিশ্বনাথ তাঁহার এই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আর্য্যসন্তান প্রত্যেক নরনারীগণ তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানের সহায়ক হইয়া মাতৃজাতির পবিত্রতা রক্ষা করুন। (আশ্রমের প্রকাশিত নিয়মাবলী দেখ।)

(২) ৺কাশীধামবাসী বিখ্যাত তাপসরত্ন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী বি এ, বি এল মহাশয় প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য" পুস্তক দেখ।

দ্বিতীয়স্তর

দ্বাদশ প্রকরণ।

দয়া-যোগে আত্ম-দর্শন।

আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করিতে পারিলে একমাত্র দয়া আচরণ যোগেই আত্মদর্শন লাভ হইতে পারে। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

দয়া ভূতেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা।
বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্কায়কর্ম্মণা॥

কায়, মন, বাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা সমস্ত প্রাণীর উপকার করিবাব যে ইচ্ছা তাহাকে দয়া বলে। দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, অনিত্য-ভোগ-সুখের অভাবই জীবের প্রকৃত দুঃখ নহে। জীবের অনিত্য বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাই যথার্থ দুঃখ। সুতরাং যে প্রকার কর্ম্মদ্বারা জীবের সেই ইচ্ছারহিত অবস্থা আগত হইয়া ভবিষ্যৎ শান্তিবিধান হইতে পারে, সেই প্রকার দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া।

দেহাত্ম-বুদ্ধিবশে অধিকাংশ মানবই দৈহিক-ভোগ-সুখজনিত দুঃখ-দারিদ্র্য নিবৃত্তির ইচ্ছাকেই দয়া বুঝিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। তন্নিবন্ধন মানব-সমাজ হইতে সাত্ত্বিক ভাব ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া, তদ্‌বিনিময়ে, নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, পরপীড়া বা হিংসাদি কলুষবৃত্তিই নানাভাবে মানব-হৃদয়কে যেন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে; পরস্পর পরস্পর মধ্যে বিশ্বাস নাই, সহানুভূতি নাই, পবিত্রতা ভাব নাই, সর্ব্বত্রই যেন একটা অশান্তি বিরাজিত, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ মোহ পরিপূর্ণ। পরসুখ-প্রিয়তাজনিত চিত্ত-প্রসন্নতা নাই, আছে পরশ্রী কাতরত ; পরদুঃখ-কাতরতা-জনিত দয়া নাই; আছে নির্দ্দয়তা। পরোপকার প্রবৃত্তি জনিত-প্রেম নাই; আছে স্বার্থপরতাজনিত পরহিংসা। কুকর্ম্মজনিত লজ্জা নাই; আছে পরনিন্দা। সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিযোগিতা নাই; আছে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও কাপুরুষতাজাত উচ্ছৃঙ্খলতা। দয়াবৃত্তির অনুশীলনের অভাবেই মানবের এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। আত্মজ্ঞানের অভাবে স্বধর্ম্মত্যাগ, স্বধর্ম্মত্যাগের ফলে সংযম-হীনতা; সংযমহীনতাবশে তদানুষঙ্গিক দয়া ও অক্রোধাদি সদ্‌বৃত্তিগুলির বিনাশ সাধিত হইতেছে। মৌখিক বক্তৃতায় বা কাগজে কলমে "দয়াবান্ হও" "অহিংসা-নীতি অবলম্বন কর" ইত্যাদি ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। স্মরণাতীতকাল হইতে আর্য্যদেশে ইহা বেদবাক্যরূপে নানাভাবে বিঘোষিত আছে। হিংসাবৃত্তি অপসারণ ও দয়াবৃত্তি অনুশীলনের পন্থা, আমাদের দেশে, আমাদের ধর্ম্মে, আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ আছে, তাহা বোধ হয়, অন্য কোন দেশে, অন্য কোন ধর্ম্মে কিম্বা অন্য কোন শাস্ত্রে সেরূপ নাই।

আমাদের দৈনন্দিনভাবে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রারম্ভেই এই শিক্ষা বিধান হইয়াছে যে, সর্ব্বাগ্রে সমস্ত জীবের তৃপ্তিসাধন দ্বারা অহিংসা ও দয়া আচরণে মনোবৃত্তি নির্ম্মল কর; নচেৎ কিছুতেই আত্মশুদ্ধি হইবে না। এ নিমিত্ত

আমাদের জাতি ও সমাজ গঠনকারী শাস্ত্রকারগণ আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা বন্দনাদির পূর্ব্বেই তর্পণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে,—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

এই ভাবে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন, সপ্তলোক, দেবতা ঋষি, পিতৃগণ, মানবগণ, পিতৃপদবাচ্যগণ, মাতৃগণ মাতামহগণ, অতীত কোটী কোটী কুলের সম্বন্ধ বিশিষ্ট সপ্তদ্বীপ বাসিগণের নিত্যতৃপ্তিবিধান করিয়াছেন। পরন্তু তাহা একমাত্র মানব কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধভাবে কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; তাঁহারা দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর. এবং তদিতর সর্প, সুপর্ণ, পক্ষিকুলাদি, জলচর, ভূচর, খেচর, রাক্ষসকুল এমন কি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পাপে ধর্ম্মে যাহারা রত, তাহাদেরও "তৃপ্তি" সাধন দ্বারা অহিংসা ও দয়াবৃত্তি অনুশীলনের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ, ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ, নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে, তেষামপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এতদ্ব্যতীতও যদি ভগবৎ সৃষ্ট কোন জীব বা পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহাদের তৃপ্তির জন্যও বলিয়াছেন—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"

এই মন্ত্রে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; ব্রহ্ম হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত সকলকে "তৃপ্ত" করা, সমস্ত জীব ও পদার্থের প্রতি অহিংসা

ভাবে ও ঐ সকলের প্রতি "দয়া" ভাবে মনোবৃত্তি গঠন করা আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম বা ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত।

কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের অভাবে দেহাত্মবুদ্ধিতে আমাদের সমস্ত গুণগ্রাম আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আত্ম-দৃষ্টির অভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব বস্তু দেখিতে পাইতেছি না। সর্ব্বদা কামনাপূর্ণ বাহ্যদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া, আমাদের গৃহসঞ্চিত অমূল্য রত্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পরিয়াই, আমরা কাঙ্গাল ; তদ্ধেতু আমাদের অপেক্ষা হিংসাবৃত্তি সম্পন্ন নির্দ্দয় জাতির নিকট "দয়া" ভিক্ষা করিতে যাইয়া, আমরা লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত হইতেছি। আমরা আত্ম-বিস্মৃতবশে আজ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আর্য্যসন্তানকে "অহিংসনীতি," "দয়া-আচরণ" শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া, সেই দাম্ভিক জাতির নিকট আমাদের জাতীয় দীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। তন্নিবন্ধন আজ পাশ্চাত্য জাতি, কথায় কথায় আমাদিগকে আদর্শহীন জাতি বলিয়া উপহাস ও অপর জাতির প্রতি আমরা বিদ্বেষ বা হিংসাপরায়ণ, অনুদার ইত্যাদি আখ্যা প্রদানে অবিশ্বাস সূচক দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইহা তাহাদের দোষ নহে ; আমাদেরই আত্ম-বিস্মৃতির ফল। আমরা যদি আত্ম-জ্ঞান-আশ্রয় করিয়া, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্যানুরূপ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতাম, সেই ভাবে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা স্বধর্ম্মানুশীলন করিতাম, তাহা হইলে আমরা একমাত্র দয়া আচরণ যোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভে সমর্থ ও জগৎ সমক্ষে সর্ব্বোচ্চ আদর্শবান হইতে পারিতাম। অহিংস-আচরণের সহিত দয়া-বৃত্তি-অনুশীলনের ওত প্রোত সম্বন্ধ। একটি ভিন্ন অপরটি সুসিদ্ধ হয় না ; এ নিমিত্ত গুরূপদিষ্ট আত্ম-জ্ঞান-যোগে সর্ব্বাগ্রে অহিংস-নীতির ভাবে মনোবৃত্তি গঠন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদেশ সুতরাং সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

কর্ম্ম যদি স্বধর্ম্মযুক্ত হয় তবেই তাহা কর্ম্ম ; যে কর্ম্মে ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হয় তাহা নিশ্চয়ই অকর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

আমাদের মধ্যে দয়াবান লোক এখনও বহু আছেন, যাঁহারা প্রকৃত ভাবে দয়া বা পরোপকারের জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইদানীং তাহার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এখন নিঃস্বার্থ দয়াবান্ কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়। নাম প্রকাশের জন্য অথবা কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে ধর্ম্ম, পুণ্য বা স্বর্গ লাভ হইবে ঈদৃশ স্বার্থপরতন্ত্র লোকের সংখ্যাই অধিক। তিথি বার, নক্ষত্র দেখিয়া বেশী ফললাভের কামনায় দয়া প্রকাশ, প্রাকৃতিক বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দুর্ব্বিপাকে বিপন্নের সাহায্যজন্য রাজপুরুষগণের হস্তে মোটা অর্থ প্রদান করা, নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক দয়ার পরিচয় নহে। অধিকাংশক্ষেত্রে অবস্থাবান্ লোকের আর্থিক দান সংক্রান্ত দয়া, প্রকৃতপক্ষে প্রাণের দয়ারূপে উপলব্ধি হয় না ; এজন্য উহা দয়া প্রদর্শন, কি স্থল বিশেষে দয়া আকর্ষণ, তাহা অনুমান করা কঠিন। প্রলোভন ও নিন্দার বশে যে কোন প্রকারের দয়া প্রকাশ করা হউক না কেন, তদ্দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায়, সেই সকল ব্যক্তিগণ কথনই দয়ার প্রকৃত ফল স্বরূপ শান্তি লাভের অধিকারী হন না। যাদৃশ দয়াগুণে অহঙ্কার বৃদ্ধি না হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাদৃশ দয়াই প্রকৃত "দয়া"। এবম্বিধ দয়বান্ লোকের সঙ্গলাভও আত্মানন্দকর। জীবনে এই প্রকার দয়াবান্ যে সকল লোক দেখিয়াছি তন্মধ্যে আমি একটি পরিবারের নাম এ ক্ষেত্রে আদর্শ রূপে প্রকাশ করিতেছি, ঢাকা জেলায় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার গুহ ঠাকুর্‌তা মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী, এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা ও শ্রীমতী বিভাবতী, ইহাঁরা সকলেই যেন দয়ার এক একটী আদর্শ মূর্ত্তি। অশ্বিনী বাবুর ভ্রাতৃগণ মধ্যেও কেহ কেহ আদর্শ দয়াবান্ ও সকলেই পূত চরিত্র বটেন। কিন্তু অশ্বিনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং

কন্যার স্বাভাবিক দয়া আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতীব উদার ও মহান্। অশ্বিনীবাবু নিজে একজন বিশিষ্ট উকিল হইয়াও মক্কেলের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে পারেন না; পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে দরিদ্র ও বিপন্ন মক্কেলের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। সাধারণ চাকর চাকরাণীগণকে তিনি নিজ পরিবারস্থ লোকের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। একবার তাঁহার বাসায় অল্পদিনের আগত একটী উড়িষ্যাদেশীয় চাকরের মারাত্মক বসন্ত হয়, সে অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে দেওয়ার জন্য সকলেই অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি ও তঁাহার দয়াবতী পত্নী এবং কন্যা শ্রীমতী বিভাবতী (কল্যাণী) যেরূপ ভাবে নিজের সন্তানের ন্যায় রোগীর সেবা শুশ্রূষাদি করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়াও, যেন আমার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে। দিবা রাত্র কাছে অবস্থান করিয়া ঐ জীবনান্তকর সংক্রামক রোগীর নিয়ত সেবা শুশ্রূষা, অল্পদিনের একটা সাধারণ চাকর কেন, সম্পর্কিত লোকের ভাগ্যে অনেকক্ষেত্রেই ঘটে না। এই প্রকার নানাবিধ গুণে উক্ত পরিবারটী দয়ার আদর্শ স্থল। সাধারণের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে অনুকরণীয়। দেহাত্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের চরিত্রে এই প্রকারের গুণ থাকা অসম্ভব। ৺কাশীধামে যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী প্রমোদাসুন্দরী দেবীর চরিত্রে এতাদৃশ অনেকগুণ আমি উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিয়াছি; স্থানান্তরে আদর্শভাবে তাহা যথা সম্ভব প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি পরমা দয়াবতী জননীর নাম প্রকাশ করিতেছি। ইনি মুক্তাগাছার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ সান্যাল মহাশয়ের মহতীগুণশালিনী সহধর্ম্মিণীরূপে "ব্রহ্মময়ী স্বরূপা" স্বর্গীয়া ৺ব্রহ্মময়ী দেবী। ইহাঁর স্বধর্ম্মপরায়ণতা, দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা ও নিরহঙ্কারিতা প্রভৃতি গুণরাশি রমণী-সমাজে বিশেষতঃ ধনী জমীদার-দুহিতাগণ মধ্যে বড়ই উজ্জ্বল ও উচ্চ আদর্শনীয়। মাতৃজনোচিত তাঁহার অপার্থিব স্নেহ

ও দয়া, মদীয় এই নশ্বর দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে প্রদীপ্ত এবং তাঁহার সেই পবিত্র মাতৃনামে আমার চিত্ত পরমানন্দে সতত উদ্ভাসিত। "ব্রহ্মচর্য্য-জীবনে" আমি অনেক উচ্চ আদর্শ তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। তাঁহার সদ্‌গুণরাশি আদর্শ-জীবন-চরিতরূপে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া। এ ক্ষেত্রে ইহাও একটু দেখা আবশ্যক যে. প্রকৃত দুঃখী কে? এবং দুঃখ পদার্থ টি কি? সাধারণ দেহাত্ম-বুদ্ধি মানবগণ দৈহিক ভোগ সুখ অপূরণের জন্যই চিরদুঃখী। মদ্যপায়ী গঞ্জিকাসেবী তত্তদ্‌বস্তুর অভাবে দুঃখী। ধর্ম্ম-কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক দুষ্পূরণীয় কামনা-লালসা-জনিত অপূর্ণ সাধের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সতত মহাদুঃখী। কেহ কেহ বা প্রকৃত অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দুঃখ ভোগ করেন; শেষোক্ত ব্যক্তিগণের দুঃখ, অর্থদানে কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সংযম অভাবে সেই নিবৃত্তিও স্থায়ী হয় না। কেন না দুঃখের কারণ নিবৃত্তি ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। এ জন্য প্রত্যেক দয়াবান্ ব্যক্তিকে, দুঃখীর দুঃখ ভোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবের দুঃখের কারণ দেহাত্মবুদ্ধিজনিত "অজ্ঞানতা" বা "অসংযম"; আত্ম-জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র অর্থ প্রদান দ্বারা উহা নিবৃত্তি হইতে পারে না। যদি প্রকৃতভাবে অহিংসা ও দয়া বৃত্তি অবলম্বনে চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে নিজে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিয়া, ভাবী বংশধরগণ ও পশ্চাদনুসরণকারিগণকেও আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষগণের আদর্শে, নিত্যকর্ম্মরূপ সন্ধ্যা তর্পণাদি নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান ও তাহার উদ্দেশ্য প্রণিধান করিতে শিক্ষা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ শুদ্ধ মৌখিক বাক্যজালে কিছুই হইবে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আর্য্যসন্তানগণের পক্ষে একটী কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অহিংসা বা দয়া প্রভৃতি যোগে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল ও পবিত্রভাব বৃদ্ধি

করাই, আমাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-তর্পণের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা। চিরজীবন "তর্পণ" সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়াও যদি উদ্দেশ্যানুযায়ী "অহিংসা" ও "দয়া" প্রভৃতি গুণে মনোবৃত্তি বা "স্বভাব" গঠন; স্বীয় স্বীয় আচরণে তাহা উপলব্ধিযোগ্য ও আদর্শনীয় না হয়; অনিত্যবিষয়-অহঙ্কারজনিত দেহাত্ম-বুদ্ধি বিদূরিত না হয়, দ্বেষ-হিংসা-স্বার্থ-মোহজাত পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ক্রমশঃ পরিহার না হয়; তবে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, ঐ "তর্পণ" সন্ধ্যাদি কেবলমাত্র বাহ্য অভিনয় স্বরূপে, ইন্দ্রিয়বিষয়-নিরত মনে শুধু জল ঢালা-ঢালি ও কোশা কুশি ঠন্‌ঠনীতেই পর্য্যবশিত এবং তন্নিবন্ধন বৃথা আয়ুক্ষয় হইয়াছে। একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান অভাবে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র অন্তরস্থ জ্ঞান মার্জ্জিত হয় নাই। অতএব দেখা যায় আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, আত্ম-জ্ঞান প্রদান বা প্রচার দ্বারা, সংযম ও স্বধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মে জ্ঞানের পরিপক্কতা সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া, জীবের দুঃখের কারণ নিবৃত্তির জন্য মানসিকশক্তি গঠনের চেষ্টা ও দুস্থকে যথাযোগ্যভাবে অন্নবস্ত্র প্রদান করাই মানবের দয়াবৃত্তি অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। এতাদৃশ "দয়া" আচরণ যোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হইতে পারে।

---*---
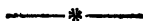
আত্মদর্শন যোগ

দ্বিতীয় স্তর।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

——:*:——

আর্জ্জব-যোগে আত্ম-দর্শন।

আর্জ্জব মনুষ্যত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান। এ নিমিত্ত যোগশাস্ত্রে ইহাকে উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে, ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবম্॥"

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমতাকে আর্জ্জব বলে। ইহার প্রকৃত অর্থ সরলতা। মানসিক কুটিলতা পরিহার না হইলে বাহিরে সরলতা প্রদর্শনের যে চেষ্টা তাহা কপটতার নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ ভিতর বাহির এক প্রকার না হইলে মানব কখনও সরল হইতে পারে না। "আত্ম-জ্ঞান-যোগে" চিত্ত-সংযমদ্বারা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন, নানাভাবে ত্রিগুণের আকর্ষণ বিপ্রাকর্ষণে মনের বক্রগতি দূর হয় না। মনের বক্রগতি দূর না হইলে সুষুম্নাপথে মন একাগ্রভাবে সরলগতিতে আত্মযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মন ভিতরে স্থির ও সরল না হইলে বাহিরে সমতা বা প্রকৃত সরলভাব প্রকাশ পায় না। যাহার মন ভিতরে, যে কোন বিষয় উপলক্ষ্যে, যত একাগ্র ও স্থির হইবে; বাহিরে তাহার কার্য্যে তত সরলতা প্রকাশ

পাইবে। সরলতা সাধকের প্রধান অবলম্বন; এজন্য ভাল ভাল জ্ঞানিগণ সরলতাগুণ অনুশীলন জন্য অনেক সময় বালক বালিকাদিগের সঙ্গে মিশিয়া খেলা করেন। সরলতা আচরণ ও সরলভাব শিক্ষা বিধানের জন্য কেহ কেহ সামাজিক ভাবে অনুন্নত শ্রেণীর লোক, অথবা লৌকিক চক্ষে চাকর চাকরাণী পর্য্যায়ভুক্ত লোকের সঙ্গে মিশিয়া সরল প্রাণে নিষ্কপট আনন্দ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন। ইহা অহঙ্কার-বৃত্তি-পরায়ণ লোকের নিকট দোষণীয় হইতে পারে ঘটে, কিন্তু সদ্‌গুণগ্রাহী মহাজনগণ ইহা অমায়িকতা-গুণস্বরূপেই গ্রহণ করেন। এতাদৃশ "সরল" ভাব অদূর অতীতে পল্লীর ঘরে ঘরে বিরাজিত ছিল; তখন বয়োজ্যেষ্ঠ চাকর চাকরাণীকে, অনুন্নত প্রতিবাসীকে নাম ধরিয়া ডাকিবার রীতি ছিল না। সেই সরলতা, সেই অমায়িকতা এখন আর পল্লীচিত্রেও প্রায় দৃষ্ট হয় না। ইদানীং পাশ্চাত্য-ভাব-বিমুগ্ধ দেহাত্মবাদিগণের পক্ষে, সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যেন কথা বলাও সম্মান হানীকর। অথচ তাহারা একটা নগণ্য শ্বেত-চর্ম্মাবৃত জীব দেখিলে পাঁচবার কুর্ণিশ করিতেও আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হয়, ইহা মনে করেন না। সুতরাং ইহারা সরলতার আনন্দ ও সরলতার মূল্য কি করিয়া বুঝিবেন।

সরলতাই সাধকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কপটতা বা সংকীর্ণতাই পাপ; কারণ কপটতা বা সংকীর্ণতা স্থলে সত্য তিষ্টিতেই পারে না। সংশয় বুদ্ধি বা দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মানবগণ এজন্য স্বভাবতঃই কুটিলতা পরায়ণ। তাহারা সাধারণতঃ একটি সত্যবাক্য প্রয়োগ করিতেও চিন্তা করে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের কল্পিত স্বার্থেরও কোনরূপ হানী হইবে কি না? অথবা ঐ সত্যবাক্য প্রয়োগ জন্য তাদৃশ দেহাত্মবাদিসমাজে তাহার গুণকীর্ত্তন হইবে কি না? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে সে কখনও সরলভাবে সত্য বাক্যটি বলিতেও যেন অসমর্থ। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানে দেহাত্মবাদি-সমাজভয়ে অনেক সত্যবাদী, পূতচরিত্র ব্যক্তিও কপটতা বা সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ

পূর্ব্বক অসরলতারূপ কুঠার আঘাতে আত্মধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন। কল্পিত লোক-লজ্জার ভয়ে অনেকে সরলতা ও স্বধর্ম্ম নষ্ট করিতে বাধ্য হন, এরূপ দেখা গিয়াছে। এজন্যই মহাজনবাক্য যে, "ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিন থাকিতে নয়" ঐ সকল পাশে (অষ্ট পাশে) যাহারা বদ্ধ তাহারাই প্রকৃত দেহাত্মবাদী বা সংসারান্ধ। যোগিগণ ঐ সকল ঘৃণা লজ্জা, ভয়, শোক, মায়া, মোহ, কুল, শীল ইত্যাদিরূপ অষ্টপাশ হইতে নিজেকে সততই মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। এ নিমিত্ত তাঁহারা বার্দ্ধক্য অবস্থায় বালস্বভাবসম্পন্ন সরল ও সরলতা প্রিয় হন। তাঁহারা জগতের যাবতীয় কর্ম্মই সরলভাবে দর্শন এবং নিজেরাও সরলভাবে অনুষ্ঠান করেন।

কুতর্ক-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও সরল হইতে পারে না। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"বাদোনাবলম্ব্যঃ" (ভক্তিসূত্র) অর্থাৎ কখনও তর্ক করিবে না। কু-তার্কিকগণ কি করিয়া অপরকে পরাস্ত করিবেন, সতত এই চিন্তায় ব্যাকুল, এজন্য সরলতা তাহাদের কাছে আসিতে পারে না। অধিকাংশ ছাত্রাবাস ও চতুষ্পাঠীতে এই রোগের আক্রমণ বড়ই প্রবল দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহাদের চিত্তবৃত্তি সুষুম্নাপথে পরিচালিত তাহারাই প্রকৃত সরল। কারণ সুষুম্নার ন্যায় সরল মার্গে কখনও কুটিলবৃত্তি গমন করিতে পারে না। ঈড়া ও পিঙ্গলা স্বভাবতঃই কুটিলবর্ত্মে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছে, সংসারের কুটিলচেতা জীবও কুটিলবৃত্তি লইয়া সেই পথেরই অনুগমন করিয়া থাকে। সরল সুষুম্নাপথে তাহারা কখনও জীবনীশক্তিকে পরিচালন করিতে পারে না। এজন্যই তাহারা সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই কুটিল দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অনর্থক পরনিন্দা, পরশ্রী-কাতরতারূপ নীচবৃত্তি অবলম্বনে অধঃপতিত হয়। সরল ব্যক্তি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ প্রেমিক এবং ভগবদ্ভক্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ইহা বিশেষভাবে উক্ত আছে যে,—

"অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥" ১৬ অঃ

ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপরে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, "সরলতা" ইত্যাদি গুণ দৈবীসম্পদভিমুখেজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ দৈবীসম্পদ-গুণযুক্ত সরলতা বা আর্জ্জব-যোগে "**আত্ম-দর্শন**" লাভ হইতে পারে।

——:*:——

আত্ম-দর্শন-যোগ

দ্বিতীয়স্তবক।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

ক্ষমা-যোগে আত্ম-দর্শন।

আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমাগুণ আয়ত্ত হয় না। ভগবান্ কমলযোনি, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছেন যে,—

"প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্বেবষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে যে সাম্যভাব তাহাকেই ক্ষমা বলে। ক্ষমা মনুষ্যচরিত্রে শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমাগুণকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, সে কর্ম্ম-জীবনে হিংসাবৃত্তিরই দাস হইয়া থাকে। ক্ষমাশীল হইলেই হিংসাবৃত্তি দূর হয়। মানবচরিত্রে যিনি যত ক্ষমাশীল, তিনি তত উচ্চগুণের অধিকারী হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া, ব্রাহ্মণের নানাগুণ এমন কি আংশিক সৃষ্টিরও অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু হিংসাবৃত্তি বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত স্বয়ং ব্রহ্মাও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহার অন্তরে যখন ক্ষমাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন যোগিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করায়, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। সুতরাং

ক্ষমাই ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। কিন্তু ক্ষমা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া, চোর, ডাকাত বা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলকারীকে দণ্ডবিধান দ্বারা তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ বা স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টায় বিরত হওয়াকে ক্ষমা বলে না। সেরূপ ক্ষমার দ্বারা ধর্ম্ম বা সমাজের শৃঙ্খলাও রক্ষা হয় না। পরন্তু তদ্দ্বারা সেই ক্ষমাকারী নিজেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকেন। ভগবান্ তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতা ৪র্থ অঃ।

সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতির বিনাশসাধন দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। জীবশ্রেষ্ঠ মানব! মনে রাখিও যে, তুমি সেই ভগবানের অংশ স্বরূপে সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতির বিনাশ জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছ। ক্ষমাশীল হইতে হইবে বলিয়া মায়া, মোহ বা স্বার্থপরতার প্রলোভনে অথবা দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, নির্দ্দয়তা বা নিষ্ঠুরতার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার কোন কার্য্য যেন অধর্ম্ম বা অবিচার যুক্ত না হয়। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত দুষ্কৃতি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপু এবং মায়া, মোহরূপ অবিদ্যার বিনাশ বা দণ্ডবিধানের জন্যই, ব্রহ্মদণ্ডধারী হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সেই "ব্রহ্মদণ্ড" আত্মপর নির্ব্বিশেষে সতত দুষ্কৃতির দণ্ডবিধানজন্য যেন উত্তোলিত থাকে, অন্যথায় আপনি স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া, সেই দণ্ডপাণির দণ্ডবিধানে দণ্ডিত হইবেন।

ক্ষমা, উপেক্ষা নহে; ক্ষমা, শান্তভাব। কর্ম্মযোগে বর্ণিত শান্তভাবের গুণত্রয় আয়ত্ত হইলে, আত্ম-জ্ঞানযুক্ত ক্ষমাগুণ তখন আপনা হইতে আসিয়া উদয় হয়, তাদৃশ ক্ষমা যোগেই আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

আত্ম-দর্শন-যোগ

দ্বিতীয়স্তর।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

—— ঃ*ঃ ——

ধৃতি-যোগে আত্ম-দর্শন।

"অর্থহানৌ চ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

ধৃতির অর্থ ধৈর্য্যশীলতা। ধারণা শক্তিকেই ধৃতি বলে। অর্থহানি ও স্বজন, কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণের বিয়োগাদি জনিত শোচনীয় বিষয় সকল পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাকেই ধৈর্য্য বা ধৃতি বলে।

প্রবৃত্তিমার্গগামী ইন্দ্রিয়-বিষয়ের এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন উদ্দেশ্যে, মানব-জীবনে এই ধৃতিশক্তি আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। এই ধৃতিশক্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে সংযম সিদ্ধ বা শম-দমাদি গুণ স্থায়ী হয় না। আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন ধৃতিশক্তির গাঢ়ত্ব সম্পাদন হয় না বলিয়াই, সামান্য কারণে মন বিচলিত হইয়া থাকে। এই ধৃতিশক্তিও গুণ ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ—

যে "ধারণা" সুকৌশলে, একাগ্র যোগের বলে,
সাম্য করে, মনঃ-প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—
সেই যে ধারণা হয় স্থির চিত্তে ধনঞ্জয়,
তাহাই জানিবে তুমি "সাত্ত্বিক" বলিয়া ॥" ৩৩ ॥

"না জানি মোক্ষের নাম, শুধু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
যে ধারণা বশে নর করিছে ধারণ—
পুণ্য ধন সুখ আশে, কর্ম্ম ফল ভালবাসে,
সে ধারণা "রাজসিক" পাণ্ডুর নন্দন ॥" ৩৪ ॥

"যে ধারণা হৃদে ধরি, জ্ঞান হীন নর নারী,
নিদ্রা, ভয়, সুখ, দুঃখ ছাড়ে না সংসারে।
সর্ব্বদাই অহঙ্কার, নাহি ঘুচে দুঃখ তার,
সে ধারণা "তামসিক" কহি যে তোমারে ॥" ৩৫ ॥

গীতা ১৮ অঃ।

অতএব সাত্ত্বিকভাবযুক্ত ধৃতি শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই অনিত্য মায়া-মোহ-জনিত শোক-দুঃখে, ধৈর্য্য স্থির রাখিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধ্যান ও সমাধির অধিকারী হয়। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-যোগে দেহের স্থান বিশেষে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে প্রাণবায়ু সহজে সুষুম্নাগামী হইয়া ধৃতিগুণ বৃদ্ধি করে (৪র্থ স্তর দেখ) এবং এতাদৃশ ধৃতি-যোগেই **আত্ম-দর্শন** লাভ হয়।

দ্বিতীয়স্তর

ষোড়শ প্রকরণ।

—*—

মিতাহার-যোগে আত্ম-দর্শন।

"অষ্টৌগ্রাসামুনের্ভক্ষাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনাম্।
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্যবাসিগণের ষোড়শ গ্রাস, গৃহস্থদের বত্রিশ গ্রাস ও ব্রহ্মচারিগণের যথেষ্টরূপ গ্রাসের ব্যবস্থা আছে। এই বিহিত অন্নগ্রাস ভোজনকেই মিতাহার বলে। এই মিতাহার সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্টভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন আছে, কিন্তু ব্রহ্মবিচরণশীল মহাত্মাগণের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন বিধান না থাকার কারণ এই যে, আত্মদর্শন-যোগ-লক্ষ্যে প্রকৃতভাবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিলে, আপনা হইতেই তাঁহাদের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলও ব্রহ্মাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সে অবস্থায় নিজের আত্মাকেই

পরমেশ্বর বা "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপে জ্ঞান হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাই বলিয়াছেন।—(অনুবাদ)

আত্মাতেই আরাম যাঁর, আত্মাতেই সুখ আর,
আত্মাতেই দৃষ্টি যাঁর হয়।
ব্রহ্মে করি অবস্থান, নির্ব্বাণ আনন্দ পান,
সদা হন চিদানন্দময়॥ ৫ অঃ। ২৪

তদবস্থায় আত্ম-জ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণের আহার বিহারাদি কর্ম্মে, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্তি থাকে না। তজ্জন্যই অন্নাদি আহারকে তাঁহারা আহার বলিয়া মনে না করিয়া "ব্রহ্মযজ্ঞ" বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ব্রহ্মযজ্ঞ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"
গীতা ৪র্থ অঃ।

তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যশীল, স্বভাব-সংযমিগণের আহার্য্য গ্রহণ, ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়াই তাঁহাদের মিতাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। কারণ তাঁহারা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত। কিন্তু ঈদৃশ আত্ম-জ্ঞান-যোগে ব্রহ্মচর্য্যশীল সংযমী না হওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস অবস্থায় মিতাহারী হওয়া প্রয়োজন। ভগবান্ও তাহাই বলিয়াছেন।—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"
গীতা ৬ অঃ।

যোগ অভ্যাস অবস্থায় যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, কর্ম্মানুষ্ঠানে যিনি নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেন, নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন,

তাঁহার যোগ, দুঃখনিবারক হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-যোগ অনুশীলন অবস্থাতেও মনকে আত্মযুক্ত রাখিয়া সংযমভাবে কর্ম্মকরার চেষ্টা অভ্যাস করিতে হইবে। পরন্তু আহার সম্বন্ধেও ত্রিবিধ গুণ ও শ্রদ্ধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক সেইরূপ আহারই গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ও সেই ত্রিবিধগুণযুক্ত আহারের উপদেশ করিয়াছেন। সাধারণের বোধগম্য জন্য সরল পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"আয়ু সত্ত্বগুণ আর, আরোগ্য বল সঞ্চার,
প্রীতি সুখ বৃদ্ধি যাতে রস আছে যার।
স্নেহযুক্ত তৃপ্তিময়, সার যার স্থায়ী হয়,
সাত্ত্বিকের বড় প্রিয় ঐ রূপ আহার॥" ৮॥

"অতি কটু অম্লময়, উষ্ণ তীক্ষ্ণ অতিশয়,
লবণাক্ত রুক্ষ দাহ দুঃখযুত যাহা।
মনস্তাপ ফল যার, রোগ প্রদ যে আহার,
রাজসিকগণ পার্থ ভালবাসে তাহা॥" ৯॥

"শীতল নিরস বাসি, দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট রাশি,
দেবস্থানে নিবেদন দিতে যাহা নাই।
অখাদ্য আহার যত, বাসি পঁচা নানা মত,
তামসিকগণ বড় ভালবাসে তাই॥ ১০॥

গীতা ১৭ অঃ

ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস অবস্থায় সাত্ত্বিকভাবের আহার করিলে মন তদ্দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবেই গঠিত হয়। আহারের সারাংশ দ্বারা যে মন গঠিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-যুক্তভাবে মিতাহারযোগ

অনুষ্ঠিত হইলে, ক্রমে আপনা হইতে বিষয় অপরিগ্রহ অবস্থা উদয় হয়। এসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

দেহরক্ষাতিরিক্তানাং পঞ্চধা দোষদর্শনাৎ।
অস্বীকারশ্চ ভোগ্যানাং অপরিগ্রহ উচ্যতে ॥

সাংখ্য কারিকা।

বিষয়ের পঞ্চপ্রকার দোষ (১) দর্শন করিয়া দেহ রক্ষার অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুর আসক্তিত্যাগ অপরিগ্রহ বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং ঈদৃশ বিষয় অপরিগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সঙ্গ-রহিত অবস্থা আগত হইয়া চিত্ত-বৃত্তিকে আত্মাভিমুখে পরিচালিত করে। অতএব আহার্য্য পদার্থ নিয়মিত ব্রহ্মার্পণাদি-যুক্তভাবে ব্রহ্মযজ্ঞ স্বরূপে পরিগৃহীত হইলে, সেইরূপ মিতাহার-যোগেই **আত্মদর্শন** লাভ হয়।

---

(১) অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা এই পঞ্চ প্রকারে ভোগ্যবস্তু দুঃখ প্রদান করে বিধায়, ইহারাই বিষয় সম্বন্ধীয় পঞ্চ দোষ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়।

আত্ম-দর্শন-যোগ

দ্বিতীয়স্তর।

সপ্তদশ প্রকরণ।

—:*:—

শৌচ-আচমন-যোগে-আত্ম-দর্শন।

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধি স্তথান্তরম্॥
মনঃশুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্ম বিদ্যয়া।
অধ্যাত্মবিদ্যাধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্য্যেণ চানঘে॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

শৌচ দুই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা গাত্রাদি শোধনকে বাহ্যশৌচ এবং চিত্তশুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। ইহা স্বধর্ম্মানুশীলন বা অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিতা বা আচার্য্য কর্ত্তৃকও ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। হঠযোগের বিধানমতে, স্থূলদেহকে নিরাময় করিবার জন্য ভিতরে ও বাহিরে বহুপ্রকার ধৌতাদির বিধান আছে। অনেকে তাহা পাঠ করিয়া, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত শৌচ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন। এজন্য অনেকে নানাপ্রকার বাহ্য-শৌচাদি অনুষ্ঠান করিয়াও আভ্যন্তরীণ শৌচার্থে, ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি নানারূপ কর্ম্ম করিয়া চিরজীবন নশ্বরদেহটাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

দেহত্যাগের পূর্ব্বে আর তাহারা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আত্ম-জ্ঞান যোগে "দেহদেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবোদেবঃ সদাশিবঃ" অর্থাৎ যে মন্দিরে সদাশিব প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরের বাহ্যাভ্যন্তর কদাচ অশুচি বা অপবিত্র থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারিলেই অশুচিরূপ কুসংস্কারের "ফস্‌কা গিরাটি" আপনিই খুলিয়া "অপবিত্র পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" অর্থাৎ এই দেহমন্দিরের ভিতরে নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা স্বরূপ মহেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন; আচমনরূপ প্রাণযজ্ঞ দ্বারা মনে সেই জ্ঞান প্রদীপ্ত হইলেই বাহ্য-অভ্যন্তর পবিত্র বলিয়া অনুভূত হইবে। সেই জ্ঞান বিকাশের চেষ্টা না করিয়া কুসংস্কারে দেহকে যে যত অশুদ্ধ মনে করিবে, সে ততই অশুদ্ধ থাকিবে। তদবস্থায় স্বর্গের মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী কিম্বা সপ্ত-সমুদ্রের জলে স্নান করিলেও, চিত্তশুদ্ধির অভাবে কোথাও দেহশুদ্ধি হয় না। এজন্য কেহ কেহ গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াও গঙ্গাজলে গোময় গুলিয়া স্নান করে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মন বিশুদ্ধ না হইলে দেহশুদ্ধি হয় না। বৈদিকী সন্ধ্যার আপোমার্জ্জন দ্বারা দেহশুদ্ধির ব্যবস্থা এবং সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের অভাবে বৈদিকী সন্ধ্যা একমাত্র স্থূলদেহের ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞানরূপ আত্মশক্তির বিকাশ সাধন হইতেছে না। কাজেই চিত্তশুদ্ধিও হইতেছে না। পক্ষান্তরে নানারূপ কুসংস্কারই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ-সমাজ বৈদিক-সন্ধ্যায় বিশ্বাসহীন হইয়া, অশুদ্ধচিত্তে তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তান্ত্রিকগণও একমাত্র ইষ্টদেবতা ছাড়িয়া বহুমূর্ত্তির কাছে দৌড়াদৌড়ি করায় ভেদবুদ্ধিপরায়ণ হইতেছেন। আপোমার্জ্জনে দেহশুদ্ধি; তত্ত্বজ্ঞান-মার্জ্জনে চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহাই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শৌচের সরল অভিব্যক্তি। কিন্তু

আত্মজ্ঞানের অভাবেই এই বুদ্ধিও শুদ্ধিহীন হইয়াছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান-যোগে "ব্রহ্মবিন্দু" বা পরমাত্মাকে আশ্রয় কর। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে "বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি হইবে। যোগবাশিষ্ঠও তাহাই বলিয়াছেন।—(অনুবাদ)

"সেই সে দেবাদিদেব সর্ব্বদেবময়।
পরমাত্মাকেই ধর করিয়া নিশ্চয়॥
দেহমধ্যে খুঁজিলেই পাওয়া যায় তাঁরে।
জ্বলিতেছে মধ্যমণি যেন কণ্ঠহারে॥
কঠোর তপস্যা-যোগে কাম ক্রোধ জয়।
"চিত্তশুদ্ধি" তরে মাত্র আর কিছু নয়॥"

উৎ ৬ষ্ঠ সর্গ।

চিত্তশুদ্ধি হইলেই সকল সংশয় দূর হয়। তদবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তীর্থ, সার্দ্ধত্রিকোটী দেবতা, ইচ্ছামাত্র দেহের ভিতরেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই সংযমের দশবিধ অবস্থা। চিত্ত হইতে পূর্ব্বসংস্কার নাশ করাই সংযমের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানস-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই, সহজেই পূর্ব্ব-সংস্কার দূর হইয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বহিরঙ্গ সংযম অনুষ্ঠানের পন্থা আপনা হইতে সরল হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন সংযম অনুষ্ঠানের চেষ্টা মূলধনহীন ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় বাহিরে চাকচিক্য বিধান মাত্র। তদ্দ্বারা অজ্ঞানতার পূতিগন্ধ দূর হয় না। এজন্য সাধক গাহিয়াছেন।—

"বাহিরে চাকচিক্য ভারি (যার) আত্মবুদ্ধি নাইকো ঘটে।
ছুঁচো যদি আতর মাখে তাতে কি তার গন্ধ টুটে ?॥"

প্রকৃত সংযমী ব্যক্তি এই দেহেই জীবন্মুক্ত হয়। দেহান্তে তাহাকে সংযমনীপুরী বা যমপুরীতে যাইতে হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মনে

রাখিতে হইবে যে, অজ্ঞানীর বা অসংযমীর নিকট যিনি মৃত্যু বা যম, তিনিই জ্ঞানীর বা সংযমীর নিকট ধর্ম্মরাজ স্বরূপে সতত আজ্ঞাবহ হইয়া থাকেন। অতএব আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত সংযমই মানবের মৃত্যুঞ্জয় মহৌষধি।

শৌচাচার প্রতিষ্ঠা হইলে কামনা বাসনাশীল দেহাত্মবোধিগণের সহিত সংসর্গ রহিতভাব আপনা হইতে উদয় হইয়া থাকে; তদবস্থায় আর কোনরূপ কুপ্রবৃত্তি-সংসর্গ মনে উদয়ই হয় না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন।

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥"

যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শৌচ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন নিজের শরীরের প্রতি এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হয়। পরের সহিতও সঙ্গ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥

যোগসূত্র।

শৌচ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্লভাব, একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয় জয় হইয়া আত্ম-দর্শনের যোগ্যতা অর্থাৎ **আত্মদর্শন যোগ** লাভ হয়। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে **পরসঙ্গ** পরিত্যাগের ইচ্ছা দূর হইলে, তখন আপনা হইতে ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত অবস্থা উদয় হইয়া "**আত্মদর্শন**" লাভ হয়।

আত্মদর্শন যোগ

তৃতীয়স্তর

অষ্টাদশ প্রকরণ।

তপস্যা-যোগে-আত্ম-দর্শন।

অষ্টাঙ্গযোগের দশবিধ নিয়ম মধ্যে তপস্যা, যোগের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। তপস্যাবলে সিদ্ধ না হয় এমন কোন কার্য্যই নাই। তপস্যা দেবারাধনা নহে, তপস্যা স্তুতি মিনতি নহে; তপস্যা অর্থে সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম তপস্যার প্রধান সহায়। চিত্তবৃত্তি সংযম হইলে পশ্চাৎ চিত্তবৃত্তিকে শুদ্ধভাবে অন্তর্মুখী রাখিয়া আত্মদর্শনের পথে পরিচালনই নিয়মের উদ্দেশ্য। নিয়মসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।—

"তপঃসন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো ব্রতং॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

(১) তপস্যা, (২) সন্তোষ, (৩) আস্তিক্য, (৪) দান, (৫) ঈশ্বরপূজন, (৬) সিদ্ধান্ত শ্রবণ, (৭) হ্রী, (৮) মতি, (৯) জপ, (১০) ব্রত, এই দশটিকে নিয়ম বলে।

"বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরং শোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

বিধিবিহিত নিয়মানুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শোষণ করাকে তপস্যা বলে। যিনি আত্ম-জ্ঞান-যোগে অন্তঃ-প্রাণায়ামে ভূতশুদ্ধিপূর্ব্বক এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের প্রবৃত্তি-পথগামী ইন্দ্রিয়-বিষয়ের ক্রিয়াশক্তিকে ত্রিবিধ তাপের দ্বারা "শোষয় শোষয়" "নিবেশয় নিবেশয়" "প্রজ্জ্বলয় প্রজ্জ্বলয়" ভাবে ব্রহ্মাগ্নি-সন্তাপে শোষণ বা দেহের স্মৃতি বিনাশরূপ স্থূলদেহস্মৃতি দগ্ধ করিয়া, সূক্ষ্মদেহ বা বীজরূপে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন তিনি প্রকৃত তপস্বী। তপ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

"কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ"

শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের অশুদ্ধ-ধর্ম্মক্ষয় হইয়া, যে ক্রিয়াবশে শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম তপঃ। এই আধ্যাত্মিক তপস্যার বাহ্য-ক্রিয়া-কৌশলের নাম কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ। কায়মনোবাক্যে এবম্প্রকার তপস্যানুষ্ঠানই শাস্ত্রবিধি। নচেৎ অজ্ঞানীরভাবে একমাত্র শরীর শোষণ উদ্দেশ্যে অনাহার বা ফল কামনা করিয়া দেহদণ্ডরূপ কতকগুলি বিধিবিগর্হিত উপবাস দ্বারা দেহক্ষয় করাকেই তপস্যা বলে না। দেহে ব্রহ্মতেজের সন্তাপ ভিন্ন তপস্যা সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় তাহাই বলিয়াছেন,—

"অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥"

গীতা ১৭ অঃ

দম্ভ এবং অহঙ্কার যুক্ত অভিলাষ, আসক্তি ও আগ্রহ বিশিষ্ট অবিবেকি-জনগণ "বৃথা উপবাসাদি দ্বারা" শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং আমাকে ক্লেশ

প্রদান করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে। তাহাদিগকে অতি ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও। সুতরাং গুণত্রয় ও শ্রদ্ধাত্রয়কে বিভাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ভূত সমষ্টির উপর হিংসাবর্জ্জিত হইয়া কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম করাই শাস্ত্রবিধি। ভগবান্‌ও সেই বিধিই জ্ঞাপন করিবার জন্য ত্রিবিধভাবে তপস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সহজ বোধগম্য জন্য পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

দেবদ্বিজ গুরুজ্ঞানী সবে পূজনীয় জানি,
তাঁদের অর্চ্চনা আর শৌচ সরলতা।
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, পরহিংসা বিসর্জ্জন,
শরীর তপস্যা এই জানিবে সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
বাক্য অনুদ্বেগ কর, সত্য প্রিয় হিতকর,
বেদাভ্যাস বাক্যময় তপস্যা এ সব। ১৫ ॥
প্রসন্নতা অক্রূরতা, ভাব শুদ্ধি নীরবতা,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই মানসিক তপ ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মফলে চিন্তা নাই, যোগযুক্ত সর্ব্বদাই,
এমন মানবগণ পরম শ্রদ্ধায়।
এ তিন তপস্যা করে, কায়-মনোবাক্য পরে,
সাত্ত্বিক তপস্যা সেই কহিনু তোমায় ॥ ১৭ ॥
সাধু সম ব্যবহারে, শ্রদ্ধায় সেবিবে মোরে,
সকলে কহিবে হেন সাধু আর নাই।
পূজিবে চরণ ধরি, এই আশা মনে করি,
দম্ভভরে যে তপস্যা রাজসিক তাই ॥ ১৮ ॥

স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে, কেবল মূঢ়তা বশে,
অন্যের অনিষ্ট যার ভাব মানসিক।
পরের নিধন স্মরি, কিম্বা আত্ম-পীড়াকারী,
অজ্ঞানীর তপস্যা সে তপঃ তামসিক ॥ ১৯ ॥

গীতা ১৭ অঃ

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুশীলন ভিন্ন, যে বাহ্য উপবাস, অনাহার বা অল্পাহার তাহা তপস্যা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু আমরা মন্ত্র বলিতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি এবং কর্ম্ম বলিতে 'কতকগুলি বাহ্য-আড়ম্বর বুঝিয়াই ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট করিতেছি। মনকে আজ্ঞাপদ্ম বা তপঃ লোকে স্থিত করিবার উদ্দেশ্যে যে মানস কর্ম্মের অনুশীলন তাহার নামই প্রকৃত তপস্যা। তাদৃশ তপস্যা যোগেই "আত্মদর্শন" লাভ হইয়া থাকে।

আত্ম দর্শন যোগ

তৃতীয়স্তর।

ঊনবিংশ প্রকরণ।

-:*:-

সন্তোষ-যোগে-আত্মদর্শন

যোগীর পক্ষে চিত্ত প্রসন্নতা পরম সাধন লব্ধ ধন; সতত চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে শোক দুঃখে কদাচ সাধককে অভিভূত করিতে পারে না। চিত্তপ্রসন্নতার অপর নাম সন্তোষ; শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"যদৃচ্ছা লভতে নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি।
যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখ লক্ষণম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

যদৃচ্ছালাভে মন অবিচলিত থাকিলে সেই স্থির বুদ্ধিকেই সন্তোষ বলে। সন্তোষ সুখের প্রধান লক্ষণ। এক্ষেত্রে যদৃচ্ছা অর্থ স্বেচ্ছা। আমরা স্বেচ্ছা বলিতে অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছা বা স্বেচ্ছাচারিতা বলিতে উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝায় না। স্বেচ্ছা শব্দের অর্থ স্ব ইচ্ছা। "স্ব"শব্দে যদি স্থূল দেহ বুঝি, তবেই তাহার সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধর্ম্ম যুক্তহইয়া যায়। কিন্তু "স্ব" অর্থে আত্মা ভিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বুঝায় না। সুতরাং আত্ম-বুদ্ধিযুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যাহা লাভ হয়,

প্রকৃতপক্ষে—তদ্দারাই তৃপ্তি বা নিত্য সুখানুভব হইয়া থাকে। তাদৃশ সুখের নামই সন্তোষ। আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি-যুক্তাবস্থায়, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাতে তৃপ্তি বা সন্তোষ হয় না। সুতরাং যে লাভে তৃপ্তি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার নামই সন্তোষ বা সুখ। শাস্ত্রে আছে "অনিচ্ছৈব পরম্ সুখম্" ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্" যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ কোথায়? সন্তোষ ভিন্ন শান্তিলাভ হয় না এবং শান্তি ভিন্নও সুখলাভ হয় না। সুতরাং সন্তোষই সুখের মূলতত্ত্ব। এই সুখের জন্যই জীব সর্ব্বদা লালায়িত। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিবিধ ভাবের সমস্ত কর্ম্মই সুখের জন্য। যাহার যে কর্ম্মে সুখবোধ না হয়, সে, সে কর্ম্ম কখনও করে না। এখন সেই, সুখ জিনিষ টা কি? সুখ অর্থই তৃপ্তি বা সন্তোষ। ত্রিবিধগুণ ও শ্রদ্ধা বিভাগ অনুসারে, এক একজন, এক একভাবে সুখ মনে করেন। তাহার হেতু এই যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মযুক্ত অনিত্য সুখকেই সুখ মনে করিয়া থাকে, তাহার নাম ভোগ সুখ। আর যাঁহারা নিত্য সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা ত্যাগের অনুসরণে এমন একটি পরমানন্দ পরম তৃপ্তিকর সুখ প্রাপ্ত হন যে, তাহা পাইলেই জগতের আর যাবতীয় সুখই, তাঁহারা দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে সুখ অনির্ব্বচনীয়। যোগিঋষিগণ, সেই সুখেই বৃক্ষমূলে বাস করিয়াও নিত্য সুখী ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত অজ্ঞানিগণ সে সুখ কল্পনাও করিতে পারে না। ভগবান্ গীতায় মোক্ষযোগে সেই কথাই বলিয়াছেন; সহজ বোধগম্য জন্য তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

"যে সুখে আনন্দ হয়, একান্তে দুঃখের লয়,

বচন অতীত সেই সুখ নিরমল।

আগে যা গরল সম, শেষে সে অমৃতোপম,
আত্মবুদ্ধি প্রসন্নতা যাহাতে উদয়।
সাধনে অনন্ত দুঃখ, সিদ্ধিতে অনন্ত সুখ,
শাস্ত্রে বলে সেই সুখ সাত্ত্বিক নিশ্চয়॥" ৩৭
"আগে লাগে সুধা সম, শেষে লাগে বিষ,
রাজসিক সুখ তাহা, হায়রে লভিতে যাহা,
লালায়িত নরনারী ভবে অহর্নিশ॥" ৩৮
"প্রথমেও যেইরূপ, পরিণামেও সেইরূপ,
সততই হৃদয়ের মোহকর যাহা।
নিদ্রা আর আলস্যেতে, মায়া মোহ প্রমাদেতে,
যে সুখ উদয় পার্থ! তামসিক তাহা॥" ৩৯ গীতা ১৮ অঃ

যাহা পরিণামে সুখকর তাহাই নিত্য ও শান্তিপ্রদ। যে সুখে জীব মায়ামোহে বদ্ধ হয় না, সে সুখ সততই মুক্তিদায়ক। আর যাহা প্রবৃত্তি সম্ভূত, ঐহিক তৃপ্তিকর এবং পরিণামে দুঃখ ও শোকপ্রদ, তাহাই অনিত্য সুখ। তাদৃশ সুখই মুক্তি পথের বিরোধী। সেই সুখের আসক্তিতেই মানব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে।

চিত্তপ্রসন্নতাই সন্তোষের মূলতত্ত্ব; ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বিষয়-বৈরাগ্য ও আত্ম-সাক্ষাৎকার ইচ্ছা বলবতী হইলেই প্রকৃতপক্ষে চিত্তপ্রসন্নতা বা চিত্তে সন্তোষ উদয় হয়। ঈদৃশ নিরবচ্ছিন্ন "সন্তোষ" ভাবই, **"আত্মদর্শন যোগ"** লক্ষ্যে, বিশুদ্ধ প্রেমের পথ প্রদর্শক। চিত্তপ্রসন্নতা বা সন্তোষ জনিত বিশুদ্ধ প্রেমবশে ক্ষণকালের জন্যও একবার আত্ম-উপলব্ধি হইলে, সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ ছাড়িয়া জগতের অন্য কোন অনিত্য পদার্থে চিত্ত আর অভিভূত হইতে চাহে না। সে, তখন সততই

আত্মা বা উপাস্য বস্তুতেই মজিয়া থাকিতে ভালবাসে। সেইভাবে সাধক গাহিয়াছেন—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন, আর কিছু ভাল লাগে না।
ভুবন-স্বপন-সম হয় জ্ঞান, থাকে না অন্য ভাবনা॥
দারা-সূতা-সূত, বন্ধু, পরিবার, সব ভুলে যাই একি চমৎকার,
কে আমি ? কে তুমি ?— থাকে নাক ভিন্ন জ্ঞান,
ডুবে যায় মম প্রাণ, অভেদ্-ভাবে হই অজ্ঞান,
তখন এঘটে কি ঘটে জানি না॥
তব রূপরাশি দেখিতে দেখিতে, উদাস অন্তর উন্মত্ত প্রেমেতে,
নিমিষে,—নিমিষে,— নব নব দেখি রূপ,
অমিয় রসের কুপ, আহা ! একি অপরূপ,
দেখে আঁখি কোনমতে ফেরে না॥
"সন্তোষে" আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে, দশেন্দ্রিয় থাকে শূন্যতে বন্ধনে,
রিপুচয়,—পরাজয়— (যেন) সকলি আনন্দময়-
অনুভব মাত্র রয়, আর সব পায় লয়,
যেন জীবনে জীবন থাকে না॥ যোগসঙ্গীত

এই ভাবই চিত্তপ্রসন্নতা বা সন্তোষের প্রকৃত অভিব্যক্তি। আত্মজ্ঞান-আশ্রয় ব্যতীত নিত্য-সুখ কদাচ লাভ হইতে পারে না। দেহাত্ম-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে, চিত্তে প্রকৃত শান্তি বা সুখোদয় হয় না। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান নিষ্ঠায় স্থিরবুদ্ধি হইলেই মনে যে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ উদয় হয়, তাদৃশ সন্তোষ যোগানুশীলনেই "আত্মদর্শনে" লাভ হইতে পারে।

তৃতীয়স্তর।

বিংশ প্রকরণ।

আস্তিক্য-যোগে আত্মদর্শন

আত্ম-বিশ্বাসই আস্তিক্য, যাহাদের আত্ম-বিশ্বাস নাই, সেই ব্যক্তিগণই যথার্থ নাস্তিক; কিছুতেই তাহাদের সংশয়াত্মভাব বিদূরিত হয় না। এ নিমিত্ত "আস্তিক্য"ই ধর্ম্ম কর্ম্মের মূলস্বরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যস্তদাস্তিক্যমুচ্যতে ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে যে বিশ্বাস তাহার নাম আস্তিক্য। আস্তিক+ষ্ণ্য—আস্তিক্য, আস্তিক্য অর্থে বিশ্বাস, নাস্তিক্য অর্থে অবিশ্বাস। বিশ্বাস সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার জগতে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই, সুতরাং তাহার নিজের অস্তিত্বও নাই বলিতে হইবে। নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিলে জগতের যাবতীয় পদার্থই সে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারে। সুতরাং প্রথমতঃ আত্ম-বিশ্বাস হইলে স্বধর্ম্মের উপর

বিশ্বাস হয়, স্বধর্ম্মের উপর বিশ্বাস হইলে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য প্রবৃত্তি হয়, তত্ত্বজ্ঞানে প্রবৃত্তি হইলেই আত্মজ্ঞানী গুরুর প্রয়োজন হয়। গুরু বিশ্বাস হইলে গুরুর বাক্যের উপর বিশ্বাস হয়। গুরুর বাক্যের উপর বিশ্বাস হইলে গুরুমুখী-ভাবে আত্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা আত্মজ্ঞান সঞ্চার হয়। আত্মজ্ঞানের সঞ্চার হইলে তখন গুরুদত্ত দীক্ষানুসারে ও নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাসযোগে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অবস্থা অর্থাৎ অক্ষর-ব্রহ্মরূপ-ধ্যানযোগে (রাজযোগে) ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান অবস্থা লাভ হইতে থাকে। তাদৃশ বিজ্ঞান অবস্থা লাভ হইলে তখন আত্ম বা ভগবৎ বিভূতির উপর বিশ্বাস স্থাপন বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ মনের ইচ্ছা শক্তি ঘনীভূত হয়। সেই ঘনীভূত ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে, তখন মনের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির একাগ্রতা সম্পাদন হওয়ায়, আত্মা বা ইষ্টদেবের "বিশ্বরূপ" প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দ্বারা সমষ্টিগতভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ অন্তর্জ্যোতিঃতে জ্ঞান চক্ষুর উন্মিলন হইতে থাকে। পরন্তু তখন প্রত্যক্ষ দর্শনযুক্ত বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া তাহা ভক্তিরূপে পরিণত হয়। এ নিমিত্ত অর্জ্জুনেরও প্রত্যক্ষভাবে "বিশ্বরূপ" দর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বতন বিশ্বাস, ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

গীতা ১১ অঃ

অতঃপর সেই প্রত্যক্ষ দর্শন লব্ধা ভক্তি ত্রিস্রোতার ন্যায়, সম্বিৎ, হ্লাদিনী, ও সন্ধিনী এই ভাবত্রয়ে অর্থাৎ সম্বিৎ-জ্ঞানশক্তি, হ্লাদিনী-ভক্তিশক্তি,

ও সন্ধিনী-কর্ম্মশক্তি (কর্ম্মশক্তির ক্রিয়াবস্থার নাম প্রাণায়াম) স্বরূপে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, নামে অভিহিত। ইহারা প্রথমে গুরুদত্ত শক্তিবলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ অর্থাৎ দেহী ও দেহের পৃথকৃত্ব ভাবরূপ আত্মজ্ঞানের বিশুদ্ধাবস্থা বিধান করিতে সমর্থ হয়। তদবস্থায় মানবের স্থূলদেহ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হইতে থাকে। এতৎ সম্বন্ধে আমার বাক্য সপ্রমাণ জন্য যোগবাশিষ্ঠে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

"যখনেতে সূক্ষ্মদেহে হয় ভাবোদয়
সব সূক্ষ্ম হয়, স্থূলজড়ত্ব পায় লয়।
ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন ভাঙ্গে স্বপ্নবস্তুমত
সূক্ষ্মজ্ঞানে লয় পায় জড়বস্তু যত ॥"

উৎ প্র ৫৭ সঃ

অতঃপর উক্ত শক্তিত্রয়, আরও সূক্ষ্মভাবে গুণত্রয় বিভাগ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম যোগের অভ্যাসে, আত্মাকে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানোৎপাদনে, আত্মা পরমাত্মায় অভেদত্ব বা একত্ব জ্ঞানোপলব্ধি করাইয়া, মানবের অবিদ্যা-জনিত সংসার-মায়ামোহ-বন্ধনছিন্ন করিয়া দেয়। ভগবান্‌ও পুরুষোত্তম-যোগে তাহাই বলিয়াছেন। তাহার অনুবাদ—

"সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্য-জ্ঞানে।
আমায় "পুরুষোত্তম" বলিয়া যে জানে।
সকলি সে জানে পার্থ! সার্থক জীবন।
আমায় সর্ব্বতোভাবে করে সে ভজন ॥"

গীতা ১১ অঃ

তদবস্থায় ভিতরে মহান্ জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মতেজ বিকাশ হইতে থাকে ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মবিচরণের অভিব্যক্তি। বিশ্বাস বা আস্তিক্যই ইহার প্রথম সোপান।

বিশ্বাসের অনুসরণে এতাদৃশ আত্ম-জ্ঞান-যোগযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যশীল অবস্থা প্রথমে সূক্ষ্মদেহে সাধিত হইয়া থাকে। তদবস্থায় সূক্ষ্মদেহ, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতেজ সন্তাপে যখন প্রদীপ্ত ও শক্তিযুক্ত হয়, সেই অবস্থার নামই তপস্যা। সূক্ষ্মদেহের সেই তপস্যাবলে জ্ঞান ও ভক্তি যখন একত্র যুক্ত হইয়া মহাজ্ঞান বা বিশুদ্ধা প্রেমরূপে পরিণত হয়। তখন অন্তরস্থ ব্রহ্মজ্যোতিঃ বাহিরে তত্ত্ব-জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মতেজ-সন্তাপে সূক্ষ্মদেহ নিবদ্ধ, ইন্দ্রিয়বিষয়ের সূক্ষ্মজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি, পরা প্রকৃতির আকর্ষণে অন্তর্মুখী বা সংযমযুক্ত হওয়ায়, অপরা-প্রকৃতিখণ্ডে অর্থাৎ স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষযুক্ত বহির্ম্মুখগামী ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলির গতি বা ক্রিয়াশক্তিগুলিও তখন আপনা হইতে সংযত হইতে থাকে। এজন্যই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রথমে স্থূল-দেহের ইন্দ্রিয়বৃত্তির বহিরঙ্গের সংযমের কঠোরতা, তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের বিধায়ক নহে। কারণ সূক্ষ্মদেহ ব্রহ্মতেজে সন্তাপিত হইলেই স্থূলদেহের ক্রিয়াশক্তি আপনা হইতেই সংযতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের গতিশক্তি বন্ধ করিলে, পশ্চাতের গাড়ীগুলির গতিশক্তি যেরূপ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়; তদ্রূপ আত্ম-জ্ঞান-যোগে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহকে বিভাগ করিয়া গুরূপদিষ্টভাবে সূক্ষ্মদেহকে আত্মযুক্ত রাখিবার ক্রিয়া-কৌশল ঠিক্ রাখিতে পারিলেই স্থূলদেহের বাহ্য-সংযমানুষ্ঠান বা শম-দমাদিগুণ আপনা হইতেই সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সহায়কভাবে স্থূলদেহের আংশিক সাহায্য গ্রহণই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তদর্থে সন্ধ্যা পূজারূপ নিত্যকর্ম্ম বা যোগানুষ্ঠান সমস্তই সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম। তবে অধিকারীভেদে যথাযোগ্য ব্যবস্থা ও বিধান সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্থূক্ষ্মদেহ, আত্ম বা ব্রহ্মতেজ যোগযুক্ত হইলে, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক-বুদ্ধির দৃঢ়তাবলে চিত্ত স্বাভাবিক সংযত শুদ্ধ এবং স্বধর্ম্মানুগামী হইয়া থাকে। তখন মুক্তি বা মোক্ষপথে যাইবার জন্যই ইচ্ছা বলবতী হয়। মনের সেই ইচ্ছাশক্তিকে স্থায়ী রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং প্রবৃত্তিমার্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তি পুনর্ব্বার অপরা প্রকৃতির মায়া-মোহ আকর্ষণে আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়া যাহাতে যোগভ্রষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য, পূর্ব্ববর্ণিত গুণত্রয় বিভাগ করিয়া, সত্ত্বগুণাশ্রয়ে দৈবাসুর-সম্পদ্ বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগানুষ্ঠানরূপ যম-নিয়মাধীনে ইন্দ্রিয়বর্গকে নিবৃত্তিমার্গে, অর্থাৎ নিয়ত বিষয় অনাসক্তরূপ সন্ন্যাস-যোগ-অবস্থায় দৈবমুখী রাখিয়া, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানাদিরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, ইচ্ছামত সমাধি বা "সোঽহং"স্বরূপ মুক্তি অবস্থা লাভের অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থকে, তজ্জন্যই স্থূক্ষ্মদেহের সহায়কভাবে স্থূলদেহের বহিরঙ্গ সংযম নিয়মাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আত্ম-বিশ্বাসযুক্ত আত্ম-জ্ঞান লাভের চেষ্টাই ইহার মূলতত্ত্ব। আমার এই উক্তি সমর্থন জন্য যোগবাশিষ্ঠ হইতে রাণী চূড়ালার আত্ম-জ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় কিয়দংশ, সাধারণের বোধগম্যজন্য সরল বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল

"কে আমি? সংসার কার? কিবা এই দেহ?
কিবা জড়? রয়েছে কি জড়াতীত কেহ?
এত ভাবি হয় রাণী সাধনে অটল।
অনাবৃত ব্রহ্মজ্ঞান লভিতে কেবল॥"
"গুরুমুখী অভ্যাসেতে করিয়া সাধন।
চূড়ালা জানিল ব্রহ্মস্বরূপ কেমন॥

জানিলা বিশেষ এই "চিৎ" মাত্র সার।
জন্ম-মৃত্যু-দাহহীন স্বরূপ আত্মার॥
"সমাধিতে দেখে রাণী সবই এক প্রাণ।
বিশুদ্ধ চেতন অজ অচ্যুত নির্ব্বাণ॥

দেখে রাণী সুরাসুর নিখিল সংসার।
সকলি প্রকাশ মাত্র চিন্ময় আত্মার॥
"অন্তরের মোহ নাশি রাণী করে ধ্যান।
লভিলা সুন্দররূপে "আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান"॥

ধীরে ধীরে অভ্যাসেতে রাগ ভয় গিয়া।
প্রশান্ত একান্তে স্থির চূড়ালার হিয়া॥"
"কিছু দিন পরে দেবী শান্ত করি প্রাণ।
ধরিয়া অন্তর দৃষ্টি করে অবস্থান॥

পূর্ব্বের সংস্কার হ'তে মুক্তিলাভ করি।
লভিলা বিশ্রাম সেই পরিশ্রান্তা নারী॥"

"অন্তরের আত্মদৃষ্টি ধরিয়া এখন।
করিতে লাগিলা সব বাহ্য আচরণ॥
সদ্‌গুরুর উপদেশে দৃঢ় করি মন।
নির্জ্জনে করেন রাণী অপূর্ব্ব সাধন॥"
"অভ্যাস করিয়া যোগ বিজ্ঞান রতনে।
পূর্ণানন্দ স্বরূপের আবির্ভাব মনে॥

রাণীর যৌবন তায় ফিরিল আবার।
রূপের ছটায় হ'ল মোহিত সংসার ॥
বহুদিন এইরূপে গুরুসেবা করি।
লভিলেন "যোগবিদ্যা" চূড়ালা সুন্দরী ॥"

নির্ব্বাণ ৭৯।৮০

অতএব প্রথম বিশ্বাস ও সদ্‌গুরুসঙ্গ দ্বারা আত্ম-জ্ঞান লাভের চেষ্টায় সূক্ষ্মদেহকে ব্রহ্মতেজযুক্ত করিতে পারিলেই মন স্বভাবতঃ "আত্ম-দর্শন-যোগ" পথে গতিশীল হয়। তদবস্থায় বহিরঙ্গ সংযম তাহার সহায়ক ভাবযুক্ত হয় মাত্র। যেমন দার্জ্জিলিং পাহাড়ে রেলগাড়ী উচ্চে উঠিবার সময় ট্রেণের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানি ইঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হয়; তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে সহসা গাড়ীর সম্মুখস্থ ইঞ্জিনের শক্তি এমনভাবে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে, তদ্বারা ট্রেণের সম্মুখস্থ গতি বন্ধ হইয়া যায়, তখন পশ্চাতের ইঞ্জিন, গাড়ীগুলিকে ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলিয়া রাখিয়া সম্মুখস্থ ইঞ্জিনের শক্তি বর্দ্ধনের সাহায্য করিয়া, নিম্নগামী হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবে। বহিরঙ্গ যম-নিয়মাদি অনুষ্ঠানগুলিও, যোগানুশীলনরূপ লৌহবর্ত্মে ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলির পশ্চাৎস্থ ইঞ্জিনস্বরূপ এবং সূক্ষ্মদেহ তাহার সম্মুখস্থ ইঞ্জিন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ আরোহিগণসহ ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ গাড়ীগুলি, প্রকৃতির পরা-অংশরূপ গৌরীশঙ্কর পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গে সূক্ষ্মদেহরূপ ইঞ্জিনের সাহায্যে, ব্রহ্মচর্য্য-শক্তিবলে উঠিবার জন্য, বিজ্ঞানরূপ "ড্রাইভার" বা চালক, সাধনরূপ ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে সম্মুখস্থগতির চেষ্টা করার অবস্থায়, নিম্নস্থ অপরা-প্রকৃতির মায়া-মোহরূপ মাধ্যাকর্ষণে, কোন সময় যাহাতে সম্মুখবর্ত্তী সূক্ষ্মদেহরূপ ইঞ্জিনের ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিকে বিলোপ বা বিপ্রাকর্ষণভাবযুক্ত করিয়া, আরোহিগণসহ

গাড়ীগুলিকে নিম্নগামী করিতে না পারে, তন্নিরাকরণার্থ ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ গাড়ীগুলির পশ্চাতে অর্থাৎ স্থূলদেহে যম, নিয়ম আসন ইত্যাদি বহিরঙ্গ সংযমরূপ ইঞ্জিন, সহায়ক স্বরূপে সতত যোজনা রাখাই প্রাচীন যোগিঋষিরূপ ইঞ্জিনিয়ারগণের যন্ত্র বিজ্ঞানরূপ শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে অবিচলিত বিশ্বাস বা আস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারা গুরুকৃপায় আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া, চিত্তকে ব্রহ্মতেজ-সন্তপ্ত এবং প্রত্যক্ষ ভাবে আত্ম-দর্শন যোগে বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তিযুক্ত কর্ম্ম আশ্রয় করিতে না পারিলে, সার্কাসের সিংহ বানরাদি পশু যেমন মানুষের ন্যায় সংযম ও কর্ম্মশিক্ষায় মনুষ্যানুরূপ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞানযুক্ত সংযম বা কর্ম্মশিক্ষায়, অজ্ঞানী মানবেরও জ্ঞান ভক্তির উৎকর্ষ বিধান হইতে পারে না। বরং কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি নষ্ট এবং আরও অবিশ্বাস অন্ধকারে নিপতিত হয়। এইভাবে আমরা অপ্রণিধান অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ যথোচিতভাবে মানবসমাজকে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত সংযমানুশীলনে তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্তি বিধানের সুপন্থা প্রদর্শন না করাইয়া, বহু কু-সংস্কার আচ্ছন্ন অসংস্কৃত মনে অজ্ঞানযুক্ত যম-নিয়মাদি ক্রিয়ারূপ বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করায়, তাহারা চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াও, কর্ম্মশক্তি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে না। পরন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায়, কর্ম্মের উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে। এ নিমিত্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মানবসমাজের এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ ঘটিয়াছে। এবম্বিধ কারণে গুরু পুরোহিত ও ইষ্টদেবতার উপর আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বিশ্বাস নাই, ইহা অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বিশ্বাস হীনতার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মনে কর, দশহরায় গঙ্গাস্নান করিলে দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। গ্রহণ কালে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হয়। এই সকল ধর্ম্মাচরণ

জনিত বিশ্বাস, পূর্ব্ব সংস্কার নাশের একটি প্রধান সহায়ক। কিন্তু অজ্ঞানতাশ্রয়ে কর্ম্মকরা হেতু মনের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায় অনেকেই পুনঃ পুনঃ ঐ সকল স্নানযোগ উপলক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সংকল্প গ্রহণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রবাক্য বা গঙ্গার উপর বিশ্বাস থাকিলে একবার দশহরা স্নানেই ত' দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হইয়াছে, একবার গ্রহণে স্নানেই ত' ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়াছে। পুনর্ব্বার ঐ কামনায় স্নান করিয়া কি শাস্ত্রবাক্য বা গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রতি অবিশ্বাস করা হয় না? তদ্দ্বারা কি চিত্তের দৃঢ়তা বা একাগ্রতা নষ্ট করা হইতেছে না? পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্রে "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" শাস্ত্রবাক্যানুসারে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া পুনর্জন্মভয় বিদূরিত হওয়ার বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, পুনর্ব্বার জগন্নাথক্ষেত্রে বা সাধারণ রথ তলায় পুনর্জন্ম-ভয় দূর করিবারজন্য যাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। একবার গয়ায় পিণ্ডদানেরপর পুনর্ব্বার গয়ায় বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। এইরূপ মুক্তিলাভেচ্ছায় মহামুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে বাস করিয়া, ফল কামনায় কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যে মহাত্মা সুকৃতিবশতঃ মহামুক্তিক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রবাক্যানুসারে স্বয়ং বিশ্বনাথ মুমূর্ষু অবস্থায় যাঁহার দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া মুক্তির বিধান করিয়াছেন এবং তিনি অঙ্গীকার করিয়া জীবের মুক্তির জন্য পঞ্চক্রোশবেষ্টিত এই কাশীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে মুক্তিক্ষেত্রে মানব দেহত্যাগ করা মাত্র বিশ্বনাথজ্ঞানে শবকে, "নমঃ শিবায়" মন্ত্রে গঙ্গাজল বিল্বপত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহার সেই শবরূপী শিবময় দেহ মহাশ্মশানে লইয়া, পঞ্চক্রোশীর বহির্ভূত স্নানের শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, সাধারণ মৃতদেহ স্বরূপে, "প্রেতস্য" উল্লেখে সৎকার, দশপিণ্ডাদি দান ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি এবং সেই ভাবে প্রেতলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোক গমন কামনায় বৈতরণী, তিলকাঞ্চন, বৃষোৎসর্গ

ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া, সাধারণ প্রেতের ভাবে একবৎসর মাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, বৎসরান্তে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করিয়া পিতৃলোকে তাহার পিণ্ড প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার প্রেতত্ব পরিহার করা. পরন্তু তাহাদের মুক্তি উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান ইত্যাদি কি ঘোর শাস্ত্র অবিশ্বাসের বা সংশয়াত্মার কর্ম্ম নহে? যে স্থানে—

> বারাণস্যাং মৃতোযস্তু স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ।
> ন তেষাং পুনরাবৃত্তিং কল্পকোটিশতৈরপি ॥
> বারাণস্যাং মৃতোযস্তু ভৈরবেণ স্বয়ং বিভুঃ।
> শ্রাবয়ন্ তারকং মন্ত্রং দদাতি মোক্ষ মুত্তমং ॥
> যদ্যস্য গুরুণা দত্তং তত্তারকমিতি স্মৃতম্।

বারাণসীধামে যাহার দেহত্যাগ হইবে, তাঁহার মুক্তি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শাস্ত্রে ইত্যাকার নিঃসংশয়ৈকবাক্য উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অনাস্তিক্য বা অবিশ্বাস বশতঃ সংশয় চিত্তে, প্রেতাধিপতি যমের অনধিকার ক্ষেত্রে (পঞ্চকোষি-মধ্যবর্ত্তী) পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থানে, বরুণা—অসি মধ্যবর্ত্তী ৺বিশ্বনাথে দেহ লয় পাইয়াও, পঞ্চক্রোশীর বহির্ভূত, পার্থিব শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, অপার্থিব বা অবিমুক্তক্ষেত্রে, গঙ্গাজলে, তাহার পারলৌকিক প্রেতত্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় কি, মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির বলে তাহার মুক্তির পথ রোধ করিয়া পুনরাবৃত্তি সম্ভাবিত পিতৃলোকমার্গে তাহাকে গতিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় না? এই সকল অবিশ্বাস বা সংশয়যুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে কি সাধারণ লোকের মনে মুক্তিভাবের দ্বিধা বা সংশয় উৎপন্ন করা হইতেছে না? কাশীবাসিগণের মনে "কলিকাল" এই সংশয় ভীতি; কাশীধামে বাস করিয়া অন্যতীর্থে পরিভ্রমণ ইত্যাদি কি আস্তিক্য

বুদ্ধি বা শাস্ত্রবিশ্বাসের পরিচয়? (১) এক্ষেত্রে কি "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" হয় না? এতৎ সম্বন্ধে আমরা "মুক্তি বিজ্ঞান" পুস্তকে প্রমাণাদিযোগে বিস্তারিত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। কেবল আস্তিক্যহীন কর্ম্মের উদাহরণ প্রসঙ্গে দুই একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলাম মাত্র। সাধারণতঃ সমাজে প্রবাদ আছে যে, "বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" আমরা বিশ্বাস ছাড়িয়া তর্কের পথে লোকের ইষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় ঘটাইতেছি। বিশ্বাসবশে কৃষ্ণকে কিরূপ সহজে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত করা গেল।

---

(১) সংযম প্রকরণে এসম্বন্ধে যাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা গিয়াছে। আস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য এস্থলে তাহা দৃষ্টান্তচ্ছলে প্রদর্শিত হইল মাত্র। সত্য হইতে দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত প্রেতশ্রাদ্ধ ছিল না।

কলৌ প্রেতত্বমাপ্নোতিতার্ক্ষ্যাশুদ্ধ ক্রিয়াপরঃ।
কৃতাদৌ দ্বাপরান্তে চ ন প্রেতোনৈবপীড়নম্॥

গারুড় ২০ অঃ

সত্যযুগের আদি হইতে দ্বাপর যুগের অন্ত পর্যান্ত কেহই প্রেত হইত না, এবং প্রেত জনিত পীড়াদিও তখন ছিল না; কলির মনুষ্যেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ৺বিশ্বনাথবাক্যে ৺কাশীধামে যখন কলির অধিকার নাই। তখন কর্ম্মদ্বারা কাশীতে কলিভাব আকর্ষণ করা, অজ্ঞতা বা বিশ্বাসহীনতা সন্দেহ নাই। পরন্তু সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে প্রেতশ্রাদ্ধ পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যখন গণ্য হয় নাই, তখন কলির অনধিকার স্থল কালমাহাত্ম্য যুগমাহাত্ম্যহীন বারাণসীক্ষেত্রে, ৺কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিশ্চয় মুক্তি বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের পুত্র কন্যা বা পরিবারগণকে প্রেতশ্রাদ্ধরূপ অভূতপূর্ব্ব কর্ত্তব্য দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানে, ৺বিশ্বনাথবাক্যে আস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ় করিবার চেষ্টা কি সঙ্গত নয়? সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে কি পুত্রের কর্ত্তব্য ছিল না? কাশীখণ্ডেও প্রেতশ্রাদ্ধ বা দশপিণ্ডের কোন বিধি, দৃষ্ট হয় না।

বহুকাল পূর্ব্বে হিমালয়ের কোন উপত্যকায় দুইজন সাধু নারায়ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বহুদিন যাবৎ কঠোর সংযম সহকারে সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। উহাঁদের মধ্যে একজন বটবৃক্ষমূলে ও অপরজন তেঁতুলবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া সাধনা করিতেন। দৈবাৎ একদিন দেবর্ষি নারদকে ঐ স্থানদিয়া গমন করিতে দেখিয়া, উভয়ে দেবর্ষিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক, তাঁহার তদানীন্তন গম্যস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, দেবর্ষি বলিলেন আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণ দর্শনে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া উভয়েই হৃষ্টচিত্তে করজোড়ে বলিলেন দেবর্ষে! আপনি দয়া করিয়া সেই ভক্তবৎসল নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আর কতকাল পরে আমরা তাঁহার কৃপালাভ ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব। এ বিষয় তাঁহার উত্তর আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইয়া গেলে আমরা কৃতার্থ হইব। দেবর্ষি 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া জনার্দ্দনকে সাধু দ্বয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়, নারায়ণ বলিলেন যে, আমার সাক্ষাৎ লাভে উহাঁদের এখনও বহু:বিলম্ব আছে। উভয় সাধককে বলিও তোমাদের মধ্যে যে সাধক, যে বৃক্ষমূলে বসিয়া সাধনা করিতেছ, সেই সাধক সেই বৃক্ষের পত্র সমসংখ্যক বৎসর সাধনানিরত থাকিলে, তাহার পর আমার দর্শন পাইবে। নারদ শুনিয়া ত' অবাক্ হইলেন; কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন সময় প্রতিশ্রুতিমত দুই সাধককেই নারায়ণের উত্তরের কথা বলিলেন। বটতলার সাধু ইহা শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন যে, তাহা হইলে আর সেই ভগবান্‌কে দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। এতকাল যাঁহার সাধনা করিয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছি, এখনও এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের পত্র-পরিমিত-বর্ষ পরে ভিন্ন তাঁহার দর্শন পাইব না, এই লক্ষ লক্ষ বৎসর কাল কি করিয়া সাধনা করিব? সুতরাং আর তাঁহাকে পাইবার আশা নাই, অতএব তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। এই ভাবে হতাশ

ও অবিশ্বাস তাহার চিত্তকে অধিকার করিল। নারদ এতাদৃশ অবিশ্বাস ও হতাশ ভাব দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক, তেঁতুল মূলোপবিষ্ট সাধকের কাছে গিয়া বলিলেন যে, এই তেঁতুলগাছে যত পত্র আছে তত বর্ষ পরে তুমি ভগবানের দর্শন পাইবে। সাধক এই কথা শুনিয়াই আনন্দে গদ্গদ হইয়া নারদকে বলিলেন যে, ঠাকুর! ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার মুখে এই নিশ্চয়বার্ত্তা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি যে, একদিন অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইব। নারদ বলিলেন যে, তেঁতুলগাছের ঘন পত্রাবলি দেখিতেছ ত? সাধক হাঁসিয়া বলিলেন, হাঁ ঠাকুর! তাহা দেখিতেছি বটে, কিন্তু অতঃপর আর উহা দেখিবার আমার কোনও আবশ্যক নাই। আমি বাহির ছাড়িয়া, ভিতরে একমাত্র সেই নারায়ণের রূপই দেখিব। বাহিরের তেঁতুলপত্র দেখার আমার আর প্রয়োজন নাই। সেই ভক্তবৎসল নারায়ণই তাহার সংখ্যা গণনা করিবেন। এই বলিয়া সাধক আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নারায়ণের ভাবেতে তাহার মন প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার ভাগ্যে নিশ্চয়ই নারায়ণের দর্শন মিলিবে, এই দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস-বুদ্ধি তাহার মনের শক্তিকে একাগ্র করিয়া তুলিল। অদম্য বিশ্বাস বলে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্মুখে প্রত্যাহৃত হইল। সাধক ধ্যানস্থ হইয়া অজপায় নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ আসিয়া সাধককে বলিলেন, হে ভক্তপ্রধান! আমি তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি। নারদ ভগবানের এই চক্র দেখিয়া বলিলেন যে, হে চক্রিন্! আজ তুমি আমাকে পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদী করিলে এবং নিজেও মিথ্যাবাদী হইলে। তুমি মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, তেঁতুলগাছের যত পত্র তত বৎসর পরে, এই সাধক তোমার দর্শন পাইবে, আর কিনা একটি পত্রের পরিমিত কাল অতীত না হইতেই নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলে। ভগবান্ ঈষৎ হাসিয়া

বলিলেন, দেখ নারদ! তোমায় যখন বলিয়াছিলাম তখন সেই ভাবই ছিল বটে, কিন্তু এই সাধক তোমার মুখে তেঁতুলপাতার সংখ্যা শুনিয়াও উহার প্রাণে "হতাশ" আসে নাই বা বিশ্বাসবুদ্ধি বিচলিত হয় নাই। পরন্তু উহার প্রাণে যাহাতে হতাশ বা অবিশ্বাস আসিতে না পারে তজ্জন্য বাহিরের বিষয় ছাড়িয়া দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবলে অন্তরস্থ জ্ঞানকে আত্মযুক্ত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে এবং আনন্দে গদগদ হইয়া ভিতরে আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সুতরাং আমিও উহার অন্তর ছাড়িয়া, অন্তরালে থাকিতে পারিলাম না। নারদ! তুমি ত জান যে, আমি আত্মারূপে সকলের অন্তরে সতত বাস করিয়া থাকি। যাহারা সেই বিশ্বাসে আমাকে দূরের বস্তু মনে না করিয়া অন্তরেই আমার ধ্যান করে, আমি তাহাদের নিকট কদাচ অপ্রকাশ থাকিতে পারি না। ঐ বটতলার সাধকের সে বিশ্বাস নাই, তদ্ধেতু বটপত্রের সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াই সে হতাশ হইয়াছে, বটপত্রের সংখ্যাপেক্ষা তেঁতুলপত্রের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক হইলেও এই সাধক হতাশ না হইয়া বিশ্বাসবলে অন্তরে আমাকে ধরিয়াছে। উহার মনের দৃঢ় বিশ্বাসই উহার অন্তরের সর্ব্বপ্রকার দূরত্বকে পরিহার করাইয়া আমার সহিত উহার অন্তরাত্মার নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করায় আমি এত তাড়াতাড়ি আসিতে বাধ্য হইয়াছি। নারদ ইহা শুনিয়া ভক্তি গদগদচিত্তে সাধককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানব! একবার বিশ্বাস বা আস্তিক্যের গুণ প্রণিধান করিয়া সূক্ষ্মভাবে ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখ যে, স্থূলভাবে তেঁতুলপাতার সংখ্যার উপর উহার লক্ষ্য না থাকায় সূক্ষ্মভাবের আকর্ষণে ভগবদ্-দর্শন উহার পক্ষে কত সহজ হইয়াছে। যেহেতু এই সাধক স্থূলদৃষ্টি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করায় উহার অন্তরের সূক্ষ্মভাব ঐ প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষটিকেও একটি সূক্ষ্ম বীজাকারে পরিণত করিয়াছে, সুতরাং স্থূল তেঁতুলপত্রের অস্তিত্বও

তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কারণ আত্মজ্ঞানযোগে যে নিজকে সূক্ষ্মভাবে ধারণা করিতে পারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই তখন তাহার জ্ঞাননেত্রে সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া থাকে। তদবস্থায় তেঁতুলতলার সাধক দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি বলে স্থূলসম্বন্ধ রহিত করিয়াছে। তাহার চিত্তও তখন সূক্ষ্ম-আত্মায় পরিণতি প্রাপ্তে, তেঁতুল বৃক্ষেরও স্থূলত্ব নষ্ট করিয়াছে। সূক্ষ্মভাবে, সূক্ষ্মমার্গে, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাত্মা সদৃশ নারায়ণের সহিত সাধকের সূক্ষ্মসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্রেই, তৎক্ষণাৎ ভিতরে বৈকুণ্ঠেশ্বরকে প্রত্যক্ষানুভূত করায় দিব্যচক্ষে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিয়াছে।

অবিশ্বাস বা সংশয়ভাব থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত একহাত দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়াছেন ও একহাত দিয়া লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাকে দেখা দেন নাই। পূর্ণভাবে যখন তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, উভয় হস্ত একত্র করিয়া অন্তরে লজ্জানিবারন কৃষ্ণকে সূক্ষ্মভাবে ধ্যান করিয়াছেন, তখন আর কৃষ্ণ অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। দ্রৌপদী যতক্ষণ কৃষ্ণ কাছে নাই, দূরে আছেন; এই মনে করিয়া "কৃষ্ণ তুমি কোথায়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাহু তুলে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, সে ডাক্ দ্বারকা পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। কারণ দ্বারকায় তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বিশ্বাস করা হইয়াছিল। অতঃপর যখন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

গীতা ১৩ অঃ

তিনি, সর্ব্বত্র হস্ত পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁহাকে স্থূল হইতে স্থূলতর, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর, মানবের

লৌকিক চক্ষের অদৃশ্য জ্ঞানে, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, সূক্ষ্মভাবে স্বদেহ ভিতরে সূক্ষ্ম পরমাত্মারূপে তাঁহার ধ্যান করিয়াছেন, তখনই তিনি স্বপ্রকাশ হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর দৃঢ়বিশ্বাসে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ভগবান্ও তাহাই বলিয়াছেন।—

"আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্যযুক্ত যাঁরা।
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগিশ্রেষ্ঠ তাঁরা॥"২

গীতা ১২ অঃ

দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন চিত্ত নিবিষ্ট হইতে পারে না। চিত্ত নিবিষ্ট না হইলে তাঁহাতে যুক্ত হওয়া যায় না। তাঁহাতে যুক্ত না হইতে পারিলে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইলে ধ্যানাবস্থা লাভ হয় না। আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত যে ভালবাসা তাহার নাম শ্রদ্ধা। সুতরাং যাহার বিশ্বাস দৃঢ় নয় তাহার আবার শ্রদ্ধা-ভক্তি কিরূপে হইতে পারে? যাহার মাথা নাই তাহার যেমন মাথাব্যথা অসম্ভব, উপাস্য বা ইষ্টদেবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসহীন সংশয়চেতা মানবের ভক্তি শ্রদ্ধাও সেই প্রকার অসম্ভব। শূন্যে ইষ্টকালয় বা দালান প্রস্তুতের চেষ্টা যেমন কখন সম্ভব হইতে পারে না, দৃঢ় বিশ্বাসহীন সংসারী মানবের শূন্য হৃদয়ে স্বর্গ নরকের লোভ ও ভয় দেখাইয়া কামনা বাসনাযুক্ত বাহ্যকর্ম্মের অভিনয়ে, ভক্তি শ্রদ্ধারূপ ইষ্টকালয় প্রস্তুতের চেষ্টাও সেইরূপ কখনও সফল হইতে পারে না। যেহেতু যাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, তাহার পাপ পুণ্য বা স্বর্গ নরকের উপরও দৃঢ় বিশ্বাস, কখন আসন লাভ করিতে পারে না। তদ্ধেতু গঙ্গাজলে নামিয়াও তাহারা পরনিন্দা ও মিথ্যাকথায় ভয় করে না। দশহরা গঙ্গাস্নান করিয়াও তাহাদের দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হইল, সে বিশ্বাসও তাহাদের মনে স্থান পায় না। যাহারা শাস্ত্রবাক্য ও ইষ্টদেবতার উপর দৃঢ় নিশ্চয়তা স্থাপন

করিতে পারে না, তাহারা বিশ্বনাথ বা অন্য দেবতা বা ব্রাহ্মণে কি করিয়া মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে? তাহাদের বাহিরের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আচার, নিষ্ঠা শুধু কেবল কামনা-বাসনালব্ধ বস্তুর সহিত জড়িত। তাহারা কখনও ভগবান্‌কে লাভ করিতে বা তাহার প্রিয় হইতে পারে না এবং তাহাদের চিত্তও কখন স্থির থাকিতে বা সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগ, উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
গীতা ১২ অঃ

যে যোগী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাঁহার আত্মা দৃঢ় নিশ্চয়শীল, যিনি মন বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন, এতাদৃশ যে সংযতচিত্ত ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত ভক্ত, এবং তিনি আমার প্রিয়। সুতরাং দৃঢ় নিশ্চয় অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন না হইলে, তাহার চিত্ত কখনও স্থির লক্ষ্যে আত্মা বা ভগবদ্গত হয় না এবং একাগ্র-ভক্তিতে মন বুদ্ধিও ভগবানে অর্পণ করিতে পারে না। কারণ ইচ্ছার নাশ না হইলে চিত্তসংযম হয় না। চিত্তসংযম না হইলে, চিত্তপ্রসন্নতা বা সন্তোষ লাভ হয় না। পরন্তু দৃঢ় নিশ্চয়তা বা একান্ত বিশ্বাস ভিন্ন পুরুষকারের উদ্রেক হয় না। পুরুষকার ভিন্ন যোগ বা সাধনা হয় না। পুরুষকারই সাধনা। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছেন; তাহার অনুবাদ—

"কার্য্য-সাধনের যত্ন পুরুষার্থ তাই।
বিনা পুরুষার্থে কোন কার্য্য হয় নাই॥
জ্ঞান প্রাপ্তি জীবন্মুক্তি আনন্দের কণা।
নাহি মিলে পুরুষের পুরুষার্থ বিনা॥

ইহা ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অদৃষ্ট ত নয়।
নির্ব্বোধেরা বলে সব দৈববশে হয়॥
আকাশ হইতে দৈব পড়ে কি ভূতলে ?
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল দৈব তারে বলে॥
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ পুরুষেই ফলে।
কেবল পুরুষকার প্রযত্নের বলে॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল টানিছে এবার।
এ জন্মের কর্ম্মফল পাশাপাশি তার॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল দৈব বলে তায়।
এ জন্মের কর্ম্মে তারে জয়করা যায়॥
ঐহিক পুরুষকার সাধনের বলে।
অসাধ্য কিছুই নাই অবনী মণ্ডলে॥
অশাস্ত্রীয় পথে কর্ম্ম নিষ্ফল নিশ্চয়।
সাধু প্রদর্শিত পথে সিদ্ধি নিঃসংশয়॥"

সকল শাস্ত্রেই, সকল ধর্ম্মেই দেখা যায়, দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাই। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি যে ধর্ম্মই বল না কেন, সকল ধর্ম্মই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "আস্তিক্য" ব্রাহ্মণের "স্বভাবজ"-ধর্ম্ম; "জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্"। সুতরাং আস্তিক্যবুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট; আস্তিক্যবুদ্ধিই "অহংব্রহ্মাস্মি"।

অতএব একমাত্র বিশ্বাস বা আস্তিক্য বলেই উপাস্য বা ইষ্টদেবতা স্বরূপ "**আত্ম-দর্শন**" লাভ হইয়া থাকে।

আত্মদর্শন যোগ

তৃতীয়খণ্ড

একবিংশ প্রকরণ।

দান-যোগে-আত্ম-দর্শন।

দান মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম; যদি তাহা স্বধর্ম্মোচিত ও যথাবিধানে সম্পন্ন হয়। দান সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"ন্যায়ার্জ্জিতং ধনঞ্চাল্পমন্যদ্বা যৎ প্রদীয়তে।
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং দানমেতদুদাহৃতম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধন (অল্প বা অধিক যাহাই হউক) শ্রদ্ধার সহিত যাচককে দেওয়ার নামই দান।

প্রকৃত ভাবে দানের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমতঃ দানের প্রকৃত বিষয়টী কি, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত শব্দের অর্থ কি? ধন বলিতে যদি আমরা টাকা কড়ি স্বর্ণ রৌপ্যাদি বুঝি, তাহা হইলে সেই দানের বস্তু স্বধর্ম্মযুক্ত বা বৈধভাবে উপার্জ্জিত কি না? এ স্থলে তাহাও বিচার করা উচিত। রাজা, জমিদার, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, মহাজন, ডাক্তার, কবিরাজ, বা চাকুরিয়া প্রভৃতি যাঁহারা নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা দানের সময়

একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, তিনি জীবনে কতধন বৈধভাবে উপার্জ্জন করিয়াছেন? অবৈধভাবে উপার্জ্জিত ধন, দানের অযোগ্য। দাতা গ্রহীতা কেহই সেরূপ অর্থদানে বা প্রতিগ্রহণে শান্তির অধিকারী হয় না। পরন্তু যিনি দান করিতেছেন, তিনি যদি তাহা শ্রদ্ধার সহিত দান না করিয়া কামনা বাসনার সহিত দান করেন এবং গ্রহীতা যদি সংযত চিত্তে দান গ্রহণ না করিয়া লোভ পরতন্ত্রভাবে দান গ্রহণ করেন, তবে সেরূপ দান কাহারও পক্ষে স্বধর্ম্মোচিত নহে। এ জন্যই ভগবান্ গীতায় ত্রিবিধ ভাবের দানের কথা বলিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

পাইতে প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা নাহিক আর,
দাতব্য জানিয়া সার যে দান হইবে।
দেশ কাল পাত্র দেখি, কর্ত্তব্যেতে মন রাখি,
সর্ব্বোত্তম সেই দান 'সাত্ত্বিক' জানিবে ॥ ২০
পাইবারে উপকার, ফলের উদ্দেশ্যে আর,
ক্লেশেদান করা সেই দান 'রাজসিক'—
না করি সুব্যবহার, করি বহু তিরস্কার,
অপাত্রে অদেশকালে দান 'তামসিক' ॥ ২২

গীতা ১৭ অঃ

গুণ ও শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগে দানের পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য। এইজন্য দেশ কাল পাত্রের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কোন দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া অন্নাভাবে বহুলোক নষ্ট হইতেছে, অথবা প্রাকৃতিক ঘটনা বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনৈসর্গিক ব্যাপারে, কোন দেশ জলমগ্ন কিম্বা ঝঞ্ঝাবাত ও ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত; এমতাবস্থায় যদি সেই দেশে আর্ত্তদিগের জন্য যথাকালে যথাযোগ্য যে অর্থদান করা হয়, তাহার

বিনিময়ে কোন উপকারের প্রত্যাশা না থাকে ; তবে এরূপ দানকেই যথার্থ সাত্ত্বিকদান বলা যায়। তাদৃশ বিপন্নের সাহায্যকালে, জাতিভেদ বিচার করিয়া দান করিলে তাহা কখনও স্বধর্ম্মযুক্ত বা সাত্ত্বিক দান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের উপনয়নাদি অর্থাৎ স্বধর্ম্মরক্ষায় নিয়োজিত করণার্থ যে দান তাহা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। পীড়িত জীবকে ঔষধ দান ; জীবনদান তুল্য ; ইহা প্রধান দান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহারা সংযতাত্মা ও স্বধর্ম্মনিরত ভাবে তীর্থবাস করিতেছে—এরূপ তীর্থবাসী অন্নবস্ত্রের অভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তাহাদের ধর্ম্মাচরণের সাহায্যার্থ দান, অপরন্তু ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য শ্রদ্ধার সহিত যে নিত্যদান,—তাহা বার, তিথি, নক্ষত্র, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ইত্যাদি বা গ্রহণকালীন কিম্বা পর্ব্বাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থস্থলে ফলকামনায় দান করা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও 'সাত্ত্বিক দান' বলিয়া গণ্য। তীর্থে বসিয়া ফল কামনায় দান করা বা তিথি নক্ষত্র পর্ব্বাদি বিবেচনা করিয়া দান করা কখনই সাত্ত্বিক দান নহে। কারণ ভগবদুক্তিতে সাত্ত্বিক দানে কোনরূপ প্রত্যুপকার বা ফলের প্রত্যাশা নাই। বিশেষতঃ নিত্য সত্ত্বগুণাবলম্বী স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে তীর্থ বা তিথি, বার নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া ফল কামনায় দান করা ভগবদ্বাক্যে বা শাস্ত্রে একবারে নিষিদ্ধ। কারণ তাদৃশ কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে সত্ত্ব ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে হয়।

কেহ কেহ ইহার মধ্যে 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' বাহির করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, 'শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামনয়া' বলিয়া পর্ব্বাদি উপলক্ষে দান করিলে, তাহাতে ফল কামনা হয় না; কিন্তু ভগবান্ সেই পাটোয়ারী বুদ্ধিজীবী জীবদের কথা শান্তি গীতায় খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রীতি-মানসে কর্ম্মও, নিষ্কাম কর্ম্ম নহে, তজ্জন্য ঈশ্বর-প্রীতি-কামনাযুক্ত সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্তচিত্তে একমাত্র **স্বধর্ম্মপালনজন্য** কর্ম্মানুষ্ঠানকরিবে।

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ বেদোক্তেন চ কর্ম্মণা ॥
নিষ্কামেন সদাচার ঈশ্বরং পরিতোষয়েৎ ॥" ৩ অঃ

এ বিষয় ভগবান্ ব্রহ্মা, বেদের প্রমাণস্বরূপ মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"বর্ণাশ্রমোক্তং সর্ব্বত্র বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কুর্ব্বতস্তস্য মুক্তি গার্গি! করে স্থিতা ॥" ২৪
"সংসারভীরুভিস্তস্মাদ্বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জ্ঞানেন সহ সর্ব্বশঃ ॥" ২৬

যাজ্ঞবল্ক্য।

"হে গার্গি! যে ব্যক্তি কামনা বর্জ্জিত হইয়া, বিধিবিহিত বর্ণাশ্রম কর্ম্ম সকলের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন. মুক্তি তাহার করতলস্থিত, সন্দেহ নাই। পরন্তু যাহারা পুনর্জ্জন্মাদি সংসার সাগরে ভয়ঙ্কর দুঃখ-তরঙ্গ সন্দর্শনে একান্ত ভীত হয়, তাহাদের কামনা-বর্জ্জিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের, জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

মানবকে একমাত্র স্বধর্ম্ম পালনার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সেই মহদুদ্দেশ্যকে কাল্পনিক ধর্ম্মাড়ম্বরে পরিণত করিয়াই মানব স্বধর্ম্মত্যাগী হইতেছে। "পাটোয়ারীবুদ্ধিজীবীদিগের দেবতা প্রীতিকামনায় দান বা কর্ম্ম নিষ্কামস্বরূপ" এই অদ্ভূত ব্যাখ্যা শাস্ত্র বা ভগবদ্বাক্য দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। এখন তর্কচ্ছলে তাহাদের কথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তত্রাচ তাহাতে যে যুক্তির সহিত কার্য্য কারণে সামঞ্জস্য নাই, নিম্নে তাহাই প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে।

কোন কারণ ভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তীর্থ স্থানে এবং বার, তিথি, পর্ব্ব দেখিয়া, দানের কারণ কি? তাহাতে ফলাধিক্য,

সুতরাং স্বধর্ম্ম পালনানুযায়ী নিত্য দান নহে। অতএব তিথি বা পর্ব্বোপলক্ষে ফলাধিক্য-রূপ কারণে দানরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে। তদ্ধেতু এ প্রকারের দান কখনই সাত্ত্বিক দান হইতে পারে না। এই প্রকার ফল কামনা বা ফলাধিক্য জন্য নিত্য অনুষ্ঠেয় একমাত্র ইষ্টদেবতা পূজা ভিন্ন, অন্য দেবতার প্রীতি উদ্দেশ্যে যে পূজা বা দান তাহাও সাত্ত্বিক দান নহে। পরন্তু তাহা সংযম-বহির্ভূত। দৃঢ়বিশ্বাস বলে একমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্ম তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। শাস্ত্রানুযায়ী স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই সর্ব্বদেবতার সন্তোষ ও সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট সাধিত হয়। অতএব দানের পূর্ব্বেই স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দান করা কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে শাস্ত্র উপদেশানুযায়ী প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম-মতেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিভাগ করিতে হইবে। তৎপর সেই স্বধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম যাহাতে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তাহাই বিচার করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভগবদ্গীতা, চারিবর্ণের স্বধর্ম্ম ও "সহজ" কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥" গীতা ১৮ অঃ

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র সকল পূর্ব্বসংস্কারজাতগুণ দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বা প্রাক্তন ফলে যে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যে অধস্তন বর্ণের কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ভগবদ্বাক্যে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। এতদবস্থায় তাহাদিগকে স্ব স্ব বর্ণোচিত ভাবে কর্ম্মে নিয়োগ করা শাস্ত্রবিধান। এ জন্য ভগবান বর্ণ ভাগানুযায়ী কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন।

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

গীতা ১৮ অঃ

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম। ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগের যম বা সংযমরূপে পূর্ব্বে বিবৃত করা গিয়াছে। এই সংযমরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণের পূর্ব্বসংস্কারের বিনাশ সাধিত হয় এবং তদ্দ্বারা মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহাও দেখা যায় যে, অর্থদান ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণের অর্জ্জিত ধন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ব্রাহ্মণ দেশ কাল পাত্রানুযায়ী সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ ধন শ্রদ্ধার সহিত (তজ্জন্য কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া পাত্র বা অধিকারী বিবেচনায়) দান করিলেই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম রক্ষা হয়। ব্রাহ্মণ অর্থদান করিতে গেলেই শম দমাদিগুণ নষ্ট হইয়া যায় বিধায়, অর্থদান ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মহানিকর; (১) কারণ তাহা রজোগুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে মহাতপা পরাশর বলিয়াছেন ;—

"বর্ণেভ্যোহি পরিভ্রষ্টো ন বৈ সম্মানমর্হতি।
স তু যঃ সৎক্রিয়াং প্রাপ্য রাজসং কর্ম্ম সেবতে॥

পরাশর গীতা ২য় অঃ

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া রাজস কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মান লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মণের কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।

অর্থদান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অর্থাৎ রাজসিক ধর্ম্ম। ভগবদগীতায়ও তাহাই উক্ত হইয়াছে।—

(১) অর্থদান ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম নহে ; তবে যাঁহারা রাজসিকগুণধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ রাজা জমীদার, তাহাদের পক্ষে অর্থদান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ধন সম্পত্তি বিহীন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণবিধবাগণের পক্ষে কায়ক্লেশ কিংবা অপকর্ম্ম করিয়াও যে, ফলকামনায় অর্থদান" করিতেই হইবে, শাস্ত্র বা গীতাও তাহা বলেন নাই বরং ঐরূপ দান স্বধর্ম্ম নষ্টকর বা অধর্ম্মই বলিয়াছেন।

"শৌর্য্যং তপোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

গীতা ১৮ অঃ

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়বর্ণ উৎপন্ন। তাহাদের কর্ম্মও সত্ত্ব-রজ গুণ মিশ্রিত। অন্যান্য স্বভাবজ কর্ম্মের সহিত "অর্থদান" ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং একমাত্র তমোগুণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন বিধায়, তাহাদের কর্ম্ম ও সেই সেই ভাবে গীতায় উক্ত হইয়াছে।—

"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

গীতা ১৮ অঃ

কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য, বৈশ্যের স্বভাবজকর্ম্ম। সুতরাং শস্য ও গবাদি পশু, বৈশ্যের বৈধভাবে উপার্জ্জিত ধন এবং ক্রয় বিক্রয়াদি বাণিজ্য ও বৈশ্যের স্বভাবজধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক ভাব-দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ধর্ম্মক্ষেত্রেও কাম্যকর্ম্মাদি বাণিজ্য-নীতির স্বরূপ। ভগবদ্গীতাতেও তাহাই বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মকর্ম্মে বণিগ্‌বৃত্তি সমাধির যোগ্য নয়।" সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত দান বৈশ্যের পক্ষেই করণীয়। শূদ্রের জন্য পরিচর্য্যা বা বাহ্য পূজারই বিধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কায়িক সদ্ব্যবহারই তাহাদের শ্রেষ্ঠ দান।

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারা সকলেই যখন পূর্ব্বজন্ম সংস্কার লইয়া দেহধারণ করিয়াছেন, তখন দান ধর্ম্মেও তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমজনিত স্বধর্ম্মানুরূপ দানের বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য;

স্বধর্ম্মের বহির্ভূত কর্ম্মে কাহাকেও নিয়োগ করিলে, তাহার মুক্তি বা উর্দ্ধগতির পন্থা রুদ্ধ করা হয়। স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম ভিন্ন কাহারও শ্রেয়োলাভ হয় না। এ সম্বন্ধে ভগবদগীতার উক্তির পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

স্বকর্ম্মেতে নিষ্ঠাবান্, মনুষ্যই সিদ্ধি পান,
কি প্রকারে কহি শুন, পার্থ মহাভাগ ॥৪৫
সর্ব্ব চেষ্টা যাহা হ'তে, এই বিশ্ব ব্যাপ্ত যাঁতে,
স্বকর্ম্মে সাধিলে তাঁরে সিদ্ধি লাভ হয় ॥৪৬
পূর্ণ পর-ধর্ম্ম হ'তে, অঙ্গহীন স্বধর্ম্মেতে,
শ্রেয়োলাভ—স্বকর্ম্মেতে নাহি পাপ-ভয় ॥ ৪৭
স্বভাবজ কর্ম্ম যেই, সহজ স্বধর্ম্ম সেই,
দোষযুত পাণ্ডুসুত যদি তাহা হয়।
ত্যাজ্য নহে তথাপি তা, ধূমাবৃত বহ্নি যথা,
সর্ব্বকর্ম্ম দোষাবৃত সংসারে নিশ্চয় ॥" ৪৮

গীতা ১৮ অঃ

শাস্ত্র বা ভগবদ্বাক্যানুসারে বৈধভাবে অর্জ্জিত ধন ও দানের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ ধন দান, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অর্থ দান, বৈশ্যের পক্ষে অন্ন ও গবাদি পশু দান স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ীভাবে নির্দ্ধারিত আছে। অতএব ধন দান বলিতে কেবল টাকা মোহরাদি দান বুঝিতে হইবে না। সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। অর্থদানের দ্বারা অনিত্য দুঃখ দূর হয়, আর জ্ঞানদান দ্বারা নিত্য ও অনিত্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর হয়। সুতরাং দুঃখের মূলোৎপাটিত হয়।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের পক্ষেও সে জ্ঞানদানের প্রকার দেখিতে হইবে। শাস্ত্রে জ্ঞানদানও ত্রিবিধ প্রকার। ব্রাহ্মণগণ সেই প্রকারের অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আত্ম জ্ঞান যথাযোগ্যভাবে দান করিলেই যথার্থভাবে দাতা ও গ্রহীতার শ্রেয়োলাভ এবং স্বধর্ম্মপালন হয়। ভগবদ্গীতায় সেই ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব উক্ত হইয়াছে, তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"ভিন্ন ভিন্ন ভূতে সবে অভিন্ন অব্যয় ভাবে
অভেদ দেখায় যাতে সে জ্ঞান সাত্ত্বিক॥ ২০
সর্ব্বভূতে ভিন্ন দৃষ্টি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি
যে জ্ঞানে দেখায় সে জ্ঞান রাজসিক॥ ২১
শাস্ত্রে যুক্তি বোধ নাই এক কার্য্যে মুগ্ধ তাই
এ দেহই আত্মা আর মূর্ত্তিই ঈশ্বর।
হেন বোধ উৎপাদক হেতু শূন্য অনর্থক
যে জ্ঞান, তামস তাহা অকিঞ্চিৎকর॥" ২২

শাস্ত্রযুক্তি পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই দেহাত্মবোধে এবং মূর্ত্তিমাত্রই ঈশ্বরজ্ঞানে কর্ম্ম করান বড়ই অজ্ঞানতা ও ভ্রষ্টাচারের পরিচয়। ব্রাহ্মণ-বর্ণ মধ্যে অধিকাংশই এই ভাবে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া, স্বধর্ম্মজ্ঞানে অধর্ম্মানুষ্ঠান ও স্বকর্ম্মজ্ঞানে অকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ আত্মজ্ঞানের অভাব ও পুঁথিগত বিদ্যা। তাদৃশ জ্ঞানহীন অবিদ্যানু-সরণে ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণবর্ণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে, আত্ম-জ্ঞান-যোগে, শাস্ত্র-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, সেই জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ পরমধন, তত্ত্বজ্ঞান দান বা প্রচার দ্বারা মানবের দুঃখ দরিদ্রতা নিবৃত্তির চেষ্টা করা। অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশ করিতে

আত্মজ্ঞানই বৈদ্যুতিক আলো। মানবের নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সেই আত্ম-জ্ঞানরূপ বৈদ্যুতিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া, প্রত্যেকে আত্ম-দর্শন অভ্যাস করুন্। ঘরে ঘরে অন্ধকার নাশজন্য আত্মদর্শন জ্ঞানালোক দান করুন্। ভগবান্ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন যে, আত্ম-দর্শন ভিন্ন মুক্তি নাই। সুতরাং জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান। অন্ধকে চক্ষুদানাপেক্ষাও জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ।

সদ্ব্যবহার সমাজের শ্রেষ্ঠ দান। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সংযম ভিন্ন সদ্ব্যবহার কথনই হইতে পারে না। তৃষ্ণাতুরকে জলদান, রোগিকে ঔষধ দান, আর্ত্তকে অভয় দান, শরণাগতকে আশ্রয় দান, অতিথিকে অন্নদান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান, গুরুকে "সর্ব্বস্বদান" ৺বিশ্বনাথকে আত্মদান, সাম্রাজ্য দান তুল্য। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে কায়মনোবাক্যে যথাসর্ব্বস্ব যে ব্যক্তি দান করিতে না পারে, সে পামর কথনও তাহাদের পিণ্ডদানের অধিকারী হয় না। মৃত্যুর পর তাহারা দান সাগর করিলেও তাহা গোষ্পদের তুল্য হয় না। অতএব স্বধর্ম্ম পালনোদ্দেশ্যে যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান এবং তদ্দ্বারাই **আত্ম-দর্শন** লাভ হয়।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বাবিংশ প্রকরণ।

ঈশ্বর পূজন-যোগে আত্ম-দর্শন

"যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব চ।
যথাশক্ত্যার্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনম্॥
রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং রাগদুষ্টানৃতাদিভিঃ।
হিংসাদিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপূজনম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে বিষ্ণু বা মহাদেবের আরাধনার নাম ঈশ্বর পূজন। আর যখন মনুষ্যের বিষয়ানুরাগ রহিত হয়, মিথ্যা কথনাদির দ্বারা বাক্য দূষিত না হয় এবং দেহ, হিংসাদি কার্য্য হইতে বিরত হয়; তাহাকেও ঈশ্বর পূজন বলা যায়।

মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বর পূজা সম্বন্ধে বাহ্য ও মানস, দ্বিবিধ ভাবেই উপদেশ দিয়াছেন। চিত্তপ্রসন্নতা ও ভক্তি সহকারে বিষ্ণু বা মহেশ্বরের

পূজা এবং চিত্তের ইন্দ্রিয় বিষয়ানুরাগ রহিত অর্থাৎ যে অবস্থায় দ্বেষ হিংসা মিথ্যাকথনাদি দুরীভূত হয়, সেই অবস্থার নামও ঈশ্বর পূজন। এক্ষণে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চিত্তপ্রসন্নতা ও ভক্তি ভিন্ন কোন মতেই ঈশ্বর-পূজা হইতে পারে না। চিত্তপ্রসন্নতা ও ভক্তি দুইটীই মানসক্ষেত্রের বিষয়। ইন্দ্রিয় বিষয় রহিত না হইলে চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয় না। ভগবদ্গীতোক্ত বিংশ প্রকার জ্ঞানের মধ্যে চিত্তপ্রসন্নতা একটি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বাসনা ত্যাগ না হইলে যেমন চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয় না, তেমনই আত্মজ্ঞান না হইলেও বাসনা দূর হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যোগে বাসনা দূর হইলেই সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহ প্রকাশিত হয় এবং তখনই প্রকৃতপক্ষে চিত্তপ্রসন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে অর্থাৎ চিত্ত তখন মায়িক জগৎ ছাড়িয়া চিদাকাশে মুক্ত-দেবতার স্বরূপে বিচরণ করিতে থাকে। সেই ভাবই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

গীতা ১৮ অঃ

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর, মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া সকলকে তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহার শরণ লওয়াই ঈশ্বর পূজা এবং তদ্দ্বারাই শান্তিলাভ ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তে শান্তি থাকিলেই চিত্তের প্রসন্নতা হয়। আত্ম-জ্ঞান-যোগে বাসনারূপ মায়ার আবরণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করার চেষ্টাই পূজা। অতএব ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে

বাসনা নিবৃত্তির জন্য, লোকানুবর্ত্তন, দেহানুবর্ত্তন, শাস্ত্রানুবর্ত্তন, ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান উৎপত্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

"লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥"

বিবেক চূড়ামণি

কি লোক বাসনা, কি দেহগত বাসনা, কি শাস্ত্র বাসনা, কিছুতেই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ নাই। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রবাসনা ত্যাগের কারণ এই যে, একবার "শাস্ত্রগর্ত্তে" পতিত হইলে, তাহা হইতে আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। "অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু" (ইতি শ্রুতিঃ) সুতরাং রজোগুণজাত যে দুর্জ্জয় বাসনা, চিত্তে পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ে প্রথমতঃ বুদ্ধিযোগে সেই চিত্তকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলেই—তাহা হইতে চিত্ত-বিশুদ্ধতারূপ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অতএব দেখাযায় রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র বাসনা বা কামনাই ঈশ্বর পূজনের বিষম শত্রু। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনও তাহাই বলিয়াছেন।

"অনাত্মবাসনাজালৈঃ স্থিরীভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্॥"

বিবেক চূড়ামণি

অনাত্ম বাসনাপুঞ্জ, পরমাত্মবাসনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আত্মজ্ঞানবলে সেই অনাত্ম বাসনার উচ্ছেদ হইলে, আপনা হইতেই পরমাত্মবাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রবাক্যের বিচারে যাহা বুঝা যায়, তাহা অনুমান মাত্র। তদ্দ্বারা কখনও জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। যে ব্যক্তি কথায় সব বুঝে

কিন্তু কাজে অভ্যাস করে না। তাহার জ্ঞান, পটে চিত্রিত সূর্য্য রশ্মির ন্যায় তেজঃশক্তিহীন। তদ্দ্বারা কি কখনও অন্ধকার নাশ হইতে পারে? চিত্রিত কামান বন্দুকের যুদ্ধ, খেলার বস্তু মাত্র; উহা যুদ্ধই নহে। অনুশীলন অভাবে পুস্তকের "আঁকা-বাঁকা" ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্মই নহে। অজ্ঞানীর তর্করূপ বাগ্ বিতণ্ডার প্রহসন্ মাত্র। ঈশ্বর কোথায়, কি ভাবে আছেন; কি ভাবে তাঁহার পূজা করিতে হয়, সে জ্ঞান তাহারা কি করিয়া বুঝিবে? বিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানে কত নূতন তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সহজ পন্থা আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কোন নূতন তত্ত্ব অথবা পুরাতত্ত্বের কোন সহজ পন্থা কি আবিষ্কার হইতে পারে না? ইহা অসম্ভব হইলে "ক্রমোন্নতি" একটা কথাই সৃষ্টি হইত না। তবে জড় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের পুরাতত্ত্ব লিখিত বিষয়টাকে জ্ঞানের চরমসীমা মনে না করিয়া, জ্ঞানানুশীলনের একটি সূত্র মনে করিয়া তাহার অনুসরণ ক্রমে, বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা আর্য্যজাতি, জ্ঞানীর বংশধরগণ কি না, আত্মশক্তিবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন উন্নত ভাব কি সহজ পন্থা আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি বা ইচ্ছা শক্তির পরিচালন করা দূরে থাক, শাস্ত্রবাক্য পর্য্যন্তও আমরা কার্য্য কারণে পৌছিতে চেষ্টা না করিয়া, কুতর্কের আশ্রয়ে, সময় সময় শাস্ত্র বাক্যের নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যাদ্বারা অপরের পুরুষকার বা প্রতিভা নষ্ট এবং স্বীয় অজ্ঞানতা সমর্থনের চেষ্টা করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না। আমরা এতই অজ্ঞানান্ধ যে আমাদের শাস্ত্র প্রণেতা প্রাচীন যোগি-ঋষিগণ, তপোবলে স্থূলদেহভাব অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞানযুক্ত ধ্যানযোগে, সূক্ষ্মদেহের, সূক্ষ্ম আত্মার, [illegible] যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-অবস্থার ব্যক্তাংশ ভাষার সাহায্যে যতটুকু [illegible] গিয়াছেন, বর্ত্তমান দেহাত্মবোধী, বাসনা-ব্যাধিগ্রস্ত, [illegible] জ্ঞানচক্ষুহীন মানব, স্থূল

দৃষ্টিতে পুঁথিগত বিস্তার, সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের ভাবোদ্ধার করিয়া বিজ্ঞতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী। তাঁহারা একটা মোটা কথা ভাবিয়া দেখেন না যে, অনুশীলনহীন পুঁথিগত জ্ঞানের বিচারশক্তি স্থূল ছাড়িয়া, সেই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না। আমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমামধ্যে বিচরণ করে। সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, যুক্তির সীমার বহির্দ্দেশে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীন যোগি-ঋষিরা যে, জ্ঞানের চরমসীমায় যাইয়া পৌছিয়াছিলেন, একথা তাঁহারাও বলেন নাই বা বলিতে পারেন না। কারণ জ্ঞান অনন্ত। আমরা তাহা না বুঝিয়া, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাইয়া কেবলমাত্র কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে এই প্রকার বাক্যের চেঁচামেচিতে একজন আর একজনকে পরাস্ত করিয়া নিজে জ্ঞানী সাজিতে চান্। এ জন্য সাধক গাহিয়াছেন—

"তোর চেঁচামেচির হবে (তবে) অন্ত।
(তুমি) বুঝেও বুঝনা মন ভ্রান্ত॥
তর্কাতর্কি ছাড়, মিছে পুঁথিপড়, গুরুমুখে পাবি তার তদন্ত॥"

"জলেতে নির্ম্মলী ঘ'ষে নাহি দিলে,
হবে কি নির্ম্মল দোকানে থাকিলে।
গুরুমুখে জ্ঞান, পাবে চক্ষুদান, বুঝবে কারে বলে "বেদ-বেদান্ত"॥"

"শুনলে লুচিপুরী তাতে কিবা করে,
না খাইলে খাদ্য কার পেট ভরে।
লইয়ে সাধন, কররে যতন, দেখবে সে "অনন্ত" ছবি রে শান্ত॥"

যোগসঙ্গীত

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুঃখ, মনের চঞ্চলতা, শরীরের কম্পন বা অঙ্গচালনা, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, এই সবগুলি মনের একাগ্রতা অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়। যখন একাগ্রতা লাভ করা যায়, তখনই চিত্ত শান্ত থাকে। সে অবস্থায় যে বিষয়ে চিত্ত নিয়োজিত কর, সেই দিকেই একাগ্রতা প্রাপ্ত হইবে। যখন চিত্ত সংযত অথবা ঠিকপথে সাধনা না হয়, তখনই ঐ সকল বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। অজপায় মন্ত্র জপ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই মন দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। তজ্জন্যই একাগ্রতা সম্পাদনার্থ ঈশ্বরপূজন বা ইষ্টদেবতার প্রতি লক্ষ্য স্থির করা যোগের অন্যতম নিয়ম স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং ইহাও স্বীকার্য্য যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। এখন সেই ঈশ্বরের রূপ কি? শিব বলিয়াছেন যে—"অনাহতে-শ্বরোঽহং সর্ব্বদেব নিষেবিতঃ" অর্থাৎ অনাহত হৃৎপদ্মে আমি সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ঈশ্বররূপে অবস্থান করিতেছি। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা যদি বিষ্ণুভাবেই ঈশ্বর পূজা করিতে চান তবে তাঁহাদের জন্যও শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, প্রাণাত্মাভাবে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। সেই প্রাণাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই সপ্তলোক ধারণ করিয়াছেন। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সবই প্রাণময়। সুতরাং প্রাণই ব্রহ্ম। পরন্তু গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" অর্থাৎ অষ্ট প্রকৃতির ভিতরে যিনি পরা বা শ্রেষ্ঠা, তিনিই বিশ্বজগৎ ধারণ

করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণই বিশ্বপ্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি। অতএব দেখা যায়. উহাদের একজনকে ধরিতে পারিলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মহা-প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তিকে ধরা যায়। ঐ দেবতাত্রয় একত্রে পরমাত্মা বা ঈশ্বর ভাবে তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এতদবস্থায় সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সবই মূলে একজন। সাধনের প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য স্থির করার জন্য "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" অর্থাৎ সাধকের হিতের জন্য শ্রীগুরু, ইষ্টদেব স্বরূপে ঈশ্বরের একটিরূপ সাকার ভাবে কল্পনা করিয়া থাকেন। মূলে সেই ঈশ্বর মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি দুইই আছেন। সাধনার প্রথম সোপানে তাহাকে ধারণা করিয়া লইবার জন্য তাঁহার একটি রূপ স্থির করা প্রয়োজন। মনে কর তিনিই শিব।

"সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তো বিভুরাত্মা মহেশ্বরঃ।
তস্যৈবাংশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ॥"।

শিবগীতা ২ অঃ

মহেশ্বর সত্য, জ্ঞান-স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, ব্যাপক, আত্মস্বরূপ, ও ইনিই প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর পূজন সম্বন্ধে কতিপয় শিষ্যের সহিত প্রশ্নোত্তর ভাবে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

শিষ্য—গুরুদেব! শিবের রূপ কি? দয়া করিয়া তাহাই উপদেশ করুন।

গুরু—"শিব" মধ্যে, শক্তি ও শিব দুইই আছেন। শিব বলিতে ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণ, শক্তি বলিতে অকারাদি স্বর বর্ণ। শিব যদি শক্তিযুক্ত হন অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ যদি স্বরবর্ণে যুক্ত হয়, তাহা হইলেই তিনি সাকার, নচেৎ তিনি নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত। ইকার যুক্ত না হইলে শব, কিম্বা শবে

শক্তিরূপা ইকারযুক্ত করিলে ঈশ্বর বাচক "শিব" হইয়া থাকে। অথবা শিব শব্দে "হং", শক্তি শব্দে "সঃ",—শিবশক্তি যুক্ত হইলে অর্থাৎ "হংসঃ" এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে, তন্ত্রোক্ত প্রধান মন্ত্র উদ্ধার হয়। জীব আগম নিগমে সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। এই শিবই হরি-হর-ব্রহ্মাত্মক—অকার, উকার, মকার, বাচক প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম। ইনিই বেদোক্ত ভর্গোজ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম গায়ত্রীরূপা। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী নামে স্থূল সাধনার লক্ষ্য স্থল। উহারাই ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিত, বিষয়—সৃষ্টি। জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠিত বিষয়—পালন। ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সংহার বা সংহরণ করিতেছেন। এই তিন শক্তির সমন্বয় ভিন্ন কাহারও সাধনা সিদ্ধ হয় না। কারণ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়যোগে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপে বহির্জগতের কার্য্য চলিতেছে। তোমার দেহরূপ ক্ষুদ্র জগতেও ইহা দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

শিষ্য—প্রভো! ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, ইহারা তিনজনই এক এবং তিনজনই ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু আমাকে শিবপূজা উপদেশ করিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন কথা আনিবার আবশ্যক কি?

গুরু—বৎস! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ইহারা তিনজন যদি এক ব্রহ্মশক্তি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাদের ভেদ বা পৃথক্ জ্ঞান করিলে তোমার মনে ব্রহ্মশক্তি পূর্ণ হইল না বরং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিও পৃথক্ হইয়া গেল। ঐ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির একত্র সম্মিলন ভিন্ন তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কাহাকেও বুঝিতে পারিবে না, বা কাহারও পূজায় অধিকারী হইতে পারিবে না।

শিষ্য—গুরুদেব! আমি এক দেবতার পূজা করিব। তিনজন দিয়া আমার কি প্রয়োজন?

গুরু—বৎস! আমি সহজ ভাবে বুঝাইতেছি। তুমি যাহাকে তিনজন বলিতেছ, মূলে তাঁহারা একজন। মনেকর তোমার এই স্থূল দেহটা একজন আছে। ইহাকে তিনভাগ কর উর্দ্ধভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। উর্দ্ধভাগ ইচ্ছাশক্তি, মধ্যভাগ জ্ঞানশক্তি, অধোভাগ ক্রিয়াশক্তি।

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ. তিনখণ্ড মনে করিলাম।

গুরু-বৎস! একি বলিতেছ. মনে করিলে শুধু কি হইবে? তাহা হইলে ত' মূলে তুমি একজনই থাকিতেছ। তোমার কথা ত' তাহা নহে, তুমি বলিয়াছ তিনজনের দরকার কি? একজন থাকিলেই ত' হইল। তোমার দেহের যে খণ্ড ইচ্ছা হয় রাখিয়া অন্য দুই খণ্ডকে পৃথক্ করিয়া ফেল।

শিষ্য—(বাধা দিয়া) গুরুদেব! আমার দেহকে তিনখণ্ড করিলে আমি কি করিয়া বাঁচিব?

গুরু—ব্রহ্ম বাঁচেন কি করিয়া? তোমরা যখন ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড কর তখন সে কথা ভাবিয়া দেখ কি?

শিষ্য—অপরাধ ক্ষমা করুন। ব্রহ্ম যে দেবতা, আমি ত সে দেবতা নই যে, দেহ তিনখণ্ড করিয়া বাঁচিব।

গুরু—হা! হা! ব্রহ্ম দেবতা আর তুমি মানুষ! এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্যই ত তোমাকে পূর্ব্বে ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝাইয়াছি যে, ঈশ্বর তোমার দেহভিতরে প্রাণাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাঁহার—সত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটিগুণ বা অবস্থা। তিনি ইহার অতীত পদার্থ। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ইহারাও ব্রহ্মশক্তির তিনটি অবস্থা, অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি; মূলে সেই মহাপ্রকৃতি। পুরুষ যখন প্রকৃতির আকর্ষণ যুক্ত হয়, তখনই তিনি ত্রিগুণের ভাবে সাকার;

তাহাই সৃষ্টি অবস্থা। আর প্রকৃতি যখন পুরুষের অনুগামিনী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করেন, সেই অবস্থাই মুক্তি অবস্থা

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, কিন্তু এখন আমার দেহটা তিনখণ্ড করিলে বাঁচিব কি প্রকারে, তাহাই বলুন; আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

গুরু—বৎস! ভয় করিলে তোমার ঈশ্বর পূজা কি করিয়া হইবে? "ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়"। এই তিনটি বিনাশের জন্যই পূর্ব্বে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত সংযমের কথা বলিয়াছি। জীব যত দিন অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন প্রকৃতভাবে তাহার কর্ম্মে অধিকার হয় না। তবে যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতেছে দেখ, সে কেবল পাশমুক্ত হইবার চেষ্টা বা অভ্যাস যোগ মাত্র।

শিষ্য—প্রভো! অষ্টপাশ কি?

গুরু—তাহা পরে বলিব। এখন তোমার ভয়-দূরের কথা বলিতেছি। তোমার দেহটা তিনখণ্ড করিতেই ত ভয়?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ!

গুরু—আচ্ছা দেহ তোমার; তুমি ত দেহ নও? তুমি দেহের অতীত বস্তু।

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ! প্রথমে আত্ম-জ্ঞানযোগে ইহা বুঝাইয়াছেন এবং আমি দেহত্যাগ করিলে, আমার দেহ পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং ইহা একটা আকার মাত্র।

গুরু—আচ্ছা। দেহের তত্ত্ব পরে বলিতেছি। এখন তোমার দেহের তিন ভাগকে তুমি—অকার, উকার, মকার বাচক প্রণবরূপে ব্রহ্ম বলিয়া মনে কর। তুমি নির্গুণ, নিরাকার; তুমিই তোমার দেহ ভিতরস্থ পূর্ব্ব-বর্ণিত

'হংস"রূপে প্রাণাত্মা বা ঈশ্বর। তোমার দেহের তিনটি খণ্ডই সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন ত্রিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী, তাহার ত্রিশক্তি; ইহারাই তোমার—ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি। ইহাদের যোগেই তোমার দেহের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আধিভৌতিক, সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতেছে। তুমি এই দেহে অপরা প্রকৃতিগত হইয়া, তাহার তমোংংশে মূলাধারে বা পৃথ্বীতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাহার—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকং জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা (নিন্দা) এই পাঁচ, এবং কুল, শীল ও জাতি একত্রে এই আটটি যাহা অষ্টপাশ নামে খ্যাত. তুমি সেই অষ্ট পাশে বদ্ধ হওয়া নিবন্ধন মন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং সংসার মায়া-মোহে অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছ।

শিষ্য—আজ্ঞে ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। মায়া-মোহে বদ্ধ হইয়াই, জীব অজ্ঞানতাবশে কেবল বাহিরের কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিকে ভুলিয়া গিয়াছে।

গুরু—বৎস! ঠিক্ বুঝিয়াছ। মায়ামোহে "জীব"; মায়ামোহ দূর হইলেই "শিব"। শিবতেই ইচ্ছাশক্তি। এই জন্যই ঈশ্বরবাচকরূপে শিবকে আশ্রয় বা তাহার শরণ লইতে পারিলেই জীব মুক্ত। আশুতোষ তখন স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে জীবের লোকচক্ষে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞানগর্ভ উপদেশে শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া, জ্ঞানযুক্ত ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে, ব্রহ্মাণীরূপা-ক্রিয়াশক্তিকে "হংস"বাহনে, বৈষ্ণবীরূপা জ্ঞানশক্তিযোগে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত ক্রিয়াবশে প্রকৃতির সত্ত্বাংশে মাহেশ্বরীরূপিণী ইচ্ছাশক্তির সহিত লয় বা সংহরণ করেন।

সেই ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি বা মায়া। এই মায়ার দুইটি অবস্থা পরা ও অপরা বা বিদ্যা ও অবিদ্যা।

"চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপং জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকারিণী।
কার্য্য প্রসাধিনী মায়া নির্ব্বিকারা চিতিঃ পরা ॥"

শান্তিগীতা ৪ অঃ

পরব্রহ্মের চিৎ ও জড়, ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শক্তি আছে। "চিৎ" শক্তি তাঁহার স্বরূপ ও জড়শক্তি-বিকারী মায়া। ঐ মায়া হইতেই সমস্ত জগতের কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া তাঁহাকে কার্য্য প্রসাধিনী বলা যায়; আর চিৎ শক্তি নির্ব্বিকার। অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তির ন্যায় এই চিৎ ও জড় অবিভাজ্য হইলেও তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচারযুক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মিথ্যা ধস্বর ভ্রম দূর হইলেই সত্য উদ্ভাসিত হইয়া, স্বীয় তেজে অজ্ঞানান্ধকার-রূপ জড় বা মায়া-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করে। নাদ পর্য্যন্ত মায়ার ত্রিগুণযুক্ত বিকার অবস্থা। তদুপরি তাঁহার চিতি বা স্বরূপ অবস্থা; ইহা গুণাতীতভাবে ব্রহ্মসহিত যুক্ত। জীব, "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয়ে স্বীয় "স্বরূপ" বা নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই একমাত্র চিচ্ছক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক চিদানন্দাবস্থা লাভ করিয়া, "সচ্চিদানন্দ" ভাবে "ব্রহ্মবিন্দুতে" স্থিত হয়; সে অবস্থা অব্যক্ত। তদবস্থায় জীব "শিবত্ব" প্রাপ্ত হইয়া, পরা প্রকৃতিযোগে গুণাতীতাবস্থায় "সোঽহং" ভাবে ব্রহ্মেতে যুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে তোমার দেহকে তিন খণ্ডে পৃথক্ করিতে বলিয়াছি, তাহা যমন সম্ভবপর নয়; সেইরূপ অকার, উকার, মকার বাচক প্রণব স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবাত্মক পরমাত্মা বা ব্রহ্মের যে সকল অবস্থা তাহাও পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে খণ্ড খণ্ড করা অসম্ভব। তোমার দেহটি যমন তুমি নও, তোমার সাকার-অবস্থা; ঐ "অকার" "উকার" "মকার"-যুক্ত

প্রণব বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, সাকার মূর্ত্তিও সেই প্রকার পরমাত্মার রূপ নহে ; উহাও তাঁহার সাকার-অবস্থা। তোমার দেহের তিন খণ্ড একত্রে সংযোজিত না থাকিলে যেমন তোমার "সাকার" অবস্থা বা দেহের স্বরূপস্বভাব নষ্ট হয়, তদ্রূপ বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বিভক্ত করিয়া, পৃথক্ জ্ঞান করিলেও পরমাত্মার সাকারভাব নষ্ট হয়। তোমার দেহের তিন খণ্ড যেমন এক হইতেই তিন ও তিনের সমষ্টিযোগে এক ; অকার, উকার মকার বাচক বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তেমনি এক ব্রহ্ম হইতেই তিন এবং উক্ত তিনের যোগেই "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" অর্থাৎ অকার, উকার, মকার-বাচক প্রণব ; এতন্মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক' পুরুষ' এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণীরূপা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তিই "প্রকৃতি"।

এই প্রকৃতি-পুরুষ অভেদাত্মক যে "বিন্দু" তিনিই ব্রহ্ম। ইচ্ছা-জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ ভিন্ন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াত্মক কোন কর্ম্মই সাধিত হইতে পারে না। বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর যেমন ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তির যোগে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারও ইচ্ছা-জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির যোগে তোমার স্থূলদেহ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধান করিতেছে। উহারাই স্থূলভাবে তিন অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। উহাদের তিনের সংযোগস্থলই তোমার দেহের ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি এবং অকার, উকার, মকার বাচক প্রণবস্বরূপে তোমার ব্রহ্মগায়ত্রী। নাভি হৃদি মূর্দ্ধারূপ ত্রিসন্ধি এবং সন্ধ্যার ত্রিগুণাত্মক স্থূল উপাস্য-মূর্ত্তিরূপা ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ; উহারাই তোমার দেহের পুরুষ ও প্রকৃতি। উহারাই তোমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক ঈশ্বর বা প্রাণাত্মা। সদ্গুরুর উপদেশে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তির সাধনারূপ ক্রিয়া কৌশলে প্রকৃতি-পুরুষের যোগ বা জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ সম্পাদনই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর পূজন বা "আত্ম-দর্শন-যোগ"।

জীব অবিদ্যারূপিণী মায়া কুহকিনীর মোহে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া অনিত্য সংসারক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সদ্‌গুরু কৃপায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ আত্ম-জ্যোতিঃ-যোগযুক্ত হইলেই অজ্ঞানরূপ মায়ান্ধকার বিনাশ হয়। সে অবস্থায় জীব নিজেকেই শিবস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ক্রমে প্রকৃতি পুরুষের অভেদ স্বরূপ "পরা" অবস্থা অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা ব্রহ্মৈকত্বভাবে "সোঽহং" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"সংসার অনিত্য অতি, ভ্রমে তাহে ভ্রান্তমতি,
জীবগণ মায়ার অধীন।
নিজে শুদ্ধ শিবরূপ, নাহি জানে নিজরূপ,
ভাবে নিজে জীবরূপ দীন॥
আত্ম-তত্ত্ব অনুসারে, শিবরূপ আপনারে,
জানিলে জীবত্ব হয় নাশ।
নাহি থাকে মায়া লেশ, আত্মভাবে শুদ্ধবেশ,
পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশ॥"

এতাদৃশ জ্ঞানশিক্ষার জন্যই ঈশ্বরপূজার বিধান।

শিষ্য—গুরুদেব! ঈশ্বরপূজা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানগম্য উপদেশ লাভ করিয়া, আমার অজ্ঞানান্ধকার যেন নিবৃত্তি পাইতেছে। আমি এখন পূজার উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এতাদৃশ জ্ঞান অধিকাংশ জীবের ভাগ্যেই দুর্ল্লভ হওয়ায়, তাহারা দেহকেই আত্মা ভ্রমে কেবল দেহের ভোগ সুখ বিধানজন্য বাহ্যাড়ম্বর লইয়াই অমূল্য জীবন নষ্ট করে। আমি আপনার উপদেশমত কার্য্য করিয়া কোন কোন বিষয়ে অনুভূতিও লাভ করিয়াছি।

গুরু—বৎস! আমি তোমার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ক্রমে অভ্যাসে অনেক বিভূতি দর্শন করিতে পারিবে। কিন্তু এতদ্দ্বারা "বাহ্য পূজার" আবশ্যক নাই, তাহা মনে করিও না। তবে যে ভাবে ইদানীং বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বাহ্যপূজা না বলিয়া পুতুলখেলা বলিলেও চলে, কারণ বাহ্য পুজা বড় কঠিন। মানসপূজার অভ্যাসে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম এবং মনের ইচ্ছাশক্তিকে ঘনীভূত করিতে না পারিলে বাহ্যপূজার অধিকার জন্মে না, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং জ্ঞান বা শক্তি অভাবে বাহ্যপূজা পুতুলখেলায় পরিণত হইতেছে। বাহ্য পূজার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বভূতে মহেশ্বর দর্শন। সে বড়ই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

শিষ্য—গুরুদেব! আমাকে দয়া করিয়া, সেই ভাবে বাহ্যপূজার জ্ঞান-উপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করুন্।

গুরু—বৎস! তুমি আত্ম জ্ঞান-যোগে দেহী ও দেহতত্ত্ব না বুঝিলে বাহ্য-পূজার তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না।

শিষ্য—আপনার আত্ম-দর্শন-যোগের উপদেশে সেই ভাবের অনুষ্ঠান করিয়া আমি অনেক তত্ত্বই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি এবং আপনার কৃপা প্রদত্তশক্তিতে, আমি আত্মা বা ইষ্টদেব সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষানুভব করিতেছি, তাহা সচরাচর সাধারণ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইয়াছি; এখন আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে "সর্ব্বভূতে-মহেশ্বর-দর্শন-রূপ" বাহ্যপূজার জ্ঞান প্রদান করুন্। আপনি বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বভূতে মহেশ্বর দর্শন না হইলে, জীব চৈতন্য সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অপরন্তু জড়-সমাধি অপেক্ষা চৈতন্য-সমাধি অবস্থা শ্রেষ্ঠ।"

গুরু—হাঁ বৎস! চৈতন্য সমাধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; কিন্তু সূক্ষ্মের দ্বারা স্থূলকে না বুঝা পর্য্যন্ত সে অবস্থা লাভ হয় না। পরন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ব লাভ করিতে

হইলেও স্থূলদেহের অনেক তত্ত্ব না জানিলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান পরিপক্ক হয় না বিধায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে "বিশ্বরূপ দর্শন" ও ভক্তিযোগের পরে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগের উপদেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা দেহী ও দেহ বা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। মনে কর তুমি যে ক্ষেত্রের অধিপতি, সেই ক্ষেত্রের কোন সম্বাদ বা তত্ত্ব না জানিলে, অনায়াসে তাহা অপরে দখল করিয়া ভোগ তছরূপ করিতে পারে। জীবের এই ক্ষেত্রতত্ত্বে জ্ঞান না থাকা বশতঃই তাহারা রিপু ও ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতেছে।

শিষ্য—গুরুদেব! ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন, সাধারণ মানব যেমন অজ্ঞানী, তাহাদের জ্ঞানদাতাও যদি তাদৃশ অজ্ঞানী হয়, তাহা হইলে এই সকল গুরুতর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপে জ্ঞান লাভ হইবে? কাজেই তাহারা চিরজীবনেও রিপু ও ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব বন্ধন হইতে দেহকে মুক্ত করিতে পারে না। আপনি বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রতত্ত্ব যোগের প্রধান অঙ্গ এবং আত্মাই দেহক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন দেহের অন্যান্য অবস্থা ও তত্ত্ব দয়া করিয়া উপদেশ করুন।

গুরু—বৎস! বাল্য, যৌবন, জরা, জন্ম, মৃত্যু, ইহা যেমন দেহের অবস্থা, সুষুপ্তি স্বপ্ন, জাগ্রতও তদ্রূপ অবস্থা। এতন্মধ্যে জ্ঞানই জাগ্রত অবস্থা; অজ্ঞানই নিদ্রাবস্থা। অপরন্তু দেহ বা সংসারকে নিত্য বোধ করা স্বপ্নাবস্থা।

শিষ্য—অজ্ঞান যে নিদ্রাবস্থা তাহা বেশ বুঝিয়াছি, এখন দেহস্থ পঞ্চ কোষ কি কি জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময়। তন্মধ্যে (১) অন্নময় কোষ—এই স্থূলশরীর। (২) প্রাণময় কোষ—পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়।

(৩) মনোময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। (৪) বিজ্ঞানময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে আখ্যাত হয়। (৫) আনন্দময় কোষ—প্রিয় সন্তোষ ও আনন্দ বৃত্তিমান্ এবং "অজ্ঞান" প্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময়কোষ বলে।

শিষ্য—ভগবন্! দেহের ভিতরের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে অন্তঃপূজা বা ইষ্ট সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং এ বিষয়ে দয়া করিয়া একটু বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু—তোমার এই শুভেচ্ছায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তোমাকেও সংক্ষেপে আমি তাহাই বলিতেছি। তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর। আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটী বিষয় বলিব।

অন্নময়কোষ এই স্থূলশরীর, ইহা বলিয়াছি; স্থূলশরীর সম্বন্ধে অন্যান্য বিস্তারিত তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোষই জীবন নামে উক্ত হয়। ঐ প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে সংকল্প বিকল্পাত্মক মন, ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই মনোময় কোষ সূক্ষ্মদেহের দ্বিতীয় আবরণ হইলেও, প্রাণময় কোষের সহিত মনোময় কোষ বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। তদ্ধেতু প্রাণময় ও মনোময় কোষের অবস্থা একসঙ্গেই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনোময় কোষ হইতেই "আমি, আমার" "তুমি, তোমার" ইত্যাকারভাব-সঞ্জাত হইয়া নাম রূপাদিভেদ-কল্পিত অবস্থায় ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, ধৃতি, স্মৃতি, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, মমতা, অভিনিবেশ, মিথ্যাজ্ঞান, বিচার, বিতর্ক, অনুমান, সিদ্ধান্ত, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি ভাবগুলি প্রাণময়-কোষ

কম্পিত করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাকার ভাবে মনোময় কোষের স্পন্দন ও কম্পনে শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত হইয়া, বাহিরে প্রকাশিত হয়। প্রাণময় কোষের ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া নাভিমূলে অবস্থিত; মনোময় কোষের স্থান মস্তক-অভ্যন্তরস্থ ললাটে। মনোময়কোষে আকুঞ্চন প্রসারণ ও সংরক্ষণ শক্তিত্রয় অবস্থিত। মন তাহার আকুঞ্চনশক্তিবলে সংকোচ, প্রসারণ-শক্তিবলে বিস্তার ও সংরক্ষণ শক্তিবলে বিষয়াদি গ্রহণ এবং পোষণ করিয়া, তাহাকে ভাবের অনুযায়ী আকারে পরিণত করে, তাহার নামই ধৃতি।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য। ইচ্ছা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, বিবেক, বৈরাগ্য ও বিবেচনা প্রভৃতি এই বিজ্ঞানময়কোষ হইতেই স্বাধীন জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রস্বরূপে, মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে থাকিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতিমার্গ অবলম্বনে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। মন বহির্জগৎ হইতে যে সকল বিষয় গ্রহণ করে, মনের প্রাগুক্ত শক্তিত্রয়, তাহা চিন্তা, কল্পনা ধারণা ও উপলব্ধি দ্বারা উহা পরিবর্দ্ধন ও প্রসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞান-ময়-কোষলব্ধ নির্ব্বাচন, বিচার ও যুক্তি সহযোগে, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রকৃতির শক্তি বিভিন্নতা অনুসারে বিজ্ঞানময়কোষের ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়।

ঈদৃশ বৈরাগ্য ও বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানময়কোষের ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি, মন ও ইন্দ্রিয়লব্ধ বহিঃস্থ বিষয়ের আকর্ষণে, সতত তদ্ভাবে তাহার অধীন এবং তন্মুখাপেক্ষী হইয়া, নিয়ত চঞ্চল থাকে বিধায়, সম্যক্ ধারণার অশক্ততা প্রযুক্ত ঐ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি, স্বীয় স্বভাবানুযায়ী উহা-দিগকে অপরা বা অবিদ্যাক্ষেত্রে বিপরীতভাবে রূপান্তরিত করিয়া লয় এবং ঐ রূপান্তরিত ইচ্ছাশক্তিতে প্রাণময়কোষ কম্পিত করিয়া, সেইভাবে প্রকাশিত হয়, তদ্ধেতু মন ও প্রাণ কেহই বিজ্ঞানময়কোষে স্থিতি লাভ করিতে

পারে না কারণ মন বহির্জগতের রূপরসাদির প্রলোভনে সতত অপরা প্রকৃতির অনুগত ভৃত্যস্বরূপে রূপরসাদির অনুধাবন করিয়া থাকে। প্রাণশক্তি "অহংতত্ত্বের" রজোংংশে উৎপন্ন বিধায় অহংতত্ত্বের সত্ত্বাংশ উৎপাদিত মনের অগ্রে যাইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। এ জন্যই বায়ুর অগ্রে মনের গতি সঞ্চারিত হয়। (বাতাগ্রে চলতে মনঃ) এ নিমিত্ত আমি সর্ব্বাগ্রে মনকে স্থির করার কথাই পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি। একাগ্রতা-যুক্ত যে কোন উচ্চতর স্থিরলক্ষ্যে ঐ মনকে স্থিত করিতে পারিলে, সমস্ত কর্ম্ম আপনা হইতেই সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিবে। একমাত্র মনের চঞ্চলতাই সমস্ত কর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। সুতরাং মনকে স্থির করাই "আত্মদর্শন-যোগের" মূলতত্ত্ব। সদ্গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান-প্রভাবে একবার মনকে "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত করিতে পারিলেই, প্রাণময়কোষ সহ মনোময়কোষ স্থির হয়। মন স্পন্দন রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে আর প্রাণময়কোষে কম্পন উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং প্রাণ তখন নির্ব্বাত-দীপ-কলিকার ন্যায় আপনা হইতেই স্থিরভাব ধারণ করে। অতএব বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানময়কোষস্থ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন। অপরন্তু মনোময়কোষের ইন্দ্রিয়বিষয় উৎপন্ন জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ পরাধীন। সুতরাং বিপরীত ধর্ম্ম সম্পন্ন অর্থাৎ একের আকর্ষণ পাঞ্চ-ভৌতিক নশ্বর স্থূলদেহস্থ অপরান্তরে বা সংসারে, অপরের আকর্ষণ নিত্য অবিনশ্বর, পরান্তর "ব্রহ্মবিন্দুতে"। একের ভাব-বিলয়, কালের প্রভাবে; অপরের ভাব-বিলয়, পরমাত্মার একত্ব ভাবে। একের স্বভাব, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান-উৎপত্তি-বিধান; অপরের স্বভাব (জীবের) অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য প্রভৃতি সংসার-বিকার-উৎপত্তি বিধান। মনোময়-কোষের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র ললাটে অন্ধকারাচ্ছন্ন; বিজ্ঞানময়কোষের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র হৃৎপদ্ম বৈদ্যুতিক আলোকসন্নিভ; পলকে ঝকমকিত,

সমস্ত দেহের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশক। সুতরাং মনোময়কোষের ইচ্ছাশক্তি বৈরাগ্য আকারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়জনিত চঞ্চলতা রহিত ভাবে স্থির করিতে পারিলে, প্রাণও যে তাহার অনুগামী হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পূর্ব্বেই তাহা বলা গিয়াছে ; ইহার নামই "আত্ম-জ্ঞান-যোগ"। পরন্ত মন, প্রাণ এতদুভয়কে উভয় শক্তি সাহায্যে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামাদিরূপ কর্ম্মযোগে মন ও প্রাণের স্পন্দন ও কম্পনাদি নিরোধ করিতে পারিলে, তদুভয়ের স্থিরতাই রাজযোগ বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত রাজযোগ বলে মন ও প্রাণ উভয়েই সমসঙ্গী ভাবে বিজ্ঞানময়-কোষে সম্মিলিত হইয়া, বিজ্ঞানময়কোষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ভাব প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারাই জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানময় পরমাত্মা বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই পরমাত্মা বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের নামই "আত্মদর্শন-যোগ"। প্রাগুক্ত সাধন-বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানবলেই এবম্প্রকার আত্মদর্শন-যোগাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানময় কোষে প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই চিত্ত আনন্দময় কোষে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা উপলব্ধি যোগ্য। অতএব "আত্মদর্শনযোগ" মন প্রাণেরই খেলা মাত্র।

এই মনঃ প্রাণতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে যথাযথ স্থানে ইহাদের আরও পরিচয় প্রদত্ত হইবে। কেবল মাত্র শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ করিয়া মনস্তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব বিষয় সম্যক্‌রূপে প্রণিধান হইতে পারে না বিধায়, সদ্‌গুরূপদেশ মত নিদিধ্যাসন দ্বারা প্রত্যক্ষোপলব্ধিযুক্ত জ্ঞান স্থিত রাখিতে পারিলেই - "আত্মদর্শন-যোগের" প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সূক্ষ্ম বিজ্ঞানতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করিয়া বুঝান কঠিন। ইহাও কার্য্য কারণাবলম্বনে গুরুমুখী ভাবে শিক্ষাযোগ্য।

অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহের বিবরণ।

সমস্ত প্রাণিগণের স্থূলদেহের পরিমাণ তাহাদের স্ব স্ব অঙ্গুলির ষড়্নবতি অঙ্গুলি পরিমিত। প্রাণবায়ুর পরিমাণ তদপেক্ষা দ্বাদশ অঙ্গুলি অধিক। মায়োপহিত চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। সেই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও স্থূলদেহের উৎপত্তি।

পিতামাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই পঞ্চকোষবিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হইতে থাকে ; তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, এই সকল পিতা হইতে। আর ত্বক্, মাংস, রক্ত এ সকল মাতা হইতে জন্মে। স্থূলদেহে এবম্প্রকার ষড়্বিধ ভাব বিদ্যমান আছে।—

"ভাবাঃ স্যুঃ ষড়্বিধাস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রসজা আত্মজাঃ সত্ত্বসংভূতাঃ স্বাত্মজাস্তথা॥
মৃদবঃ শোণিতং মেদো মজ্জাপ্লীহাযকৃদ্ গুদম্।
হৃন্নাভীত্যেবমাদ্যাঃ স্যুর্ভাবা মাতৃভবা মতাঃ॥
শ্মশ্রুরোমকেশস্নায়ুশিরাধমনয়ো নখাঃ।
দশনাঃ শুক্রমিত্যাদি স্থিরাঃ পিতৃসমুদ্ভবাঃ॥
শরীরোপচিতির্ব্বর্ণো বৃদ্ধিস্তৃপ্তির্ব্বলং স্থিতিঃ।
অলোলুপত্বমুৎসাহ ইত্যাদীন্ রসজান্ বিদুঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ভাবনা।
প্রযত্নো জ্ঞানমায়ুশ্চেন্দ্রিয়াণীত্যেবমাত্মজাঃ॥"

শিবগীতা ৯ম অঃ।

এই শরীর সম্বন্ধে মাতৃজ, পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বসম্ভূত এবং স্বাত্মজ এই ছয় বিধ ভাব আছে। তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, মজ্জা, প্লীহা, যকৃৎ, গুহ্যদেশ, হৃদয়, নাভি এই মৃদু পদার্থরাশি মাতৃজ। শ্মশ্রু, রোম, কেশ, স্নায়ু, শিরা,

ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র ইহারা পিতৃজ। শরীরোপচিতি—অর্থাৎ উৎপত্তি-কালে শরীরের স্থূলতা; গৌর, শ্যামাদি বর্ণ, বৃদ্ধি—অর্থাৎ ক্রমে শরীরের উপচয়, তৃপ্তি, বল; স্থিতি—অর্থাৎ অবয়বের দৃঢ়তা অকার্পণ্য উৎসাহ ইহারা রসজ অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুজ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ু ও ইন্দ্রিয় ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্ম্মজ। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাগত মনই এই প্রারব্ধ সংগ্রহীতা। কারণ পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে যে, প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়। তন্মধ্যে স্থূল ভাগ মল, মধ্য ভাগ মাংস, শেষ সারভাগ "মন"-রূপে পরিণত হয়।

দেহো মাত্রাত্মকস্তস্মাদাদত্তে তদ্‌গুণানিমান্।
শব্দঃ শ্রোত্রং মুখরতা বৈচিত্র্যং সূক্ষ্মতা ধৃতিঃ ॥
বলঞ্চ গগনাদ্বায়োঃ স্পর্শশ্চস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
উৎক্ষেপণমবক্ষেপাকুঞ্চনে গমনস্তথা ॥

প্রসারণমিতীমানি পঞ্চকর্ম্মাণি রুক্ষতা।
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানসমানোদান সংজ্ঞকান্ ॥
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
দশৈতা বায়ুবিকৃতিস্তথা গৃহ্ণাতি লাঘবম্ ॥

শিবগীতা ৯ম অঃ।

এই দেহ মাত্রাত্মক অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূত তাদাত্ম্যেই উৎপন্ন। সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই স্থূলদেহস্থ শ্রোত্রেন্দ্রিয়; আকাশ হইতে, শব্দ বক্তৃত্ব, কর্ম্মকুশলতা, লঘুত্ব, ধৈর্য্য, ও বল এই সপ্তগুণ গ্রহণ করে। ত্বগিন্দ্রিয়; বায়ু হইতে, স্পর্শ, উৎক্ষেপণ,

অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রসারণ ও কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশপ্রকার বায়ুবিকৃতি ও লঘুতা এই একোনবিংশতি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ। বায়ুর অবস্থিতি স্থান ও ক্রিয়াদি পশ্চাৎ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

"অগ্নেস্তু রোচকং রূপং দীপ্তং পাকং প্রকাশতাম্।
অমর্ষতীক্ষ্ণসূক্ষ্মাণামোজস্তেজস্তু শূরতাম্॥
মেধাবিতাং তথাদত্তে জলাত্তু রসনং রসম্।
শৈত্যং স্নেহং দ্রবং স্বেদং গাত্রাণাং মৃদুতামপি॥
ভূমের্ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং গন্ধং স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ গৌরবম্।
ত্বক্সৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥

শিবগীতা ৯ অঃ

তেজ দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয় শ্যামিকাদিরূপ, শুক্লরূপ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকাদি শক্তিপ্রকাশিতা, স্ফুর্ত্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা কৃশতা, ওজঃ, সন্তাপ, পরাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে ধারণাশক্তি, রসনেন্দ্রিয়, ষড়্‌বিধরস, শৈত্য, স্নেহ, দ্রব, ঘর্ম্ম, এবং শরীরের মৃদুতা গ্রহণ করে। পৃথ্বী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, স্থিরতা, ধৈর্য্য, গুরুত্ব, ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র ধাতু উৎপন্ন হয়।

"অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্যান্মধ্যমোরুধিরং ভবেৎ।
কনিষ্ঠ ভাগঃ প্রাণঃ স্যাত্তস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ॥"

শিবগীতা ৯ অঃ।

জলের স্থূলভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়। তদ্ধেতু প্রাণকে জলময় বলে। তেজ অর্থাৎ তেজময় ঘৃতাদির

স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যমভাগ মজ্জা, শেষভাগ বাগিন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়। তজ্জন্য বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলা হইয়া থাকে।

"বাতপিত্ত কফাশ্চাত্র ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দশাঞ্জলি জলং জ্ঞেয়ং রসস্যাঞ্জলয়ো নব॥
রক্তস্যাষ্টৌ পুরীষস্য সপ্ত হি শ্লেষ্মণশ্চ ষট্।
পিত্তস্য পঞ্চচত্বারো মূত্রস্যাঞ্জলয়স্ত্রয়ঃ॥
বসায়া মেদসো দ্বৌতু মজ্জাত্বঞ্জলিসম্মিতঃ।
অর্দ্ধাঞ্জলি তথাশুক্রং তদেব বলমুচ্যতে॥"

শিবগীতা ৯ম অঃ

এই শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শরীরে জল দশ অঞ্জলি পরিমিত, রস নয় অঞ্জলি, রক্ত অষ্ট, পুরীষ অর্থাৎ মল সপ্ত, শ্লেষ্মা ষষ্ঠ, পিত্ত নবম, মূত্র তিন, বসা দুই ও মেদ দুই, মজ্জা এক অঞ্জলি ও শুক্র অর্দ্ধ অঞ্জলি পরিমিত আছে। এই শুক্রই বলপ্রদ, এজন্য ইহাকে বলস্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

অপরন্তু এই শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি আছে। উহা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যথা জলজ, কপাল, রুচক, তরুণ এবং নলক। এই শরীরে দ্বিশত দশ সংখ্যক অস্থিসন্ধি আছে। এই সন্ধিস্থস্থানগুলি রৌরব, প্রসর স্কন্দসেচন, উলূখল, সমুদ্গত, মণ্ডল, শঙ্খাবর্ত্ত, বামনকুণ্ডল এই অষ্ট নামে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন এই শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি রোম এবং ত্রিলক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ আছে।

বায়ু ও অগ্নির সমতা।

ঈশ্বরপূজারূপ যোগাভ্যাস দ্বারা আপন দেহ মধ্যস্থ বায়ু ও অগ্নির সমতা অথবা ন্যূনতা সাধন করাই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

বায়ু জয় করা।

ঈশ্বরপূজনরূপ যোগাভ্যাস বলে আত্মস্থিত যোগবহ্নি দ্বারা বায়ুকে জয় করা যায়। সদ্গুরূপদেশে এই যোগকৌশল, যে সাধক, যত পরিমাণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি প্রকৃতিকে (অর্থাৎ অষ্ট প্রকৃতিযুক্ত ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়বিষয়কে) তত পরিমাণ জয় করিবার অধিকারী হইয়াছেন। রোগ ব্যাধি, হর্ষ, দুঃখ, ভয়, শোক, মায়া, মোহ সহজে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। এই শক্তিবলে সাধক ইচ্ছামৃত্যু অথবা জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পুস্তকপাঠে হয় না। এই শক্তি ক্রমে তোমার ভিতরে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিবে।

প্রাণিগণের বহ্নিস্থান।

প্রাণিগণের দেহমধ্যে উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাশালী অগ্নিস্থান আছে। এই স্থান মনুষ্যদিগের ত্রিকোণ, পশুদের চতুষ্কোণ, পক্ষীদের মণ্ডলাকার। মানবদিগের গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধভাগে এবং মেঢ্রস্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে যে স্থান উহাই দেহের মধ্যস্থান। চতুষ্পদ জন্তুগণের হৃদয়ের মধ্যস্থানই তাহাদের দেহমধ্য। পক্ষীদের উদরের মধ্যস্থানই দেহমধ্য। এই দেহমধ্যই সমস্ত জীবগণের অগ্নিস্থান। এইস্থানে সূক্ষ্মাকারে অগ্নিশিখা বর্ত্তমান আছে।

প্রাণিগণের কন্দস্থান।

মনুষ্যগণের কন্দস্থান দেহমধ্য হইতে নয় অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং চারি অঙ্গুলি বেধ বিশিষ্ট। ডিম্বের ন্যায় ইহার আকৃতি; শোণিতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। চতুষ্পদ প্রাণী ও পক্ষী প্রভৃতিদের উদরের মধ্যস্থানই কন্দ বলিয়া উক্ত হয়। এই কন্দমধ্যে নাভি অবস্থিত, নাভিতে একটি চক্র উদ্ভূত হইয়াছে। এই চক্র দ্বাদশটি "অর" (পক্ষ)

বিশিষ্ট। তদ্দ্বারা এই জীবদেহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জীব পাপ পুণ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই চক্রেই তন্তু-পঞ্জর-মধ্যস্থিত লূতকের (মাকড়্শা) ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, জীবের এই মূল চক্রের অধোভাগে প্রাণপবন নিয়তই সঞ্চারণ এবং সমস্ত জীবের জীবাত্মাই ঐ প্রাণবায়ুর উপর আরোহণ করিয়া থাকে। এই চক্রের উপরিভাগে নাভির উর্দ্ধ ও অধঃ তির্য্যক্ ভাবে কুণ্ডলী স্থান। এই কুণ্ডলী অষ্ট প্রকৃতিস্বরূপা। এই কুণ্ডলী, বায়ুর স্বচ্ছতাসঞ্চার এবং প্রত্যহ ভুক্তান্নাদি নিরোধ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কন্দস্থানের চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিজ মুখদ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। স্বীয়প্রভায় মহোজ্জ্বলা এই কুণ্ডলী যোগকালে অগ্নি সমন্বিত অপানবায়ু কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া হৃদাকাশে দীপ্তি পাইতে থাকে। তখন প্রাণ-পবন চিরসখা অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীতে গমন করিয়া থাকে। কন্দের মধ্যভাগে যে নাড়ী অবস্থিত আছে তাহার নাম সুষুম্না। এই কন্দচক্রের চতুর্দ্দিকে সমস্ত নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে।

দেহমধ্যস্থ প্রধান প্রধান নাড়ী।

"সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্ ॥

শিব সংহিতা ২য় পটল।

মনুষ্যদেহ মধ্যে তিনলক্ষ পঞ্চাশসহস্র নাড়ী বিদ্যমান আছে। যোগিগণ দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধান। তাহাদের নাম যথা—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, বারুণী, পূষা, হস্তিজিহ্বা, যশস্বিনী, বিশ্বোদরী, কুহূ, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, অলম্বুষা ও গান্ধারী। ইহাদের মধ্যে আবার তিনটি প্রধান। যথা—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এই তিনটির মধ্যে আবার একটি প্রধান, তাহার

নাম সুষুম্না ; এই নাড়ীই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং এই নাড়ীই মুক্তিমার্গ বলিয়া জানিবে। কন্দের মধ্যস্থানে এই সুষুম্না অবস্থিত। পৃষ্ঠমধ্যস্থ মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া উহা মূর্দ্ধাস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। মুক্তিমার্গে এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই সুষুম্না নাড়ী অব্যক্তা ও অত্যন্ত সূক্ষ্মা। এই নাড়ীস্থ ব্রহ্মবিবর দ্বারা কুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে সহস্রারে গমন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে মিলিতা হন। এই নিমিত্ত ইহা 'ব্রহ্মবিবর' বলিয়া বিখ্যাত। সুষুম্না মধ্য পঞ্চবর্ণে সমুজ্জ্বলা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা চিত্রানাড়ী বিদ্যমানা আছে। প্রকৃতপক্ষে সুষুম্নার মধ্যভাগকেই চিত্রানাড়ী বলা যায়। চিত্রানাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মপথই দিব্যপথ বলিয়া কথিত। যোগীরা ইহা ধ্যান করিবামাত্র পাপ সমূহ হইতে পরিত্রাণ পান। এ সম্বন্ধে তন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা তান্ত্রিক সাধকগণের বোধগম্য জন্য নিম্নে লিখিত হইল।

গুহ্যদেশের অঙ্গুলিদ্বয় উর্দ্ধে, মেঢ্রস্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারিঅঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অতি সুশোভিত একটি ত্রিকোণ মণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলকে যোণিমণ্ডল বলে। এই যোণিমণ্ডল মধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার সম্পন্না সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরমদেবতা কুলকুণ্ডলিনী নিরন্তর বিবিধ সৃষ্টি করণে সমুদ্যতা। ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী নামেও কথিতা হন। ইহাই তন্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর সংস্থান।

সুষুম্না ও ইড়া পিঙ্গলার অবস্থা।

মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিতা. ইহার মধ্যে বামভাগে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা বিদ্যমানা। ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ী মেরুদণ্ডকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটদিয়া আজ্ঞাচক্রে ত্রিবেণীসঙ্গমে

মিলিত হইয়াছে। সুষুম্নানাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া আধারপদ্মে গমন করিয়াছে। এবং আজ্ঞাচক্র হইতে ঐ সুষুম্নানাড়ী দ্বিধাভূত হইয়া মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই উভয় পার্শ্বদিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের দক্ষিণপার্শ্ব প্রবাহিতা হইয়া ইড়ানাড়ী আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণদিক হইতে, আজ্ঞাচক্র ও সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া বাম নাসা-পুটে প্রবেশ করিয়াছে এবং পিঙ্গলা, নাড়ীও উক্তরূপে আজ্ঞাচক্রের বামদিক দিয়া সুষুম্না ও আজ্ঞাচক্রকে বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবেশ করিয়াছে।

ইড়া এবং পিঙ্গলাতে চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে ইড়াতে চন্দ্রমা ও পিঙ্গলাতে ভাস্কর অবস্থিতি করেন। চন্দ্র তমোগুণময় এবং সূর্য্য রজোগুণাত্মক। রবির মার্গ বিষময়, এবং চন্দ্রের মার্গ অমৃতময় জানিবে। তাহারা উভয়ে রাত্রি ও দিবারূপে কালের বিধান কর্ত্তা। সুষুম্নানাড়ী ঐ কালের ভোক্ত্রী। ইহা অতিগূঢ়তত্ত্ব জানিও, সরস্বতী ও কুহুনাম্নী নাড়ী দুইটিও ইহার উত্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী। গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বানাম্নী নাড়ীদ্বয়ও ইহার পার্শ্বে স্থিতা। এই দুইটি নাড়ীর মধ্যস্থলে বিশ্বোদরীনাম্নী নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে। যশস্বিনী ও কুহু নাড়ীর মধ্যস্থলে বারুণীনাম্নী নাড়ী। পূষা ও সরস্বতীর মধ্যস্থলে যশস্বিনী। গান্ধারী ও সরস্বতীর মধ্যস্থলে পয়স্বিনী নাড়ী। অলম্বুষা নাড়ী কন্দমধ্য হইতে অধোমুখে গমন করিয়াছে। সুষুম্নার পূর্ব্বস্থিত কুহুনাম্নী নাড়ী মেঢ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বারুণীনাম্নী নাড়ী দেহের ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বস্থানে গমন করিয়াছে।* যশস্বিনী নাড়ী পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সুষুম্নার দক্ষিণদিকে পিঙ্গলানাড়ী ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ

* যাঁহারা বারুণীস্নান করেন তাঁহারা ইহার তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; আর দক্ষিণদিকে পূষানাড়ী পিঙ্গলার পূর্ব্বদেশে অবস্থিত হইয়া নেত্রপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যশস্বিনী দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপ সরস্বতী ঊর্দ্ধে গমন করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শঙ্খিনী ঊর্দ্ধদিকে গমন পূর্ব্বক বামকর্ণের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গান্ধারী ইড়া নাড়ীর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া বামনেত্রান্ত পর্য্যন্ত এবং ইড়া মধ্যভাগে থাকিয়া বাম নাসার অগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হস্তিজিহ্বা বাম পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বিশ্বোদরী উদর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অলম্বুষা গুহ্যদেশের মূল হইতে অধঃদিকে গমন করিয়াছে. এই নাড়ী হইতে আরও অন্যান্য বহুতর শিরা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত নাড়ীর তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। অদ্যাপিও হিন্দুর ঘরে ঘরে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য প্রণিধান করিলে এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য—গুরুদেব! ঈশ্বর পূজা বুঝাইতে এত নাড়ীতত্ত্ব বুঝাইবার কি আবশ্যক?

গুরু—বৎস! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষেত্রতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে ক্ষেত্রজ্ঞকে কি করিয়া সন্ধান করিবে? পূজা বলিতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞেরই অনুসন্ধান। তজ্জন্যই দেহশুদ্ধি, নাড়ীশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস ইত্যাদি ক্রিয়া শাস্ত্রে বিধান আছে। তাহা যথানিয়মে সম্পাদিত হইলে, দেহমধ্যেই ঈশ্বরের অনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ভিন্ন পূজার কোন ফল বা ইষ্ট সিদ্ধ হয় না।

শিষ্য—গুরুদেব! আপনি বলিয়াছেন যে মানস পূজা করিতে ধ্যান অবস্থায় তাঁহার চিন্তা করিবে। আর বাহ্য পূজা আপনি এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝান নাই। তবে দেখিতে পাই যে, ফুল দূর্ব্বা চন্দন বিল্বপত্র

নৈবেদ্য এবং কর্দ্দমত ষোড়শোপচারের পূজাদ্রব্যের আয়োজন করিতে পারিলেই ঈশ্বর পূজা হইবে। ভক্তি করিয়া দিলেই পূজা হইল।

গুরু—বৎস! ভক্তিকথা বড়ই উচ্চাঙ্গের কথা। চিত্তবৃত্তির সংযম না হইলে অর্থাৎ "শান্তভাব" উপস্থিত না হইলে ভক্তির উদয় হয় না। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর ভক্তি। এ জন্য গীতায় "বিশ্বরূপ" দর্শনের পরে ভগবান্, অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনেরও বিশ্বরূপ দর্শনের পরেই ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। অন্তঃকরণ কামনাহীন বা বিষয় বৈরাগ্যই ভক্তিলাভের পূর্ব্ব লক্ষণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতে উক্ত আছে—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

ভাগবত ১।২।৭

ভগবানে ভক্তি অর্পিত হইলে অচিরেই বৈরাগ্য সঞ্চার হয়, এবং তৎপরেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সার্ব্বজনীন্ প্রেম লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যাহা. তাহা ভক্তির অভিনয় মাত্র অর্থাৎ বিষয়াসক্তির নামান্তর মাত্র। সুতরাং উহাতে ঈশ্বর বা দেবতা পূজা হয় না। যদি ঐ ভাবেই পূজা হইত তবে ভগবানের এরূপ পাটোয়ারী বা বণিগ্ ভক্ত অনেক আছে যে, তাহারা এক এক জনে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ফুল বিল্বপত্র, বাজারের চাউল কলা, মিঠাই কাপড় গহনা ইত্যাদি যত পূজোপকরণ আছে, প্রাতে উঠিয়াই "শ্রীশ্রীগোবিন্দায় নমঃ" বা "মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া সব নিবেদন করিয়া রাখিবে। অত হাঙ্গামের আবশ্যক কি? (এই সময়ে দ্বিতীয় শিষ্য প্রশ্ন করিলেন।)

২য় শিষ্য—সে কি কথা প্রভো! মূল্য দিয়া দ্রব্যাদি খরিদ না করিলে তাহা কি করিয়া ভগবানে নিবেদিত হইতে পারে? ফুল দূর্ব্বা বরং ক্ষেত্র

হইতে চয়ন করিয়া আনিলে হয়, কিন্তু অন্যান্য উপকরণ বাজারের জিনিষ, অর্থদিয়া তাহা খরিদ করিতে হইবে। ঠাকুর দেবতার পূজা; এত আর মাঠের গরুর দ্বারা বৃষোৎসর্গ করিলে চলিবে না যে, লোক দেখাইয়া গরু আবার ছাড়িয়া দিলাম।

গুরু—কেন হইবে না বৎস! তোমরা বলিয়াছ ভক্তি করিয়া দিলেই পূজা হইবে। আর—সব জিনিষ যদি অর্থ দিয়া আনিলেই পূজা হয়, তবে বেশ তাহাই কর। প্রথমে অর্থদিয়া দেবতা আন, তবে ত পূজা হইবে। ইত্যবসরে তৃতীয় একটি (তার্কিক) শিষ্য উত্তর করিল।

৩য় শিষ্য—কেন মহাশয়! যাহারা প্রতিমা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে মূল্য স্বরূপ অর্থ দিয়াই ত ঠাকুর লইয়া আসা হয়।

গুরু—বেশ কথা বৎস! আচ্ছা—তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার ইষ্ট দেবতা কি বাজারে বিক্রয় হয়?

৩য় শিষ্য—দেবতা বাজারে বিক্রয় কি করিয়া হইবে? দেবতার মূর্ত্তি বাজারে বিক্রয় হয়।

গুরু—বৎস! এতক্ষণে ঠিক পথ ধরিয়াছ, ঐ মূর্ত্তি খরিদ করিয়া আনিলেই ত দেবতা আনা হয় না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মূর্ত্তি আর দেবতা পৃথক্ জিনিষ। তোমার দেহ আর তুমি যেমন পৃথক্, তদ্রূপ ঐ মূর্ত্তি আর দেবতা পৃথক্। ঐ দেবতার মূর্ত্তি যেরূপ অর্থদিয়া খরিদ করিয়া আনা হয়, দেবতাকেও সেইরূপ পরমার্থ মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া আনিতে হয়। তোমার সেই পরমার্থ সঞ্চিত থাকিলে ত তাহা দ্বারা দেবতা আনা হইবে।

৩য় শিষ্য—দেবতাকে পুরোহিত ঠাকুর আনিবেন। সে জন্য ত তাঁহাকে দক্ষিণাই দিয়া থাকি।

গুরু—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পুরোহিত ঠাকুর মূল্য লইয়া দেবতা বিক্রয় করেন, না হয় ভাড়াদিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। কিন্তু বৎস! তাহা নহে। পূজার দক্ষিণা দেবতার মূল্য নহে বা ভাড়াও নহে; তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ। তাহা সময়ান্তরে বুঝাইব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরমার্থ যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিয়াছে, দেবতা তাহার আহ্বানে কখনও আসেন না। ইষ্ট পূজা নিজেই করিতে হয়। নিজেরা অসমর্থ হইলে **পুরোহিতকে প্রতিনিধি ভাবে** বরণ করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট নিজের পরমার্থরূপ, ভক্তি শ্রদ্ধা ও জ্ঞান সমর্পণ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে সংকল্প বা শপথ গ্রহণ করিয়া পুরোহিত বরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ পরমার্থ সঞ্চয় না থাকিলে শুধু বেনারসীজোড় ও সুবর্ণ নির্ম্মিত বরণাঙ্গুরী প্রদান করিলেই "আত্মশক্তি সমর্পণ মূলক" প্রতিনিধি, প্রকৃতভাবে বরণ করা হয় না; কারণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম ভিন্ন ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞানরূপ পরমার্থ বিকাশ বা চিত্তের মলিনতা দূর হয় না। এই মলিনতাই পাপ সুতরাং পাপযোগে যেমন যাত্রা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ পাপযোগে ধর্ম্ম-কর্ম্মও নিষিদ্ধ। এ বিষয় পুনঃ পুনঃ আর কি বলিব।

৩য় শিষ্য—গুরুদেব দয়া করুন। আপনার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্ত হইতেছে। আহা! জীব কি কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন। তাহারা মনে করে যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বাড়ীতে আনিয়া, নৈবেদ্য বস্ত্রালঙ্কার ফুল দুর্ব্বা বিল্বপত্র প্রভৃতি উপকরণ দিলেই পূজা হইল। এখন দেবতা আনার কৌশল কি, আপনি সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া বলুন। আমি কথা বুঝিবার জন্যই তর্ক করিতেছি ক্ষমা করিবেন।

গুরু—বৎস! পুরোহিতের দায়িত্ব অতি গুরুতর। যজমানদ্বারা দূত বা প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, যজমানের অর্পিত নির্ম্মল মন,

বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার যোগযুক্ত অন্তঃকরণরূপ কল্পিত যন্ত্র বা ঘটস্থাপন করিয়া স্বীয় সুসংযত দেহরূপ যন্ত্রে, যে স্থানে প্রাণাত্মা অবস্থিত আছে; তাহার অনুসন্ধানার্থ প্রথমে তাঁহাকে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়; অতঃপর ন্যাস প্রাণায়ামাদি যোগে স্বীয় প্রাণাত্মার চিদংশ (একটি প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা হইতে অপর আর একটি বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করার ন্যায়) ঐ যন্ত্র বা ঘটে আবাহন পূর্ব্বক স্থাপিত মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি সম্পন্ন করিবায় জন্য স্বীয় দেহ যন্ত্রটী হইতে প্রথমে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কৌশলে যন্ত্রীরূপ প্রাণাত্মা বা মহেশ্বরকে আকর্ষণ (প্রগাঢ় ইচ্ছাশক্তি বলে) করিতে পারিলে তাহাকে যে কোনও যন্ত্রের কাছে রাখ তাহা প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত হইবে। কারণ সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে সমস্ত যন্ত্রেরও তিনিই যন্ত্রী। যখন যে যন্ত্রে তাঁহার আবির্ভাব হইবে তখনই সেই যন্ত্র আপেক্ষিক শক্তি অনুসারে স্পন্দিত বা চৈতন্যশীল হইবে। তিনি যে যন্ত্রমধ্যে আবির্ভূত না হইবেন সে যন্ত্রই স্পন্দনরহিত বা অচৈতন্য থাকিবে। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যন্ত্রের সহিতই তাঁহার সংযোগ আছে। বীণাযন্ত্রের ন্যায় উদারা, মুদারা, তারা এই তিনখণ্ডে (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সপ্ত স্বরায়, তাঁহার যন্ত্রের সহিত সমানঘাটে সুর বাঁধিয়া লইতে পারিলেই সাধকের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। পুরোহিত ঠাকুরের নিজের যন্ত্রটি যদি সেই ভাবে সুর বাঁধা থাকে, তবে তারহীন টেলিগ্রাফের ন্যায়, নিজের যন্ত্রে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কৌশলে, যেই শব্দ বা কম্পন উপস্থিত করিতে সমর্থ হ'ন, তখনই সেই কম্পন প্রধান যন্ত্রের যন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন যোগি-ঋষীরা এই ভাবে প্রধান যন্ত্রের সহিত স্বীয় স্বীয় যন্ত্রের সুর সমান ঘাটে বাঁধিয়া লইয়া, সংসারে বিচরণ করিতেন। সেই ভাবে পুরোহিত ঠাকুর যদি যন্ত্রবিজ্ঞানশীল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানী হন, তবে তাঁহার নিজের যন্ত্রে শব্দ বা কম্পন উপস্থিত করা মাত্র ইষ্টদেবতার যন্ত্রে প্রতিকম্পন উপস্থিত

হইবে এবং সেই শব্দ বা কম্পনশক্তির আকর্ষণ প্রবাহে, সেই দেবতাকেও স্বীয় যন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। অপরন্তু পূর্ব্ববর্ণিত যজমানের অন্তঃকরণের সদৃশ পূজার যন্ত্রটির সহিত, পুরোহিত ঠাকুরের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি যেই যোগযুক্ত করিবেন, অমনি তাহাও স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হইবে। যন্ত্রের কার্য্যকরীশক্তি, যন্ত্রপরিষ্কার ও পরিচালনের উপর নির্ভর করে। যন্ত্র যত পরিষ্কৃত থাকে ততই তাহার স্পন্দন স্থূল, সূক্ষ্ম, মৃদু, গাঢ় নানা ভাবে ইচ্ছামত অনুভূত হয়। সুতরাং যন্ত্রকে নির্ম্মল রাখিবার বা পরিচালনের ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা করিবার জন্যই নিত্যকর্ম্মযোগে সেই যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব দেহযন্ত্রের কর্ম্ম সঞ্চালন পন্থা অর্থাৎ নাড়ী ও বায়ুতত্ত্ব অবগত না থাকিলে দৈনন্দিন ভাবে কামক্রোধাদি রিপু এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির মলা বিদূরিত করা ও ইষ্টদেবতার যন্ত্রের সহিত সপ্তস্বরায় সমান ঘাটে, একস্থরে স্থর বাঁধা যায় না। এজন্যই আমি ইড়া-পিঙ্গলাদি প্রধান প্রধান চতুর্দ্দশটি নাড়ী ও বায়ুর গতিবিধির বিষয়, ঈশ্বর পূজনোপলক্ষে সংক্ষেপে তোমাদিগকে বুঝাইয়াছি। সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদিসাধনে, এ বিষয়ের জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার।

২য় ও ৩য় শিষ্য—(উভয়ে প্রণাম পূর্ব্বক) গুরুদেব! আপনার উপদেশে ঈশ্বর পূজার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। আমাদের ভ্রান্তি দূর হইল। মনে করিতাম পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্রের শব্দ সমষ্টিতে, দেবতা বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, দেহের মধ্যেই যে যন্ত্র আছে, তাহার যন্ত্রী, দেবতা বা ঈশ্বর। তাহার তত্ত্ব না জানিলে, দেবতার নিকটে মনের ভাব পৌছান যায় না। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ, সেই যন্ত্র আবৃত করিয়া আছে। তাহাদিগকে জয় করিতে না পারিলে, মন সে যন্ত্র অধিকার করিয়া, দেবতার নিকটে "ভাব" পৌছাইতে পারে না। সেই ভাবের নামই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান এবং তাহাই "পরমার্থ"। সেই

পরমার্থ সঞ্চয় ভিন্ন দেবতাসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। আমরা যাঁহাদের পূজাকরি সেই দেবতারা স্বর্গে থাকেন শুনিয়াছি। দেহের ভিতরও যে স্বর্গ অছে, তাহা কোথায়? সংক্ষেপে তাহা উপদেশ করুন।

গুরু – বৎস! এতক্ষণে অনেকটা বুঝিয়াছ। এখন দেহের স্বর্গ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বৃহদ্‌জগৎ যেরূপ চতুর্দ্দশলোক বিশিষ্ট, এই দেহরূপ ক্ষুদ্র জগতেও সেইরূপ চতুর্দ্দশটি লোক অর্থাৎ সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে পদতল হইতে.—অতল, পাতল বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল এই সপ্তপাতাল। তদুপরি—ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্তস্বর্গ। জীব ভূর্লোক নামক মূলাধারে অবস্থিত, তাহাই পৃথ্বীলোক। এই নিজদেহ ভিতরস্থ পৃথ্বীলোক হইতে সুষুম্নাপথে মনকে যে যতদূর উর্দ্ধগামী করিতে পারিবে, সে ততই স্বর্গস্থ উর্দ্ধলোকের অধিকারী হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র যেমন যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই বিদ্যালয় হইতে 'এলাউ' (টেষ্ট্) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইবার আশা করিতে পারে না; সেইরূপ জীব অন্তঃর্জ্জগতস্থ স্বর্গ লাভের অধিকারী না হইলে দেহান্তে তাহারা বহির্জ্জগতস্থ স্বর্গ লাভেরও অধিকারী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণ, যোগবলে অন্তরস্থ স্বর্গলোক উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী হওয়ায়, বহিঃস্থ স্বর্গসুখ লাভের জন্য তাঁহারা প্রয়াসী হইতেন না। পরন্তু বহিঃস্থ স্বর্গবাসী দেবতাবৃন্দ সততই তাঁহাদের নিকট অবনত থাকিতেন। ইহার নামই "মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতা; তে মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণজ্ঞেয়াস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবতা"। সুতরাং আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে, এই দেহেই আমরা যাহাতে সর্ব্বোচ্চলোকের অধিবাসী হইতে পারি, তদনুসারে যোগানুষ্ঠানের প্রথম সোপান স্বরূপ "ঈশ্বর-পূজন" শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর-পূজনযোগে মানস-ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বিধানের

প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকিও। তাহা হইলেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ স্বরূপ "আত্মদর্শন-যোগ" লাভ হইবে। ইহাই "ঈশ্বর-পূজন"-যোগে আত্ম-দর্শন লাভের মূল অভিব্যক্তি।

শিব। বিষ্ণু। ব্রহ্মা।

আত্ম দর্শন যোগ

তৃতীয়স্তর

ত্রয়োবিংশ প্রকরণ।

সিদ্ধান্ত শ্রবণ-যোগে-আত্ম-দর্শন।

"সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ।
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তং সিদ্ধান্তশ্রবণং বুধৈঃ॥
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি শীলবৃত্তিবতাং সতাম্।
শূদ্রানাঞ্চ স্ত্রিয়শ্চৈব স্বধর্ম্মস্ত তপস্বিনাম্॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রবণং বুধৈঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

জ্ঞানিগণ-বেদান্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্তশ্রবণ বলেন। বিপ্রগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণেরও সিদ্ধান্তশ্রবণের বিধান আছে। কেহ কেহ স্ব স্ব বৃত্তিস্থিত সাধুচরিত্র বৈশ্যগণেরও সিদ্ধান্তশ্রবণ বিহিত বলেন। শূদ্র, স্ত্রীলোক ও তপস্বিগণেরও স্ব স্ব ধর্ম্মের আচরণ ও পুরাণ শ্রবণই, উহাদের সিদ্ধান্তশ্রবণ বলিয়া বিধান আছে।

এক্ষণে সিদ্ধান্তশ্রবণ বুঝিতে হইলে সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ ভাল করিয়া প্রণিধান করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ মীমাংসা। সিদ্ধ হইয়াছে অন্ত যাহার অর্থাৎ যাহার পরে আর প্রশ্ন উত্থাপন হইতে পারে না

সেই শেষ মীমাংসিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে। এখানে সিদ্ধ অর্থ মুক্ত। সুতরাং যে শাস্ত্রের অন্তে আর শাস্ত্র নাই, সেই মুক্তি বিষয়ক শাস্ত্রের নামই সিদ্ধান্ত। ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে বেদান্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলিয়াছেন। তাহাও আবার অধিকার নির্ব্বাচন করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিসংবাদিতরূপে বেদান্তের কথাই বলিয়াছেন। বেদান্তই মুক্তি বিষয়ক অন্ত শাস্ত্র। এখন দেখিতে হইবে যে, বেদান্তকে মুক্তি শাস্ত্র বলে কেন? ইহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "আত্মতত্ত্ব" বা আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান শ্রবণ করার নামই সিদ্ধান্ত শ্রবণ। এতদ্দ্বারা ইহাও দেখা যায় যে, পুরাণাদি ঐতিহাসিক ধর্ম্ম সম্বাদ শ্রবণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয় ও সাধুচরিত্র বৈশ্যের পক্ষে শাস্ত্রব্যবস্থা নহে। পরন্তু পুরাণ শ্রবণ অধস্তন বর্ণের জন্যই বিধি বিহিত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অধস্তন বর্ণের জন্য যাহা বিধি সঙ্গত, উচ্চবর্ণের জন্য নিশ্চয়ই তাহা বিধি বিগর্হিত বা অশাস্ত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই ভাবে শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই, প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রবাক্য রক্ষা হয় এবং তাহাকেই স্বধর্ম্মনিরত ও শাস্ত্র বিশ্বাসী বলা যায়। কর্ত্তব্য অবধারণ শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য। শাস্ত্র পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইলে, তাহার শাস্ত্র পাঠে কোন ফল হয় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। এজন্য স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যে শাস্ত্র অধ্যয়নে চিত্ত স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হয়, বাল্যকাল হইতে সেইরূপ শিক্ষা বীজ রোপণ করিবার জন্যই দশবিধ নিয়ম মধ্যে, অধিকারীভেদে সিদ্ধান্ত শ্রবণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বেদান্ত শ্রবণের অধিকারিগণ প্রথম হইতে বেদান্তের "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যারূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেই মুক্তির উপায়-স্বরূপ আত্মজ্ঞান শ্রবণ করা হয়।

সর্ব্ববেদান্তবাক্যানামপি তাৎপর্য্য নিশ্চয়ম্।
শ্রবণং নামতৎ প্রাহুঃ সর্ব্বে তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

শিবগীতা ১৩ অঃ

ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করার নামই "শ্রবণ" বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তাহা মনন ও নিদিধ্যাসনবলে, কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন্মুক্ত অবস্থায়, অনাসক্ত ভাবে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া, জীব কৈবল্য লাভ করিতে সমর্থ হন। এজন্য প্রথম হইতেই "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যাযুক্ত বেদান্ত বা মীমাংসা শাস্ত্ররূপ সিদ্ধান্তশ্রবণ করিতে, অধিকারী নির্ব্বাচন একান্ত যুক্তিযুক্ত; ব্রহ্মাও ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র অনন্ত, পরমায়ু অল্প; এমতাবস্থায় যেটুকু সারভাগ তাহাই অগ্রে গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত। হংসকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ দিলে, সে যেমন জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধটুকু পান করে, সেইরূপ শাস্ত্রের যেটুকু সারভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান বা মুক্তি লাভ হয়, সেই টুকুই অগ্রে গ্রহণীয়। অন্য তিন বর্ণের পক্ষে সাধারণতঃ অন্য শাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা। কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণের পক্ষে প্রধানতঃ মুক্তি বিষয়ক মীমাংসাশাস্ত্রপাঠে "আত্মজ্ঞান" লাভের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সেই শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া অনেকেই পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র লইয়াই জীবন কাটাইতেছেন। আমার এই উক্তির প্রতিকূলে সম্ভবতঃ কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে যখন পুরাণ প্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন কি কোন ব্রাহ্মণ তাহা শ্রবণ করেন নাই? তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তাহা ইতিহাস ভাবেই শুনা হইয়াছে মহাভারতে ইহা পরিষ্কার ভাবে উক্ত আছে যে, "একদা নৈমিষারণ্যে মহর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া, কথা প্রসঙ্গে অধ্যাসীন আছেন; ইত্যবসরে লোমহর্ষণ পুত্র পৌরাণিক সৌতি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী

ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া "অত্যাশ্চর্য্য কথা" শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সূত নন্দন! এখন কোথা হইতে আসিতেছ? এবং এতকাল কোন্ কোন্ স্থান পর্য্যটন করিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বল। সৌতি বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি মহাত্মা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম; তথায় বৈশম্পায়ন মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর বহুতীর্থ দর্শন, অনেক আশ্রম এবং যথায় কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল সেই সমস্তপঞ্চকতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের দর্শনার্থ এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। হে তেজস্বী ঋষিগণ! অনুমতি করুন, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কি বর্ণনা করিব?"

"ঋষিগণ কহিলেন, ভগবান বেদব্যাস যে "ইতিহাস" কহিয়াছেন; সুরগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শুনিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন, সর্পযজ্ঞে জন্মেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই "ইতিহাস" শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।" সুতরাং ঐ সকল পুরাণ কথা যে ঋষিগণ, ইতিহাস বা আখ্যায়িকা ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা যে স্বধর্ম্মযুক্ত "সিদ্ধান্ত" শ্রবণের ভাবে শ্রবণ করেন নাই; ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। পরন্তু ঋষিগণ আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে, "যাহাতে আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক্ সম্যক্ "মীমাংসা" আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই পাপভয় নিবারণ হয়।" সুতরাং এতদ্বারা সুপ্রমাণিত হইল যে, পুরাণ কথাপ্রসঙ্গ, গল্প ভাবেই শ্রবণ করিয়াছেন। অতএব পুরাণকথা হইলে যে, ব্রাহ্মণকে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হইবে, তাহা নহে; কিন্তু শাস্ত্রোচিতভাবে সিদ্ধান্তশ্রবণ দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্বধর্ম্মানুযায়ী, সংযম-নিয়মাধীনে গঠন করিয়া "আত্মদর্শন-যোগে" মন পরিপক্ক হইলে, তদবস্থায় আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। তখন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পুরাণ ভিন্ন কোরান

শুনিলেও তদ্দ্বারা চিত্তে মলিনতা বা সংশয় উপস্থিতের আশঙ্কা থাকে না, অন্যথায় ধর্ম্মবিঘ্ন উপস্থিত হয়। পরন্তু পৌরাণিক যুগ কলির আদর্শ নহে; বৈদিকযুগই আমাদের আদর্শ। কারণ, আমরা আত্মদর্শন-যোগে সত্যের পথেই যাইব। তদবস্থায় যোগশাস্ত্রমতে আমাদিগকে ধর্ম্মগত, কর্ম্মগত, জ্ঞানগত বিঘ্ন অতিক্রম করিতেই হইবে। কুসংস্কার দূর না হইলে সমাজ অথবা সাধককে সংযম-নিয়মাদি-যুক্ত আত্মদর্শন-যোগের অনুগামী করা অসম্ভব। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত সংযম-নিয়মাদি-বহির্ভূত, শিক্ষা ও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি হওয়ায়, মানবসমাজ যথেচ্ছাচারী হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যানুসারে, যে পুরাণশাস্ত্র, অন্ত্যজ বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমানযুগে ব্রাহ্মণগণ সেই পুরাণ পাঠ, পুরাণ কথা শ্রবণ ও পুরাণানুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। এতদপেক্ষা আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইদানীন্তন সেই মীমাংসাশাস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভট্টি, রঘু, কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ ও পদাবলী সমূহ কল্পনা প্রসূত কাব্যগুলিই একমাত্র পাঠ করিয়া অনেকে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা রূপে সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্রও কুন্ঠিত হইতেছেন না। কাজেই সেইরূপ আদর্শ ও শিক্ষাবলে, সমাজের মানবগণ যে, দেহাত্মবোধী হইয়া কামনা-বাসনায় জড়িত এবং কেবলমাত্র ভোগসুখে রত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভাবের শাস্ত্র-আবর্ত্তে পড়িয়াই ধর্ম্ম-তরণী সমাজসাগরে ডুবু ডুবু হইতেছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক জঞ্জাল প্রবেশ করায়, "আত্মতত্ত্ব"রূপ মূল স্মৃতির ক্রমেই উচ্ছেদ সাধন হইতেছে। তদ্ধেতু আধ্যাত্মিক জ্ঞান একরূপ আর্য্যদেশ হইতে পলায়ন করিয়া সাগর পারে আশ্রয় লইয়াছে; আর আমরা (সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যোগিঋষীর বংশধরগণ কি না), সেই সপ্ত সমুদ্রপারস্থিত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, অনার্য্য জাতির মুখে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছি। আমরা সেই আর্য্য

বংশধরগণ কিনা, বড় বড় কালেজে অনার্য্যজাতীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট, সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে কিছুমাত্র আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ বা লজ্জানুভব করিতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ. আমাদের আত্মদর্শনোপযোগী জ্ঞাননেত্রের অভাব ঘটিয়াছে। সেই আত্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই আজ আমরা অন্ধেরন্যায় বিপথগামী হইয়া অনার্য্যজাতির পদশব্দ লক্ষ্যে, অগ্রবর্ত্তী হওয়ার দুরাশা করিতেছি। তাই আমরা স্কুল কলেজের অধর্ম্ম মূলক শিক্ষার দোষানুদর্শন করিলেও প্রকৃত সুশিক্ষার অনুবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের পরম পবিত্র টোল চতুষ্পাঠীতেও বর্ত্তমানে সেই আদর্শ প্রবেশ করিয়াছে। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া, আমরা নাটক নভেলরূপ সাহিত্য বা কাব্যের উন্মাত বিধানে বিপথগামীভাবে আমাদের অক্ষর ব্রহ্মরূপ পঞ্চাশদ্‌বর্ণময়ী ভাষা মাতৃকার **স্বর-ব্যঞ্জন "অক্ষরের"এর** ক্ষয় বিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছি এবং তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমাদের নিত্যকর্ম্মরূপ যোগানুশীলনযুক্ত *ইষ্টদেবতা বা মহেশ্বরের দৈনন্দিন পূজা উপলক্ষে, যে পঞ্চাশদ্‌মাতৃকাবর্ণযোগে,* অভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও বায়ুশুদ্ধি এবং অন্তর্ব্বহির্মাতৃকান্যাস ও ভূতশোধনাদি করা শাস্ত্রবিধান; যে পঞ্চাশদ্বর্ণের উৎপত্তি, উচ্চারণ, বিনিয়োগ, আমাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিবদ্ধ; যে পঞ্চাশদ্বর্ণের একটি পরিত্যাগ করিলে, উপাস্য দেবতা পরিত্যাগ ও আর্য্যজাতির বৈশিষ্ট্যরূপ যোগানুশীলন বা আধ্যাত্মিক-শক্তি অর্থাৎ মন্ত্র ও পুরশ্চরণ শক্তি তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ রোধ হয়, সেই পঞ্চাশদ্বর্ণের ষোড়শটি স্বর বর্ণের মধ্যে, শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাকরণ নামক কর্ষণ যন্ত্র হইতে, কেহ কেহ দুইটি, তিনটি, চারিটি পর্য্যন্ত স্বরবর্ণ বিতাড়িত করিয়া চতুর্দ্দশটি, ত্রয়োদশটি, দ্বাদশটিতে পরিণত করায়, আমাদের "বিশুদ্ধ" স্থলে, কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছেন। পুনরায় বর্ত্তমানে আবার

সেই স্পর্দ্ধাবশে তিনটি শ—(শ, ষ, স,) দুইটি ব (ব ব) দুইটি জ (জ য) প্রত্যেককে এক একটিতে পরিণত করিবার জন্য সমবেত ভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্দ্বারা কি আমাদের আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞান-বিশ্বাস নষ্ট করা হয় নাই বা হইবে না? দেশের স্বধর্ম্মরক্ষক অধ্যাপক ও গুরু-পুরোহিত বা প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিগণ এ বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? সহিত শব্দ+ষ্ণ্য— সাহিত্য; হিতের সহিত বর্ত্তমান যে; সহিত শব্দের আভিধানিক অর্থ সংযুক্ত, ইহার দার্শনিক অর্থ ধর্ম্ম-সংযুক্ত, আত্ম-সংযুক্ত বা জ্ঞান-সংযুক্ত, সুতরাং সেই মৌলিকতা ত্যাগ করিয়া সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। ইহা সাহিত্যসেবিগণ স্মরণ রাখিলে সাহিত্য দ্বারা স্বধর্ম্মের উন্নতি হইবে। স্বরবর্ণ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু মহাদেব বলিয়াছেন—

"ধূম্রবর্ণং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদ শোভিতম্।"

শিব সংহিতা।

অর্থাৎ কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে ষোড়শদল পদ্মেতে, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ, এই ষোড়শটি স্বরবর্ণ বিরাজিত; ইহা ধূম্রবর্ণ। এইরূপ আরও বহুস্থলে ইহার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা দ্বাদশ, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশটি স্বরবর্ণ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন বা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা কি আত্ম-তত্ত্বের প্রতি একবারও লক্ষ্য করিয়া থাকেন? এই অজ্ঞতা বা অনাচারমূলক শিক্ষাই যে, বর্ত্তমানে স্বধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিনাশের হেতু, তৎপ্রতি মনীষিবৃন্দের কি দৃষ্টিপাত করা সঙ্গত নহে? আত্মতত্ত্ব ও নিত্যকর্ম্মে অবিচলিত রাখিবার জন্য শাস্ত্রসম্মত ভাবে ব্যাকরণের সংস্কার সাধন করিয়া, কুশিক্ষার বীজ দূর করা কর্ত্তব্য নয় কি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, "অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যানাং" অর্থাৎ বিদ্যার মধ্যে

আমি অধ্যাত্মরূপ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সুতরাং যে শিক্ষায় সেই অধ্যাত্ম বিদ্যার সংস্কার নষ্ট হয়, তাহাই অবিদ্যা। অতএব তাদৃশী অবিদ্যা শিক্ষায় যাহারা শিক্ষিত বা কুসংস্কারাপন্ন তাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণ বা মাতৃকান্যাস, ভূতশোধন মন্ত্রদীক্ষা ও পুরশ্চরণ করিবার জ্ঞান বা শক্তি কোথায় পাইবেন? তাঁহারা প্রাণ ও অপর ঊনপঞ্চাশটি বায়ুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম-যোগে, সমস্ত বায়ুকে একমাত্র প্রাণবায়ুতে পরিণত করিয়া, আধ্যাত্মিক কর্ম্ম বা যোগানুশীলন কিম্বা ইষ্ট ও শিবপূজা, বিশুদ্ধভাবে সম্পাদনের অধিকারী কিরূপে হইবেন? অতএব স্বধর্ম্মানুযায়ী আত্মতত্ত্ব বা সিদ্ধান্তশ্রবণ না করিয়া একমাত্র পুরাণ-আশ্রয় করাতেই আত্মস্মৃতি নষ্ট হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় কি না, আজ যোগিশ্বরীর বংশধরগণ কালের দোহাই দিয়া, কলির ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আত্মশক্তির অসারতা প্রতিপাদনেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সিদ্ধান্ত-তত্ত্বরূপ আত্মতত্ত্ব ছাড়িয়া, স্মৃতি, পুরাণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুতর্কে নিজেদের ভ্রষ্টাচারের পরিচয় দিতেও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন না? অনেকে সম্মানলাভের ইচ্ছায় অথবা জন্মগত অধিকার অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেও, ক্রমে ব্রাহ্মণোচিত আত্ম-বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং তাঁহারা এতাদৃশ আত্মঘাতী না হইয়া ও সমাজের ধ্বংস-সাধন না করিয়া, অধিকার অনুসারে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রবিহিত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ-উপলব্ধ "অহং ব্রহ্মাস্মি"; আমিই সেই ব্রহ্ম বা ভর্গো-জ্যোতির্ম্ময় শিবস্বরূপ "সচ্চিদানন্দ"; ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শ্রবণে মনোযোগী হইলেই তাদৃশ সিদ্ধান্তশ্রবণ দ্বারা আত্মদর্শনের যোগ্য হইবেন এবং তদ্দ্বারাই নিজেদের দুর্দ্দশা প্রণিধান করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। অতএব এবম্বিধ একমাত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ-যোগেও "আত্ম-দর্শন" লাভ হইতে পারে।

তৃতীয়স্তম্ভ।

চতুর্ব্বিংশতি প্রকরণ।

পবিত্রতা-যোগে আত্ম-দর্শন।

মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা "আত্ম-দর্শন-যোগের" একটি প্রধান সাধনা। পবিত্রতাই পুণ্য, অপবিত্রতাই পাপ। পবিত্রতাই মনের শুদ্ধি, অপবিত্রতাই মনের অশুদ্ধি। পবিত্রতাই জ্ঞান বা ধর্ম্ম, অপবিত্রতাই অজ্ঞান বা অধর্ম্ম। মানবসমাজে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান প্রত্যেক বিষয়েতেই পবিত্র ও অপবিত্র দুইটি ভাব আছে। স্বধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে বেদবিহিত যে সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই পবিত্র এবং বেদ-বিগর্হিত ভাবে লোক-সমাজে যে সকল কর্ম্ম, কুৎসিত বা অবৈধ বলিয়া নিন্দিত, তাহাই অপবিত্র। তজ্জন্যই যোগাঙ্গের দশবিধ নিয়ম মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা, যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে।—

"বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্মযদ্‌ভবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

বেদে ও লোকে, যে কর্ম্ম কুৎসিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, সেই সকলের আচরণে যে লজ্জা হয়, তাহাকে "হ্রী" কহে। সুতরাং "হ্রী" লজ্জার নামান্তর মাত্র। উক্ত উপদেশ প্রণিধান করিলে দেখা যায়, মানসিক যে বৃত্তি অবলম্বনে বেদ ও লোকনিন্দিত কুৎসিত কর্ম্ম পরিহার হয়, সেই বৃত্তির নামই লজ্জা। সুতরাং পবিত্রতা রক্ষায় লজ্জা যে একটি প্রধান সহায়ক, তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। পরন্তু লজ্জার অভাবেই যে, প্রাগুক্ত অপবিত্র বা নিন্দিত কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে, সে বিষয়ও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে পাষণ্ড পুত্র, সাধ্যশক্তি থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার প্রতিপালন ও সেবা শুশ্রূষা না করিয়া, পক্ষান্তরে নানা প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে; যে পত্নী, স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাশীলা না হইয়া, তাহার পরিপন্থীভাবে স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা, দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঐ অধর্ম্ম ও লজ্জাহীনতা। ঐ যে কোনও কোনও দোকানদার উচিত মূল্য লইয়াও ক্রেতাকে ঠকাইতেছে, ঐ যে কোনও কোনও উকিল মোক্তারবাবু, বিপন্ন মক্কেলকে নানা ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেছে; ঐ যে কোনও কোনও ডাক্তার বাবু রোগীর নিকট হইতে ভিজিট গ্রহণ করিয়া, আরও ২।৩টা ভিজিট আদায়ের কৌশল চিন্তা করিতেছে; ঐ ভাবে যে সকল কর্ম্মচারী মালিকের নিকট হইতে বৈধভাবে বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াও অসদুপায়ে কিছু উপরি লাভ; অথবা একদিনের কার্য্যে তিনদিন অতিবাহিত করিয়া অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে; ঐ যে কোনও কোনও শিক্ষক, ছাত্রকে পড়াইতে যাইয়া ছাত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী না হইয়া, ঘড়ির কাঁটার উপর দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া আছে, ঐ যে ধর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্রে কোনও কোনও শিষ্য যজমান গুরু-পুরোহিতের জ্ঞানোপদেশ লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল বা স্বেচ্ছাচারিতায়, অনিত্য ভোগ সুখের মোহে, ধর্ম্মকর্ম্মে অবিশ্বাস পূর্ব্বক ইহপরকালের নিত্যসুখ ধ্বংস

সাধনের পন্থা সৃজন করিতেছে এবং তথা কথিত যে সকল গুরু-পুরোহিত উপরোক্ত ভাবে জ্ঞান বা শক্তি অর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র অর্থলোভে ধর্ম্মের ব্যবসা স্বরূপে শিষ্য যজমানের ইহপরকালের সুখশান্তি বা স্বধর্ম্ম রক্ষোপযোগী জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি না দিয়া, কর্ত্তব্যে উপেক্ষা বা অর্থলাভের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে; ঐ যে ব্রাহ্মণ বেদবিহিতভাবে স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া সম্মান বা অতিপূজ্য লাভের চেষ্টায় কাল্পনিক ধর্ম্মের আড়ম্বর করিতেছেন। ঐ যে কোনও কোনও ধনী বা রাজা জমিদার, ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অনাচার বা প্রজাপালনের পরিবর্ত্তে অর্থ-লালসায় প্রজাপীড়ক, বা স্বধর্ম্মপরায়ণ আশ্রিত অনুগত রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা অহঙ্কারে ধরাকে শরাজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না; ইহার মূলে সেই লোভরূপ অধর্ম্ম বা লজ্জাহীনতারূপ মানসিক অপবিত্রতা বিদ্যমান। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞাহন্তি হতাহ্রিয়ং।
হ্রীর্হতা বাধতেধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হতঃশ্রিয়ং॥"

উদ্যোগ পর্ব্ব

লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে হ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, "হ্রী" নষ্ট হইলে ধর্ম্ম থাকে না, এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রী অর্থাৎ যাহা কিছু শুভ সমস্তই নষ্ট হয়। সুতরাং যাহার চিত্তে স্বধর্ম্মজ্ঞান ও লজ্জারূপ পবিত্রতা বিদ্যমান আছে, সে কখনই লোভ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ ও লোকসমাজের নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পারে না। কারণ ঐ সকল অপবিত্র কর্ম্মই বেদবিগর্হিত মনুষ্যত্ব ভাবের বহির্ভূত আসুরিক ভাবের কর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এজন্য গীতায় পবিত্র ও অপবিত্র দুটী ভাবকে যথাক্রমে দৈব ও আসুরিক ভাবে বিভাগ

করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান-যোগে চিত্তকে দৈবমুখী করিতে না পারিলে, আসুরিক বৃত্তিরূপ শাস্ত্রনিন্দিত কর্ম্মের পরিহার কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আত্ম-দর্শনেচ্ছুকগণ আত্মজ্ঞান-যোগে পরমাত্ম-স্বরূপা, সচ্চিদানন্দদায়িনী, পরম ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি ভগবতীর শরণাপন্ন হইতে পারিলে, অপবিত্র বা নিন্দিত কর্ম্মের ভাব সহজেই বিদূরিত হয়। কারণ; তিনিই লজ্জা বা হ্রী স্বরূপা, কমলযোণি ব্রহ্মাও তাঁহাকে সেই ব্রহ্মশক্তি ভাবে স্তব করিয়াছেন।

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং "হ্রী" ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥"

* * * * *

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ; নমস্তস্যৈ।"

দেবীমাহাত্ম্য

"তুমি সর্ব্বব্যাপিণী ব্রহ্মশক্তি, তুমিই সম্পদদায়িনী লক্ষ্মী বা শ্রী, তুমিই "হ্রী" অর্থাৎ বেদনিন্দিত কুকর্ম্ম বিনাশিনী বা হ্রীং বীজরূপা ভুবনেশ্বরী, তুমিই বুদ্ধিরূপা, চিণ্ময়াত্মিকা ; তুমিই লজ্জারূপা, তুমিই পুষ্টিরূপে পোষণকারিণী ; তুমিই তুষ্টিরূপে সন্তোষদায়িনী ; তুমিই শান্তিরূপা ইন্দ্রিয় সংযম বিধায়িনী এবং তুমিই ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমাগুণ প্রদায়িনী মাতৃরূপাও তুমি। আরও বলিয়াছেন "যিনি লজ্জারূপে সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার"—

অতএব আত্মজ্ঞান-যোগে পরমাত্ম-স্বরূপা সেই "হ্রী" বা লজ্জারূপা সর্ব্ব-ব্যাপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, যোগেশ্বরী ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, সংসারে কি তাহার পক্ষে আর অশাস্ত্রীয় কোন নিন্দিত কর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা থাকে ? কিম্বা তাহার চিত্ত কখনও অপবিত্রতা বা পাপ স্পর্শ করিতে পারে ? অতএব পুণ্য বা পবিত্রতাকে

আশ্রয় করিতে হইলে, যিনি সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন; সেই বিশ্বব্যাপিনী পরমাত্মস্বরূপা চিচ্ছক্তি বা ভর্গোজ্যোতিকেই আত্ম-জ্যোতীরূপে ধারণা করিয়া, তাঁহার চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে অচিরাৎ আত্মদর্শন-যোগে সাধকের সকল অন্ধকার নাশ হইয়া, চিত্ত, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ।

"সদাযুক্ত ভক্তে আমি দেই দিব্যজ্ঞান,
দুর্ল্লভ আমায় যাতে অনায়াসে পান। ১০
অযাচিত অনুগ্রহ করিবার তরে,
গুপ্ত থাকি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি' পরে;
তাহে করি আত্মজ্ঞান—জ্যোতির সঞ্চার,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ দিয়া নাশি অজ্ঞান-আঁধার।"১১ ১০ম অঃ

ভগবৎপদে আত্মনির্ভর করিতে না পারিলে, পবিত্রতা বা "হ্রী" রক্ষা হইবার অন্য উপায় নাই। অতএব অনুক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্বধর্ম্মপালন করিয়া যাওয়াই মানবের কর্ত্তব্য। কুকর্ম্ম, কুচিন্তা, কুসংসর্গ, কুবাক্য, কুৎসা ও কু-আচরণ গোপনে করিলেই লজ্জা বা পবিত্রতা রক্ষা হয় না। সর্ব্বপ্রকার কুঅভিপ্রায় অন্তঃকরণে স্থান না দেওয়াই পবিত্রতা রক্ষা। ভগবান্‌কে স্মরণ রাখিতে পারিলেই, তিনিই মানবের অন্তঃকরণের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে আর একটি বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্রহ্মার উপদেশ ভাবে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "বেদে ও লোকে যে সমস্ত কর্ম্ম কুৎসিত বা নিন্দিত বলিয়া কথিত, তাহার আচরণে লজ্জা বোধ করিবে।" এ ক্ষেত্রে লোক বলিতে বর্ত্তমান কালের স্বধর্ম্মত্যাগী, ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত, ভ্রষ্টাচার সম্পন্ন, দেহাত্মবোধী

মানবগণের আচরণকে লোক সমাজ বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। সংসারস্থ এতদাকারবিশিষ্ট লোকের সঙ্গ বা সমাজ পরিত্যাগ না করিলে কখনও আত্মার উন্নতি সাধন বা স্বধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন,—

"তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥" ৩।৩১।৩৪

অসংযতেন্দ্রিয়, মূঢ়, দেহাত্মবোধী, অসাধু, যোষিৎক্রীড়ামৃগ; এতাদৃশ লোকের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং কেহ কেহ ইত্যাকার মানবসঙ্গকে লোকসমাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, ইহাদের আচরণকে লোকাচার দৃষ্টান্তে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন এবং কোন কোন শাস্ত্রসম্মত কার্য্যেও লোকনিন্দার ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা নিজেই ভীত হইয়া সৎকর্ম্মের নাশক হন্ ও বিবেকের বিরুদ্ধে স্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের বোঝা অবনত শিরে বহন করিয়া, স্বীয় অজ্ঞানতা হেতু ইহপরকাল নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন্ না। ভীরুতা অর্থাৎ সৎসাহসের অভাবে, মিথ্যা-লোক-নিন্দার ভয়ে, ধর্ম্মকর্ম্ম ও আত্মার যে কতদূর অবনতি সাধন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

১। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষ্কাম আধ্যাত্মিক কর্ম্ম, বৈদিকী সন্ধ্যা বা ভর্গোজ্যোতির উপাসনাই তাহার স্বধর্ম্ম। কিন্তু কোনও কোনও স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যদি অনন্যস্মরণ হইয়া, একান্তমনে সেই বেদোক্ত ধর্ম্মপালন করিবার চেষ্টা করেন; তবে দেহাত্মবোধী অজ্ঞানিগণ তাঁহাকে নাস্তিক বা "ব্রাহ্ম্য" বলিয়া নিন্দা, উপহাস, এমন কি সমাজচ্যুত করিবার জন্যও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগে বাধ্য করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে যিনি বর্ত্তমান লোকাচার বা সমাজের নিন্দার ভয়ে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন, তিনিও

নিশ্চয়ই দৃঢ়বিশ্বাস বা আস্তিক্য বুদ্ধিহীন। পরন্তু গীতার ভাষায় তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী, সৎসাহসহীন, দুর্ব্বলচেতা, কাপুরুষ সন্দেহ নাই। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহাকে প্রাচীন যোগিঋষিগণের আদর্শ-অনুযায়ী লোকাচারই সমাজ বলিয়া দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া চলিতে এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে, বর্ত্তমানে সংসারবিকারী লোকাচার বা তাদৃশ লোকসংসর্গ ত্যাগ করিয়া, আত্ম বা শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিতেই হইবে। যিনি তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম, রক্ষা করিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্যক্রমে মনের একাগ্রতা লক্ষ্যে চলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈদিকধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় নহে ; ইহা স্বয়ং ব্রহ্মাও বলিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সদা।
সবৈদিকং জপেন্মন্ত্রং লৌকিকং ন কদাচন॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

অতএব লোকনিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য করিলে, কদাচ লক্ষ্য স্থির হইবে না। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্ব স্ব গোত্রোক্ত মুনিঋষিগণের আদর্শকেই লোকাচার বলিয়া মনে করিবেন। এই প্রকার চতুরাশ্রমীদের মধ্যে যিনি যে আশ্রমাবলম্বী, তাঁহার পক্ষে সেই আশ্রমের উচ্চাদর্শই লোকাচার স্বরূপে অনুকরণীয়। ইহাই ব্রহ্মার উপদেশ। তাহা হইলেই প্রকৃতভাবে "হ্রী" বা লজ্জা রক্ষা এবং তদ্দ্বারা চিত্তপবিত্রতাবশে, "আত্মদর্শন-যোগ" লাভ হইবে।

২। যাঁহারা প্রকৃতভাবে কাশীবাস করিবার উদ্দেশ্যে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুক্তি-বিধায়ক জ্ঞানের মর্ম্ম অবগত থাকিলেও বর্ত্তমান ভোগসুখপরায়ণ দেহাত্মবোধী লোকসমাজের ভয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামনাযুক্ত কর্ম্ম করিয়া, ক্রমে মুক্তির ভাব নষ্ট করিয়া

থাকেন। কাশীতে যিনি নিজে, বিশ্বনাথ (শিব) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিম্বা যাহার পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ বিশ্বনাথ (শিব) প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিজের বা নিজের বংশের প্রতিষ্ঠিত (শিব) "বিশ্বনাথ দর্শন" করিয়া, বিশ্বনাথ দর্শন হইল; কিম্বা তাহার পূজা দেওয়ায় "বিশ্বনাথের" পূজা হইল, সে দৃঢ়জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া, অপর ব্যক্তির "প্রতিষ্ঠিত শিবকে" একমাত্র বিশ্বনাথ জ্ঞানে তাঁহার দর্শন, স্পর্শনজন্য চিরজীবন ছুটাছুটি, অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করিয়া, ঐ নিজের প্রতিষ্ঠিত শিবকে নিজেই তাচ্ছিল্য এবং দর্শনের পরিবর্ত্তে কেবল দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধাদি রিপু বৃদ্ধিজনিত অধর্ম্ম, সঞ্চয় করিয়া থাকেন; সে সময় মনে করেন না যে, কাশীর পঞ্চক্রোশীমধ্যস্ত সমস্ত শিবই ৺বিশ্বনাথ। যিনি নিজের প্রাতষ্ঠিত বা পূজিত শিবকে ৺বিশ্বনাথ বলিয়া মনে করিতে না পারেন, তিনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিলেও বিশ্বনাথের দর্শন পাইবেন না। যিনি কাশীবাস করিয়াও দেশের সংস্কারে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে "কাশী" কাশীই নয়. সাধারণ দেশতুল্য; কারণ তিনি সংস্কারে আবদ্ধ আছেন। সংস্কার হইতে মুক্ত না হইলে তিনি কিরূপে মুক্তির আশা করিবেন? যিনি জ্ঞানবলে সংস্কার হইতে কতকটা মুক্ত হইয়াছেন, তিনিও লোকনিন্দার ভয়ে অথবা অজ্ঞানমূলক অভ্যাসবশতঃ বাহিরে বিশ্বনাথের অনুসন্ধানে না ঘুরিয়া পারেন না। তাহাও আবার পরিচিত লোকচক্ষে সেই ভাবে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই, নচেৎ নিন্দার ভয়ে সে দিন ঘুম হইবে না। এইরূপ লোকনিন্দার ভয় করিতে করিতে পুনর্ব্বার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া ভেদজ্ঞানশীল হইয়া পড়েন। এ ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদে মনে রাখিতে হইবে যে, জীবের সংস্কারকে বহুত্ব হইতে একত্বে আনিবার জন্যই বিশ্বনাথ কাশীপুরী নির্ম্মাণ করিয়া, সেখানে স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত দেবগণ এই পঞ্চক্রোশমধ্যস্থ স্থানে একমাত্র বিশ্বনাথেরই

অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে এখানে সমস্ত শিবই বিশ্বনাথ। সুতরাং ঈদৃশ লোকনিন্দার ভয়ে কত লোকে যে মোক্ষফল ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করিলাম, বর্ত্তমান লোকসমাজে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং, এতাদৃশ আচরণ বা সৎসাহসের অভাবই পবিত্রতা বা লজ্জা-অপহারক।

শাস্ত্রমর্ম্ম না বুঝিয়া বর্ত্তমান কালের দেহাত্মবোধী মানব-নামধারিগণের অযথা নিন্দার ভয় করিয়া জীব যে, এরূপ কত ক্ষেত্রে সুকর্ম্মের পরিবর্ত্তে কুকর্ম্ম; ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ঈদৃশ লোকসমাজের সঙ্গত্যাগ করিতে ভগবদুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কাত্যায়ন সংহিতা বলিয়াছেন।—

"বরং হুতবহজ্বালাপিঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
নচাত্মচিন্তাবিমুখজনসংবাসো বিধেয়ম্॥"

অগ্নিদাহমধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি আত্ম-চিন্তাবিমুখ অর্থাৎ দেহাত্মবোধিগণের সংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং লোকনিন্দা কি? জগতে কিরূপ প্রকৃতির মানব লোকপদবাচ্য? তাহা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

যাহারা সতত পরনিন্দাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, লোভী, স্বার্থপর ও মনুষ্যত্বহীন, সেই সকল অজ্ঞানিগণ কখনও লোকপদবাচ্য নহে। তাহাদের সমাজ কখনই মনুষ্যসমাজ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যাহারা সংসারবিকারগ্রস্ত, তাহারাই মনুষ্যত্বহীন। মনে রাখিও স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহাদের নিন্দার দায় হইতে অব্যাহতি পান্ নাই। তাহারা সামান্য সামান্য কারণে অহরহঃ ভগবান্‌কেও নিন্দা করিয়া থাকে। এজন্য সাধারণতঃ

কথায় বলে যে, "নিন্দুকের হাত ভগবান্‌ও এড়াইতে পারেন নাই।" সুতরাং মানব হইয়া কি প্রকারে তাহাদের নিন্দার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে? ঈদৃশ লোকনিন্দাস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তুমি তাহাদের দলে মিশিতে পার নাই, অর্থাৎ তুমি মনুষ্যত্ববিহীন হইতে পার নাই; অথবা উহাদের অলক্ষ্যে তোমার কোন সদ্‌গুণ আছে, ইহা দেখিয়া মর্ম্ম বেদনায় তোমাকে নিন্দা বা গালি দিতেছে। নিন্দুকদিগের প্রকৃতি নীচ; ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি তাহাদের নাই বলিয়া, তাহারা তোমাকে গালি দিতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উহাই তোমার প্রশংসা; যেহেতু তুমি উহাদের সঙ্গে সংসার-কূপে নীচগামী হও নাই। আর যখন ঐ শ্রেণীর সংসারবিকারগ্রস্ত মানবগণ তোমার প্রশংসা করিবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, নিজেই তুমি কোন স্থলে বা কোন কার্য্যে উহাদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ। কিম্বা কোন ক্ষেত্রে তুমি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছ, নচেৎ উহারা তোমার প্রশংসা করিবে কেন? ঐ প্রকৃতির লোক যে, কেবল নিন্দা করিয়াই তোমাকে পথভ্রষ্ট বা স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে তাহাই নহে; উহারা আক্রমণের জন্য; কখনও নিন্দা, কখনও অযথা স্তুতি; কখনও আত্মীয়; কখনও পর; কখনও মিত্র; কখনও শত্রু সাজিয়া তোমাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। উহারা মহীরাবণের দলের ন্যায় ঘোর মায়াবী। উহারাই রাবণ স্বরূপ কামের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য, তোমার ভিতর হইতে "আত্মারাম" ও তোমার সংযমরূপী "লক্ষ্মণ"কে অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে নানামূর্ত্তিতে নিয়ত তোমার রন্ধ্র অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। উহারা শত্রুরূপে ধরিতে না পারিলে, মিত্ররূপ ধরিয়া, ফোটা তিলক কাটিয়া. তসর, গরদ, নামাবলী ধারণ করিয়া অনুগত বিভীষণ রূপে পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক, তোমার "আত্মারাম" হরণ করিতে চেষ্টা করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে অতীব সাবধান। সুন্দর-বনের "বাঘ" অপেক্ষা তুলসীবনের "বাঘ" আরও ভয়ঙ্কর; ইহাদের আক্রমণ,

বুঝিবার উপায় নাই। এ জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্ভক্তগণকে নিন্দা ও স্তুতি, উভয়ই সমান ভাবে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। তুমি তোমার দেহস্থ ইন্দ্রিয়বিষয় ও ষড়রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, সর্ব্বাগ্রে সংযমী হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই বাহিরের নিন্দা বা প্রশংসার আক্রমণে, তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। তোমার দেহস্থ ভূতকে জয় কর, তাহা হইলে বাহিরের ভূত তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। আত্মজ্ঞান আশ্রয় কর; তুমি কুলোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া ভগবান্কে হারাইবে? না, ভগবান্কে রাখিয়া, কুলোকের সংশ্রব ত্যাগ করিবে? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত বা আত্মবিশ্বাসী হইলে, সে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে ত্যাগ করে; তবুও ভগবানকে ত্যাগ করে না। পাণ্ডবেরা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন; তাই ভগবান্ তাঁহাদের অধীন থাকিয়া সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং যদি ভগবান্কে চাও, ধর্ম্ম চাও; মনুষ্যত্ব চাও; যদি জ্ঞান বা শান্তি চাও; যদি "আত্মদর্শনযোগে" জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিতে চাও; তাহা হইলে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান বলে একমাত্র **সত্যকে** আশ্রয় করিয়া চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত সাধনবলে একবার ভগবান্কে লাভ করিতে পারিলে অর্থাৎ তোমার "আত্মদর্শন" লাভ হইলে, তখন তুমি দেখিবে যে, সাধনাবস্থায় যাহারা তোমাকে নিন্দা বা তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে; যাহারা তোমার সহিত নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা তোমার পদে অবনত। তোমার আত্মজ্যোতিঃ-সম্মুখে আর তাহারা তিষ্টিতে পারিতেছে না। তখন প্রকাশ্যে বা মনে মনে অবশ্যই তাহারা তোমার পদে লুণ্ঠিত হইবে,—ইহা ধ্রুবসত্য। তাই তুমি "সত্যের" উপর আত্মনির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত হও। সত্যই তোমাকে সর্ব্বোচ্চ ভাবে রক্ষা করিবে। "আত্মদর্শন-যোগ" তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সেই পরমাত্মা বা পরমেষ্টদেবের

লক্ষ্যে মনকে একাগ্র করিতে যত্নবান হও। "সত্যই" তোমার সহায়, "সত্যই" তোমার বল। সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে নিশ্চয়ই "আত্মদর্শন" লাভ করিয়া ধন্য হইবে। একমাত্র "সত্য" অবলম্বনেই তোমার "হ্রী" বা পবিত্রতা রক্ষা হইবে। পবিত্রতা রক্ষার নামই লজ্জা রক্ষা; যাহারা মানসিক পবিত্রতা ত্যাগ করিয়া বাহিরে লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করে, তাহারা ভণ্ড, অসাধু বা কপটাচারী জানিও; ভগবান্ বা ইষ্টদেব কখনও তাহাদের নিকটবর্ত্তী হন না। তাহাদের কৃত, ঐ সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ যত বাহ্য-অনুষ্ঠান, উহার কোনটিই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য নহে; উহা অবৈধ-স্বার্থ-সিদ্ধির দুরাকাঙ্ক্ষা-জনিতভণ্ডামি মাত্র। অপবিত্র অন্তঃকরণ, ভগবানের স্থান নহে; তাহা কু-লোকের, কু-সঙ্গের, কু-কর্ম্মের, কু-চিন্তার বিপণি-ক্ষেত্র-স্বরূপ। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে "হ্রী" বা লজ্জা রক্ষার জন্য পবিত্রভাবকে আশ্রয় কর। আত্মজ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়-সংযম ভিন্ন মানসিক পবিত্রতা রক্ষার অন্য উপায় নাই। সাবধান! যাহারা বাহিরের নিন্দা প্রশংসায় অভিভূত, তাহারা কখনই পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। এজন্য যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রাপ্ত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্।
তাবেব বিপরিতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ॥

দত্তাত্রেয়।

মনুষ্য মাত্রেরই মান ও অপমান এই দুইটি প্রাপ্তি, উদ্বেগের কারণ। কিন্তু এই দুইটি যোগীর নিকট বিপরীতার্থ অর্থাৎ অপমানে মান, মানে অপমান বোধ হইলেই সিদ্ধিপ্রদ হয়। অতএব পবিত্রতা রক্ষার নামই আত্মরক্ষা; ইহা দ্বারাই **আত্মদর্শন** লাভ হয়। এতাদৃশ আত্ম-রক্ষার কথাই শাস্ত্রবাণীরূপে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"।

আত্ম দর্শন যোগ

তৃতীয়স্তর।

পঞ্চবিংশতি প্রকরণ।

—:*:—

ভক্তি বা ভক্তি-যোগে-আত্মদর্শন

দৃঢ়বিশ্বাসে অনন্যশরণ হইয়া অবিচ্ছেদে অতীব অনুরাগ বা ব্যাকুলতার সহিত, ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখার যে ঐকান্তিকতা, তাহার নাম ভক্তি। প্রত্যক্ষদর্শন ভিন্ন বিশুদ্ধা ভক্তি সম্ভবে না। বিষয়-বৈরাগ্য ভক্তির প্রধান লক্ষণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়াত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥" ১।২।৭

ভগবানে ভক্তি হইলে, অচিরেই বৈরাগ্য-সঞ্চার হয় এবং তৎপরেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সার্ব্বজনীন্ প্রেম লাভ হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং ভোগসুখ পূরণার্থ মুখে 'ভগবান্, ভগবান্' 'হরি, হরি' বলিলেই তাহা ভক্তির পরিচয় নহে; পরন্তু তাহা বিষয়াসক্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে, প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে বলিতেছেন—

"যা প্রীতিরবিবেকাণাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

হে ভগবন্! অবিবেকী ব্যক্তিদের বিষয়ের প্রতি যেরূপ প্রীতি, তোমাকে অবিচ্ছেদে স্মৃতিপথে রাখিয়া যেন তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতি থাকে। সুতরাং কামনাশীল সাংসারিক লোকের বিষয় প্রতি যে অনুরাগ বা টান্ তাহাই বিষয়াসক্তি। তাহাদের সাধন ভজনের উদ্দেশ্য, ভগবানের সাহায্যে বিষয়-লাভ করা। আর ভক্তি হইতেছে বিষয়কে স্মৃতিপথ হইতে দূরে রাখিয়া, বৈরাগ্য-লাভ করা। সর্ব্বদা মন ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিলে, তাহাতে অনিত্য বিষয়-বাসনা কখনও স্থান পায় না। সেই জন্যই অবিচ্ছেদে ও অনন্যভাবে ভগবান্‌কে স্মৃতিপথে রাখা প্রয়োজন এবং তাহার নামই সাধনা।

উপনিষদে প্রায়শঃ ভক্তি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ উপনিষৎ, ভক্তি বিষয়টিকে উপাসনা ভাবে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। উপাসনা শব্দের অর্থ-"সমীপে বসা", অর্থাৎ "ভগবান্ বা পরমাত্মার সমীপে বসা"। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন যে, পরমাত্মা বা ভগবান্ ত সর্ব্বত্র সকল সময় সকলের সমীপেই আছেন। তবে আর তাঁহার সমীপে বসার একটা বিশেষত্ব কি? এই স্থলেই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। এই অমূল্য বস্তুটির অভাবেই মানব পশুতুল্য হইতেছে। ভগবান্ বা পরমাত্মা সর্ব্বদা আমাদের সমীপে আছেন ইহা সত্য; কিন্তু এ কথাটি সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে কি? ভগবান্ বা পরমাত্মা যে আমাদের সমীপেই আছেন, আমরাও যে তাঁহাতেই বাস করিতেছি এবং তিনিও যে আমাদের ভিতরেই বাস করিতেছেন; এই কথা সর্ব্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া অবিচ্ছেদে ও অনুরাগের সহিত ধ্যান করা বা সতত স্মৃতিপথে রাখার নামই উপাসনা। এই অর্থে ভক্তি ও উপাসনা একই পদার্থ। এই প্রকারে উপাসনা বা ভক্তির অপর এক নাম মতি। যোগ সাধনায় ইহা একটি যোগাঙ্গ বলিয়া যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। বিশ্বযোনি

ব্রহ্মা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যোগের উপদেশ প্রদান উপলক্ষে, এই "মতির" কথাই বলিয়াছেন। ইহা দশবিধ নিয়মের অন্তর্গত। ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে—

"বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ।" যাজ্ঞবল্ক্য

সমস্ত বিহিত কর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাহাকে মতি বলে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই অবধারিত হয় যে, যোগ বা মুক্তির উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার নামই বিহিত কর্ম্ম এবং তৎপ্রতি যে শ্রদ্ধা তাহার নাম মতি। সাধারণতঃ শ্রদ্ধা শব্দের অর্থও ভক্তি বলিয়া উক্ত হয় বটে; কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তি যখন দুইটি শব্দ, তখন ভাবার্থেরও একটু বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই আছে। এজন্য কেহ কেহ শ্রদ্ধাকে আস্তিক্য বুদ্ধি বলেন। আস্তিক্য অর্থ, দৃঢ়-বিশ্বাস। দৃঢ়বিশ্বাসই ভক্তির প্রথম সোপান। অতএব বেদান্তে, যে প্রকার ভক্তি শব্দের ব্যবহার না হইয়া, উপাসনা শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ যোগশাস্ত্রেও শ্রদ্ধা শব্দ তাদৃশ প্রকার ভক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। কারণ যোগশাস্ত্রে শ্রদ্ধা বা দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভিন্ন ভক্তির পৃথক্ কোন পর্য্যায়, ব্যবহার দেখা যায় না। এই প্রকার মতিকেও ভক্তি বাচক শব্দের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ মতি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুমতি ও সুমতি। প্রবৃত্তিমার্গে অনিত্য বিষয়ে যে মতি, তাহার নাম কুমতি। আর নিবৃত্তিমার্গে নিত্য বিষয়ে যে মতি, তাহার নামই 'সুমতি' শাস্ত্র এই সুমতিকেই 'মতি' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। বিষয় বৈরাগ্যই সুমতি, এবং বিষয়াসক্ত বা অবৈরাগ্যই কুমতি। সুতরাং সুমতির নামই ভক্তি। কোন সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—

"শ্মশানান্তে রতিশ্রান্তে গানভঙ্গে চ যা মতিঃ।
সা মতি দীয়তে নাথ! মম জন্মনি জন্মনি॥"

শবদাহনের পরে মনে যে নশ্বরতা উপস্থিত হয় ও রতির পর যেরূপ অলিপ্সা ভাব উপজয় এবং গানভঙ্গের পর যেরূপ উদাস ভাব উদয় হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী না হইয়া চিরজীবন বা জন্মে জন্মে যেন সেই বৈরাগ্য ভাব আমার চিত্তে স্থায়ী থাকে। সুতরাং ভগবানের উপর সেই দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা মতির পরাবস্থাই বৈরাগ্য। এবম্বিধ বৈরাগ্যই ভক্তির লক্ষণ। প্রকৃতভাবে ভক্তি ভিন্ন কখনও বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ত ভক্তির সহযোগে হয় নাই? সে প্রশ্নের উত্তরে ইহাই প্রণিধান করা আবশ্যক যে, অর্জ্জুনের সেই বৈরাগ্য অনিত্য মায়ামোহ ও শোকের কারণ জনিত। তজ্জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে "কাপুরুষ", অনার্য্য, "স্বধর্ম্মত্যাগী" বলিয়া ভৎর্সনা পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানে, তাঁহার বিষাদ ভাব দূর করিয়া, স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধকর্ম্মে রত করিয়াছিলেন। তবে মায়া-মোহ-যুক্ত শোক-দুঃখের সন্তাপে যে ক্ষণিক বৈরাগ্য বা সংসার নশ্বরতা ভাব না হয়, তাহা নহে; কিন্তু তদবস্থায় চিত্তকে যদি অন্য কোন প্রকার মায়ামোহ-ব্যসনাসক্ত হইবার সুযোগ না দিয়া, একমাত্র অবিনশ্বর জ্ঞানে, ভগবৎপদে দৃঢ়ভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়, তবে তাহা হইতে সহজেই ভক্তি বিকাশ পাইয়া থাকে এবং বৈরাগ্যভাব স্থায়ী হয়। যাহার বৈরাগ্য, ভগবদ্‌যুক্ত হয় নাই, তাহা জল বুদ্বুদবৎ; অর্থাৎ তাহা বৈরাগ্যই নহে। তাহা ঐ বিষণ্ণ চিত্তকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বানুষ্ঠান মাত্র। বৈরাগ্য সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং।"

যোগ সূত্র।

দৃষ্ট বা শ্রুত সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি "অপূর্ব্ব ভাব" আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়

বাসনাকে দমন করিতে পারেন, সেই অনাসক্ত ভাবই (বশীকার সংজ্ঞা নামে) বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হয়।

বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন ক্রোধরিপু কখনও দমন হইতে পারে না, চিত্তকে বিষয়ের অধীন বা আসক্ত না হইতে দেওয়াই বৈরাগ্য। যিনি যে পরিমাণ বিষয়াসক্তি নিজের অধীন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণ বৈরাগ্যশীল বুঝিতে হইবে। নচেৎ মাথা ন্যাড়া করিলে বা জটা রাখিয়া ভস্ম মাখিলে বা ফোঁটা তিলক লোটা চিমটা ধারণ করিলেই বিষয় বৈরাগ্য হয় না। ভগবানে অবিচলিত ভক্তিই বৈরাগ্যের মূল। উল্লিখিত যোগশাস্ত্রের "অপূর্ব্ব" ভাবটির অর্থ "ব্রহ্ম" বা "আত্মস্বরূপ" ভগবান্ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে, শ্রদ্ধা বা দৃঢ় আস্তিক্যবুদ্ধি কিম্বা উপাসনা বা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয়। দৃঢ়-আস্তিক্য বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা ভিন্ন ভক্তি হয় না। তাই যোগশাস্ত্রে বা গীতায় শ্রদ্ধাকে ভক্তির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ আমার বিশ্বাস শ্রুতি বা যোগশাস্ত্রে ভজনা বা ভক্তির পৃথক্ পর্য্যায় স্বীকার করেন না বিধায়, ভক্তির পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা বা উপাসনা শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধা বা উপাসনা উভয় শব্দই মূলে ভক্তি পদবাচ্য।

অতএব ভক্তি বিষয়ে, শ্রদ্ধা ও উপাসনা আলোচনায় দেখা যায় যে, শ্রদ্ধা, উপাসনা ও ভক্তির মূলে কোনও প্রভেদ নাই। সর্ব্বদা অনন্যমনে ভগবান্কে স্মরণ করারূপ যে ধ্যান, তাহার নাম উপাসনা। উপাসনা সম্বন্ধে ভক্তকুলচূড়ামণি রামানুজ স্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।—

"স্মৃতিসন্তানরূপদর্শনসমাকারং ধ্যানমুপাসনশব্দবাচ্যম্।
তদেবহি ভক্তিঃ।"

অবিচ্ছেদে স্মৃতিরূপ যে ধ্যান, তাহার নামই সমীপে বাস বা উপাসনা এবং তাহাই ভক্তি। পরন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি বা দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত একান্তমনে

সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করার নামই ভক্তি। গীতায় ভক্তিযোগের উপদেশচ্ছলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের প্রশ্নে বলিয়াছেন।—

"ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥" ১২ অঃ

আত্মাতে মন একান্ত করিয়া সর্ব্বদা আত্মাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার (আত্মার) উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম যোগী।

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"১২অঃ

যাহার আত্মা দৃঢ়নিশ্চয়শীল (শ্রদ্ধাযুক্ত) এবং মদ্বিষয় স্থিরলক্ষ ও আমাতে (আত্মাতে) মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া সংযতচিত্ত ও সতত সন্তুষ্টভাবে অবস্থিত, এতাদৃশ যোগীই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিয়। সুতরাং আত্মার দৃঢ়নিশ্চয়তাই পরমশ্রদ্ধা; ঐ শ্রদ্ধার পরাবস্থার নামই ভক্তি। এখন ভক্তি জিনিষটি কি, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ভক্তি কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে নারদভক্তিসূত্রে লিখিত আছে "সাকস্মৈপরমপ্রেমরূপা" অর্থাৎ ভগবানের প্রতি পরম প্রেমের নাম ভক্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"

ইতি শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

ভগবানে পরা অনুরক্তির নাম ভক্তি,

"স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

বিবেক চূড়ামণি।

স্বকীয় স্বরূপ, অর্থাৎ আত্মরূপের অনুসন্ধানই যথার্থ ভক্তি বলিয়া পরিগণিত, এতদর্থেই চণ্ডীতে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি" ভাব সর্ব্বপ্রথমেই অর্গলা স্তবে উক্ত হইয়াছে। * সুতরাং আত্ম-তত্ত্ব বা আত্মদর্শন যোগানুশীলনই প্রকৃত ভক্তি।

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতাপ্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

নারদ পঞ্চরাত্র।

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না রাখিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে (আত্মায়) যে প্রেমযুক্ত মমতা, তাহাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন। উচ্চভাবের ভক্তি তিন প্রকার। রাগাত্মিকা (অনুরাগাত্মিকা) ভক্তি, অহৈতুকীভক্তি ও মুখ্যাভক্তি।

"ইষ্টে স্বারাসিকোরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ইষ্ট বা অভিলষিত বস্তুতে যে সরস পূর্ণাবিষ্টতা অর্থাৎ আপন আপন হৃদয়ের রসভরা গাঢ় আবেগ তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। যেমন, "আমার চিত্ত সদা তোমাকেই চায়" এই প্রকারের যে ভাব তাহাই রাগাত্মিকাভক্তি অহৈতুকীভক্তির লক্ষণ—

* রূপং দেহি—(রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং) আত্মরূপ বা পরমাত্ম বস্তু দেহি, জয়ং দেহি—(জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি) জয়ো (ততো জয়মুদীরয়েৎ ইতি স্মৃতি) যশো দেহি—সহঃনৌযশঃ ইতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনজন্যং যশঃ, তদ্ দেহি। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে যশস্বিনী। দ্বিষোজহি—(কামক্রোধাদীন্ শত্রূন্ নাশয়)

"ন পরমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং নরমাধিলভ্যং
ন যোগ সিদ্ধিরপুনর্ভবং বা মষ্যর্পিতাত্মেচ্ছতিমদবিনাঽন্যৎ ॥"

ভাগবত। ১১।১৪।১৪

ভাগবতে উক্ত আছে যে, আমাতে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনি ব্রহ্মপদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌমপদ, কি পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ পর্য্যন্ত চান না। আমি (ভগবান্) ভিন্ন তাঁহার কোন পদে অভিলাষ নাই। ইহাই অহৈতুকী ভক্তি। আত্মজ্ঞান ভিন্ন এ অহৈতুকী ভক্তি কোন প্রকারেই লাভ হয় না।

প্রকৃত ভক্ত, মুক্তির জন্য লালায়িত হন না। মুক্তি তাহার পদে, আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হয়। ইহাই "আত্মদর্শন"যুক্ত ভক্তি বা উপাসনা ভাব। সুতরাং অহৈতুকী ভক্তির অর্থ যাহার হেতু নাই অর্থাৎ কোন দেনা পাওনা নাই। ভগবান্‌কে যে পাওয়া উহা আমার পাইবার ইচ্ছা নয়, উহা আমার স্বাভাবিক কর্ম্ম; আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে যে, "তুমি" আর "আমি" ইহার ভিতরে কোন ভেদ নাই। যেমন অগ্নি ও অগ্নিকণা। তোমাকে দর্শন করিলে আমার পৃথক্ সত্ত্বাই হারাইয়া যায় অর্থাৎ—

"আমি শুধু ভাবি তাই, তুমি ভিন্ন আমি নাই,
আমার আমিত্ব যাহে তুমি তার মূল।
আমি তব অনুকণা। দ্বিধা ভাব ভুল ॥"

ইহার নামই অহৈতুকী ভক্তি। মুখ্যাভক্তিও প্রায় এইরূপ। ইত্যাকার ভক্তি "আত্ম-দর্শন-যোগ" ভিন্ন উদয় হয় না। এই ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, তাহার আর মান, অপমান, নিন্দা, স্তুতি কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গীতায় ভগবান্, অর্জ্জুনকে এই আত্ম-জ্ঞানযুক্ত অহৈতুকী ভক্তির কথাই বলিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে ভক্তের

লক্ষণ। গীতায় ভক্তিযোগে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। পূর্ব্ববর্ণিত উচ্চস্তরের ভক্তি ভিন্ন, বৈধাভক্তি, হৈতুকীভক্তি ও গৌণাভক্তির প্রকার বলা যাইতেছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত ভক্তি হইতে নিম্নস্তরা। বৈধাভক্তি—সাধারণ মানবের যে ভক্তি, তাহার নাম বৈধাভক্তি। ইহা সাধারণতঃ বিশ্বাসের নামান্তর মাত্র।

হৈতুকীভক্তি—কামনা-বাসনাযুক্ত চিত্তে, কোন বিষয় বিশেষের জন্য যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তাহার নাম হৈতুকীভক্তি। ইহা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল বা মনের শান্তি কখনও উৎপাদন হয় না। তবে অধিকারী ভেদে নিম্নস্তরের জন্য ইহার প্রয়োজন। ইহাই প্রায় গৌণাভক্তির লক্ষণ।

ভক্তভেদে ভক্তিভাব পাঁচ প্রকার। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শান্তভাবের দুইটি গুণ, ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও সংসার বাসনা ত্যাগ। চিত্তসংযম ভিন্ন শান্তভাবের ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্তভাব ভক্তির প্রথম সোপান। তবে ইহার পূর্ব্বে যে ভক্তির প্রতিবিম্ব দেখ, তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। তাহার নামই আস্তিক্য বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা। **শান্তভাবের ভক্তিরস হৃদয়ে সঞ্চার না হইলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ভক্তি কখনও আসিতেই পারে না।** কারণ—আকাশতত্ত্বের গুণ "শব্দ" তাহা যেমন সমস্ত পঞ্চভূতেই আছে; সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত "শান্ত" ভাবের গুণ দুইটিও, অন্যচারিটি ভক্তিরসেই আছে। শান্তভাবের ভক্তির ঐ দুইটি গুণ অর্জ্জন না করিয়া, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের মধুরভাবের ভক্তিরস আস্বাদন করিতে চান, শাস্ত্রনির্দ্ধারিতরূপে তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত নহেন। প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ, ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন। (ভক্তিযোগ দেখ) ভক্ত সম্বন্ধে ভাগবতেও এইরূপ উক্ত আছে যে,—

"ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥" ১১।২।৫০

যাঁহার চিত্তে বাসনাযুক্ত কর্ম্মবীজ জন্মাইতে পারে না; একমাত্র বাসুদেব (পরমাত্মা) প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি থাকেন; সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত। সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার না হইলে তাদৃশ ভক্তি কখনও জন্মে না। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অনুরাগের সহিত একাগ্রভাবে প্রতিনিয়ত মনকে পরমাত্মা বা ভগবানে বিভোর করিয়া রাখার নামই ভক্তি বা উপাসনা। ইহার নামই যোগ বা আত্মতত্ত্বানুশীলন। এতাদৃশ ভক্তি দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া আত্মদর্শন লাভ হয়। এ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।—

"স্থির চিত্তে নিত্য যিনি স্মরেন আমায়।
তাহার সুলভ আমি কহিনু তোমায় ॥" ৮।১৪

স্থিরচিত্তে ভগবান্ বা পরমাত্মাকে নিত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে স্মরণ করার নামই ভক্তি বা উপাসনা। ইহার নামই আত্ম-জ্ঞান-যোগ। এতদ্বারা সহজেই "আত্মদর্শন" লাভ হয়। এ সম্বন্ধে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন।—

"যে একান্ত ভক্তি ভরে, আমাকেই সেবা করে,
সর্ব্ব গুণ অতিক্রমি সেই চলি যায়,
ত্যজি কর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম ব্রহ্মভাব পায় ॥" ১৪।২৬

অব্যভিচারিণী একান্ত ভক্তিতে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে পারিলে, সাধক আত্মদর্শন লাভে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার পদ্যানুবাদ।—

"আমাতেই মনবুদ্ধি দেহ ধনঞ্জয়।
আমাতে থাকিবে উর্দ্ধে নাহিক সংশয়।" ১২।৮

ভগবান্ বা পরমাত্মাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে অর্থাৎ অনন্তস্মরণ ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারিলে, আত্মদর্শন-যোগে ঊর্দ্ধদেশে তাহাতেই যুক্ত হইয়া, জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিবে। এইরূপ অবস্থা প্রকৃত ভক্তই প্রাপ্ত হন। সেইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে, একনিষ্ঠ হওয়া দরকার; নচেৎ আত্মদর্শন লাভ হয় না। মুক্ত প্রান্তরে বহু দুগ্ধবতী গাভী একত্র বিচরণ করা অবস্থায়, গো-বৎস যেমন দুগ্ধপানের জন্য স্বীয় মাতাকেই খুজিয়া দুগ্ধ পান করে, অন্য কোন পয়স্বিনীর নিকট যায় না, প্রকৃত ভক্তও সেইরূপ স্বীয় আত্মা বা ইষ্টদেবের প্রতি একাগ্রতা সম্পন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতেও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

"অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥" ৪।১১।২৬

অজাতপক্ষ ক্ষুধার্ত্ত পক্ষিশাবক যেমন মাতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎসগণ যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়; দীর্ঘকাল বিদেশগত স্বামীকে দেখিবার জন্য যেমন সতী স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুলা হয়; হে অরবিন্দাক্ষ ভগবন্! তোমাকে দেখিবার জন্য আমার মনও তদ্রূপ সতত ব্যাকুল হউক। এতাদৃশ ভাবে আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান জন্য মন ব্যাকুল হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপুগণ কখনই তাহার চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত করিতে পারে না। তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও কোন চিন্তা করার আবশ্যক করে না। ভগবান্ই তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এজন্য ভগবান্ প্রতিশ্রুত আছেন।

"একান্ত অন্তরে চিন্তা করে যে আমার।
আমিই বহন করি "যোগক্ষেম" তার ॥"

গীতা ৯।২২

দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে, তিনি স্বয়ংই তাহাদিগের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা মিলাইয়া দিয়া থাকেন। অনন্য-চিত্তে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে, যোগীর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। সেরূপ বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতা নাই বলিয়াই ত ভগবৎ সাধনার কথা মনে হইলেই খাওয়া পরার চিন্তা আগে আসে। সুতরাং ভক্তি বিশ্বাসও সেই ভাবেই হয়, শুধু বাসনা-কামনার জন্য ভগবান্‌কে ডাকা মাত্র।

বিশুদ্ধা ভক্তির পরা অবস্থাই প্রেম। ক্রমে সেই প্রেম যখন ব্যষ্টিভাব দূর করিয়া, সমষ্টি জগতে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই মানব বিশ্ব-প্রেমিক হয়। এই অবস্থায় সর্ব্বভূতে **আত্মদর্শন** লাভ হয়। ইহাই মতি বা ভক্তিযোগে আত্মদর্শনের মূলতত্ত্ব।

তৃতীয়স্তম্ভ।

ষড়বিংশ প্রকরণ।

জপ-যোগে আত্ম-দর্শন।

জপ যোগাঙ্গের একটি নিয়ম। একান্ত মনে জপসাধন করিতে পারিলে এক জপযোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে জপই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। সেই জপ করিবার পন্থা বিস্মৃত হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ করিয়াও কুসংস্কারবশে অযাজ্ঞিক; এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"জপ্যেনৈবতু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবাকুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ২।৮।৭

ব্রাহ্মণ যাগাদি করুন বা না করুন; একমাত্র "জপ" দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই জপ পদার্থটি কি, তৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছেন যে,

"গুরুণাচোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ২।১২

যাহা বেদের বহির্ভূত নয়, এরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্র, বিধি অনুসারে অভ্যাস করাকে জপ কহে। মনে কর বেদবিহিতভাবে গুরু বা আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী। বিধিপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট তান্ত্রিক মন্ত্রও বেদবহির্ভূত নহে। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রধানতঃ ব্রহ্মগায়ত্রীই মুখ্যমন্ত্র বুঝিতে হইবে; পরন্তু প্রত্যেক দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী আছে, আমি সেই বিভিন্নের মধ্যে না যাইয়া, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম গায়ত্রীর কথাই বলিব। উহার মধ্যেই নিখিল দেবতাতত্ত্ব আছে। তত্ত্বনির্ণয়ের অভাবে যে ভেদজ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই অজ্ঞানতার কার্য্য। অতএব জপ করিবার পূর্ব্বে মন্ত্র বা গায়ত্রীর অর্থ ও শক্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া জপ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে—

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি॥"

মহানির্ব্বাণ ৩।৩১

যে সাধক মন্ত্রের অর্থ বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈদিকমন্ত্রের, সর্ব্বপ্রধান গায়ত্রী; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকার্য্য। সেই গায়ত্রীর অর্থ অপরিজ্ঞাত থাকিয়া কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সমষ্টি মাত্র জপ করায়, আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, আজ সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণজাতি কিরূপ শক্তিহীন হইয়াছেন; পরন্তু তৎসঙ্গে অন্যান্য বর্ণের কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে;

সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এমতাবস্থায় সেই ব্রহ্মগায়ত্রী জপেরই, সংস্কার বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহা ভিন্ন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম এবং যোগশাস্ত্রও আজ নির্জ্জীব।

গায়ত্রী—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি;
ধিয়োঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

গায়ত্রী উচ্চারণ—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, (বরণীয়ং) ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়োঃ যো (য়ঃ) নঃ প্রচোদয়াৎ।

অন্বয়ঃ—ওঁ ভূঃ (ভূর্ব্যাহৃতিঃ ক্ষিতিতত্ত্বং মূলাধারপদ্মম্) ভুবঃ (ভুবো ব্যাহৃতিঃ অপ্‌তত্ত্বং স্বাধিষ্ঠানপদ্মম্) স্বঃ (স্বর্ব্যাহৃতিঃ তেজঃ মরুদ্ব্যোম মনস্তত্ত্বং মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যং লোকচতুষ্টয়ম্) তৎসবিতুঃ (তস্য সপ্তলোকা-প্রসবিতুঃ) দেবস্য (দীপ্তি বা ক্রীড়াযুক্ত সর্ব্বভূত প্রসবকর্ত্তা. সর্ব্বত্র পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরোমুখ ও শ্রুত্যেন্দ্রিয় বিশিষ্ট; যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই বিরাটমূর্ত্তি) বরেণ্যং (বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভয়নাশার্থ উপাসনীয় ভর্গঃ) (সম্বিৎ নামা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় চেতনাত্মা একাক্ষর প্রণববাচক, ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মভূত প্রাণিনাং হৃৎপদ্মে যো বসতি, সোঽপি ভর্গঃ। তথাহি প্রাণিনাং হৃদয়ে সূর্য্যমণ্ডলমস্তি, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে, সোমমণ্ডলং; তন্মধ্যে তেজঃ, তেজোমধ্যে সত্যং, সত্যমধ্যে পরমাত্মা, তত্র সোমমণ্ডলমধ্যেয ঃ, তেজোমণ্ডলঃ স এব অমৃতনামা চেতনাত্মা; তদেবং স্বরূপঃ অমৃতনামা চেতনাত্মাপি তস্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষান্তরাত্মা ভর্গঃসৈব মূর্ত্তিরিতি প্রতিপাদিতম্) ধীমহি (বয়ং চিন্তয়ামঃ) যঃ (যো ভর্গঃ) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ সম্বিৎনামা চেতনাত্মস্বরূপেণ প্রেরয়েৎ)

সেই সপ্তলোক প্রসব কর্ত্তা দেবতাদিগেরও পূজনীয় পরব্রহ্মবাচক প্রণবাকারে (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন ও আধার স্বরূপে,

প্রতি জীবদেহে অবস্থিত এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজের প্রাণভূত) দিব্য-জ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি। যে জ্যোতিঃ (সম্বিৎরূপে) আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। ইহাই গায়ত্রীর অর্থ।

পূর্ব্বেই শাস্ত্র বাক্যদ্বারা প্রমাণ করা গিয়াছে যে, মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিতে হইলে তাহার অর্থ ও শক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত বেদচতুষ্টয়তত্ত্ব, নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে যে—

"প্রজাপতি লোকান্ অভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রসান্
প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষাৎ আদিত্যং দিবঃ॥"
"স এতাস্তিস্রোদেবতা অভ্যতপৎ তাসাং তপ্যমানানাং রসান্
প্রাবৃহৎ অগ্নেঋর্চঃ, বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ॥"
"স এতাং ত্রয়ীবিদ্যামভ্যতপৎ তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্
প্রাবৃহৎ ভূরিতি ঋগ্‌ভ্যঃ, ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ, স্বরিতি সামেভ্যঃ॥"

প্রজাপতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত লোকের মঙ্গলোদ্দিশ্যে তপস্যানিরত হইয়া মহর্ষি অগ্নিদেবের উপর পৃথিবী, মহর্ষি বায়ুদেবের উপর অন্তরীক্ষ এবং মহর্ষি আদিত্যদেবের উপর দিব্যধাম বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয় স্বর্গলোকের ভার অর্পণ করিলেন। তাহাতে উক্ত দেবত্রয় কর্ত্তৃক অর্থাৎ মহর্ষি অগ্নিদেব কর্ত্তৃক ঋগ্‌বেদ, মহর্ষি বায়ুদেব কর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদ এবং মহর্ষি আদিত্যদেব কর্ত্তৃক সামবেদ; এই ত্রয়ীবিদ্যা প্রকাশিত হয়। এজন্য ঋগ্‌বেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান ভূঃ; যজুর্ব্বেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান ভুবঃ; সামবেদের ব্যাহৃতি বা আহরণ স্থান স্বঃ।

অতএব যে যে স্থান হইতে বেদের মন্ত্র সকল সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানই সেই সেই বেদমন্ত্র সমূহের ব্যাহৃতি, বা বিশেষরূপে

আহরণ স্থান অর্থাৎ ভূর্লোক হইতে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র সমূহ, ভুবোলোক হইতে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সমূহ এবং স্বঃ (স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য) লোক হইতে সামবেদের মন্ত্র সকল সমাহৃত হইয়াছে, এজন্য উক্ত তিন বেদের ব্যাহৃতির নাম "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির সহিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এই তত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে প্রকৃত পক্ষে গায়ত্রী জপের অর্থ ও শক্তি হৃদয়ঙ্গম হইবে না। বিন্দুর সহিত বিন্দুর যে সম্বন্ধ, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টিরও সেইরূপ সম্বন্ধ। ব্যষ্টিরূপ জীবদেহক্ষেত্রের সত্যলোক বা ব্যাহৃতি, যেরূপ সর্ব্বোপরি মস্তিষ্ক বা সহস্রদল কমলে অবস্থিত, সমষ্টিরূপ স্থূল জগতের সত্যলোক বা ব্যাহৃতিও সেইরূপ সর্ব্বোপরি সহস্রদলে অর্থাৎ উর্দ্ধভাগে অবস্থিত। এই দিব্য চিন্ময়ক্ষেত্র ও অনন্তশক্তির আধারস্থল, উক্ত সত্যলোক হইতে, ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞানাত্মক একটি প্রাণময়শক্তি প্রবাহিত হইয়া, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগত সৃষ্টি করিতেছেন। সেই প্রাণময়শক্তিই "সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন" চিন্ময়জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট নারায়ণ বা পরমাত্মা। ইহার জ্ঞান, শক্তি পুরুষাত্মক; আর ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিই প্রকৃতি বাচক। প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলনে ইনি ব্রহ্ম বা ভর্গোজ্যোতিঃ। ঐ পরমাত্মার দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রাণশক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। ঐ শক্তিই ইচ্ছা ও ক্রিয়াবাচক। ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভাব স্বরূপ। ক্রিয়াশক্তি উৎপত্তি, স্থিতি, লয়াত্মক। ঐ আদিপুরুষ পরম পরাৎপর পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনিই অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য। ইনিই চিতিরূপে নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মকরূপে "প্রণবরূপী ব্রহ্ম"। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী উহার প্রোক্ত ত্রিশক্তি। ইনি সপ্রকাশ হইলেও জড়মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি, মন প্রভৃতি দ্বারা অবিদ্যা মায়ায় আবৃত; তদ্ধেতু ইনি "প্রবুদ্ধশ্চ জনার্দ্দন" বলিয়া চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তবে, মহামায়ার চিদংশ স্ফুরিত

হওয়ায় ইনি অবিদ্যা বা মায়া আবরণ মুক্ত হইয়াছিলেন। এ জন্যই ইনি কখনও সপ্রকাশ, কখনও অপ্রকাশ। জীব প্রাক্তনবশে পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানে স্থূলদেহপাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ইন্দ্রিয়গত উপাধি বিশিষ্ট মন-আখ্যায়, বিষয়েন্দ্রিয়ের মাত্রাস্পর্শে অনিত্য সুখ, দুঃখ, মায়ামোহে আচ্ছন্ন। অপরন্তু আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত অতীতেন্দ্রিয় উপাধিগত মন, সততই মুক্ত; এনিমিত্ত জীব, ভূতশুদ্ধি বা তত্ত্ব শোধনাবস্থায় সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তপদ্মে বিষয়েন্দ্রিয়ের দিব্য চিন্ময়ত্ব স্বরূপ, আত্ম-জ্ঞান-যোগে "আত্মদর্শন" অর্থাৎ সেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি প্রাপ্ত হইলেই, সংসারমায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

বৃহজ্জগতে বা সমষ্টিক্ষেত্রে সূর্য্যের উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে স্বঃ, মহঃ, জনঃ ও তপোলোক বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয় পরম্পরা প্রাপ্তভাবে, উর্দ্ধভাগে বিরাজিত। এই ব্যাহৃতি চতুষ্টয় বা চতুর্লোক, নিম্নবর্ত্তী ভূর্ভুবলোক বা ব্যাহৃতিদ্বয় অপেক্ষা উজ্জ্বল ও দিব্য জ্যোতির্ম্ময়; ইহার নামই দিব্যধাম। স্থূলদেহধারী মানবগণ যেরূপ একদেশ হইতে দেশান্তরে ইচ্ছামত যাতায়াত করে, তদ্রূপ ঐ দিব্যদেহধারী মুক্ত জীবাত্মা স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ প্রভৃতি লোক চতুষ্টয়ের যে কোন লোকে অবস্থান পূর্ব্বক ইচ্ছামত অন্যলোকে যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তবে ইহাদের মধ্যেও জ্ঞান এবং শক্তির তারতম্যানুসারে সম্মানের বৃদ্ধি ও ন্যূনতা আছে। উহাদের মধ্যে যিনি যেরূপ ভর্গো বা চিদাত্মার উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট, তিনি তত পরিমাণ উচ্চ সম্মানের অধিকারী। (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগে আত্মদর্শন প্রকরণ দেখ)

সবিতৃমণ্ডল ও গায়ত্রী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এই ব্যাহৃতি বা লোকচতুষ্টয় লইয়াই দিব্যধাম বা "স্বঃ" লোক। উক্ত স্বর্লোক বা ব্যাহৃতি চতুষ্টয়ই সবিতৃমণ্ডল প্রবাহিত ভর্গোজ্যোতিঃ দ্বারা, সতত উদ্ভাসিত।

(ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী,) ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট এই ভর্গোজ্যোতিঃই **"বেদমাতা গায়ত্রীরূপে"** গায়ত্রী নামে উপাস্য। এই পরমোজ্জ্বল ভর্গোজ্যোতীরাশি উর্দ্ধতনলোক হইতে প্রবাহিত হইয়া সপ্ত মিশ্রবর্ণে "ভূর্ভুবঃ"স্তর অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আলোকিত করিতেছে।

মিশ্রিতবর্ণ বিশিষ্ট এই জীবদেহ ও জড়জগৎ যেরূপ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অধীন, ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট দিব্য ভর্গোজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত লোকচতুষ্টয় এবং তত্রত্য মুক্তাত্মগণ সেরূপ নহেন। মহাপ্রলয়ে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সবিতৃমণ্ডলস্থ দিব্য ভর্গোজ্যোতিঃ মহাপ্রলয়েও বিলয় প্রাপ্ত না হওয়ায় তত্তল্লোকস্থ মুক্তাত্মগণ মরজগতের ন্যায় মহাপ্রলয়েও ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। ঐ ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট ভর্গোজ্যোতির নিম্নস্তরের নাম সবিতৃমণ্ডল; এই সবিতৃমণ্ডল, সূর্য্যের উর্দ্ধভাগে নিত্য প্রকাশিত।

উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করায় সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ ভর্গোজ্যোতিই বেদমাতা স্বরূপ "তৎসবিতু" (প্রসবিতুঃ যো ভর্গঃ) ভর্গোজ্যোতিঃ। সুতরাং গায়ত্রী ধ্যানের মূল বিষয়টিই সেই "ভর্গোজ্যোতিঃ"। সেই "ভর্গোজ্যোতিঃই" পরমাত্মা "প্রণব" স্বরূপ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্ব্বোচ্চলোক বা বিন্দুরূপী "সত্য" ব্যাহৃতি হইতে সৃষ্টি অভিমুখীন প্রাণাত্মার ঐ শক্তি প্রবাহের নাম "প্রণব"। শ্রুতিও বলিয়াছেন এই বিন্দুই প্রণবের উর্দ্ধে নাদোপরি অবস্থিত, অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপ। এই বিন্দু হইতে একটি শক্তি বিনিঃসৃত হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন। প্রবাহাত্মক এই শক্তির নাম প্রাণাত্মা বা প্রণব। উক্ত প্রণবের বিষয় বেদান্ত দর্শনে উক্ত আছে—

ওঁ "অকার দক্ষিণঃ পক্ষ উকার স্তুত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরঃস্তথা॥

পাদৌরজস্তমস্তস্য শরীরং সত্যমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চদক্ষিণং চক্ষুরধর্শ্চোত্তরজং স্মৃতম্ ॥

ভূর্লোকঃ পাদয়স্তস্য ভুবোলোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ ॥

জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাট মধ্যেতু সত্যলোক ব্যবস্থিতঃ ॥"

নাদবিন্দু উপনিষৎ।

অকার উকার মকার যুক্ত হংসাখ্য প্রণব বা ওঁকারের, অকার দক্ষিণপক্ষ, উকার বামপক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং নাদবিন্দুই অৰ্দ্ধমাত্রা শিরঃ স্বরূপ। রজঃ ও তমোগুণ ঐ হংসরূপী প্রণবের পাদদ্বয়, সত্ত্বগুণ দেহ, ধর্ম্ম দক্ষিণচক্ষু, অধর্ম্ম বামচক্ষু স্বরূপ। ঐ প্রণবের পাদদেশ অর্থাৎ নিম্নাংশে ভূর্লোক, তদূর্দ্ধে জানুদেশে ভুবোলোক, এবং কটিপ্রদেশ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্বর্লোক অর্থাৎ নাভিস্থলে স্বঃ, হৃৎপ্রদেশে মহঃ, কণ্ঠে জনঃ, ভ্রুমধ্যে তপঃ ও অৰ্দ্ধমাত্রা নাদ এবং বিন্দুস্বরূপে শিরঃ প্রদেশে সত্যলোক অবস্থিত।

গঙ্গোত্তরী তীর্থ হইতে গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া যেরূপ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মলোক বিনিঃসৃত প্রণব প্রবাহও সেইরূপ গতিভেদে সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন। এই চরাচর বিশ্ব জগতের যাবতীয় পদার্থই উক্ত প্রণব প্রবাহে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণ প্রবাহাত্মক প্রণব; সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ; অর্থাৎ নিম্নাংশ "সৎ" স্বরূপ, মধ্যাংশ "চিৎ" স্বরূপ; উৰ্দ্ধাংশ "আনন্দ" স্বরূপ। তদর্থে ঐ প্রণব জ্যোতিও "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"।

এখন দেখিতে হইবে যে উল্লিখিত প্রণব ও পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীমধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা ? এবং উভয় একই পদার্থ হইলে তাহা শাস্ত্র প্রামাণ্য কি না ?

গৈ ও ত্রা এই দুইটি ধাতুর যোগে গায়ত্রী শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। গৈ ধাতুর অর্থ গান এবং ত্রা ধাতুর অর্থ ত্রাণ। যে গান-যোগে জীবের ত্রাণ হয়, তাহাই গায়ত্রী। "গায়ন্তে ত্রায়তে যস্মাত্তস্মাত্বং গায়ত্রীস্মৃতা"। এখন ব্যাকরণগত অর্থ ছাড়িয়া প্রাচীন ঋষিগণের প্রতিপাদ্য শাস্ত্র গত অর্থ কি ? তাহা দেখা আবশ্যক ; এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

"গকারো গতিদঃ" প্রোক্ত আকারো বিষ্ণুরব্যয়ম্।
'ত্র' স্ত্রাতাচ তথা বিদ্ধি "ঈকার" ঈশ্বরঃ স্বয়ং ॥"

গায়ত্রীতন্ত্র।

গকার গতিদাতা, আকার বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ ; ত্র শব্দে ত্রাণকর্ত্তা, ঈকারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর পরব্রহ্ম। অতএব যিনি উপাসককে বিষ্ণুর অব্যয় পরমপদ বা পরমাত্মা পরব্রহ্মে গতি প্রদান করিয়া ত্রাণ করেন, তিনিই গায়ত্রী। এই গায়ত্রী চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক বলিয়া গায়ত্রীতন্ত্রে উল্লেখ আছে।—

"চতুর্ব্বিংশাক্ষরী বিদ্যা পরতত্ত্ব বিনির্ম্মিতা।
"তৎ"কারাৎ "য়াৎ"কার পর্য্যন্তং শব্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥"

"তৎ"কার হইতে "য়াৎ"কার পর্য্যন্ত (তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ) এই চতুর্ব্বিংশাক্ষরী গায়ত্রী, শব্দব্রহ্ম, প্রণবাকারে পরতত্ত্ব বা পরাবিদ্যায় বিনির্ম্মিত। কিন্তু ব্রহ্মা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রণবসহ পঞ্চবিংশতি অক্ষরাত্মক বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥
মনোবুদ্ধি স্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্।
চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু।
প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অবস্থিতি করে অর্থাৎ এই চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর হইতে জীবাত্মার এই চতুর্ব্বিংশতি শক্তি বিনির্গত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী প্রণবময়; এই প্রণবই (ওঁ) পঞ্চবিংশতি পুরুষতত্ত্ব। "পঞ্চবিংশতির্গণ" মিতি শ্রুতি।

ভগবদ্গীতায় ১৩শ অধ্যায়ে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কথা উল্লেখ আছে, পরন্তু পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম তিনি যে উক্ত চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরের অতীত, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গীতায় বলিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ।—

দুইটি পুরুষ আছে শুন ধনঞ্জয়।
'ক্ষর' ও 'অক্ষর' নামে মম ভাব দ্বয়॥
স্থাবর জঙ্গম যত সর্ব্বভূত 'ক্ষর'।
কূটস্থ চৈতন্য যিনি তিনিই 'অক্ষর'॥ ১৬
'ক্ষর' ও 'অক্ষর' ভিন্ন হে কুরুনন্দন।
উত্তম পুরুষ আছে মূলে একজন॥

তিনিই ঈশ্বর নাম পরমাত্মা তাঁর।
করেন ত্রিলোক পশি পালন সংহার॥ ১৭

ক্ষরের অতীত আমি নিত্য নিরমল।
আমি (ই) অক্ষর হ'তে উত্তম কেবল॥
তাই সে "পুরুষোত্তম" পাইয়াছি নাম।
লোকে বেদে সুবিখ্যাত শুন গুণধাম॥ ১৮

সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্যজ্ঞানে,
আমায় পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে,
"সকলি সে জানে পার্থ সার্থক জীবন,
আমায় সর্ব্বতোভাবে করে যে ভজন।" ১৯

সেই ক্ষর ও অক্ষরের অতীত প্রণব জ্যোতির্ম্ময় "সচ্চিদানন্দই" ব্রহ্ম বা ভর্গোজ্যোতিঃ বা পুরুষোত্তম। "আত্ম-দর্শন-যোগে" তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ বা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই গায়ত্রী সম্বন্ধে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন।—

"গায়ত্রীর যেই অর্থ প্রণবের হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোক বিবরিয়া কয়॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

গায়ত্রী হইতে প্রণব অভিন্ন। প্রণব সূর্য্য সদৃশ, গায়ত্রী তাহার জ্যোতিঃমণ্ডল। কিরণ বা জ্যোতিঃসমষ্টিকে যেরূপ সূর্য্য বলা যায়, তদ্রূপ গায়ত্রী বা তাহার অক্ষর সমষ্টি ভূত হইয়া দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রণবাকার ধারণ করে। প্রণব মন্ত্রের, গায়ত্রীছন্দঃ।—

ওঙ্কারস্য ব্রহ্মঋর্ষি র্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দেবতা
সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ॥

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, "গায়ত্রীছন্দসামহম্" অর্থাৎ ছন্দঃ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী। এই গায়ত্রী হইতে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ, ও জগতি এই সাতটি বৈদিক ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই তেজোময়ী গায়ত্রীর জপকৌশলে মনঃ প্রাণ স্পন্দিত হইলেই, প্রণব উদ্ধার বা প্রাণপ্রবাহ কেন্দ্রীভূত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় আকার ধারণ করে। অকার, উকার, মকার বা সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি স্বরূপিনী ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী অথবা ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান এই সর্ব্বমূলীভূতাশক্তি ত্রিতয়ে প্রণব ও গায়ত্রী অভিন্ন কলেবরে সর্ব্বত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই গায়ত্র্যাত্মক প্রণব বা প্রণবাত্মক গায়ত্রীই পরব্রহ্ম বা ভগবানের চরম বা উৎকৃষ্ট নাম। দেবর্ষির বাক্যে শ্রুতিতে উল্লেখ আছে।—

"ওঁ মিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম।
যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার
ভয়াত্তারয়তি এতস্মাদুচ্যতে তার॥" ইতি শ্রুতেঃ

এই গায়ত্র্যাত্মক প্রণবই পরব্রহ্ম বা ভগবানের চরম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাম। এই ছন্দোময় নামের উচ্চারণাত্মক "গান" দ্বারা বা জপকৌশলে অর্থাৎ গায়ত্রীছন্দে মনঃ প্রাণ স্পন্দিত হইয়া প্রণবোদ্ধার হইলেই সেই গায়ক বা জাপককে সংসার ভয় হইতে ত্রাণ করেন। এজন্য ইহাকে তার বলে।

গায়ত্রী জপের উদ্দেশ্য সেই তারকব্রহ্ম প্রণবের উদ্ধার। জ্ঞানী গুরু বা আচার্য্যের উপদেশে গায়ত্রীর গূঢ়ার্থ "শ্রবণ" হইলে এবং তাহা "মনন" দ্বারা বুদ্ধি দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলে, পরে "নিদিধ্যাসন" অর্থাৎ ক্রিয়া বা জপকৌশলে প্রাণে যে তন্ময়ত্ব ভাবোদয় হয়, সেই ভাব বশেই মনঃপ্রাণ স্পন্দিত

হইয়া ভাব সমাধি বা "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়। ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন যে, হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি বেদপারগ হইয়াও কেবল পাণ্ডিত্যাভিমানী হন অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের অভিজ্ঞান না থাকে, তদ্দ্বারা পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার অভাব হেতু "(শ্রমস্তস্যশ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষতঃ)" তাহার শ্রমমাত্র সার হয়; বন্ধ্যা গাভী দোহন যেমন নিরর্থক, বেদপাঠও তাহার তদ্রূপ বিফল। অতএব শব্দরূপ ব্রহ্ম-গায়ত্রী-তত্ত্ব অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া বা জপকৌশলাদির বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। ইহা গুরুমুখী বিদ্যা; পুস্তক পাঠ করিয়া, লাভ হয় না। অধুনা আর্য্যদেশ এই বিদ্যার অভাবে, অবিদ্যায় আসক্ত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

অগ্নিপুরাণে এই গায়ত্রীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা উক্ত আছে তন্মধ্যে দুটি শ্লোক নিম্নে লিখিত হইল।

> "স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো "হংস" পুরুষঃ প্রভুঃ।
> আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ॥"
> "যোহসাবাদিত্যপুরুষঃ সোহসাবহমনন্তওম্।
> জ্ঞানানি শুভ কর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা॥"

অগ্নি বলিতেছেন যে, তিনি লীলাময়, এজন্য দেবশব্দে বিখ্যাত। অথবা যিনি পরমপূজ্য তাহাকেও দেব বলে। তিনি হংসাখ্য ভাবে অহংশব্দ-প্রতিপাদ্য পুরুষ এবং তিনিই আত্মা, তিনিই প্রভু, তিনিই আদিত্যের অন্তরে ভর্গোনামে বিরাজ করেন; তিনিই জীবের মুক্তিদাতা। যিনি সেই আদিত্যের অভ্যন্তরে পুরুষরূপে বিরাজ করেন, তিনিই আমি, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অবস্থিত অন্তরাত্মা; তিনিই অনন্ত এবং প্রণবাকারে আমাতে বিরাজিত। আমি তাঁহার ধ্যান করি। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের জ্ঞান ও শুভকর্ম্মাদি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।

অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিযুক্ত আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক্ পরিচয় আমরা গায়ত্রীমন্ত্রমধ্যে প্রাপ্ত হই। এখন শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, গায়ত্রীর অক্ষরসমষ্টিমধ্যে, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ; ইহার প্রথম ওঁকারটি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ তিনটি ব্যাহৃতি, "তৎ" হইতে "য়াৎ" পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতিটি অক্ষর চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-স্বরূপ, অতএব "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"; ইহার অতীত যে পঞ্চবিংশতি অক্ষর অর্থাৎ "ওঁ" ইহাই মূল গায়ত্রী এবং তাহাই ভর্গোজ্যোতিঃ স্বরূপ সবিতা; মূলে তাহাই প্রণব; তাহাই হংসাখ্য ভাবে আত্মা। উহাই পরমাত্মজ্যোতিঃ এবং উহাই ত্রিবর্ণাত্মক সবিতৃমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিঃ। আর্য্যঋষিগণ ঐ সবিতৃমণ্ডল বা তাহার দিব্যজ্যোতিঃ, ধ্যানবলে প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞানবলে বিচার করিয়া তিনটি মূল বর্ণ ও তাঁহার ত্রিবিধ মহাশক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। ঐ দিব্যজ্যোতিঃ বা ত্রিবর্ণাত্মক মহাশক্তি, জীবের হৃৎপুণ্ডরীক ও সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হয় না। অথবা ঐ মহাজ্যোতিঃ, অপর কোন পদার্থের ধারণ করিবারও শক্তি নাই। সূর্য্যের ঊর্দ্ধপ্রদেশে ঐ সবিতৃমণ্ডল নিত্য অবস্থিত। গায়ত্রীমন্ত্র উক্ত সবিতৃমণ্ডলেরই বাচক; অর্থাৎ সবিতা বা সবিতৃমণ্ডলের ঐ দিব্যজ্যোতির ভাব গায়ত্রীমন্ত্রেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সূর্য্য ঐ ভর্গোজ্যোতিতেই জ্যোতির্ম্ময়। ঐ ভর্গোজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মজ্যোতিই আমাদের "আত্মজ্যোতিঃ"। এজন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ১৫। অঃ

সূর্য্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ, সেই তেজ আমার, আমার সেই তেজই অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, জানিও। সুতরাং

সূর্য্য, ঐ জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, সপ্তমিশ্রবর্ণে জগত ও জীবের মধ্যে তাহা প্রকাশ ও প্রবাহিত করিতেছে। অতএব এই সূর্য্যাগত জ্যোতিঃ মূলজ্যোতিঃ নহে; উহা মিশ্র বলিয়া নশ্বর। উহা নশ্বর বলিয়াই উহাদ্বারা তদূর্দ্ধস্থ সবিতৃমণ্ডলের অবিনশ্বর দিব্যজ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থ কোন তত্ত্ব বা পদার্থ উপলব্ধি হয় না। এই নশ্বর বা অনিত্য সূর্য্য-জ্যোতির্ব্বিকাশে জড়বস্তু বা পদার্থের যে কতকঅংশ প্রকাশ পায়, সেই অংশ সাধারণ জীবের অনুভব হয় মাত্র। অণু বা সূক্ষ্মপদার্থতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বা আত্মসম্বন্ধীয় চেতনাশীল জগৎ, ভর্গোজ্যোতিঃ ভিন্ন নশ্বর সূর্য্যজ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হয় না বলিয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সকল সূক্ষ্ম আত্মা সতত বিচরণ করিতেছে, আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। যাঁহারা যোগবলে বা গায়ত্রী সাধনায় দিব্যনেত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সতত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ঐ দিব্যজ্যোতিঃ, ব্যষ্টি ও সমষ্টিক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ লোকে বিরাজিত। সুতরাং দেহের ভিতরেই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ জ্যোতিঃপ্রবাহের নামই প্রণব এবং উহাই ব্রহ্ম। একমাত্র "আত্ম-দর্শন-যোগ" বলেই তাহা উপলব্ধি হয়।

কেহ কেহ সবিতা শব্দে একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন, তাহাদের তর্কের নিরাকরণ করা আবশ্যক। যে সবিতা বা ভর্গোজ্যোতিঃ অবলম্বনে কোটি কোটি সৌরমণ্ডল দশদিকে বিরাজ করিতেছে, তাহার একটি সূর্য্যকে সবিতা বলিয়া মনে করা নিতান্তই ভ্রান্তি। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দেবস্য সবিতুঃস্বতম্" অর্থাৎ তৎশব্দে সবিতা স্বরূপ বিষ্ণুর পরমপদ। পরন্তু সবিতা শব্দের ব্যাখ্যায় উপনিষৎ বলিয়াছেন—

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।

বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক ইন্।
মহো দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে, সবিতার সাহায্য প্রয়োজন। বিপ্রগণ উহাদিগকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন, তাঁহাদের উচিত সবিতাকে সাহায্যার্থে স্তব করা। ঐ সবিতা সর্ব্বব্যাপক। কারণ উনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয় স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষীস্বরূপ অন্তর্য্যামীরূপে সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান; জীবের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইতেছে। তিনি সকল ক্রিয়ায় নিয়ামক। এ সম্বন্ধে দেবীভাগবতে উক্ত আছে—

"মাতা চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাঙ্গনাঞ্চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রানাঞ্চ বিচক্ষণা ॥
দ্বিজাতি জাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রহ্মণ্য তেজোরূপা চ সর্ব্বসংস্কাররূপিণী॥
পবিত্ররূপা সাবিত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
তীর্থানি যস্যাঃ সংস্পর্শং বাঞ্ছন্তি হ্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥
শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ-শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপিণী।
পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥
পরব্রহ্মস্বরূপা চ নির্ব্বাণপদদায়িনী।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৯ম স্কন্দ ১মঅঃ

সাবিত্রী চারিবেদ বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ সমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া, মন্ত্র ও তন্ত্রাদিরও মাতৃরূপা। তিনি ব্রাহ্মণ জাতির ব্রহ্মণ্য রূপিণী জপরূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্মতেজোময়ী এবং সর্ব্ব সংস্কাররূপিণী। তিনি ব্রহ্মার প্রিয় পবিত্ররূপা সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তীর্থগণও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার স্পর্শ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব ও পরমানন্দরূপিণী মুক্তিপদ-দায়িনী সনাতনী পরব্রহ্ম স্বরূপা। তিনি পরব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

এইরূপে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যযোগিঋষিগণের উপদেশে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, গায়ত্রীমন্ত্রই পরব্রহ্মের নির্গুণ উপাসনা। উহা কখনও মূর্ত্তির উপাসনা হইতে পারে না। এই গায়ত্রীমন্ত্র প্রভাবেই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঐ গায়ত্রীই ব্রাহ্মণ হৃদয়ের আধ্যাত্মিক চিচ্ছক্তি।

সবিত্রী শব্দের অর্থ—জনয়িত্রী (প্রসব করা) সু+তৃণ্—ক+ঈপ— (পুংলিঙ্গে সবিতা) জননী মাতা। সবিতা অর্থ জনয়িতা উৎপাদয়িতা ঈশ্বর সূর্য্য। সুতরাং ধাতু প্রত্যয়গত অর্থে ইনি ঈশ্বর বাচক, ইহাই নিষ্পন্ন হয়। অতএব সবিতা অর্থে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, সবিত্রী অর্থে ব্রহ্মশক্তি বা ভর্গোজ্যোতিঃ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি সকলেই আমার (আত্মার) তেজেতেই জ্যোতির্ম্ময়, পরন্তু আরও বলিয়াছেন—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥"

গীতা ১০ ম অঃ

দ্বাদশাদিত্য মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে আমি তেজোময় সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। সুতরাং

সূর্য্য একটি নয়, পরন্তু সূর্য্যের জ্যোতির সঙ্গে তিনি জ্যোতির তুলনা করিয়াছেন। জ্যোতিঃস্বরূপে সূর্য্য তাঁহার বিভূতি মাত্র।

সূর্য্য নিজে তেজোবিশিষ্ট নয়, পরমাত্মা বা ব্রহ্মতেজবলেই তেজোময়। তবে ইহা সত্য যে, সূর্য্যে সেই ব্রহ্মতেজ প্রতিফলিত আছে। অপরন্তু তাহা সমস্ত জীবেও আছে। অতএব এস্থলে সবিতা অর্থ সূর্য্য নহে এবং সবিতৃমণ্ডল অর্থে সূর্য্যমণ্ডলও নহে; অভিধানে সবিতা অর্থে সূর্য্য প্রয়োগ থাকিলেও, সূর্য্য অর্থ যিনি গমন করেন। সৃ (গমন করা) ক্যপ্। গতিশীল, অপর নাম তিমিরহর, জ্যোতিষ্মান্; পুরাণে কথিত আছে, রাবণ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়া, তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে অচেতন হইলে, রাবণ সূর্য্যকে অর্দ্ধরাত্রে উদিত হইবার জন্য আদেশ করেন; সেই সূর্য্যকে যাঁহারা জগতের পরমকারণ সবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্যই কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত, তাঁহার রামায়ণে সূর্য্যকে হনুমানের বগলচাপা করাইয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সূর্য্য যদি সবিতা হন, তবে জোনাকীপোকাও নিশ্চয় চন্দ্র হইবে। সাধকব্যক্তি দেহস্থ পঞ্চতত্ত্ব-শোধনানুষ্ঠানে, আকাশতত্ত্বে সংযমন করিলেই, আমার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোন সাধক সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন।—

"কোথায় সে জন, জান কি তপন! যার পদতলে হইয়া রেণু।
গড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি অবাক্ ভানু॥"

সবিতার রূপ ভাষায় অব্যক্ত। এজন্য তাঁহাকে সূর্য্যসম ভাস্বর উপমার্থে, সম্ভবতঃ কেহ সূর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে।—

"সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" ৮। অঃ
"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে॥" ১৩। অঃ
"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ॥" ১৫। অঃ

অতএব ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সবিতৃমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল নহে, সূর্য্যও সবিতা নহে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ
পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা
সূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি॥"
১৭খঃ ৩ প্রঃ

জগতের কারণীভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। তন্মধ্যে অহরহঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। যাহাদিগের চক্ষু বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মবিজ্ঞানীরাই সেই "ভর্গোজ্যাতিঃ" দর্শন করিয়া থাকেন। সেই পরম দিব্য ভর্গোজ্যোতিঃ, ব্রহ্মেই অবস্থিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের উপরি বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ যাঁহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছেন, তাঁহারা সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে না। বাহ্য-অন্ধকার-বিনাশক সূর্য্যের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াই সূর্য্য উদিত হইতেছে এরূপ মনে করে। অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক যে দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঐ আদিত্যমধ্যে এবং আমাদের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছে, সূর্য্যের জ্যোতিঃ সেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতেই প্রবাহিত, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ আদিত্যমধ্যে সম্প্রতিষ্ঠ থাকায় ঐ সূর্য্য, জ্যোতিষ্মান হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। সেই জ্যোতিঃই দেবগণের মধ্যে সূর্য্যরূপে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ স্বর্গলোক সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই

উদ্ভাসিত। এই দিব্য ভর্গোজ্যোতিঃই, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপে নিখিলজগৎ ও পদার্থমধ্যে সতত উদ্ভাসিত এবং সর্ব্বোত্তম জ্যোতিঃ। অতএব সূর্য্য কখনই সবিতা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছেন।—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতিহ্যুদ্গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্॥"

"ওঁ" এই অক্ষরটি পরমব্রহ্মের অতি প্রিয়তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। এই অক্ষর "কর্ম্মযোগ" দ্বারা উদ্গীথ। (উৎ—ঊর্দ্ধ+গীথ কীর্ত্তন) অর্থাৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উপাসনা করিবে। এই উদ্গীথাবয়ব অক্ষরের ব্যাখ্যা করিতেছি।

"এষাং ভূতানাং পৃথিবীরসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ,
অপামোষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ,
পুরুষস্য বাগ্রসঃ, বাচ ঋগ্রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ,
সাম্ন উদ্গীথো রসঃ॥"

পৃথিবী, এই চরাচর ভূতসমূহের রস অর্থাৎ গতি। পৃথিবী অবলম্বনে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। পৃথিবীর রস জল। জল, পৃথিবী মধ্যে ঊর্দ্ধ অধঃ ওতপ্রোত রহিয়াছে। ওষধি (বৃক্ষ লতা গুল্ম ইত্যাদি) জলের সারভূত রস। এই ওষধিসমূহের সারভূত, পুরুষশরীর। এই শরীরযুক্ত পুরুষের সাররস, বাক্ অর্থাৎ বাক্য; শব্দাত্মকবাক্যের সাররস, ঋক্ বা মন্ত্র। এই ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রের সাররস, সাম বা ছন্দ বা সুর। উদ্গীথাবয়ব "ওঁকার" সেই সামের সারতর।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ।

সেই যে উদ্গীথাবয়ব ওঁকার, তাহাই রসসমূহের সারভূত; পরমোৎকৃষ্ট পরমাত্মার স্থান এবং পরার্দ্ধ। উহা পৃথিবী হইতে সংখ্যানুসারে অষ্টম।

বাগেবর্ক, প্রাণঃসাম, ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথঃ। *
তদ্ বা এতন্মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, মন্ত্রাত্মক জীবাত্মার বাকাই ঋক্ স্বরূপ, প্রাণ সাম স্বরূপ। (জীবাত্মা প্রাণাত্মার মিলনে বিজরিত) "ওঁ" এই অক্ষরই উদ্‌গীথ স্বরূপ। "ওঁ" এই অক্ষরই সেই মিথুন ; যাহা বাক্ ও প্রাণ বা ঋক্ ও সাম বিজড়িত।

অতএব গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর বা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত স্থূল দেহস্থ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা বা মিথুনীভূত ওঁকারের যোগে, বাক্ ও প্রাণ বা ঋক্ ও সামবিজড়িত। গায়ত্রী অর্থাৎ হংসাখ্য জীবই সূক্ষ্ম পঞ্চীকরণে পরব্রহ্মস্বরূপ "ওঁ" কারে পরিণত হয় এবং সিদ্ধিপ্রদ পরমশক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং মূলে "ওঁকারই" পরব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন।—

"তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে ;
যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তোহ বৈ তাবন্যোন্যস্যকামম্ ॥"

উক্তপ্রকার সেই বাক্ প্রাণাত্মক (তৎসবিতুঃ হইতে প্রচোদয়াৎ এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব) জীবাত্মার ও প্রাণাত্মার মিলমে মিথুনীভূত "ওঁ" এই অক্ষর ব্রহ্মরূপে সংসৃষ্ট বা সম্মিলিত হয়। যখনই ঐরূপ পরস্পর মিলনে মিথুনীভূত হয়, তখনই তাঁহারা পরস্পরের কাম অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিরূপ ফল ও সম্যক্‌রূপে শক্তি প্রদান করেন।

এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে আমার পূর্ব্ববর্ণিত অর্থাৎ গায়ত্রীজপ দ্বারা সেই প্রণব বা পরব্রহ্মরূপ ওঁকার উদ্গীথযোগে জীবাত্মা-পরমাত্মায় ঐক্য বা মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহার নামই মুক্তি, এবম্বিধ মুক্তিই গায়ত্রী জপের মূল উদ্দেশ্য। গায়ত্রীজপের ঐকৃষ্টরূপ অর্থ ও শক্তি কোন বিশিষ্ট

সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের নিকট গুরুমুখী বিদ্যাভাবে উপলব্ধি করিয়া, অতঃপর তাহা সুকৌশলে জপ করিলেই ক্রমে ব্রহ্মশক্তি লাভ হইয়া থাকে। অনন্যশরণ ভাবে এই ক্রিয়া সাধন করার জন্যই, মৌনভাবে জপ করা, শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে। ইহার নামই "জপযজ্ঞ" অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মায় হোম করা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিধায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" বলিয়াছেন। অপরন্তু সামবেদ হইতে এই জ্ঞান সমাধান বা ছন্দঃ নিরাকৃত হয় বলিয়া, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে "জপযজ্ঞ" ও বেদের মধ্যে "সামবেদ"কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

অন্যান্য সমস্ত দেবতার পূজা বা গায়ত্রীমন্ত্র জপেরও ইহাই বিধান। সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তবে চণ্ডীতে ইহা বিশদ ভাবে উক্ত আছে।

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবীত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥" শক্রাদেঃ স্তুতিঃ।

তুমি শব্দ ব্রহ্মস্বরূপা; তুমি সুবিমল ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের আশ্রয়; তুমিই উদাত্তাদি স্বরযোগে রমণীয় পদযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়; অতএব তুমিই ত্রয়ী (বেদরূপা); তুমিই সকল পদার্থের প্রকাশিকা, তুমিই সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুক্তা, তুমিই সংসার প্রবাহের রক্ষাকারিণী; কৃষি বাণিজ্যাদিবৃত্তি স্বরূপা এবং তুমি নিখিল জগতের পরম দুঃখ নাশিনী। সুতরাং একমাত্র শব্দব্রহ্মরূপা উদ্গীথ উপাসনা সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত দেব দেবীরই সাধনা হইয়া থাকে। সমস্ত দেবীই মূলে সেই ব্রহ্মস্বরূপা মহাপ্রকৃতি। ইহাই জ্ঞান করিতে হইবে। স্থানাভাবে সকল দেব দেবীর মন্ত্র, গায়ত্রী ও জপকৌশল পৃথগ্‌ভাবে লিখিত হইল না।

তন্ত্রশাস্ত্রবক্তা জগদ্‌গুরু মহাদেবও ইহাই বলিয়াছেন।—

"জাতঞ্চ জায়মানং যৎ তৎ সর্ব্বং রুদ্র উচ্যতে।
তস্মিন্নেব পুনঃ প্রাণঃ সর্ব্বমোঙ্কার উচ্যতে॥"
"প্রবিলীনং তদোঙ্কারে পরংব্রহ্ম সনাতনম্।
তস্মাদোঙ্কার জাপী যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥"

শিবগীতা ১৫ অঃ

ওঁকার আমার অভিন্ন স্বরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও আমা হইতে বিভিন্ন নহে। তাই সমস্তকেই "প্রণব"স্বরূপে অধ্যারোপ করা যাইতেছে। প্রাণিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি আন্তর রাজ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ওঁকারে প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ আমার সনাতন ব্রহ্মরূপ, এই "প্রণবের" মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ওঁকারের আরাধনা করেন, তিনি "আমারই" আরাধনা করিয়া থাকেন। তিনি মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং যোগেশ্বরী ভগবতী বলিয়াছেন।—

"ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।"

দেবীগীতা ৬ অঃ

ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া যথোক্ত প্রকারে সেই আত্মাকে চিন্তা কর, সংসারসাগরের পরপার প্রাপ্তিবিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও। তোমরা অবিদ্যাবিরহিত ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হও।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন।—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" ৮ অঃ

যিনি "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন; তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন্। সুতরাং

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বেদ: তন্ত্র: গীতা মধ্যে মূলে কোন পার্থক্য নাই এবং ব্রাহ্মণগণ বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত সমস্ত কার্য্যেই অধিকার জন্মে। সুতরাং তান্ত্রিক দীক্ষার আর কোন প্রয়োজন করে না। পরন্তু আপামর সাধারণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে পুনরায় তান্ত্রিকীদীক্ষা প্রদানে, ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা হয়। অধিকন্তু অপরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় একটা "ভেদবুদ্ধি" উৎপাদন করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে। স্বয়ং ব্রহ্মাও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সেই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী উপাসনা ভিন্ন অন্য মন্ত্র প্রশস্ত নহে।

"ব্রাহ্মণঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ স্বধর্ম্ম নিরতঃ সদা।
সবৈদিকং জপেন্মন্ত্রং লৌকিকং ন কদাচন॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

জ্ঞানিগুরু লাভ হইলে, দীক্ষা গ্রহণকালে সেই গুরুদেব প্রথমতঃ আত্ম-শক্তিবলে শিষ্যের হংসাখ্য জীবনীশক্তিটি ঈড়া পিঙ্গলা প্রবাহী যন্ত্র হইতে সুষুম্নাপথে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তাহাই গুরুকৃপা। এই সকল জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যায় হয় না। ইহাতে জ্ঞানিগুরুর প্রয়োজন। গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়া, পরে শিষ্য সেই গুরুকৃপারূপ সাধনাশক্তি-বলে গুরুদত্ত মন্ত্র, স্বঃ, মহঃ জনঃ, তপঃ বা মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপথে অন্তঃপ্রাণায়ামযোগে সঞ্চারিত করিলেই সেই প্রাণাত্মা, প্রণব-আকারে পরিণত হয়। গায়ত্রীমন্ত্র জপ বা ভগবদুপাসনার ইহাই উদ্দেশ্য এবং ইহাই মুক্তিলাভেচ্ছুগণের নিষ্কাম বা নির্গুণ উপাসনার বিষয়। আশ্রমভেদে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমীদের জন্য পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সাধনা বা কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত থাকিলেও ব্র.আ.নন্মাত্রই চতুরাশ্রমী। নির্গুণ ব্রহ্মগায়ত্রী উপাসনা

ভিন্ন তাঁহারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইবার অধিকারী নহেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজোচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

জীব জন্মমাত্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞোপবীত (আত্মজ্ঞান) বা উপনয়ন সংস্কারে, গায়ত্রী দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে, দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন্। বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মভাবরূপ নির্গুণ উপাসনায় বিপ্র এবং সেই নির্গুণ উপাসনা দ্বারা "আত্মদর্শন" বা ব্রহ্ম উপলব্ধি হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ বা "অহংব্রহ্মাস্মি" অবস্থা প্রাপ্ত হন্। বৈদিকী দীক্ষা সংস্কারে আচার্য্য বা গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্মভাব বা "আত্মজ্ঞান" প্রতিপাদক মন্ত্র বা ব্রহ্মগায়ত্রী প্রাপ্ত হইলেই, উপাসক প্রণব অবলম্বনের অধিকারী হন্। তদবস্থায় "হংস"রূপী জীবাত্মা বিলোম প্রত্যাবর্ত্তনে সুষুম্নায় ফিরিয়া "সোহং" অর্থাৎ "স বেদ পরমাত্মা" ও 'অহং শব্দে প্রত্যগাত্মা এতদুভয় শব্দের যোগে, ব্রহ্মে লক্ষ্য ভাবে দ্বিজত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইতেই প্রণবযুক্ত গায়ত্রী ধ্যানে বা জপকৌশলে নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনারম্ভ হয়। ইহাই মোক্ষপথ। (ইহাই ভগবদ্গীতোক্ত কর্ম্মক্ষেত্র ও ধর্ম্মক্ষেত্র ভাব) আর দ্বিজত্ব হইতেই জীবাত্মার প্রাণপ্রবাহ প্রণব অবলম্বনে সুষুম্নাপথে আজ্ঞা-দলাভিমুখে পরিচালিত হওয়ায় গন্তব্যপথ পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং এই সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়াম যোগে, নাভি, হৃদি, মূর্দ্ধ্না গ্রন্থী ভেদ করার শক্তি জন্মে এবং নাভি বা ব্রহ্মগ্রন্থী ভেদ হইলে দ্বিজ, হৃদি বা বিষ্ণুগ্রন্থী ভেদ হইলে বিপ্র ; মূর্দ্ধ্না বা রুদ্রগ্রন্থী ভেদ হইলে, সপ্তব্যাহৃতির সর্ব্বোচ্চ সত্য বা সহস্রদলের ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন পূর্ব্বক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই জীবন্মুক্তি অবস্থা। এই গ্রন্থিভেদ হইতে আরম্ভ হইলেই পূর্ব্বোক্ত "অজপা" ধারা

পূর্ব্বে অহোরাত্র ২১৬০০ সংখ্যায় স্বাভাবিক জপ হইতেছিল, তাহার ক্রমে সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে। ঐ মন্ত্র ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাকার সহজশক্তিতে ব্রহ্মৈকত্ব ভাবে, পরব্রহ্ম মন্ত্র বা গায়ত্রী সম্যগ্‌রূপে উদ্‌গীথ হইতে থাকে। এ জন্যই সাধক গাহিয়াছেন।—

বিষয় জপ।

রাগিণী—সুরট মল্লার তাল—ঝাঁপ।

"জপ মন অজপায় তাঁরে (সেই) প্রণবাত্মা মহেশ্বরে
(যিনি) "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ভুলনা ভুলনা তাঁরে ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরোধ ক'রে,
মূর্দ্ধ্‌ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণ যোগস্থিতে জপতাঁরে—
(যে জপ) হ'চ্ছে অহোরাত্র তাঁর, একুশহাজার ছয়শত বার,
(সেই) ঈড়া পিঙ্গলার "হংস" (জপ) সুষুম্নাতে সূক্ষ্মাকারে ॥
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ বল যারে,
সেই "অধ্যাত্ম" সেই "কর্ম্ম" সেই ব্রহ্ম জেন তাঁরে—
(যে জন) অন্তকালে জ'পে তাঁরে, ত্যজে নিজ কলেবরে,
(তার) হয় না পুনরাগমন, (আর) ত্রিতাপময় এ সংসারে ॥
(হ'য়ে) "অনন্য চেতাঃ সততং" যে জন উপাসতে তাঁরে
(সে) লভিয়া পরমা সিদ্ধিঃ (ভবে) আনন্দে সদা বিহরে—
যে অজপা জ'পে যোগী, হয় গৃহ সুখ ত্যাগী,
(জপে) "আত্মযোগে" সেই "অজপা," (যেন) যোগেশ্বরীও নিরন্তরে ॥"

যোগেশ্বরী সাধন-সঙ্গীত।

ইহাই জপযোগের মূলতত্ত্ব। অতএব, আত্ম-যুক্তভাবে "অজপায়" জপ অনুষ্ঠিত হইলে, একমাত্র জপযোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়।

আত্মদর্শন যোগ

তৃতীয় স্তর।

সপ্তবিংশ প্রকরণ।

—:*:—

ব্রত বা বিন্দু-ধারণ-যোগে-আত্মদর্শন

বিন্দুধারণ উদ্দেশ্যে মনের একাগ্রতা বিধান জন্য যে সকল ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার নামই ব্রত। ব্রত বলিতে আমরা সাধারণতঃ মেয়েদেরই ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। উহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণী মধ্যেই বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে।

অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব সুব্রত।
নারীভিশ্চ নরৈশ্চৈব কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ॥

দেবী গীতা ৮ অঃ

হে সুব্রত! এক্ষণে তোমার নিকট ব্রতসমূহ বলিতেছি। নারী ও নরগণের যত্ন পূর্ব্বক তাহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

মন সাধারণতঃ চঞ্চল; এ নিমিত্ত বাল্যকাল হইতে তাহাকে কোন স্থির লক্ষ্যে একাগ্র ও দৃঢ় করিবার জন্যই শাস্ত্রকারগণ নানা ভাবে ইহার যে সকল পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি চরিত্র গঠন, কতকগুলি সুশিক্ষা বিধান, কতকগুলি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযমানুষ্ঠান, কতকগুলি দৈহিক

স্বাস্থ্য রক্ষার বিধায়ক, অপরন্তু কতকগুলি বর্ণ ও আশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ মনকে দৃঢ়ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার উপায় স্বরূপে অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষগণের পক্ষে যেমন বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণের ব্যবস্থা আছে, স্ত্রীলোকদের পক্ষেও তেমন পঞ্চমীব্রত, মঙ্গলবারব্রত, সর্ব্বজয়াব্রত, অমাবস্যাব্রত ইত্যাদি ব্রতগুলি, ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠানের নামান্তর মাত্র। ঐ সকল ব্রতে অলবণ খাওয়া, হবিষ্যান্ন ভোজন, ফলাহার করা অতঃপর "উপবাসে প্রতিষ্ঠয়েৎ" অর্থাৎ উপবাস করিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে "বিন্দুধারণ" বা "ব্রহ্ম-বিচরণই" এই সকল ব্রত ধারণের উদ্দেশ্য। পরন্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই প্রায় সমান ভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সদনুষ্ঠান ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে। অর্থাৎ বালকগণের পক্ষে বিন্দুধারণ জন্য গুরুগৃহে বাস করিয়া যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত আচরণের বিধি, বালিকাগণের পক্ষেও তদ্রূপ পিতামাতার আশ্রয়ে বাস করিয়া পিতামাতার সেবা করা ও সংযম উপবাসাদি যোগে নানা প্রকার ব্রতাচরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য বা আত্মসংযম শিক্ষার বিধান আছে। অতএব যাঁহারা বলেন যে প্রথম জীবনে মেয়েদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-আচরণ বা বিন্দুধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাঁহাদের কথা স্বীকার্য্য নহে। এ অবস্থায় ব্রত কথাটি কি তাহাই প্রথম বুঝিতে হইবে। ব্রত, যোগের একটি অঙ্গ। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন।—

"প্রসন্ন গুরুণা পূর্ব্বমুপদিষ্টমনুজ্ঞয়া।
ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধ্যর্থমুপয়াগ্রহণং ব্রতম্॥"

গুরু প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বে যে উপদেশ করেন, পরে তাঁহার অনুমতি অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত। সুতরাং গুরু প্রসন্ন অর্থাৎ গুরু শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট

থাকিয়া শিষ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যে সকল কর্ত্তব্যের উপদেশ করেন, তাহার অনুষ্ঠানই ব্রত। প্রথম জীবনে সুশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বধর্ম্মপালনজন্য যে, চেষ্টা তাহার নামও ব্রত। যাঁহারা বলেন যে, ব্রত কামনা পুরণজন্য, সুতরাং তদ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয় না; তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ বেদ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে,—"মুক্তির ইচ্ছায় যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নামই কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই অকর্ম্ম," সুতরাং ব্রতানুষ্ঠানে যদি মুক্তির ভাব সূচিত না হয়, তবে ঐ সকল ব্রতানুষ্ঠানও নিশ্চয়ই অকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু ব্রত যখন যোগের একটি অঙ্গ; পরন্তু মুক্তির উদ্দেশ্যেই যোগানুষ্ঠান, তখন ব্রতও যে মুক্তির সোপান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানমধ্যে মুক্তির ভাব যেরূপ প্রচ্ছন্ন; অন্যান্য ব্রত-আচরণ-মধ্যেও মুক্তির ভাব সেই রূপই প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতগ্রহণের উদ্দেশ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ "বিন্দু ধারণ"; ব্রতের উদ্দেশ্যও তাহাই। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল বালক প্রথম ভাগ পড়ে, তাহাদের নিকট কলেজের পাঠ্য দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা না করিয়া, তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ বা মনের একাগ্রতা বিধানজন্য, লেখাপড়া শিক্ষা করিলে, তাহারা বড়লোক হইতে পারিবে, গাড়ী ঘোড়া চড়িবে, ইত্যাকার ফলশ্রুতির প্রলোভনে, প্রথম শিক্ষার্থী বালকগণকে যেরূপ মনোযোগদিয়া শিক্ষা লাভের জন্য চেষ্টা করা হয়; অতঃপর উহারা পাঠশালা বা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, কলেজে যাইয়া যেমন তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রণিধান পূর্ব্বক গাড়ীঘোড়া চড়িবার আশা না করিয়া, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে উচ্চশিক্ষায় মনোযোগী হয়; ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রথম সোপানও সেইরূপ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে সংযম ও স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা, ব্রহ্মচারী বা ব্রতধারিগণকে "বিন্দু-ধারণ-যোগে" সংযম শিক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে

পারিলেই, পশ্চাৎ যোগানুশীলন-অভ্যাসে, তাহারাও পরাজ্ঞান বা মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিবে। এজন্যই ব্রতানুষ্ঠানের প্রথমাবস্থায় মোক্ষলাভের উল্লেখ না করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কামনাসিদ্ধির কথাই বলা হইয়া থাকে। "বিন্দু-ধারণই" এই স্থলের "কাম্য বিষয়" ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রতপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ঐ বিন্দু-ধারণ; ইহা মানস কর্ম্ম। প্রকৃতপক্ষে মানসক্ষেত্রে সেই বিন্দু-ধারণ সিদ্ধ হইলেই, সাধক তখন চতুর্ব্বর্গলাভের অধিকারী হয়। তদুদ্দেশ্যে প্রথম হইতেই শক্তি-সঞ্চয়জন্য ব্রতধারণ-যোগে মানসিক সংযম শিক্ষায় জ্ঞানলাভ করিয়া, "ব্রহ্মবিন্দুতে" তাহার "প্রতিষ্ঠায়" যত্নবান হইবে। এই ভাবে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলেই তদ্দ্বারা শক্তি লাভ হয়। মনে রাখিতে হইবে, মানসিক শক্তি গঠনই ব্রতধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য; মন গঠিত না হইলে বহিরঙ্গ-ব্রতানুষ্ঠান নিস্ফল। শাস্ত্রের মর্ম্মও তাহাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"

ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠা হইলেই বীর্য্যলাভ হয়। এই বীর্য্য অর্থই "বিন্দু" বা "শক্তি"; ইহা কেবল বহিরঙ্গ-সাধনে বা উপস্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহদ্বারাই সুসিদ্ধ হয় না। কারণ অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অপরিগ্রহ অবস্থা সিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বীর্য্য বা শক্তি রক্ষা হয় না। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই বীর্য্যক্ষয় হইতে পারে ও হইতেছে। মনের চাঞ্চল্য বশতঃ প্রতিনিয়তই শক্তিক্ষয় হইয়া থাকে। মনের একাগ্রতায় যদি শক্তিবৃদ্ধি ও বীর্য্যধারণ সম্ভব হয়, তবে মনের চঞ্চলতায়ও যে সেইরূপ শক্তি বা বীর্য্য ক্ষয় হয়; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এ জন্য একমাত্র উপস্থ নিরোধ বা তাহার ক্রিয়াশক্তি লোপ করিলেই যে ব্রহ্মচারী হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। একমাত্র উপস্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বা বিন্দু-ধারণ সিদ্ধ হইত, তবে সেইরূপ উপস্থ নিগ্রহকারী নবাব-অন্তঃপুররক্ষী খোজাগণ, অথবা

পশুজাতিমধ্যে যাহাদের উপস্থ নিষ্ক্রিয় করা হইয়া থাকে, সেই সকল মানব ও পশুগণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মচারী এবং মৃত্যুঞ্জয়ী হইত। এ সম্বন্ধে রাণী মীরাবাঈয়ের একটি দোঁহা বড়ই সুন্দর। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নিৎ নাহানেছে হরি মিলে ত জলজন্তু হই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুর বাঁদরাই॥
তিরণ্ খাকে হরি মিলে ত বহুৎ মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুৎ রহেহিয়ে খোজা॥
দুধ্ পিকে হরি মিলে ত বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥"

প্রতিদিন গঙ্গাদি তীর্থজলে স্নান করিলেই যদি ভগবান্‌কে লাভ হইত, তাহা হইলে মৎস্য, কুম্ভীরাদি জলজন্তুরা সহজেই ভগবান্‌কে লাভ করিত। আর ফল-মূল খাইলেই যদি ভগবৎপ্রাপ্তি হইত, তবে বাদুর বাঁদর প্রভৃতিরাও ভগবান্‌কে লাভ করিত। তৃণলতা খাইলেই যদি ভগবান্‌কে পাওয়া যাইত, তবে ছাগ, হরিণ প্রভৃতি জন্তুগণ অনায়াসে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইত। আর স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যদি ভগবান্ লাভ হইত, তবে খোজাগণ ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্য হইত। আর শুধু দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলেই যদি ভগবান্ লাভ হইত, তবে গোবৎসগণই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইত। তাহা যখন হয় না, তখন মীরা বলিতেছেন যে, একমাত্র "প্রেম" ভিন্ন কখনই ভগবান্ লাভ হইতে পারে না। সুতরাং একমাত্র উপস্থনিগ্রহই যে, ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ এরূপক্ষেত্রে শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং॥" শিবসংহিতা ৩অঃ

বিন্দু পতন মৃত্যুর কারণ এবং বিন্দু-ধারণ অমরত্ব লাভের হেতু; এ জন্য সাধকেরা অতি প্রযত্নে বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন। সাধকের পক্ষে বিন্দু-ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা স্বীকার্য্য। কারণ "বিন্দু-ধারণ" ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রতরক্ষা হয় না। "বিন্দু-ধারণ" ভিন্ন আত্ম-দর্শনও লাভ হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, সেই "বিন্দু" জিনিষটি কি? এবং কি উপায়েই বা তাহা ধারণ করা যাইতে পারে, পরন্তু ব্রতানুষ্ঠানই তাহার পন্থা কি না? তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বিন্দু বলিতে কেহ কেহ একমাত্র "শুক্রই" বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু বীর্য্য বা বিন্দু অর্থে যে, একমাত্র শুক্রই নয়, পরন্তু তাহা যে একমাত্র উপস্থ নিগ্রহ করিলেই রক্ষা হয় না; তাহাও কতিপয় দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে শুক্রধারণ যে দেহরক্ষা ও মনের একাগ্রতা সাধনের বিশেষ উপযোগী বা সহায়ক, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু বিধায়ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বরং "বিন্দু-ধারণই" শুক্রক্ষয় নিবারণের পক্ষে বিধায়ক। এক্ষণে "শুক্র" ও "বিন্দু" ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রথমতঃ তাহাই দেখা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শুক্র সম্বন্ধে উক্ত আছে—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রসম্ভবঃ॥
শুক্রসৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয়মুত্তমম্॥
ওজস্তুতেজোধাতূনাং শুক্রস্থানং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপ্য দেহস্থিতিনিবন্ধনং॥"

ভাব প্রকাশ

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। ঐ শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল ও পুষ্টি কারক। উহা গর্ভের বীজ স্বরূপ, শরীরের সার ও জীবনীশক্তির প্রধান আশ্রয়। ঐ রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত, সপ্ত ধাতুর তেজকে "ওজঃ" বলে। এই তেজ বা "ওজঃ" পদার্থই জীবাত্মার স্থিতি নিবন্ধন সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া হৃদয়ে অবস্থিত আছে।

এই ওজঃ শক্তির নাম অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীপ কলিকার তেজ। ইহা শরীর রক্ষার প্রধান আশ্রয়। শুক্র হইতে ইহা বিভিন্ন পদার্থ। সুষুম্না হইতে ব্রহ্মে বিচরণশীল প্রাণাত্মার গতি প্রণবাকারে প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বীর্য্য অর্থাৎ "ওজঃ" বা "তেজ লাভ" হয়। জীব যতদিন "ব্রত বা বিন্দুধারণযোগে" স্বীয় সুষুম্নামধ্যে ঐ প্রণবগতি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি কিছুতেই বীর্য্য ধারণে সমর্থ হইবেন না।

অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, শুক্র এবং বীর্য্য বা ওজঃ ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ। সদ্‌গুরুর কৃপায় প্রাণপ্রবাহ অন্তর্মুখে সুষুম্নাপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে, বীর্য্যলাভ ও "বিন্দুধারণ" হয় না। অতএব একমাত্র উপস্থনিগ্রহই যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত, তাহা নহে। ব্রহ্মে বিচরণই ব্রহ্মচর্য্যব্রত এবং সুষুম্নাই ব্রহ্ম-বিবর। ব্রহ্ম-বিচরণ-শীল হইলে, আপনা হইতেই "শুক্ররক্ষার" শক্তি জন্মে। এই শক্তিসম্পন্ন সাধকই ঊর্দ্ধরেতা।

মন, প্রাণ "ব্রহ্মবিন্দু"যুক্ত করিতে না পারিলে, ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায় না; সুতরাং "ব্রহ্মবিন্দু" ধারণই, ঊর্দ্ধরেতা-শক্তি-সঞ্চয়ের মূল-তত্ত্ব। অতএব বর্ত্তমান সংসারাশ্রমবাসী অর্থাৎ যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন ও যাঁহাদের পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে, শুক্রক্ষয় নিবন্ধন তাঁহারা যে কখনও ব্রহ্মচর্য্যশীল হইতে পারিবেন না, এই কথা বলিয়া, যাঁহারা সংসারাশ্রমীদের মনে বা

ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানকারীদের মনে হতাশ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সংসারাশ্রমীদের যথাবিধি নিজপত্নীসঙ্গতে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে,—

"ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতি র্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্॥"

প্রতি ঋতুকালে নিজপত্নীসহ যথাবিধি যে সঙ্গতি, তাহাই গৃহস্থাশ্রমীদের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত। সুতরাং যাঁহারা বিবাহ করিয়া, স্বীয় পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য বা যোগের অধিকার নষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলা অবৈধ। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ করিলে, অবশ্যই আত্মার উন্নতিলাভে সমর্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; ইহাঁরা সকলেই বিবাহ করিয়া, কেহ কেহ বা একাধিক বিবাহ করিয়া, সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যশীল বা যোগানুশীলনে যথেষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, ইহাঁরা সকলেই বাল্যকাল হইতে সংযমী ছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি ইহাঁদের মধ্যে অনেকের বাল্যজীবনী কখনও আলোচনা করেন নাই। পরন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে যে, রত্নাকরের ন্যায় মহাদস্যু ও নরহন্তা পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ করিয়া, উত্তরকালে মহামুনি বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান সংসারস্থ ভোগ-সুখ-পরায়ণ অসংযমী মানবগণের পক্ষে আত্মোন্নতি লাভের দ্বার যে, চিরজীবনের জন্য রুদ্ধ, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সদ্‌গুরু বা উচ্চাদর্শ প্রাপ্ত হইলে, ইহারাও যে, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া, 'বিন্দুধারণযোগে' বীর্য্যবান্ ও মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জগাই মাধাইয়ের জীবনী আলোচনা করিয়াও বর্ত্তমান সংসারস্থ মানব,

সাধনা বা পুরুষকারকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিন্দুধারণ-যোগে সংযমের পথে অগ্রসর হউন ; জ্ঞানী বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করুন্ ; স্বধর্ম্মরক্ষায় আত্মনিয়োগ করুন্ ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা ব্রত বা বিন্দুধারণ-যোগে "আত্মদর্শন" লাভে মুক্তির অধিকারী হইবেন। দুর্ব্বলবুদ্ধি বা প্রকৃত শাস্ত্রমর্ম্ম অপরিগ্রাহী দেহাত্মবোধিগণের হতাশ বা ভীতিসূচক বাক্যে, বর্ত্তমান সংসারাশ্রমী মানবগণ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণে কখনও নিরাশ হইবেন না। সদ্‌গুরু কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত থাকিয়াও "সূত্রে মণি গণাইব" ভাবে বিন্দুধারণ বা যোগানুশীলন দ্বারা আত্মদর্শনের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বনিতা গ্রহণ কামরিপু চরিতার্থ জন্য নহে; পরন্তু কামরিপু জয়ের জন্যই বিবাহ। আমরা যাঁহাদের বংশধর, সেই সকল যোগিঋষিগণ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, ভৃগু, পুলস্ত্য, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর সকলেই দারাগ্রহণ ও বহুসন্তান উৎপাদন করিয়াছেন ; অথচ যোগ তপস্যায়ও চিরজীবন নিরত ছিলেন। আত্মজ্ঞানযোগে বিন্দুধারণ করিতে পারিলে, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক করে না এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও তাহা করেন নাই। স্বধর্ম্ম বা শাস্ত্রবাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহাদের পন্থার অনুসরণ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণজাতি কোন কালেও স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক লোটা, চিমটা লইয়া "গাছতলা"বাসী হন নাই। অপরন্তু তাঁহারা অভ্যন্তরস্থ "বৃক্ষমূলেই" অবস্থিতি করিয়া, মহাযোগী ও ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছেন ; সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এ স্থলে আরও একটি বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করা আবশ্যক। অধুনা অনেকেই বলিয়া থাকেন, মহাশয়! "কামিনীকাঞ্চন" ত্যাগ না করিলে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় ? ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই হয় ত ধর্ম্মকর্ম্মের খোঁজও রাখেন না, এমন কি স্বধর্ম্মোচিত সন্ধ্যা-গায়ত্রী পর্য্যন্ত পাঠ করেন কি না সন্দেহ ;

অথচ একনিশ্বাসে বলিয়া থাকেন "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না"। তাঁহাদের কথার অর্থই লোটা চিম্‌টা লইয়া সন্ন্যাসী সাজা। সুতরাং "কামিনী কাঞ্চন" শব্দের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা কখনও প্রণিধান করেন না। যে আর্য্যদেশের শাস্ত্র, "ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি সস্ত্রীকোধর্ম্ম-মাচরেৎ" এই বাণী প্রচার করিয়াছেন; যে আর্যদেশে পূর্ণব্রহ্ম অবতার (ভার্য্যা পরিত্যাগী) শ্রীরামচন্দ্রকে পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে সুবর্ণময়ী সীতা মূর্ত্তি গঠন করিয়া, পত্নীর স্থলাভিষিক্তরূপে শাস্ত্রবাক্য পালন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; সেই দেশের লোক "কামিনী-কাঞ্চন" শব্দার্থে কেবল মাত্র স্ত্রী ও টাকা পয়সা মনে করিয়া, কতই প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বুঝা উচিৎ, কামিনী অর্থে কেবলমাত্র স্ত্রী, ও কাঞ্চন অর্থে কেবল মাত্র স্বর্ণ নহে। উহা তাহার বহিরর্থ মাত্র। ভিতরের গূঢ় অর্থ না বুঝিলে, এইরূপ বহিরর্থ অনেক স্থলেই অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি করে। জ্ঞানদৃষ্টিতে "কামিনী" অর্থ "আসক্তি" এবং "কাঞ্চন" অর্থ "মায়া"। আত্মজ্ঞান যোগে 'বিন্দুধারণ' করিয়া, যিনি অনিত্য সংসারাসক্তি ও মায়া প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই যথার্থ পক্ষে 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগী। তিনিই রাজর্ষি জনকের ন্যায় 'কামিনী কাঞ্চন' পরিবৃত থাকিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন বিঘ্ন উৎপাদন হয় না। আর যিনি "আসক্তি" ও "মায়া"ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি লোটা চিম্‌টা লইয়া 'গাছতলা'-বাসীই হউন, ভস্মই মাখুন, নিরাহারী বা একাহারীই হউন্ তাঁহার মন সততই "কামিনী কাঞ্চনে" অভিভূত। তাঁহার ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ সমস্তই মিথ্যা। পরন্তু মানবদেহই প্রকৃতির অভিব্যক্তি। দেহের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী ও অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ। যাঁহারা যোগী বা সাধক, তাঁহারা জীবাত্মা বা কুণ্ডলীকে পরমাত্মরূপী ব্রহ্মবিন্দু বা পরমেশ্বরে যুক্ত করিবার জন্যই

বিন্দু ধারণ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ব্রতাদিদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা ব্রতের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বাহ্যভাবে যে কোন ব্রতই অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহা প্রতিষ্ঠার অযোগ্য (১)

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রতানুশীলন করার নামই কর্ম্ম। আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের নামই কর্ম্মযোগ। এই প্রকারে কর্ম্মযোগের অনুশীলনই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা; তদ্দ্বারাই চিত্তকে ব্রহ্মে স্থিত করিবার শক্তি সঞ্চয় হয়। এই শক্তি সঞ্চয় হইলেই, প্রকৃতপক্ষে আত্মদর্শন বা বিন্দু-ধারণের ক্ষমতা জন্মে। ঐ "বিন্দু-ধারণ" হইলেই জীবের মায়ামোহ-যুক্ত সংসারাসক্তি তিরোহিত হইয়া বিষয়-বৈরাগ্যযুক্ত বিমল জ্ঞান ও আত্মানন্দ লাভ হয়। "বিন্দু-ধারণ" অবস্থা যত পরিপক হইতে আরম্ভ হয়, ততই সাধক বা যোগীর ভোগাসক্তি নিবৃত্তি হইতে থাকে। তদবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ আপনা হইতে তাহার বশতাপন্ন হইয়া মিত্রভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র মনকে জয় করিতে পারিলেই বহিরঙ্গভাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিশেষতঃ উপস্থকে ধ্বংস করিতে হয় না। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ জন্য বাহ্য-কঠোরতা বিধান করিলে তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট করা হয়। তাহাতে যে কেবল সাধনার পক্ষে সিদ্ধি লাভের অন্তরায় হয়, তাহা নহে; পরন্তু দেহের পক্ষে স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর কারণ হয়। তবে যথাসম্ভব ভাবে বাহিরের সংযম ব্রহ্মচর্য্যের সহায়ক স্বরূপে অনুষ্ঠান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

---

(১) অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম। তাহারা দেশ, কাল, জাতি ও সময়ের দ্বারা অনিয়মিত বা সার্ব্বভৌম হইলে, তাহাই মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং ব্রত বাহ্য আচরণ নহে, ব্রত "মানস" অনুষ্ঠান।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একমাত্র উপস্থ-ইন্দ্রিয়-নিগ্রহদ্বারাই মৈথুনত্যাগ বা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মৈথুন আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনং ত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥"

শ্রীমদ্গীতাসার ১ম অঃ

সর্ব্বদা ও সর্ব্ব অবস্থাতে কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা, বাক্যদ্বারা, মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধ ভিন্ন একমাত্র উপস্থনিগ্রহে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। এ অবস্থায় আদৌ মনকে জয় অর্থাৎ "অহং" ভাবকে শুদ্ধ করিতে না পারিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় কিছুতেই নিরোধ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

"মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণম্।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥" শিবগীতা

মনোজয় করিতে পারিলেই বায়ু ও বিন্দু-ধারণ হয়। তদ্দ্বারা ইহ ও পরলোক সম্বন্ধীয় সিদ্ধি আয়ত্ত হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে কথিত আছে, "বায়োরগ্রে বসেন্মনঃ" বায়ুর অগ্রে মন বাস করে; সুতরাং বায়ু মনেরই অনুগামী; অর্থাৎ মনকে অগ্রে চালনা করিলে পশ্চাদ্বর্ত্তী বায়ু আপনা হইতেই মনের অনুগামী হইবে। এতদ্দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে হয় না। বরং তাহা অনিষ্ট-দায়ক। বিন্দু-ধারণের জন্য আত্ম-জ্ঞান-যোগে, প্রণবরূপ সূক্ষ্মদেহের "ব্রহ্ম বিন্দুতে" প্রগাঢ় ভাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টাই সহজ উপায়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন—

"স্বরেণ সন্ধয়েদ্‌যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে ॥

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ

যাহারা প্রথমাধিকারী তাঁহারা প্রণব অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত নিরোধের অভ্যাস করিবেন এবং বাক্যাতীত পরব্রহ্মের (ব্রহ্মবিন্দুর) চিন্তা করিবেন। এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যান করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভাবে "ব্রহ্মবিন্দু-ধারণই" ব্রত বা "বিন্দু-ধারণ-যোগ"; তদ্দ্বারাই মন স্থির হয়। সুতরাং মন স্থিরের সঙ্গে বায়ু আপনা হইতেই স্থির হইয়া আসিবে। গুরুকৃপা-বশে বা ধ্যানযোগে, ঐ "ব্রহ্মবিন্দুতে" সংযমন করিতে পারিলেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম বা "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়। প্রথমে তাহা বিদ্যুতের ন্যায় বড়ই সূক্ষ্ম স্পন্দনে উপলব্ধি হয়। তবে সাধক বা যোগী অভ্যাসযোগে ঐরূপ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে উহা স্থির ও স্থায়ী হইয়া থাকে। এই স্থায়ী হওয়ার নামই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা বা বীর্য্যলাভ। সদ্‌গুরু সন্নিধানে বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিয়া উহাই অভ্যাস করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই বীর্য্য বা শক্তি লাভ হয়। ঐ বিন্দুই ব্রহ্মরাজ্য, উহার অন্তর্ভাগে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। মধ্যভাগে জ্যোতিঃব্রহ্ম। বহির্ভাগে জীবব্রহ্ম। ঐ বিন্দুর নামই "ব্রহ্মবিন্দু"; ইনিই পরমেশ্বর। ইহা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

"সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণে নিলয়ান্তরে।
"বিন্দুরূপে" মহেশানি পরমেশ্বর ঈড়িতঃ"

শতনাম স্তোত্র

হে মহেশানি! আমি সমস্ত জীবদেহে, সহস্রদল পদ্মস্থ ত্রিকোণে, তোমার সহিত অভেদযুক্ত ভাবে "বিন্দুরূপে" অবস্থান করিতেছি। সেই বিন্দুকেই পরমেশ্বররূপে জানিও। সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মেরই শাস্ত্রবাক্য এই যে,

সর্ব্বাগ্রে সেই পরমেশ্বরের অনুসন্ধান কর। এই জন্য বহিঃস্থ যাবতীয় কর্ম্মে, নাম ও রূপহীন ব্রহ্মস্বরূপ শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ, পরমেশ্বররূপে সম্মুখে রাখিয়া, সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি ভাবে প্রার্থনা করা হয় যে,

"তস্মিন্‌তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তস্মিন্ লব্ধে সর্ব্বলাভো বৃথাসর্ব্বং যদন্যথা॥"

পরমাত্মা বা পরমেশ্বর তুষ্ট হইলে জগৎতুষ্ট, তাঁহাকে প্রীত করিতে পারিলেই জগৎকে প্রীত করা হয় এবং তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বলাভ হয়, ইহার অন্যথা হইলে সকলই বিফল। সুতরাং সেই বিন্দুরূপ পরমেশ্বরকে ধারণ করিতে পারিলেই যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা, প্রতিষ্ঠা সমস্তই সিদ্ধ হইবে। আজ্ঞাপদ্মের ঊর্দ্ধে নাদ, তদুপরি এই "বিন্দু" অবস্থিত। ইহাই যোগিগণের নিত্যধ্যেয় বস্তু। এই বিন্দুই অর্দ্ধনারীশ্বর, পুরুষ প্রকৃতি অভেদাত্মক ব্রহ্ম। ইহা স্বয়ং ব্রহ্মাও বলিয়াছেন।—

বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবম্।
উমার্দ্ধং দেহং বরদং সর্ব্বকারণকারণম্॥

যাজ্ঞবল্ক্য

"উমার" সহিত শরীরের অর্দ্ধাংশে সর্ব্বকারণের কারণ ব্যোমাকার সদাশিব বিন্দুরূপে অবস্থিত আছেন, ইহার নামই বিন্দুপীঠ। এই বিন্দুপীঠ আজ্ঞা-পদ্মের উপরে অবস্থিত।

পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥

মহানির্ব্বাণ

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধদেশে যোগচিন্তাপথে তিনটি পীঠ আছে। সর্ব্বোচ্চ "বিন্দুপীঠ", দ্বিতীয় "নাদপীঠ"; তৃতীয় "শক্তিপীঠ"। এই বিন্দু ধারণই ব্রহ্মচর্য্যাদি যাবতীয় ব্রতের চরমোৎকর্ষ। এই বিন্দু ধারণ দ্বারাই

ব্রহ্মচর্য্যাদি যাবতীয় ব্রত প্রতিষ্ঠায় বীর্য্য বা শক্তি লাভ হয়। এই বিন্দু-ধ্যানই সূক্ষ্ম ধ্যান। ইহা যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ।
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ন্তথা।
সূক্ষ্মবিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥"

স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ভেদে ধ্যান তিনপ্রকার। তন্মধ্যে মূর্ত্তি বা সাকার ধ্যান স্থূল এবং তেজস্তত্বের আশ্রয়ে প্রাণরূপ প্রণব প্রবাহে সপ্ত ব্যাহৃতি যুক্ত সুষুম্নামধ্যস্থ চিত্রাণিপথে, জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কারের যে জ্যোতিঃ প্রবাহ বিরাজিত আছে, অন্তঃপ্রাণায়ামে তাহার অনুলোম বিলোম দ্বারা ভর্গোজ্যোতির আকর্ষণকেই জ্যোতির্ধ্যান বলে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা প্রণবোপরি প্রকৃতি পুরুষের অভেদাত্মক ব্রহ্মবাচক "বিন্দুরূপ" পরমেশ্বর বা পরমাত্মায়, জীবাত্মার মিলন রূপ যে যোগানুষ্ঠান বা ব্রহ্মসদ্ভাব, তাহার নামই সূক্ষ্মধ্যান। এই সূক্ষ্মধ্যান দ্বারাই নির্গুণ উপাসনা বা "ব্রহ্মবিন্দু" ধারণ হয়। চাতুর্ব্বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে এই "বিন্দু-ধ্যানই" নিত্যকর্ম্ম; ইহাই ব্রাহ্মণের নিত্য উপাংশু-সন্ধ্যা-গায়ত্রী; ব্রাহ্মণের বৈদিকীসন্ধ্যা স্থূলদেহের কার্য্য নয়। এ সম্বন্ধে ধ্যানযোগ প্রকরণে বিস্তারিত বিবৃত হইবে।

শাস্ত্রানুসারে উপনয়নসংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই, ব্রত বলিয়া কথিত। বৈদিক সন্ধ্যার প্রাণায়াম, ধ্যান বা গায়ত্রী জপমধ্যে উপরোক্ত স্থূল, জ্যোতিঃ ও সূক্ষ্ম এই ত্রিবিধ প্রকার ধ্যান বা উপাসনা নিহিত রহিয়াছে। অধিকারীভেদে নিম্নাবস্থায় স্থূলধ্যান, মধ্যাবস্থায় জ্যোতির্ধ্যান ও উচ্চাবস্থায় সূক্ষ্মধ্যান বা ব্রহ্মসদ্ভাব। উক্ত তিন প্রকারের কর্ম্ম দ্বারা তিন প্রকার দেহের বিভাগ সাধিত হয়। অর্থাৎ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ,

এই দেহত্রয়ের বিষয় পূর্ব্বে যথাস্থানে বলা হইয়াছে। এখন উপনয়ন সংস্কার বা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানে বিন্দুধারণের পন্থা, বৈদিকী সন্ধ্যায় যেরূপে অন্তর্নিহিত আছে, এ স্থলে সংক্ষিপ্তরূপে তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে। সন্ধ্যাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন, এই গ্রন্থে, ভাষায় প্রকাশ-যোগ্য সন্ধ্যার বিষয়গুলিও সম্যক পরিস্ফুট করা অসম্ভব। পরন্তু সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ গুরুমুখী বিদ্যা; ভাষা দ্বারা ইহার সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব; কার্য্য-কারণ-অনুশীলনে উপলব্ধি করা ভিন্ন, পুস্তকের ভাষায় প্রকাশ অথবা কদাচ তাহা পরিগ্রহ হইতে পারে না।

বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়ামের দ্বারাই বিন্দুধারণ ও ব্রহ্মবিচরণ বা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেদত্রয়োক্ত ব্যাহৃতি অনুসারে মন্ত্রের একটু ইতর বিশেষ থাকিলেও সাধনপ্রণালী মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। এস্থলে সামবেদোক্ত ক্রিয়ার বিষয়ই বলা যাইতেছে। কথিত প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।—

"গায়ত্রী শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
ত্রিজপেৎ সদশোঙ্কারং প্রাণায়ামোঽয়মুচ্যতে॥"

যোগদর্শন।

স্বশিরস্ক, ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জনঃ-তপঃ-সত্যং এই সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত দশটি প্রণব বিশিষ্ট গায়ত্রী, তিনবার সুষুম্নাপথে জপ করাকেই অন্তঃপ্রাণায়াম বলে। উক্ত প্রকারে সুষুম্নাপথে ভূতত্ত্বগত জীবাত্মাকে, অন্তঃপ্রাণায়াম যোগে, আকাশ তত্ত্বে পরমাত্মায় মিলিত করাকে ভূতশুদ্ধি বলে। বৈদিকী সন্ধ্যার এই অন্তঃপ্রাণায়ামযোগে, প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি উভয়ই সাধিত হয়। সুতরাং স্বশিরস্ক সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত দশটি প্রণব (গায়ত্রীকে) সুষুম্নায় সমারোহণ করাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। সমগ্র দেহই প্রণবময়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।—

"সর্ব্বাঙ্গং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥"

সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিত ওঁকারাকৃতি প্রণব যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনিই বেদবিৎ, অর্থাৎ বেদজ্ঞ। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য বা বিন্দুধারণের উহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্থূল, জ্যোতিঃ ও সূক্ষ্ম এই ত্রিবিধ ধ্যান, উক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামরূপ গায়ত্রী-উদ্গীথ ধ্যানে বা জপযোগেই যে সিদ্ধ হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।—

বিন্দুধারণযোগে বৈদিকী অন্তঃপ্রাণায়াম ॥

স্থূলধ্যান পূরক—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

অর্থ—নাভিদেশে রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, একহস্তে অক্ষ (জপমালা) ও অপর হস্তে কমণ্ডলু, হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী ও তাহার শিরোভাগ চিন্তা করিবে। প্রাণায়ামের এই অংশ প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য। পূরক, কুম্ভক, রেচকাখ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক স্থূলধ্যান। যাহারা জ্যোতিঃ ও সূক্ষ্মধ্যান করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য গায়ত্রী জপের পূর্ব্বেও উহার ত্রিশক্তিবাচক অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণীর স্থূলমূর্ত্তি কল্পনায়, গায়ত্রীর পৃথক্ পৃথক্ ধ্যানের বিধান আছে।

জ্যোতির্ধ্যান—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ওঁ ভর্গোদেবস্য, ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অর্থ—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং এই সপ্তলোক প্রকাশক, সৃষ্টি স্থিতি লয়কারক, ত্রিগুণাত্মক, জীবের একমাত্র উপাস্য,

যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন, সেই ওঁকারস্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ, আমরা ধ্যান করি। ইহাই জ্যোতির্ধ্যান।

সূক্ষ্মধ্যান—ওঁআপোজ্যোতীরসোমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

অর্থ—যে জ্যোতিঃ জগতের কারণীভূত জল স্বরূপ ও তেজস্বরূপ. তৃণ, বৃক্ষ, ওষধির রসস্বরূপ এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষীর চেতনা স্বরূপ, পরন্তু যিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং) বা সপ্তলোক স্বরূপ। সেই যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম তাহাকে ধ্যান করি। তিনিই আমার অভেদ স্বরূপ। ইহাই সূক্ষ্মধ্যান বা নিগুর্ণ ব্রহ্মধ্যান।

১। স্থূলধ্যান—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানের প্রথম স্তর, অর্থাৎ অকার, উকার, মকারাত্মক ত্রিশক্তির সমন্বয় সাধন; ইহা প্রথম শিক্ষার্থী বা অজ্ঞানীর জন্য, সত্ব, রজঃ, তমোগুণাত্মক মূর্ত্তি উপাসনা।

২। জ্যোতির্ধ্যান—ব্রহ্মবিচরণ অবস্থা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্রহ্মধ্যান। ইহাকে কেহ কেহ নাদ বা ব্রহ্মশক্তির ধ্যানও বলিয়া থাকেন। ইহাই চণ্ডীর অন্তর্গত ব্রহ্মোক্ত।—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যান্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতি রূপাচ পালনে।
* * * *
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী॥

ইনিই মহামায়া, ইনিই পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুকে, স্বীয় তেজোরূপ মহামায়ায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ মহামায়ার আবরণ উন্মুক্ত হইলেই পরমাত্মা বা পরমপুরুষ প্রকাশিত হন। তদ্ধেতু গায়ত্রীর "তৎ" হইতে "য়াৎ" পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি অক্ষররূপী চতুর্ব্বিংশতিশক্তি-তত্ত্বের বীজ স্বরূপ, ভর্গোজ্যোতীর মূলপ্রান্তে ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকারস্থিত নাদোপরি "বিন্দুরূপ" নিগুর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজিত।

৩। সূক্ষ্মধ্যান—প্রোক্ত ওঁকারই গায়ত্রীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইনিই পরমপুরুষ "ব্রহ্মবিন্দুরূপে পরমাত্মা"। ইহার ধারণা দ্বারাই যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাসাদি ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকে ধ্যান ও ধারণা করিতে পারিলেই "আত্মদর্শন" লাভ হয়। ইনিই গীতোক্ত।—

"সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" ৮ম অঃ

ইনিই সেই "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইনিই পরম দিব্যপুরুষ, বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্র ইহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত। শ্রুতি বলিয়াছেন।—

"বেদাদি বাঙ্ময়ং সর্ব্বং প্রণবে যৎ প্রতিষ্ঠিতং।
ততঃ প্রণবমভ্যস্যেদ্বেদাদিং বেদজাপকঃ॥" যোগদর্শন।

বেদাদি নিখিল বাঙ্ময়শাস্ত্র, প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব বেদাভ্যাসী ব্যক্তি বেদের অধিভূত প্রণব যত্নসহকারে জপরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস করিবে, ইহাতে যুক্ত থাকাই ব্রহ্মচর্য্য।

"প্রণবে নিত্যযুক্তস্য সপ্তসু ব্যাহৃতিষ্বপি।
ত্রিপদায়াস্তু গায়ত্র্যাং ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ॥
একাক্ষরং পরব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ।
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি পাবনং কলসোদ্ভব॥" যোগদর্শন।

যে ব্যক্তি সপ্তব্যাহৃতিবিশিষ্ট ত্রিপদা গায়ত্রীযুক্ত একাক্ষরাকৃতি প্রণবময় অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনও কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যেহেতু অন্তঃপ্রাণায়ামরূপ পরমতপোভূত একাক্ষর "প্রণব"ই পরব্রহ্ম স্বরূপ ; রিপুবিমর্দ্দক এবং পরম পবিত্রতা বিধায়ক।

এই অন্তঃপ্রাণায়ামরূপ সূক্ষ্মধ্যানদ্বারাই সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত সপ্তপদ্ম ভেদ করিয়া মানব ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারে। এই বিন্দুধারণরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম মধ্যেই গায়ত্রীর সপ্তছন্দঃ, সপ্ত দেবতা বিদ্যমান। ইহা বৈদিকী সন্ধ্যাতেও উক্ত আছে।—

"ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী
পঙ্‌ক্তিস্ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-
বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥"

ভূ র্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং এই সাতটি ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি (যথাক্রমে) গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুব্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুব্, জগতী এই সাতটি উহার ছন্দ এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব উহার এই সপ্তদেবতা এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়। ইহা পূর্ব্বেও সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

অতএব বিন্দুধারণরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস জন্যই স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যান, শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বপ্রকার ব্রতাদিমধ্যেও ইহাই সাধনালব্ধ বিষয়। এই "বিন্দু" ধারণযোগেই ব্রহ্মচর্য্য বা অন্যান্য যাবতীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয়। এই বিন্দু-ধারণ উদ্দেশ্যেই যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, তপস্যাদি যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী মধ্যেই ইহা অন্তর্নিহিত আছে। আত্মজ্ঞান-যোগে এই বিন্দু ধারণ করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠা

করিতে হয়। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলেই বীর্য্য বা আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সদ্গুরুকৃপায় গার্হস্থ্যব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারাও ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব বিন্দুধারণের সহিত "শুক্রক্ষয়ের" সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র এবং তাহা গৌণ। সুতরাং এ বিষয় সংসারাশ্রমিগণের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা গায়ত্রী জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই "ব্রহ্মবিন্দু" ধারণেরই অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান অভাবে তাহার ফল বা উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে। আত্মজ্ঞান-যোগে গায়ত্রীর সূক্ষ্মধ্যান করিতে পারিলেই "আত্মদর্শন" লাভ হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহার নামই "আত্ম-দর্শন-যোগ"। বেদমূলক উপনিষৎও তাহাই বলিয়াছেন।—

> "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
> দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"
>
> কাঠকোপনিষৎ

এই একাক্ষরাত্মক পরমাত্মপুরুষ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল ভূতে বিরাজিত থাকিয়াও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায়, প্রকাশ পান না। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা একাগ্রতাবিশিষ্ট সংস্কৃতবুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) দ্বারাই "আত্মদর্শন" করিতে পারেন।

ব্রত সম্বন্ধে আর একটি কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত-কর্ম্মজনিত-জ্ঞানরূপ ফল বা কর্ম্মশক্তি, কি এই জন্মেই প্রাপ্তব্য? না ব্রত-অনুষ্ঠাতা, পরজন্মে তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন? কেহ কেহ বলেন যে, মানব পরজন্মে উহার ফলভাগী হয়; এ কথা বড়ই হাস্যাস্পদ। ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর কি আছে? কেহ কোন ব্যাধি উপশম করার জন্য এ জন্মে ঔষধ সেবন করিলে, তাহার ফল কি, রোগী পরজন্মে প্রাপ্ত হইবে? কেহ কি এইরূপ আশা করিয়া, ঔষধ সেবন করিয়া

থাকেন? না কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক, রোগীকে তাহার পরজন্মে রোগ আরোগ্য হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া শান্ত রাখিতে পারেন? যদি সুচিকিৎসক-প্রদত্ত ঔষধের গুণে স্থূলদেহের রোগ এই জন্মেই আরোগ্য হইতে পারে, তবে ব্রতাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সূক্ষ্মদেহের সঞ্চিত রোগগুলিও এই জন্মেই আরোগ্য হইবে না কেন? না হইলে সে ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, হয় চিকিৎসক বিজ্ঞ নহেন; তন্নিবন্ধন রোগের চিকিৎসানুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই; অথবা রোগী নিজে কুপথ্যসেবী হওয়ায়, নিজেই চিকিৎসকের উপদিষ্ট-নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ **বাহ্য-ব্রতধারিগণের** পক্ষে, কোন জন্মেই ফল প্রাপ্তির আশা নাই। কারণ ব্রত, যোগের একটি অঙ্গ। শাস্ত্রানুযায়ী ব্রতপালন ও ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, এই জন্মেই কর্ম্মের শক্তিলাভ বা যোগবল সঞ্চয় হয়। প্রাচীন যোগিঋষি ও তদীয়া পত্নীগণ. যে জন্মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই জন্মেই তাহার ফল লাভ করিয়াছেন। সাবিত্রী যে জন্মে ব্রত করিয়াছেন, সেই জন্মেই ফলস্বরূপ মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। মহাভারতেও কর্ম্মকে উভয়কালেরই প্রত্যক্ষীভূত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২২৬ পৃষ্ঠা দেখ) এ সম্বন্ধে পুরাণাদি গ্রন্থে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে—

এ জন্মে যাহারা পুরুষ বা স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিয়াছে; পরজন্মেও যে, তাহারা সেই সেই ভাবে পুরুষ বা স্ত্রীলোক হইয়াই জন্মিবে, শাস্ত্র তাহা বলেন না। শাস্ত্র বলেন যে, পুরুষ বা স্ত্রী তাহার স্থূলদেহের একটা অবস্থা মাত্র। আত্মা বা প্রাণচৈতন্যের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য কোন প্রকার জাতি বিভাগ নাই। জীব যে সংস্কার বা আসক্তিতে বদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিবে, সে তদনুরূপ ভাবে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ বা দেহধারণ করিয়া, পুনরায় প্রারব্ধের অধীন হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতেও তাহাই বলিয়াছেন এ স্থলে তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি।
নিশ্চয় আমার ভাব প্রাপ্ত হন তিনি॥ ৫
যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,
কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
কৌন্তেয়! দেহান্তে জীব সেই ভাব পায়॥" ৬

৮ম অঃ

এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, মেয়েরাও যদি পরজন্মে স্ত্রীলোক হইবার সংস্কার লইয়া দেহত্যাগ করেন, তবে যে, সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যদি তাঁহারা ব্রতকে এ জন্মেরই কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, কেবলমাত্র প্রারব্ধক্ষয় জন্য ব্রতানুষ্ঠান করেন, পরন্তু আত্ম-জ্ঞান-যোগে নিজেকে একটী স্ত্রীজাতি স্বরূপে না বুঝিয়া, স্ত্রীজাতীয় দেহটা, তাহার একটা অবস্থা মাত্র; এই জ্ঞানে, নাম রূপের সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেষ্ট বা পরমাত্ম-শিব স্বরূপে, নিজকে ধারণা করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে আর স্ত্রীলোক হইয়া, জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। পরন্তু স্ত্রীজনোচিত অনিত্য সাংসারিক দুঃখ বা বৈধব্য যন্ত্রণা হইতেও তাঁহার চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ হইবে। যাঁহারা মনোযোগ দিয়া মহাভারত পাঠ করিয়াছেন; তাঁহারা এই উক্তির সত্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহার মনোভাব যেরূপ, তাহার সেই রূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বেদমূলক শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।"

যে যেরূপের উপাসনা করে, সে সেই রূপই প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে ভাগবতে উক্ত আছে—

"যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলাং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্॥"

স্নেহ বশতঃই হউক, বা দ্বেষ বশতঃই হউক; অথবা ভয় প্রযুক্তই হউক, দেহী একাগ্রচিত্তে নিরন্তর যে বস্তুকে ভাবনা করে, সে তৎস্বরূপকে লাভ করিয়া থাকে। রাজর্ষি ভরত, হরিণশিশু ভাবিতে ভাবিতে হরিণশিশু হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিন্তাশক্তি বিশেষরূপে গাঢ় হইলে এই জন্মেই ধ্যেয় বস্তুর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। "কীটকে ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রামরাত্মায় কল্পতে" অর্থাৎ তৈলপায়িকা নামক কীট, ভ্রমর বা কাঁচপোকা চিন্তা করিতে, করিতে সেই জন্মেই কাঁচপোকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মানব, যদি আত্ম-জ্ঞান-যোগে, স্থূলদেহের নাম ও রূপের স্মৃতি, কোন প্রকারে বিলয় করিতে পারেন, তবে তিনিও তাঁহার নিত্য আরাধ্য ইষ্টদেবতা বা শিবভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স বক্ষ্যতে॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

জীব; স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব; যে সময়, যে দেহ আশ্রয় করে, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পায়। জীব দেহধারী হইলেই, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। সুতরাং নিজকে শিবস্বরূপ জ্ঞান রাখিবার উদ্দেশ্যেই ব্রতগ্রহণ।

অতএব যাঁহারা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া পরজন্মে ব্রতফল প্রাপ্তির কামনা পূরণ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের মুক্তি লাভের আশা

সুদূর পরাহত। কারণ যাঁহারা নিজেরাই পরজন্মে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, এইজন্মে "এগ্রিমেণ্ট" বা প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিতেছেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, তিনি কি দেহ? না দেহী? তাহা হইলেই নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে. তিনি ঐ দেহ নন্। অপরা প্রকৃতিগত মনের বিকার অবস্থায়, কামনা-বাসনাময় সংসারে তিনি ঐরূপ দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"নির্গুণোনিষ্ক্রিয়োনিত্যো নিত্য-মুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

অপরোক্ষানুভূতি

আমি নির্গুণ, ক্রিয়াবিহীন, নিত্য ও নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বন্ধনশূন্য ও "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ। আমি অসংরূপ দেহ নই। জ্ঞানিগণ এই ভাবকেই "আত্মজ্ঞান" বলিয়া থাকেন।

অতএব ব্রতাদি কর্ম্ম এই দেহেরই প্রারব্ধক্ষয় ও মুক্তির উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়; পরজন্মের জন্য নহে। এবম্প্রকার ব্রত বা বিন্দু-ধারণ-যোগেই **"আত্ম-দর্শন"** লাভ হইয়া, জীবন্মুক্ত-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রত-অনুষ্ঠানের মূল অভিব্যক্তি।

তৃতীয়স্তর।

অষ্টবিংশ প্রকরণ।

উপবাস-যোগে আত্ম-দর্শন।

উপবাস, ব্রতের একটি অঙ্গ বা ব্রত হইলেও, আত্মদর্শন লাভের পক্ষে উপবাস একটি বিশুদ্ধ-যোগস্বরূপ। ইহা আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া নানা কারণে তাহার স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা, পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে উপবাস প্রধানতঃ আনুষঙ্গিকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন হরিবাসর বা একাদশী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, শ্রীরামনবমী প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য অনুষ্ঠেয় ব্রতে, উপবাসই মূল বা মুখ্যকর্ম্ম। অর্থাৎ অসমর্থ পক্ষে আনুষঙ্গিক পূজাদি করিতে না পারিলেও অনেকে কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকেন। পরন্তু প্রত্যেক উপবাসের পূর্ব্বে "সংযম" ও অন্তে "পারণ" করিবারও বিধি আছে। উক্ত সংযম ও পারণ ভিন্ন উপবাস সিদ্ধ হয় না। এতন্মধ্যে বর্ত্তমানকালে ঐ সংযম অর্থে একবেলা নিরামিষ বা আতপান্ন গ্রহণ। উপবাস অর্থে দেহদণ্ড বা অভুক্ত থাকা। পারণ

অর্থে পঞ্জিকার লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে জলগ্রহণ করা। ইদানীং অনেকে উহাকে "পারণের জলপড়া খাওয়া" বলিয়া থাকে। এই সকল উপবাস মধ্যে আবার একাদশীর উপবাস, ব্রাহ্মণ ও বিধবার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রবিধি হইলেও, ইদানীং ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্ম্মাচরণীয় অন্যান্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই একাদশী-উপবাসেরও "অন্তর্জলী" করিয়াছেন। কেহ কেহ বা একাদশী তিথিতে "অন্নগত পাপ" এই বচন বাহির করিয়া, পক্ষান্তে একদিন, একমাত্র তণ্ডুলসিদ্ধান্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লুচিপুরী, ডাল, ডালনা, তরকারীদ্বারা কোনরূপে, অন্যদিন অপেক্ষাও পরিমাণে কিছু বেশী, "তৈজসপত্র" উদরস্থ করিয়া "ব্রহ্মযজ্ঞ" সমাধা করেন। কেহ কেহ বা সাত্ত্বিকভাবে ফলমূলাহারী হইয়াও দিনটা কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া দেন। কিন্তু শেষোক্ত ব্রাহ্মণের সংখ্যাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী হিন্দু বিধবা-গণের পক্ষে, বড়ই কঠোরতার ব্যবস্থা। অসমর্থ পক্ষে শিবরাত্র্যাদি উপবাসে, রাত্রে শিবপূজা করিয়া বরং জল খাওয়া অনুমোদিত, কিন্তু একাদশীর উপবাসে কচি বালবিধবা, কিম্বা উহাদের মধ্যে কেহ মুমূর্ষা রোগিণী হইলেও, তাহার পক্ষে জলগ্রহণ কিছুতেই বিধি নয়। কিন্তু এ বিধি কি বিধির বিধি? না বেদের বিধি? না অবিধির বিধি? সে সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতগণও সম্যগ্রূপে বিধিনিষেধ বিচার করিয়া, এ পর্য্যন্ত বিধি দিতে পারেন নাই। তদ্ধেতু দেশাচার মতে দুই ভাবেই ইহার প্রচলন চলিতেছে। অর্থাৎ কোন কোন দেশে বিধবার জলগ্রহণ দোষণীয় নহে, কোন কোন দেশে বাহ্য শৌচাচারেও যেন ঐ দিন বিধবার জলগ্রহণ নিষিদ্ধ। যেন কোনরূপে ঐ জল নাড়ীগ্রস্ত হইয়া বিধবাকে ভ্রষ্টাচারী না করে, এজন্য বালবিধবাগণকে তালা বন্ধ পর্য্যন্ত করিয়া রাখা হয়, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী হইলেও, পিপাসায়

তাঁহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়া অবস্থাতেও, একবিন্দু জলপান করিয়া, প্রাণরক্ষা বা ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধানে অধিকার নাই, ইহা কি সত্য? শাস্ত্র বিধি সম্বন্ধে এদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের অভিমত জানা গিয়াছে যে, একাদশী ব্রতে বিধবাকে একেবারে নিরম্বু উপবাস করিতেই হইবে, শাস্ত্রে এরূপ কোন্ ব্যবস্থা নাই। বরং অসমর্থের জন্য ফল মূল দুগ্ধাদি পানের এবং নিতান্ত অসক্তের জন্য রাত্রিতে হবিষ্যান্নেরও ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়, তাঁহার প্রণীত "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাশ" পুস্তকে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনস্মৃতির তিথিতত্ত্বে উক্ত আছে যে—

"নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বুবাজ্যম।
তৎ পঞ্চগব্যং যদিবাথ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ"॥

ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন পৃথগ্ ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। পরন্তু লোক বা দেশাচার ভেদেও যখন দুই মতে অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, তখন নিরম্বু উপবাস দেশাচার বা লোকাচার ভাবেও যে সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এসম্বন্ধে বর্ত্তমানে বারেন্দ্র শ্রেণীর স্তম্ভস্বরূপ, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, পরম নিষ্ঠাবান্ রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের স্বীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিখ্যাত ত্রিশূল পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের যে সকল গ্রন্থ এদেশে ছাপা হইয়াছে এবং ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশ হইতে ছাপা হইয়া যে সকল পুস্তক এদেশে আসিয়াছে ঐ সকল পুস্তকে এবং তাহার বাঙ্গালা ও ইংরেজী অনুবাদ পুস্তকের কোন স্থানেই একাদশীর দিন, তৃষিতা, প্রার্থিতা মুমূর্ষা হিন্দু বিধবাকে যে একটু গঙ্গাজলও দিতে হইবে না, এমন কোন কথাত

নাই-ই, পরন্তু একাদশী সম্বন্ধে কোন কথাও ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার অতিরিক্ত হাতের লিখা বেদের কোনও পুস্তকে হয়ত' থাকিতেও পারে, কিন্তু ঐ সকল পুস্তক দেখিবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করিতে পারি নাই।"

"শুধু বেদে নহে, শঙ্কর-ভাষ্য-যুক্ত উপনিষৎ সমূহের মধ্যে, কোথাও একাদশীর কথা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।"

"মনুস্মৃতি প্রভৃতি কোন ধর্ম্মসংহিতা বা ধর্ম্মসূত্রের মধ্যেও প্রার্থিতা তৃষিতা মুমূর্ষা হিন্দুবিধবাকে, একাদশীর দিনে যে জলদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, এমন ভাবের কোনও বচন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন মুদ্রিত তন্ত্র গ্রন্থের কোথাও ঐরূপ কোন বচন দেখা যায় না।"

"অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে যে কয়েকখানি পুরাণে বিষ্ণু-উপাসনার কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে, ঐ সকল পুরাণে এবং এতদ্ভিন্ন আর যে দুই একখানি শাস্ত্র গ্রন্থের দুই একস্থানে, একাদশী ব্রতের উল্লেখ আছে, ঐ সকলের কোন স্থানেই প্রার্থিতা তৃষিতা মুমূর্ষা হিন্দু বিধবাকে যে একাদশীর দিনে একটু গঙ্গাজল দিবে না; এমন কোন নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।" (ত্রিশূল ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা)

সুতরাং ইহা পূর্ব্বোক্ত মদীয় উক্তির সমর্থক স্বরূপে প্রামাণ্য। অতএব যে কর্ম্ম বেদে ও লোকে অবিসংবাদিত রূপে স্বীকার করে না, সমাজে তাদৃশ কঠোর কর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। এ সম্বন্ধে উক্ত রাজাবাহাদুর কর্ত্তৃক বিবৃত একটি সুন্দর আখ্যায়িকাও উক্ত কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

"কোন পল্লীগ্রামের এক শ্রাদ্ধবাড়ীতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ, ভোজনের জন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে ঘরে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, ঐ ঘরের বারান্দায় ৩টা বিড়াল বাঁধা রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ ইহা

দেখিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ঐ বিড়াল বাঁধার উদ্দেশ্য কি? তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অতি করুণ ভাবে সজল চক্ষে বলিলেন—আমার যেমন অদৃষ্ট, সেইরূপই ফল পাইব। আমার ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের সময়, আমার বাবা ১০।১৫ টা বিড়াল বাঁধিতে পারিতেন। এখন আর বাড়ীতে একটি বিড়ালও নাই, প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে অতি কষ্টে এই তিনটি বিড়াল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

অপর একজন ব্রাহ্মণ বিস্মিত ভাবে পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রাদ্ধে বিড়াল বাঁধিবার কোন আবশ্যক আছে কি?"

"পুরোহিতঠাকুর বলিলেন—বাঃ! বিড়াল বাঁধা না হইলে, শ্রাদ্ধই যে অসিদ্ধ হয়"। শ্রাদ্ধে এরূপ বিড়াল বাঁধার আবশ্যক আছে কি না; ইহা লইয়া তখন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দুই দল হইয়া মহাতর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—তোমরা বৃথা গণ্ডগোল করিও না। শোন, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা আমি বলিতেছি—পূর্ব্বে ইহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল; প্রচুর মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ নিত্য গৃহে আমদানী হইত। সে সময় ইহাদের গৃহে ২০।২৫ টি বিড়াল থাকিত। ভোজনের বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আশঙ্কায়, ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে ঐ সমস্ত বিড়ালগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ভোজনের পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই অবধি ইঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ ব্রাহ্মণভোজনের সময়, বিড়াল বাঁধিয়া রাখা হয়। কেন যে বিড়াল বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা এখন আর ইহারা জানে না। একটা লৌকিক আচারবৎ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, এখন ইহারা প্রতিবেশীদের নিকট হইতেও বিড়াল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণভোজনের সময় বাঁধিয়া রাখেন।" আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে ক্রমশঃ এইরূপভাবে যে, কত বিড়াল বাঁধার বিধি "অনুস্বার" "বিসর্গযোগে"

শাস্ত্ররূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা সুকঠিন। সুতরাং আমাদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্ম আত্মজ্ঞানযোগযুক্ত না হইলে, কিছুতেই আমাদের স্বধর্ম্ম রক্ষা বা পুনরুন্নতির আশা নাই। আমরা স্থূলের চাক্‌চক্যে ভুলিয়া মূলহারা হইয়াছি। এ অবস্থায় একমাত্র বেদ বা বেদমূলক যে সমস্ত শাস্ত্র, তাহার উপর নির্ভর করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে "আত্ম-দর্শন-যোগ"ই আমাদের একমাত্র আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্ম্ম বেদের বহির্ভূত; যে কর্ম্ম আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণ অর্থাৎ আমরা গোত্র উল্লেখে যাঁহাদের নাম করিয়া থাকি, তাঁহাদের আচরণীয় কর্ম্ম ভিন্ন, অন্য কোনরূপ বর্ণাশ্রম বিরোধী কর্ম্মব্যবস্থাকে আমাদের পক্ষে, "অবশ্যকর্ত্তব্য"রূপে, শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত নহে। তদ্দৃষ্টান্তে এরূপ বেদবহির্ভূত নিয়মযুক্ত একাদশীর নিরম্বু উপবাস, কখনই শাস্ত্র সম্মত বলা যাইতে পারে না। ভগবান্ ঐ প্রকার কর্ম্মে কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় তাদৃশ কর্ম্মকে ক্রূরতা মূলক আসুরিক ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; এস্থলে তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল।

"অহঙ্কার বলদর্প, কামক্রোধে মাতি,
আমি যে তাদের দেহে, আমিই অপর দেহে,
না জানিয়া হিংসা মোরে করে দিবারাতি।
না বুঝি সাধুর তত্ত্ব অহঙ্কার ভরে।
পবিত্র সাধুর গুণে দোষারোপ করে॥ ১৮
হিংসাকারী ক্রূর সেই নরাধম নরে
ফেলিয়া দুঃখের মাঝে, শিক্ষাদিতে প্রতি কাজে,
অর্জ্জুন! অসুরজন্ম দেই নিম্নস্তরে॥" ১৯ ১৬শ, অঃ

অতএব ভগবদ্বাক্যে ভক্তি-বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, নিরম্বু উপবাসরূপ কঠোরতা দ্বারা দেহস্থ "আত্মানারায়ণকে" কষ্ট দেওয়া হয়। তিনি দেহের ভিতরে বিরাজিত থাকিয়া আমাদের গৃহীত খাদ্য, তিনিই গ্রহণ পূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছেন। ইহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥"

গীতা ১৫ অঃ

আমি, বৈশ্বানর বা জঠরাগ্নিরূপে, প্রাণিগণের দেহেতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণাপানে সংযুক্ত হইয়া, প্রাণিগণের ভুক্ত, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি। সুতরাং হিন্দুবিধবাগণ কি প্রাণিমধ্যে গণ্য নহেন? অথবা একাদশী-উপবাসে দারুণ পিপাসা গ্রস্তা হইয়া, তাঁহারা একটু জল গ্রহণ করিলে, তাহা কি বৈশ্বানরে হোম করা হয় না?

এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদিগণ স্বীয় মতের পোষণার্থে, কেহ কেহ অশাস্ত্রীয় ভাবে নানাবিধ অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে তাহাদের একটি কথা এই যে, —"পুরুষ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞে অধিকার আছে; তজ্জন্য হরিবাসরে ব্রাহ্মণগণ "অন্নগত পাপ" পরিত্যাগ করিয়া, আর আর যাহা আহার করেন, তাহা "ব্রহ্মযজ্ঞ বা ব্রহ্মকর্ম্ম", কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ব্রহ্মকর্ম্মে অধিকার নাই; তদ্ধেতু বিধবাগণের জলগ্রহণ নিষেধ।" তাহাদের এই স্বার্থপূর্ণ অসঙ্গত বাক্যের উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, যজ্ঞ জিনিষটি কি? একমাত্র অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলেই যজ্ঞ হয় না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন।

"ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোম কর্ম্ম তদুচ্যতে॥" জ্ঞানসঙ্কলিনী

ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণকে হোম করাই প্রকৃত যজ্ঞ। মানবমাত্রেরই সে যজ্ঞে অধিকার আছে। জপযজ্ঞই বল, আর ব্রহ্মযজ্ঞই বল বা প্রাণযজ্ঞই বল, ইহা সমস্তই অন্তর্যজ্ঞ, দেহের ভিতরেই উহা অনুষ্ঠিত হয়; অন্তর বা মানসযজ্ঞ ভিন্ন কেবলমাত্র বাহ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞের অভিনয় মাত্র। এমতাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের ব্রহ্মকর্ম্ম বা ব্রহ্মযজ্ঞে অধিকার নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—

"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥"

গীতা ৪র্থ অঃ

কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞানুষ্ঠানকারী; কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞের (আজ্ঞাদলে বা তপোলোকে প্রাণ অবস্থিতরূপ যজ্ঞের) অনুষ্ঠাতা; কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং সংশিতব্রত যতিগণ ব্রহ্মবিদ্যারূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযমাদিও যজ্ঞ বলিয়া কথিত। এ সম্বন্ধে গীতায় আরও উক্ত আছে

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥

গীতা ৪র্থ অঃ

কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান-যোগ-প্রজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে, সমুদয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম প্রাণকর্ম্মহোম করেন। সুতরাং "আত্মযজ্ঞ" সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; ভগবান্‌ও তাহাই বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ গীতা ৪র্থ অঃ

হে পরন্তপ! আত্ম-ব্যাপারহীন দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। যে হেতু হে পার্থ! জ্ঞানেই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা বিধবাগণ সংযমযজ্ঞ, প্রাণযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও আত্মযজ্ঞে অধিকারী হইলে, তাঁহারা আহাররূপ দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা বৈশ্বানররূপ জঠরাগ্নিতে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" গীতা ৪র্থ অঃ

ব্রহ্মকর্ম্মসাধনের অধিকারী নয়, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? পরন্তু ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীগণ অভুক্ত থাকিয়া, নিরম্বু "উপবাসরূপ" দেহদণ্ড করিবেন, তাহাই বা কোন্ প্রমাণে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? সংযম বা ইন্দ্রিয়-বশীকার যদি ঐ উপবাসের উদ্দেশ্য হয়, তবে কি একমাত্র লঙ্ঘনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে? ক্ষুৎপিপাসায় দেহ যখন অবসন্ন হয়, তখন মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কি স্থির থাকে? না আরও অস্থির বা উত্তেজিত হইয়া উঠে? সেই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা উত্তেজিত অবস্থায় কি, অবশীকৃত-ইন্দ্রিয় বা মনের একাগ্রতা সাধন হইতে পারে? সে অবস্থায় মনকে আত্মযুক্ত করিয়া, কোনরূপ কর্ম্মযোগে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উপবাস অর্থে অভুক্ত বা দেহদণ্ড নহে। উপবাস অর্থই "যোগ"। যদি কেহ উপবাসকে লঙ্ঘন বা অনশন বলেন, তাহা হইলেও, সংযমী না হইলে উপবাস সিদ্ধ নহে। ইহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ভিতরে যোগযুক্তাবস্থা বা ভাবোদয় না হইলে, বাহিরে কর্ম্ম হয় না। সুতরাং কর্ম্মাবস্থাও যোগ; এ জন্যই তাহার নাম কর্ম্মযোগ। অতএব কর্ম্ম যদি যোগপদবাচ্য হয়, তবে অনাহারী হইয়া তাহা করিতে হইবে, ইহা বলিলে ভগবদ্বাক্যের উপর অবিশ্বাস করা হয়। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় বলিয়াছেন।—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগেঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ॥"

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ

হে অর্জ্জুন! অত্যধিক ভোজনকারীরও যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না, অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না।

"অত্যাহার অনাহার নিদ্রা অতিশয়।
অতি জাগরণ হ'লে যোগ নাহি হয় ॥"

অতএব ভগবদ্বাক্যে দেখা যায় যে, একেবারে অনাহারী বা কঠোর দেহদণ্ডভাবে, যে সমস্ত ব্রত, পূজা ইত্যাদি যে কোন কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করা হউক না, আত্মযুক্তহীন ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত অসংযমী ব্যক্তির পক্ষে কখনও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। মন আত্ম-যোগ-যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাদৃশ "উপবাস" বা "তৎসামীপ্যবাস" হেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্বভাবতঃ অন্তর্ম্মুখী হয়। তখন দৈহিক কঠোরতা ব্যবস্থায়ও ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত হয় না।

অতএব হে পরমজ্ঞানী যোগিঋষির বংশধরগণ! তোমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মমধ্যে, যোগযুক্ত-অবস্থা ভিন্ন কি কোন কর্ম্ম আছে? তোমাদের পাঠ্যাবস্থা ব্রহ্মচর্য্য-যোগ; গার্হস্থ্যাবস্থায় যত কিছু কর্ম্ম আছে, তৎসমুদায়ও যোগ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অনিত্য দৈহিক সুখসম্ভোগ জন্য কোন কর্ম্মই শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তোমরা মনে রাখিও; তোমরা যে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেছ, তাহাও যোগ; সন্তান উৎপাদন করিতেছ, তাহাও যোগ; তোমরা যে আহার করিতেছ, তাহা রসনা-তৃপ্তি জন্য নয়, তাহাও যোগ; তোমরা ইন্দ্রিয় সংযম কর, তাহাও যোগ; তোমরা

দান কর, সত্য কথা বল, সমাজ গঠন কর, ঈশ্বর পূজা কর, ব্রত কর, উপবাস কর, জপ কর, হোম কর তৎসমস্ত একবার প্রণিধান করিয়া দেখ, সে সমস্তই যোগ। তোমাদের স্থূলদেহের অনিত্য সুখের জন্য, কি কর্ম্ম আছে? নিয়ত আত্মযুক্তভাবে স্পৃহাশূন্য, সংযত ও সত্যগুণমণ্ডিত অবস্থা ভিন্ন, কি কর্ম্ম তোমাদের করণীয়? তোমাদের আহার, বিহার, চেষ্টা, কর্ম্ম, নিদ্রা, শয়ন সমস্তই, অনিত্য দুঃখ-নিবারণ-জন্য, যোগযুক্তভাবে করাই শাস্ত্রবিধি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণ যে, তোমাদের জন্য সেই বিধিই প্রণয়ন করিয়া, রাখিয়া গিয়াছেন। অবিদ্যাবশে তোমরা যদি সেই যোগযুক্ত অবস্থাটি ভুলিয়া গিয়া থাক, "আত্ম-দর্শন-যোগে" পুনর্ব্বার তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতারূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার পূর্ব্বক তোমাদের সেই স্বধর্ম্ম পুনর্ব্বার তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তোমরা যোগযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর। এখানে "যুক্ত" কথাটির অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পদ্যানুবাদ দেওয়া হইল।

"সংযত হইয়া চিত্ত আত্ম-গত যার।
সর্ববকর্ম্মে স্পৃহাশূন্য "যুক্ত" নাম তার॥" ১৮

গীতা ৬ অঃ

সংযত অর্থাৎ স্পৃহাশূন্য হইয়া, আত্মগতচিত্তে সমস্ত কর্ম্ম করাই তোমাদের পক্ষে বিধি। তন্নিবন্ধন তোমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, সমস্তই যোগাঙ্গ স্বরূপ; দশবিধ যম-নিয়মের অন্তর্গত। এনিমিত্ত সমস্ত কর্ম্মই যোগপদ-বাচ্যরূপে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-যোগে একবার আত্মযুক্তাবস্থা চিন্তা করিয়া দেখ। সেই যুক্তাবস্থা ভিন্ন বাহ্য-অনুষ্ঠিত শৌচাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, সমাধি অবস্থা বা চরম মুক্তি পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই, তোমাদের যোগাঙ্গের বহির্ভূত নহে। ভগবদুদ্দেশে

কর্ম্মফল নারায়ণে সমর্পণ ভিন্ন তোমাদের নিজস্বভাবে, কি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় আছে? অতএব তোমাদের আহারেও যদি যুক্তাবস্থা থাকে এবং আহার্য্য বস্তুও যদি ভগবৎরূপী বৈশ্বানরে সমর্পণ করা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস কর; তবে নিরম্বু "উপবাসে" তোমরা কাহাকে অভুক্ত রাখিতেছ? তোমরা যাঁহার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিতেছ, তাঁহাকেই তোমরা অভুক্ত বা অনাহারী রাখিয়া, তোমরা কি তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস বা অবহেলা করিতেছ না? আর যদি তোমরা অভুক্ত অবস্থাকেই উপবাস বল, তবে একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা কাহাকে অভুক্ত রাখিতেছ? উপবাসের দিন তোমাদের ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়গণমধ্যে কাহাকে কতদূর সংযম করিতে পারিয়াছ? এবং কাহার খাদ্য বন্ধ করিয়াছ? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যেরূপ মৈথুন আছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের, খাদ্যও সেইরূপ আছে। উপবাসের দিন চক্ষুঃ, বাহিরের যত রূপ দর্শন ও পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই চক্ষুর খাদ্য। কর্ণ—কত বাজে কথা, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা শ্রবণ করিতেছে, রসনা—কত পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, অপরকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছে এবং মনের সাহায্যে কত বাজে রসাস্বাদন করিতেছে; এরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুগণ, বিশেষতঃ প্রধান কর্ত্তা মন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের সাহায্যে, সে যে কত বিষয় পরিগ্রহ বা আহার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবলমাত্র তোমার দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে, যে সকল অনন্ত কোটি প্রাণী বা আত্মার স্বরূপ সেই বিশ্বতোমুখ, বৈশ্বানররূপী নারায়ণ আছেন। একমাত্র তাঁহাকেই অভুক্ত রাখিয়া ঐ অনন্তকোটি প্রাণীর জীবন রক্ষায় বিক্ষোভ উপস্থিত করিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ইন্দ্রিয় ও ষড়রিপুগণ নানাভাবে উত্তেজিত হইয়া, তোমার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের বিরুদ্ধে, ভীষণ সংগ্রাম ঘোষণাপূর্ব্বক, তোমার কর্ম্মকরী শক্তিকে এতদূর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি তাহাদের পদে

আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া, যোগভ্রষ্ট ও ইহপরকালের কর্ম্মভোগ বৃদ্ধি করিতেছ। অতএব এতাদৃশ অভুক্তরূপ লঙ্ঘনানুষ্ঠানের অর্থ কখনই উপবাসপদবাচ্য হইতে পারে না। "উপবাসের" অর্থ যোগ; "উপবাসের" উদ্দেশ্য আত্মযুক্ত ভাবে "**আত্ম-দর্শন**"।

এখন দেখা আবশ্যক, উপবাস শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? উপবাস শব্দের প্রকৃত অর্থ "সামীপ্যবাস" (উপ-বস-ঘঞ প্রত্যয়ে, ভাববাচ্যে উপবাস) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্ম বা ভগবৎসমীপে বাস করার নামই উপবাস। এই জন্যই উপবাস ব্রতস্বরূপে যোগের একটি অঙ্গ বা যোগপদবাচ্য। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, উপবাস অর্থ কখনই অনাহার বা অভুক্ত অবস্থা হইতে পারে না। উপবাসরূপ যোগবলে পরমাত্মা বা ভগবৎসমীপে বাস করিয়া অর্থাৎ "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত হইয়া, ধর্ম্মকর্ম্মানুষঙ্গিক বাহ্যপূজাদি বা ব্রতরূপ কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিলেই, উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা হয়। কারণ মন আত্মযুক্ত থাকিলে, চিত্ত, ইন্দ্রিয়-বিষয়-অনাসক্ত হেতু, কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তিমূলক চাঞ্চল্যের কারণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু আত্ম-যোগ-যুক্তাবস্থায় মনের একাগ্রতা সম্পাদন হওয়ায়, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বহির্ম্মুখ আপনা হইতে রুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ নিরুদ্ধ হইলেই, ইন্দ্রিয়-সংযম স্থায়ী হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম স্থায়ী করিতে পারিলেই, বিষয়-অনাসক্তভাবে জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। তখন আর বাহিরের অনিত্য সুখ-ভোগের কামনা-বাসনা ও মায়া-মোহে চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে না। তদবস্থায় সাধকের ক্ষুৎপিপাসা আপনা হইতেই হ্রাস পাইতে থাকে। তজ্জন্য বিশেষ কোনরূপ ব্যাকুলতা বা চঞ্চলতার কারণ থাকে না। পরন্তু সাধক সর্ব্বদা আত্মানন্দে অর্থাৎ সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান ভাবে বিভোর হইয়া, স্থিত প্রজ্ঞারূপ "পারণ" বা পূর্ণভাবে

"তৎপরায়ণ" অবস্থায়, বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, সাধককে কর্ম্মে বদ্ধ বা ভবিষ্যৎ প্রারব্ধেরও অধীন হইতে হয় না। এই উদ্দেশ্যেই উপবাস-রূপ ব্রতগ্রহণ বা "সামীপ্যবাস" করিবার বিধি। ইহাই সংযম, উপবাস ও পারণের গূঢ় অর্থ। সুতরাং জ্ঞানযুক্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারিলে, সে কর্ম্ম অনর্থক দেহদণ্ডরূপে দেহের বা দেহীর কষ্টদায়ক হয় না। উপরোক্ত কারণেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনাহারী বা অত্যাহারীর যোগ হয় না বলিয়াছেন। স্বয়ং মহাদেবও তাহাই বলিয়াছেন,—

"সদ্য ভুক্তেঽতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।"

শিবসংহিতা

ভোজন করিবার কিছুক্ষণ পরে এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময় যোগ অভ্যাস করা উচিত নহে। সুতরাং দেখা যায় কাহারও মতেই নিরম্বু উপবাস করা ব্যবস্থা নয়।

উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, যেন কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে, আমি প্রচলিত একাদশী অথবা অন্যান্য উপবাসের বিরোধী। বরং সমধিক পক্ষপাতী। স্থূলভাবেও একাদশী প্রভৃতি কতক-গুলি তিথিতে, অভুক্ত থাকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বিশেষতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা, যোগী বা সাধকের সিদ্ধি-লাভের পক্ষে বিশিষ্ট সহায়ক। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষা একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অসমর্থ অবস্থায়, স্বাস্থ্যের প্রতিকূলে, নিরম্বু-লঙ্ঘন ব্যবস্থা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই সমর্থন করিতে পারেন না। অপরন্তু শাস্ত্রও তাহা স্বীকার করেন না। দৈহিক স্বাস্থ্য ও স্বধর্ম্মরক্ষার অনুকূলে প্রতি একাদশী তিথিতে, একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সংযম-বিধানই একাদশী উপবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্তু ঐ দিনে অভুক্ত থাকিয়া দেহ শোষণ করার আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে ঐ তিথিতে

দেহমধ্যে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হওয়ায়, যাহাতে বাত-শ্লেষ্মাদি ব্যাধি বা উপসর্গ বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারই চেষ্টা মাত্র। কারণ অভুক্ত থাকিলে বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, দেহের জলীয় ভাগ বা শ্লেষ্মা আপনা হইতেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তন্নিবন্ধন অতি কঠোরতায়, উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। সুতরাং গৌণধর্ম্মপালন করিতে যাইয়া, দেহস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়া, উপবাসের মুখ্যধর্ম্মস্বরূপ, "সামীপ্য বাসের" প্রধান অবলম্বন, মনের একাগ্রতা নষ্ট করা কদাচ সঙ্গত নহে। এ জন্যই বেদ ও তন্ত্র একবাক্যে নিরাহারীর যোগ হয় না, বলিয়াছেন। অপরন্তু স্বয়ং মহাদেব, যোগাভ্যাসীদিগকে অল্প অল্প করিয়া বহুবার খাওয়ার উপদেশ করিয়াছেন।—

"অভ্যাসিনাং বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা।"

শিব সংহিতা।

যোগাভ্যাসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের, অল্প অল্প করিয়া বহুবার ভোজন করা উচিত।

মনে রাখিতে হইবে কর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মদর্শন। উপবাসযোগে সেই "আত্মদর্শন" বা "আত্মসমীপে" বাস করিয়া, প্রজ্ঞা স্থিত করা ও পারণ স্বরূপে পূর্ণভাবে "তৎপরায়ণ" হইতে পারিলেই, জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। সুতরাং তৎপরায়ণ ভাবে পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করাই উপবাসের মুখ্য ফল।

"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥"

গীতা ৫ অঃ,

সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন,

সেই পরমাত্মাই যাঁহাদের পরমগতি এবং জ্ঞানকর্ত্তৃক যাঁহাদের অজ্ঞানরূপ-পাপক্ষয় হইয়াছে; এতাদৃশ ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করেন। সুতরাং জ্ঞানযুক্ত ভাবে সংযম, উপবাস, পারণ, অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, মুক্তি তাঁহার পক্ষে অনায়াস লব্ধ হয়।

অতএব "আত্ম-দর্শন-যোগ" আদর্শে, একমাত্র উপবাসযোগেও "**আত্মদর্শন**" লাভ হইতে পারে। উপবাস অর্থই "আত্ম-সামীপ্য-বাস" এই আত্মসামীপ্য-বাসই "আত্ম-দর্শন যোগ"।

আত্ম দর্শন যোগ

তৃতীয়স্তর।

ঊনত্রিংশ প্রকরণ।

—:*:—

তীর্থবাস-যোগে-আত্ম-দর্শন

পূর্ব্ববর্ণিত যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অন্তর্গত, তীর্থভ্রমণ বা তীর্থবাসও অন্যতম যোগাঙ্গস্বরূপ জানিবে। বিধিসঙ্গতভাবে তীর্থ-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে, একমাত্র তীর্থবাস-যোগেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হইতে পারে। শাস্ত্রে ত্রিবিধ তীর্থ সম্বন্ধে উক্ত আছে যথা—জঙ্গমতীর্থ, মানসতীর্থ ও স্থাবরতীর্থ। স্থাবরতীর্থের অপর নাম ভৌমতীর্থ। এতন্মধ্যে স্বধর্ম্মপরায়ণ যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত জীবন্মুক্ত যোগি-সন্ন্যাসিগণই জঙ্গমতীর্থ, ইহাদের দর্শন ও প্রসন্নতাবলে অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া, আত্ম-দর্শন-যোগ লাভের অধিকারী হয়। পুরাকালে তাদৃশ যোগিঋষিগণের প্রসন্নতাযুক্ত একমাত্র আশীর্ব্বাদ-বলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ হইত। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর মানসতীর্থ ও স্থাবরতীর্থের বিষয়ই বলিব। মানসতীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥

জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থাণামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা ॥"

তীর্থচন্দ্রিকা

ইহার সারমর্ম্ম এই যে, সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য ইত্যাদি অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিগুলিই **মানসতীর্থ**; অপরন্তু মনের বিশুদ্ধতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতীর্থ বা তীর্থরাজ। এতদ্ভিন্ন বহিঃস্থ তীর্থগুলিকেই স্থাবরতীর্থ বা ভৌমতীর্থ বলে। মানস-তীর্থে-স্নাত না হইলে, ভৌমতীর্থের অধিকার জন্মে না; ইহা অনেকেই অবগত আছেন। মানসক্ষেত্রে পবিত্রভাব উৎপাদনের জন্যই, প্রায় প্রত্যেক ভৌমতীর্থে নানাবিধ কূপ, তরাগ বা কুণ্ড ইত্যাদি এরূপ নির্দ্দিষ্টভাবে আছে যে, তাহাতে স্নাতভাবে মানসক্ষেত্রে পবিত্রতা-বিশ্বাস না হইলে, তত্তৎতীর্থ-দেবতাদি দর্শন, স্পর্শন নিষেধ। যথা—কাশীধামে আসিয়া "জ্ঞানবাপী" বা জ্ঞানগঙ্গায় স্নান বা আপোমার্জ্জন অথবা আত্ম-জ্ঞানরূপ কারণ বারিতে চিত্তমার্জ্জন দ্বারা, চিত্তশুদ্ধি না হইলে, ভৌমতীর্থ-যোগের অধিকার জন্মে না। যেরূপ মানস-পূজাযোগে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদির ক্রিয়াশক্তি পরিপক্ক ও বিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, বাহ্যপূজার অধিকারী হয় না। যেমন, মানস-তর্পণ-যোগে চিত্ত, অহিংস বা দয়া-বৃত্তি-গুণে সুগঠিত না হইলে, চিরজীবন জল-তর্পণ ও সন্ধ্যাপূজা-উপাসনাদির বাহ্য-অনুষ্ঠান করিয়াও, অজ্ঞানতাবশে তাহা নিষ্ফল হয়; অর্থাৎ হিংসা, ক্রোধ, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি কলুষবৃত্তি, চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় না; তদ্রূপ মানস-তীর্থ-যোগে পূর্ব্বোক্ত সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি সংযম-নিয়মদ্বারা চিত্ত সুস্নাত বা সুমার্জ্জিত না হইলে, চিত্ত-বিশুদ্ধতা-অভাবে বহিঃস্থ ভৌমতীর্থ ও জঙ্গমতীর্থ দর্শন; তীর্থবাস, তীর্থপর্য্যটনাদি সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা

চিত্তও নির্ম্মল হয় না। এই নিমিত্ত তীর্থ-পর্য্যটন, তীর্থ-বাস বা তীর্থ-দর্শন করিয়াও, বর্ত্তমানকালে অনেকেরই তীর্থের পবিত্রতা, তীর্থের বিশুদ্ধতাজনিত জ্ঞান, তাহাদের চরিত্রে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, তীর্থ পর্য্যটন বা তীর্থবাস করিয়া, কখনও তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিবে না; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন তীর্থ পর্য্যটন বা তীর্থবাস করিয়া মনোবৃত্তি নির্ম্মল বা পুণ্য-পবিত্র-ভাবে, চিত্ত উদ্ভাসিত হইবে, তখনই তীর্থ-পুরোহিতগণ তাহার পক্ষে তীর্থ-বাস বা তীর্থকর্ম্ম "সফল" বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু হায়! ইদানীং তীর্থ যাত্রিক বা তীর্থবাসিগণ সে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, তীর্থের ভাবে মনোবৃত্তি গঠনের চেষ্টা না করিয়াই, অর্থ বিনিময়ে, তীর্থপুরোহিতগণ নিকট হইতে একটা ভূয়া "সফল" বাক্য খরিদ করিয়া, যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করেন। কাজেই "মানস-তীর্থ-যোগ" বিহনে ভৌমতীর্থ পর্য্যটন, তীর্থবাস করিয়া, তীর্থবাসের উদ্দেশ্য "সফলের" পরিবর্ত্তে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহার কারণও "আত্মজ্ঞানহীনতা" আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানহীনতাই আত্ম-অবিশ্বাসের কারণ। আত্ম-অবিশ্বাসের ফলেই, মানসতীর্থ-যোগে অযুক্ত বা নাস্তিক্য ভাব; মানস-তীর্থে অস্নাতহেতু চিত্ত অবিশুদ্ধ; চিত্ত অবিশুদ্ধতাই ইন্দ্রিয় অসংযমের কারণ। এই ইন্দ্রিয় অসংযমরূপপাপ, বর্ত্তমানে অধিকাংশ মানবকেই ভৌমতীর্থের ফললাভে বঞ্চিত করিয়াছে।

শাস্ত্রমতে সর্ব্ব প্রথমে মানসতীর্থে স্নাতঃ হইয়া, স্থাবর বা ভৌমতীর্থে ভূমির অসাধারণ প্রভাব, তীর্থসলিলের অত্যদ্ভুতশক্তি, তীর্থবাসী জঙ্গম বা যোগি-ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ বা সাধুগণের অপার মহিমাবলে মুক্তিপ্রদ "আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান" উপলব্ধি করাই তীর্থবাসের উদ্দেশ্য। সুতরাং আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-যোগে মানসতীর্থে স্নাত না হইলে, ভৌমতীর্থবাসাদির বাহ্যানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় না।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান্ বা ভক্তিশূন্য, পাপাত্মা, নাস্তিক, পিতৃ-মাতৃ-গুরুভক্তি-পরায়ণ নহে; যাহার চিত্ত, "সংশয়"যুক্ত; যাঁহারা অনিত্য ভোগ-সুখের প্রত্যাশায় কামনা-লালসা-পরতন্ত্র হইয়া ,ইচ্ছা পূর্ব্বক পরনিন্দা বা পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন; যাহারা তীর্থ পর্য্যটন বা তীর্থবাস করিয়া, তীর্থক্ষেত্রের ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিরুদ্ধে কর্ম্ম করেন, তাহারা পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যাঁহার হস্ত, পদ, মনঃ সুসংযত, বিদ্যা, তপঃ কীর্ত্তি বিদ্যমান, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি "প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" যে ব্যক্তি, অহঙ্কার বিমুক্ত, লঘু আহারী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করেন।

দৈহিক অশুচি বা অপবিত্রভাবে যেমন, তীর্থগমন ও তীর্থস্নান নিষেধ; সেইরূপ মানসিক অশুচি বা অপবিত্রভাব লইয়াও, তীর্থগমন, তীর্থ-স্নান, তীর্থবাস, শাস্ত্রনিষিদ্ধ, এ নিমিত্ত মানস-তীর্থস্নানে, অভ্যন্তর বা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, বহিঃস্থ স্থাবর বা ভৌমতীর্থ পর্য্যটন, তীর্থস্নান, তীর্থবাস, শাস্ত্রবাক্যে নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে। রাত্রিবাস বস্ত্রপরিধান করিয়া, গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ জ্ঞানে, যে প্রকার অনেকেই পবিত্র ধৌতবাস পরিধান করিয়া গঙ্গাস্নান বা দেবদর্শনাদি করেন, সেই প্রকার মোহ-রজনীর বাসনা-পর্য্যবসিত, ইন্দ্রিয়-বিষয়-মলা-বিমুক্ত, বিশুদ্ধ-চিত্ত-বাস-পরিহিত অন্তঃকরণে যদি আত্মজ্ঞান-সলিলে অবগাহন করিয়া, ভৌম বা স্থাবর তীর্থ-স্নান-দর্শন ও তীর্থবাস করেন; তাহা হইলে, তাদৃশ মানসতীর্থ-সুস্নাত চিত্ত-বিশুদ্ধতাবলে, ত্রিবিধ তীর্থস্নান, দর্শন ও বাসের ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইতে পারেন। এবম্প্রকার "মানস-তীর্থবাস-যোগযুক্ত" ভৌমতীর্থবাস করাই, তীর্থবাস বলিয়া গণ্য। তাদৃশ তীর্থ-বাস-যোগেই **"আত্ম-দর্শন"** লাভ হয়।

সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত না করিয়া যাহা সিদ্ধিপ্রদ, সেই সিদ্ধাসন ও পদ্মাসনের কথাই বলা যাইতেছে।

আসন অন্নময়কোষের সাধন। সুতরাং আসন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্নময়কোষের অবস্থাটি পরিজ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করিলে, সাধকের পক্ষে যোগানুশীলন সহজ সাধ্য হয়। তন্নিবন্ধন আসনের প্রকার বিবৃত করার পূর্ব্বে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

আসনাদি দ্বারা অন্নময়কোষ সাধন হইয়া থাকে। অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহের স্মৃতি পরিহার করাই অন্নময়কোষ সাধন। আসন তাহার পক্ষে বিশিষ্ট সহায়ক। কোন স্থিরলক্ষ্যে দেহকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নিশ্চলভাবে রাখিতে অভ্যাস করিলেই ক্রমে অন্নময়কোষের স্মৃতি তিরোহিত হয়। সুতরাং যে প্রকার আসনে উপবেশন করিলে অন্নময়-কোষ বা স্থূলদেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন উদ্বেগ বা বিক্ষোভ উপস্থিত না হয়, যোগী বা সাধকের পক্ষে তাহাই সুখাসন। তাদৃশ সুখাসনাবলম্বনই আসনের উদ্দেশ্য। "আসন-যোগে"ই অন্নময়কোষের স্মৃতি ও অনুভূতি সহজে তিরোহিত হইয়া, সাধক বা যোগিকে প্রাণময়কোষে গমনের পন্থা সহজ করিয়া দেয়। এ নিমিত্ত আসনাভ্যাসের সঙ্গে অন্নময়-কোষের অবস্থাটি পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই অন্নময়কোষের সাধনে দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল থাকা প্রয়োজন হয়। কারণ, দেহ কার্য্যপটু না হইলে, সহজে মন স্থির হয় না। এ জন্য অনেকে হঠযোগের অভ্যাস করিয়া থাকেন। হঠযোগ-সাধনাভ্যাসে দেহ অনেকটা শোধন হয় বটে, কিন্তু তাহা আবার একটা দৈনন্দিন কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। দৈনিক সেই ভাবের বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেহ শোধন না করিলে, দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি উপস্থিত হয়। এ জন্য বহিঃস্থ কর্ম্মাপেক্ষা অন্তঃকর্ম্ম দ্বারা দেহ শোধন অভ্যাস করিলে, সাধকের পক্ষে দেহ-শোধন বা মানসিক শান্তি উভয়ই বৃদ্ধি হয়।

দেহে রোগোৎপত্তির কারণ কি, প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক। স্থূলদেহ—মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতে গঠিত। ইহার মধ্যে বিভাগমতে মৃত্তিকা অৰ্দ্ধেক, জল দুই আনা, তেজ দুই আনা, বায়ু দুই আনা, আকাশ দুই আনা, একুনে ষোল আনা অর্থাৎ পূর্ণ দেহ। প্রাকৃতিক কোন সূক্ষ্ম ঘটনা বিপর্য্যয়ে ইহার তারতম্য উপস্থিত হইলেই, দৈহিক অস্বাস্থ্য উৎপাদিত হয়। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, আকাশ ও বায়ুর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আকাশ ও বায়ুর নৈসর্গিকতা থাকিলে, অন্যান্য প্রকৃতিগুলিও, শান্ত আছে কি থাকিবে, তাহাই অনুমিত হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণ-বিপ্রাকর্ষণে আকাশ ও বায়ুর ভবিষ্যৎ অবস্থা সূচিত হয়। সুতরাং মূলে চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই বহির্জ্জগতের প্রাকৃতিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণের প্রধান অবলম্বন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিদ্‌গণও সেইরূপে, স্থূলদেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক তত্ত্বানুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেহস্থ আকাশ ও বায়ুর প্রতি স্থিরলক্ষ রাখিলেই, তেজ, জল ও মাটির অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবে দেহের স্বাস্থ্য বা নৈসর্গিকতা, অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন। দেহস্থ বায়ু ও আকাশের অবস্থা স্বাভাবিক না থাকিলে চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি বা আকর্ষণ-বিপ্রাকর্ষণ মধ্যে কোন অনৈসর্গিকতা উৎপাদন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দেহজগতের সেই চন্দ্রসূর্য্যই ঈড়া ও পিঙ্গলা। সুতরাং ঈড়া পিঙ্গলার গতি শক্তির আকর্ষণ-বিপ্রাকর্ষণের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, সেই চন্দ্রসূর্য্যের গতিশক্তির মধ্যে অবস্থা বিশেষে স্থূল, সূক্ষ্ম, মৃদু, গাঢ়ভাবে যথাবশ্যক স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি সঞ্চালিত করিলেই, চন্দ্রসূর্য্য-মধ্যে এক এক প্রকার কম্পন বা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া, আকাশ বায়ুর নৈসর্গিকতা উৎপাদন করিবে; অর্থাৎ সপ্তবর্ণ রশ্মি দ্বারা

সপ্তপ্রকার ধাতু বিকীর্ণ হইয়া, যথা আবশ্যক ভাবে ন্যূনাধিকতা সম্পাদন করিলেই, প্রকৃতি তদ্দ্বারা শান্ত হইবে। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার উপদিষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনের ক্রিয়া যোগে, আপনা হইতেই দেহশোধন সম্পাদিত হইয়া আসিবে। সাধনাবস্থায় এতৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে, কোনও কোনও সময় সাধনায় বিপরীত ফলও ফলিয়া থাকে। এ জন্য এই সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুশীলন বিশেষ সতর্ক ভাবে করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয় ভিন্ন, আরও একটু স্থূলভাবে বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ ইহাদের অনৈসর্গিকতা, দেহস্থ রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ। উহারাই পঞ্চভূতস্থ, বায়ু, তেজ ও জল। পার্থিব দেহে, ইহাদের পরিমাণ এক অষ্টমাংশ হিসাবে বর্ত্তমান আছে। উহাদের বিকৃতাবস্থাই রোগ। আমাদের স্থূলদেহে সর্ব্বত্র উহাদের অবস্থান থাকিলেও, উহাদের প্রত্যেকের এক একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রস্থান আছে। যথা—

বায়ুর কেন্দ্রস্থান—নাসিকা ও বৃহদন্ত্র।

পিত্তের কেন্দ্রস্থান—চক্ষুদ্বয় ও ক্ষুদ্রান্ত্র।

কফের কেন্দ্রস্থান—ললাট অভ্যন্তরস্থ আবরণ ও পাকস্থলী।

এই সকল স্থান কেন্দ্র করিয়া, ইহারা সর্ব্বশরীরস্থ অন্তর বাহিরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। বায়ু, তেজ ও জল ইহাদের মধ্যে কোন একটি বা দুইটি বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস বৃদ্ধি উৎপাদন হইয়া, নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। এ জন্য হঠযোগ-বিধিতে ধৌতি, বস্তি, নেতি ও ত্রাটক প্রভৃতি বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষানুভূতভাব এই যে, সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাসিকা ও মুখ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া, ভিতরে

তাহা ধারণ ও যথাস্থানে চালনা করিতে পারিলে, সমস্ত দৈহিক বিঘ্নেরই লাঘব হয়। এজন্য যোগ-সাধনে বসিবার পূর্ব্বে ও পরে এ প্রকার ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এ ক্ষেত্রে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু নাসিকা, মুখ, নেত্র ও কর্ণ দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া, অন্তরে ধারণপূর্ব্বক অপান বায়ুর যোগে অধোমার্গে বিরেচন করিলে, বায়ু-পিত্ত-কফজনিত শিরঃশূল, সর্দ্দি, কাশী, উদরাময়, আমাশয়, অজীর্ণ শূলবেদনা, যক্ষ্মা ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয় এবং পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহার ক্রিয়াকৌশল জ্ঞানীগুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া, কার্য্য করিলে, ফল ভাল হয়। পরন্তু বায়ুপিত্ত বৃদ্ধি হইলে, জলতত্ত্বে; কফ বৃদ্ধি হইলে, বায়ু ও তেজস্তত্ত্বে আধ্যাত্মিক কৌশলযুক্ত সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করা প্রয়োজন। এজন্য তিথি বিশেষে এক এক প্রকার খাদ্য পরিত্যাগ ও পরিগ্রহণ অথবা লঙ্ঘনেরও ব্যবস্থা আছে। ঐ ত্রিদোষ-নাশন-জন্য ত্রিফলা চূর্ণ বা ত্রিফলার জল পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। প্রাগুক্তমতে বায়ু সঞ্চালন বা বহিঃপ্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত ধৌতিকর্ম্ম ও দেহ শোধন হইয়া থাকে। দেহ অভ্যন্তরস্থ বায়ু, তেজ ও জল দ্বারাই হঠযোগোক্ত বায়ুসার, বারিসার, অগ্নিসারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। সদ্‌গুরুর উপদেশে অন্তরস্থ বস্তু দ্বারা অন্তর-ধৌতি শিক্ষা কর। বাহিরে খুজিতে হইবে না। আমার বিবেচনায়, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-অভাবে হঠযোগের অভ্যাস করা অপেক্ষা ঔষধের সাহায্য গ্রহণও ভাল। তাহাতে দৈনন্দিন সময় অপব্যবহার হয় না এবং তাহাও আমাদের বেদোক্ত। দেবতারাও সেই আয়ুর্ব্বেদ বিধান মানিয়া থাকেন। এখন যোগসিদ্ধিপ্রদ পূর্ব্বোক্ত আসন দুইটির প্রকরণ বলা যাইতেছে—

সিদ্ধাসন—

"যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা॥

দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষাবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ॥
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্॥"

শিবসংহিতা

যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগী বামপদের গুল্‌ফদ্বারা যত্ন পূর্ব্বক যোনি (লিঙ্গ ও গুহ্যদেশ মধ্যস্থল) নিপীড়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ পদের মূলদেশ (যাহাতে লিঙ্গদ্বার রুদ্ধ হয় এরূপ ভাবে) লিঙ্গের উপরে রাখিবেন এবং সংযতেন্দ্রিয় ও স্থিরকায় হইয়া ভ্রূমধ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিবেন। বিশেষতঃ নির্জ্জনে চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া এই প্রকার ভাবে বসিতে হইবে যে, শরীরের কোন ভাগ যেন বক্রভাবাপন্ন না হয়। এইরূপ উপবেশনকে "সিদ্ধাসন" কহে। অনেক সিদ্ধযোগী এই আসন দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিলে, শীঘ্র যোগসিদ্ধি অবস্থা লাভ হয়। এই সিদ্ধাসনাপেক্ষা গোপনীয় শ্রেষ্ঠাসন আর নাই। ইহা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন।

পদ্মাসন—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বাতু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্ দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধিতঃ॥
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

শিবসংহিতা

বাম পদতল দক্ষিণ উরূপরি এবং দক্ষিণ পদতল বাম উরূপরি যত্ন পূর্ব্বক উত্তানভাবে রাখিয়া গুরূপদেশ ক্রমে হস্ততলদ্বয় ও উরুদ্বয়মধ্যে ঐ প্রকার উত্তানভাবে সংস্থান এবং দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপন পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিবে; এইকালে বক্ষঃস্থল ঈষৎ উচ্চ করিয়া, তাহাতে চিবুক স্থাপন করতঃ ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সাধ্যমতে জঠর পূর্ণ করিবে। শরীরের অবিরোধে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া পশ্চাৎ ঐ বায়ু ত্যাগ করিবে। যোগীরা ইহাকেই পদ্মাসন কহেন। ইহাদ্বারা সমস্ত দৈহিক ব্যাধি দূর হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকার আসন আছে। সাধারণতঃ তাহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। আসনের মধ্যে যোগসাধনে সিদ্ধাসন, শয়নে শবাসন, কফরোগে ভুজঙ্গাসন, বায়ুরোগে কুর্ম্মাসন, পিত্তরোগে বদ্ধ-পদ্মাসন, প্লীহারোগে ময়ূরাসন, বায়ুপানকালে অশ্বাসন করিলে ভাল হয়। প্রয়োজন ভিন্ন একমাত্র সিদ্ধাসন ব্যতীত অন্য আসন কখনও করা উচিত নহে। সিদ্ধাসন সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই অন্নময়কোষের স্মৃতি তিরোহিত হইয়া, প্রাণময়কোষে যাওয়ার পন্থা সুগম হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন "স্থিরং সুখমাসনম্" অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকার কষ্টবোধ না হয় ও চিত্তের উদ্বেগ না জন্মে; সেইরূপ অটল ও স্থিরভাবে উপবেশনই প্রকৃত আসন।

এবম্বিধ আসনযোগে স্থূলদেহের স্মৃতি লোপ করিতে পারিলে, একমাত্র আসনযোগেই **আত্মদর্শন** লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থতন্ত্র।

একত্রিংশ প্রকরণ।

প্রাণায়াম-যোগে আত্ম-দর্শন।

প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গযোগের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাণাত্মাকে অন্নময়কোষ হইতে প্রাণময়কোষে পরিচালন করিতে, প্রাণায়াম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। প্রাণায়াম দ্বিবিধ—বহিঃপ্রাণায়াম ও অন্তঃপ্রাণায়াম। বহিঃপ্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ও নাড়ীশুদ্ধি এবং অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব বা ভূতশুদ্ধি হইয়া, যোগসিদ্ধি অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোগে প্রাণাত্মা, পরমাত্মায় স্থিত বা যুক্ত হইয়া, যোগীর মুক্তি বিধান করিয়া থাকে।

সচরাচর সন্ধ্যা বন্দনাদির সময়ে যে ভাবের প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা প্রাণায়ামের বর্ণ-পরিচয়; অর্থাৎ তাহা বায়ু ও নাড়ীশোধন মাত্র। তদ্দ্বারা প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এবং প্রাণায়ামের শক্তিও সঞ্চয় হয় না। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে উহা "অজ্ঞানাং ঘ্রাণ-পীড়নাৎ" অর্থাৎ অজ্ঞানীর কেবল নাসাপীড়ন হয় মাত্র। সুতরাং তদ্দ্বারা নাড়ীশুদ্ধিও হইতে পারে না। শাস্ত্রে দুইপ্রকার নাড়ীশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে—

"নাড়ীশুদ্ধির্দ্বিবিধা প্রোক্তা সমনুর্নির্মনুস্তথা।
বীজেন সমনুং কুর্য্যান্নির্মনুং ধৌত কর্ম্মণা ॥"

ঘেরণ্ডসংহিতা

নাড়ীশুদ্ধি দ্বিবিধ—সমনু ও নির্ম্মনু। বীজমন্ত্র দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি করিলে, তাহাকে সমনু এবং ষট্‌কর্ম্ম (নৌলি, ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক ও কপাল ভাতি) অন্তর্ধৌত ক্রিয়া দ্বারা যে, নাড়ীশুদ্ধি অবলম্বন করা হয়, তাহাকে "নির্ম্মনু" নাড়ীশুদ্ধি বলে। সুতরাং বর্ত্তমানে ৪।১৬।৮ বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক বীজমন্ত্র উচ্চারণে বাহিরের বায়ুদ্বারা যে, পূরক কুম্ভক ও রেচকাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা সমনুবায়ু-শোধন মাত্র। এই বর্ণশিক্ষায় আর যে কোনরূপ ফলা বানান আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। কাজেই আর্য্যদেশ হইতে আধ্যাত্মিক কর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আত্মজ্ঞানের অভাবই ইহার মূল কারণ। আত্মজ্ঞানের অভাবেই পূর্ব্বস্মৃতি লোপ হইতেছে। আত্ম-জ্ঞান-যোগে প্রকৃত ভাবে প্রাণায়ামের কি উদ্দেশ্য, তাহা বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়াম আলোচনায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণায়াম জিনিষটি বুঝিতে হইলে, বায়ুতত্ত্ব ও প্রাণময়কোষে গমন-পন্থার কৌশল, একটু অনুধাবন করা আবশ্যক। অজ্ঞান-অন্ধের ন্যায় ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক পথে চলা সম্ভব নয়। তদ্দ্বারা কথনও অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোক একান্ত প্রয়োজন। বৃহজ্জগতে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয়াস্তে দিবারাত্রি হইয়া থাকে, দেহরূপ ক্ষুদ্র জগতেও, দেহস্থ চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তে সেইরূপ দিবারাত্র সম্পন্ন হইতেছে। ঈড়া পিঙ্গলায় স্বরোদয় কালে তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাম নাসিকায় যথন শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখন চন্দ্রস্বর, এবং দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ কালে, তাহাকে সূর্য্যস্বর বলে। চন্দ্রের উদয়ে শরীরে

রাত্রি এবং সূর্য্যোদয়ে শরীরে দিবা হয়। সূর্য্যস্বরের অস্ত, ও চন্দ্রস্বরের উদয়কালে আমাদের সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হয়। এই সন্ধির সময়, শাস্ত্রানুসারে সন্ধ্যোপাসনা এবং পূজাদির জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। এই জন্যই মহাতপস্বী জরৎকারু মুনি আশুতোষকন্যা মনসাকে বলিয়াছিলেন যে, "বহির্জগতের চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যোপাসনার সময় নির্দ্ধারিত হয় না"। অধ্যাত্ম-জ্ঞানশীল ব্রাহ্মণগণ, অন্তরস্থ চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া সন্ধ্যারকাল নির্দ্ধারিত করিবেন। ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। যে ব্রাহ্মণ আত্মশক্তিবলে সূর্য্যোপস্থান করিতে পারেন না, তাঁহার আধ্যাত্মিক জগতে জ্ঞানলাভ হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্ত প্রাণায়াম প্রসঙ্গে তাহা কিছু বলা আবশ্যক। সূর্য্য যেমন বৃহজ্জগতের পার্থিব বস্তু সকলের লয়বিধান করে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যস্বরও দেহের অনেকানেক পদার্থের লয়বিধান করিয়া থাকে। এইজন্য সূর্য্যস্বর কালে ভোজনাদি করিলে, তাহা উত্তমরূপে পরিপাক হয়। সূর্য্যস্বরে শূন্যোদরে থাকিলে শরীর নানা প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাত্রি বা চন্দ্রস্বরে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জন্য চন্দ্রস্বরে ভোজন করা উচিত নহে। কারণ রাত্রিস্বরে ভোজন করিলে ভুক্তান্নাদির অপরিপক রস, শরীরের গঠনকার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ গ্রন্থিবাত, অণ্ডকোষবৃদ্ধি ইত্যাদি শরীর-রসস্থ-জনিত নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য অন্তরস্থ চন্দ্রসূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করা বিধেয়। মনে রাখিতে হইবে যে, সূর্য্যস্বরে ভুক্তান্নের পরিপাক সাধিত হইয়া, চন্দ্রস্বরে তদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

যাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য করেন, তাঁহারা ইহাও অবশ্য প্রণিধান করিয়াছেন যে, সূর্য্যস্বরে শ্বাসের গতি হ্রাস ও চন্দ্রস্বরে

শ্বাসের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূর্য্যস্বরে যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ও চন্দ্রস্বরে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। দিবাস্বর উদয়কালে রাত্রির অস্ত, এবং রাত্রিস্বর উদয়কালে দিবার অস্ত হয়। দেহমধ্যে তাহাদের উদয়াস্ত বুঝিতে হইলে, শ্বাসের গতিদ্বারা তাহা প্রণিধান করিতে হয়। সূর্য্যস্বর উদয়কালে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে শ্বাসের গতি হয়। চন্দ্রস্বরের উদয়কালে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি, মাত্র নাসাগ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়।

সাধারণতঃ ২১৬০০ একুশহাজার ছয়শতবার আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আহার বিহারাদি এবং শরীরের অবস্থানুসারে কাহারও কাহারও পক্ষে এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্থকায় পরিমিতাহারী ব্যক্তির ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার সূর্য্যস্বরে ও ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার চন্দ্রস্বরে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। দৈহিক ঋতু ও অয়নাদি পরিবর্ত্তনে এই সংখ্যার কিছু পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। নিয়ম পূর্ব্বক ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার সূর্য্যস্বরে ও ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার চন্দ্রস্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অবিচ্ছেদে স্থায়ী রাখিতে পারিলে, এক একটি তত্ত্বের লয়, উদয় ও স্থিতিকাল প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহা পঞ্চতত্ত্ব শোধনের বিভাগ ক্রমে যথাস্থানে প্রদর্শন করা হইবে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস আকাশতত্ত্বে বর্ত্তমান থাকার সময় অতিমৃদু; কথনও উভয়স্বরে আকাশতত্ত্বের সন্ধিকালে প্রাণবায়ু স্বাভাবিক ভাবে নিরোধও হয় অর্থাৎ সূর্য্যস্বরের অস্ত ও চন্দ্রস্বরের উদয়কালে. সূর্য্যস্বরের আকাশতত্ত্বে অস্ত এবং চন্দ্রস্বরের আকাশতত্ত্বে উদয় আরম্ভ হয়। এই উভয় আকাশতত্ত্বের সন্ধিক্ষণে অতি অল্প সময়ের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আপনা হইতে নিরোধ হইয়া থাকে। এই সময় চন্দ্রস্বরকে উদয় হইতে না দিয়া

এবং সূর্য্যস্বরকে নিরোধ রাখিয়া, ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করণান্তর, স্থিরভাবে অবস্থানের চেষ্টা করিলে, প্রাণকর্ম্ম আপনা হইতে নিরোধ হয়, (ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যভেদন কুম্ভক বলে) এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া, আত্ম-দর্শন-যোগে জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় তাহাই বলিয়াছেন—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥" ৫ অঃ

রূপ রসাদি বাহ্য-বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া (বিষয় সকল চিন্তিত হইলে উহা মনে প্রবেশ করে, মনঃস্থৈর্য্য দ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ করিতে না দিয়া) চক্ষুকেও ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া) নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায়, তাহারা কেবল মাত্র নাসা মধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে, এইরূপ) প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি, তিনি সদা (জীবিত থাকিয়াও) মুক্ত।

এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত প্রকার উভয় স্বরের সন্ধি সময়, উভয় স্বরে যখন শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হয়, তখন উভয় স্বরে অবিচ্ছেদ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস সমান রাখিতে পারিলেও তাহা হইতে একটা শক্তি প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ায়, প্রাণকর্ম্ম আপনা হইতে নিরোধ হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের অপরিগ্রহ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ ভাবে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির

অপরিগ্রহ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লাভ হয়। দোল দুর্গোৎসবে যাঁহারা সন্ধিপূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অভ্যন্তরস্থ চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত ও সন্ধি সময়ের উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিলে, সন্ধি পূজার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করিবার তাৎপর্য্যও বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

সাধারণতঃ স্বর বলিতে বায়ুকে বুঝাইলেও এ ক্ষেত্রে বায়ুর দুইটি গুণ বিচার করিতে হইবে। বায়ুর একটি গুণ শব্দ. অপরটি স্পর্শ। নিশ্বাস দ্বারা নাসারন্ধ্রে প্রবেশকালে তাহার যে শব্দ, তাহাই "হং" এবং প্রশ্বাসে "সঃ"। ঈড়া পিঙ্গলার এই হংসঃ (জীবাত্মাকে) সদ্‌গুরূপদেশে সুষুম্নাক্ষেত্রে ফিরাইয়া "আমিই সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা" ইহা ধারণাপূর্ব্বক, প্রত্যেক স্বরে ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার অজপায় জপ করিলে স্বর শোধন বা প্রাণায়াম অভ্যাস হয়।

অতঃপর পঞ্চতত্ত্ব বিভাগে "প্রাণের আয়াম" বা পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়টির উপর মনোযোগ আকর্ষণ আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যস্বর উদয়কালে পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব এবং চন্দ্রস্বর উদয়কালে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয় ও লয় সাধিত হইয়া থাকে। এই পঞ্চতত্ত্বকে একত্বে পরিণত করিতে পারিলে, কামক্রোধাদি রিপু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি আপনা হইতে আয়ত্তাধীন হইয়া, চিত্তশুদ্ধ ও তাহার একাগ্রতা বিধান হয়। ইহাকেই তত্ত্বশোধন বা ভূতশুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। ভূতশুদ্ধি না হইলে, পূজা, জপ, হোম সকলই নিষ্ফল হয়। কর্ম্ম প্রারম্ভে আত্মবুদ্ধি স্থিত না হইলে, "অহংতত্ত্ব" শুদ্ধ হয় না। এই "অহংতত্ত্ব" শুদ্ধ হইলেই, পঞ্চতত্ত্ব বা ভূতশুদ্ধির জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব ইহারাই পঞ্চতত্ত্ব নামে অভিহিত। আকাশতত্ত্বই ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি ও লয়স্থান।

পঞ্চতত্ত্ব-শোধন-প্রণালী—

পঞ্চতত্ত্ব—দেবতা—বর্ণ—বীজ—আকার—ভোগকাল—জপসংখ্যা।

আকাশতত্ত্ব—সদাশিব—রঞ্জিতবর্ণ—হং * * * * * * * * * ৬ দণ্ড ২১৬০

উজ্জ্বলনক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশের ন্যায়

বায়ুতত্ত্ব—ঈশ্বর—কৃষ্ণবর্ণ—যং ৬ দণ্ড ২১৬০

গোলাকার শালগ্রাম শিলার ন্যায়

তেজস্তত্ত্ব—রুদ্র—রক্তবর্ণ—রং ৬ দণ্ড ২১৬০

অগ্নিশিখাবৎ

জলতত্ত্ব—বিষ্ণু—শ্বেতবর্ণ—বং ৬ দণ্ড ২১৬০

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি

পৃথ্বীতত্ত্ব—ব্রহ্মা—পীতবর্ণ—লং ৬ দণ্ড ২১৬০

চতুষ্কোণ

১০৮০০

এই পঞ্চতত্ত্ব-শোধন প্রভাবে সাধক অতীন্দ্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং ইচ্ছামাত্র ষড়রিপুচয় তাঁহার পদে অবনত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত অন্নময়কোষ হইতে প্রাণময়কোষে যাইবার যে সকল অন্তরায় আছে, যে ক্রিয়া দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়, তাহার নাম প্রাণায়াম। সাধারণতঃ লোকে প্রাণবায়ুকেই প্রাণ বলিয়া থাকে; কিন্তু যোগিগণ জানেন যে, দেহের সমস্ত বায়ু রোধ করিলেও প্রাণ বর্ত্তমান থাকে, দেহ প্রাণহীন হয় না। সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সংস্থান সম্বন্ধে একটু জ্ঞান না জন্মিলে, প্রাণ বা প্রাণায়ামের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে অনেকেই ভ্রান্তি বশতঃ প্রাণবায়ুকে প্রাণ বুঝিয়া থাকেন। এই সংশয় নিবারণার্থ বায়ুর সংস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

দেহমধ্যে নাড়ী সংস্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, প্রাণের সংস্থানও প্রায় সেইরূপ জানিবে। মূল প্রাণবায়ুসহ আরও উনপঞ্চাশ প্রকার বায়ু দেহমধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দশটি বায়ু প্রধান। যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি প্রাণ নামে অভিহিত। তাহার মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান এই দুইটি প্রধান। এই উভয়ের মধ্যে আবার প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুখ, নাসিকা, উদর ও নাভি মধ্যে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করে। কেহ কেহ বলেন যে, পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রাণবায়ুর বসতি স্থান। অপান বায়ু কুণ্ডলীচক্রমধ্যে অধঃ ও উর্দ্ধভাগে এবং চারিদিকে ব্যাপ্ত থাকিয়া দেহমধ্যস্থ গূঢ়স্থানসমূহ দীপবৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যানবায়ু কর্ণ ও নেত্র মধ্যে, কৃকাটিকা (ঘাড়) গুল্‌ফ দ্বয় নাসিকা ও গলদেশে, স্ফিকদ্বয় (কটির অধোদেশে) এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কেহ বলেন যে গুহ্যদেশ মেঢ্র, উরু, জানু, উদর, অণ্ডকোষ, কটি, জঙ্ঘাদ্বয় ও নাভি এই সকল প্রাণ অপান বায়ুর আশ্রয়। বস্তুতঃ অপান বায়ু গুহ্

ও অগ্ন্যাধার স্থানের মধ্যে অবস্থান করিয়া, প্রদীপ্ত শিখার ন্যায় ঐ সকল স্থান প্রকাশিত করিতেছে। উদান বায়ু সমস্ত সন্ধিস্থানে ও হস্ত, পদে অবস্থিতি করে। ব্যানবায়ু সমস্ত গাত্র ব্যাপিয়া বাস করিয়া থাকে এবং সমান বায়ু সমস্ত ভুক্তদ্রব্যের রস, অগ্নির সহিত শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। একমাত্র এই ব্যান বায়ু ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ীপুঞ্জে সঞ্চরণ পূর্ব্বক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। নাগাদি পঞ্চবায়ু, ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া উদরস্থিত অন্ন, জল ও রসাদির সমীকরণ করিয়া থাকে। উদর-মধ্যস্থিত প্রাণবায়ু ও তৎস্থিত অন্ন ও রসাদিকে পৃথক্ সাধন করে। তখন অপানবায়ু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অগ্নির উপর জল ও জলের উপর অন্নাদি স্থাপন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার দেহমধ্যস্থ বহ্নিস্থানে প্রতিগমন করে। তখন ঐ অগ্নি, অপানবায়ু দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দেহস্থ নিজস্থানে জ্বলিতে থাকে। তদনন্তর শিখাবিশিষ্ট, সেই অগ্নি প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, কোষ্ঠ মধ্যস্থ জলকে অতিশয় উষ্ণ করিয়া থাকে। তখন বহ্নি, ঐ জলোপরি সংস্থাপিত ভুক্ত অন্ন-জলাদিকে, সেই সন্তপ্ত জল দ্বারা উত্তমরূপে পাক করে। তখন ঐ পক্ক জলাদি, স্বেদ ও মূত্ররূপে এবং রসাদি বীর্য্যরূপে, আর অন্নাদি, পুরীষরূপে পরিণত হয়। প্রাণবায়ু এই সকল কার্য্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সম্পাদন করিয়া থাকে। তদনন্তর ঐ প্রাণ, সমানবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, অন্নরসাদিকে সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত করিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে দেহমধ্যে সঞ্চালন করে। দেহস্থ নয়টি শূন্যরন্ধ্র দ্বারা ঐ স্বেদ ও বিষ্ঠা মূত্রাদি দেহ হইতে বহির্গত হয়। বর্ণিত বায়ুসকল নানাবিধ ভাবে সতত দেহমধ্যে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এজন্য আহার্য্যাদি পরিপাক হওয়ার পূর্ব্বে বায়ু নিরোধাদি প্রাণায়াম কর্ম্ম নিষেধ। আহারের পর তিন ঘণ্টা সময় বিশ্রাম দিয়া কার্য্য করাই ভাল।

নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণবায়ুর কার্য্য বলিয়া উক্ত। বিষ্ঠা-মূত্রাদি বহিনিঃসরণ অপানবায়ুর কার্য্য। ক্ষয় ও সংগ্রহ ব্যানবায়ুর কার্য্য। অঙ্গের উন্নয়নাদি উদানবায়ুর কার্য্য এবং দেহের পোষণাদি সমানবায়ুর কার্য্য বলিয়া কথিত। উদ্গারাদি নাগবায়ুর কার্য্য। নিমিলনাদি কূর্ম্মবায়ুর কর্ম্ম। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কৃকরবায়ুর কার্য্য, নিদ্রা তন্দ্রাদি দেবদত্তের কার্য্য, শোষণাদি সমস্ত ক্রিয়া ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য। এইরূপে নাড়ী সকল ও বায়ু সকলের স্থান অবগত হইয়া শাস্ত্রমতে নাড়ী ও বায়ু শোধন করিবে। এই ভাবে নাড়ী ও বায়ুশোধন জন্যই রেচক, পূরক, কুম্ভকাদিযুক্ত প্রাথমিক বহিঃ প্রাণায়ামের ব্যবস্থা। কিন্তু হায়! অধিকাংশ অজ্ঞান মানব, সেই শোধন প্রণালীকেই চিরকাল প্রাণায়াম অর্থে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ও তৎফললাভে বঞ্চিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত সুষুম্নানাড়ীর উভয় প্রান্তকে উভয় মেরু বলা যায়। সুষুম্নানাড়ীকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য, যে আবরণ, তাহাকে পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড বলা হইয়া থাকে। এই মেরুদণ্ড মস্তকের নিম্নস্থান হইতে গুহ্যের পশ্চাদ্‌ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে সমসংখ্যক্ অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। সুষুম্নানাড়ীর শাখা সমূহ ঐ সকল ছিদ্র পথে নির্গত হইয়া, বহু প্রশাখাদি বিস্তারক্রমে শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে সুষুম্নানাড়ী প্রশস্তভাবে বিদ্যমান এবং তাহা কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত। সুষুম্নার এই বিস্তৃত অংশকে মস্তিষ্ক বা ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ কঠিন আবরণকে ব্রহ্মাণ্ডাধার বা মস্তক বলে। ঐ মস্তকের নিম্ন প্রদেশের সম্মুখভাগে, বামে, দক্ষিণে সমভাবে যে, কতকগুলি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, মস্তিষ্ক হইতে কতকগুলি সূক্ষ্মনাড়ী ঐ সকল ছিদ্রদিয়া মুখমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত আছে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারগুলির বহিরবস্থা যে প্রকার সাদৃশ্যযুক্ত, ঐ সকল নাড়ীগুলিও পরস্পর

তন্নিবন্ধন ঐ তত্ত্বের পর্য্যাপ্তপরিমাণ উন্নতি সাধন হইতে পারে নাই। এস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আত্মতত্ত্ব ভাল করিয়া অনুশীলন না করা পর্য্যন্ত, পরতত্ত্বানুশীলন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তদ্দারা "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" অর্থাৎ জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগগ্রন্থে আসন সম্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের অবতারণা করিয়া, অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা, সঙ্গত বোধ হইল না। যাহা আবশ্যক তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আসন সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতা বলিয়াছেন।—

"আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তোজীবজন্তবঃ।
এতেষামখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ॥
চতুরশীতি লক্ষণামেকৈকং সমুদাহৃতম্।
ততঃ শীর্ষেণ পীঠানাং ষোড়শোনং শতং কৃতং॥
আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যো দ্বয়মেতদুদাহৃতম্।
একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং॥"

সংসারে যতপ্রকার জীব জন্তু আছে, সে সকলের প্রভেদ; একমাত্র যোগেশ্বর মহেশ্বরই জানেন। সাংসারিক জীবসমূহ চতুরশীতি লক্ষ প্রকার, তাহাদের প্রত্যেকের আসনও সেইরূপ বিভিন্নভাবে চতুরশীতি লক্ষ প্রকার। তন্মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসন শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত চতুরশীতি আসনের মধ্যে "সিদ্ধাসন" ও "পদ্মাসন" এই দুইটি আসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হঠযোগ পন্থিগণ সাধারণতঃ দ্বাত্রিংশ প্রকার আসন ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মতেও সিদ্ধাসন এবং পদ্মাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ নিমিত্ত সমস্ত আসনতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া,

চতুর্থখণ্ড।

ত্রিংশ প্রকরণ।

আসন-যোগে আত্ম-দর্শন

আসন, যোগের একটি অঙ্গ। আসন বহুবিধ। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার জীব, তত প্রকার আসন। প্রত্যেক জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন আসন। পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণ ঐ ভিন্ন ভিন্ন আসনের তত্ত্বানুশীলন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিতত্ত্ব ও তাহাদের অভ্যন্তরীণভাব এবং ভাষা ইত্যাদির মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। ঐ সকল তত্ত্বানুসন্ধিৎসা দ্বারা জগতে বিজ্ঞানবিৎ ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ হওয়া যায়। অপরন্তু কোনও কোনও প্রাণীর স্বাভাবিক আসন অবলম্বনে মনুষ্যদেহের কোনও কোনও ব্যাধি পীড়া আরোগ্যলাভের অনুকূলে আংশিক সহায়তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ প্রলোভন, মুক্তি লাভের পক্ষে কদাপি অনুকূল নহে। পক্ষান্তরে আত্মরক্ষায় বিশেষরূপ শক্তিসঞ্চয় না হইলে, ইতর প্রাণীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনেকের ভাগ্যে তীর্য্যগ্‌গতি লাভ হওয়াও অসম্ভব নহে। তজ্জন্য মুমুক্ষু যোগিঋষিগণ ঐ সকল প্রাণিবিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন করিতেন না। আমার বিশ্বাস

তদ্রূপ সাদৃশ্য বিশিষ্ট। *সুষুম্নার বিস্তৃত অংশ বা মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত নাড়ীসমূহমধ্যে কতকগুলি আমাদের চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্যগুলি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কতকগুলি হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি দেহমধ্যস্থ যন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এতন্মধ্যে যে সকল নাড়ী, জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত প্রবাহিত, তাহারা দেহের বাহ্যপ্রদেশ হইতে প্রাণময়কোষের পোষণ-কারক বিষয়সমূহ আকর্ষণ করে এবং যে সকল নাড়ী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারা প্রাণময়কোষ হইতে প্রাণকে দেহের বাহ্যপ্রদেশে প্রবাহিত করিয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রাণের অন্তর্মুখী প্রবাহ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা প্রাণের বহির্মুখী প্রবাহ সম্পন্ন হয়। নেত্র এবং জিহ্বাদি বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় একত্র বিদ্যমান থাকায়, যদিও ঐ সকল স্থানে প্রাণের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রবাহ তুল্যভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তর্মুখের প্রবাহিত প্রাণ, বহির্মুখে প্রবাহিত হইতে অসমর্থ হইয়া, সাধারণতঃ উহা সুষুম্নামুখে গমন করে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া, সাধারণভাবে ইহা লিখিত হইল। এই সকল যোগ-সাধন-রহস্য জ্ঞানীগুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা হয় না।

এখন প্রাণায়াম বুঝিতে হইলে, প্রাণ জিনিষটি কি? তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। একমাত্র প্রাণবায়ু বুঝিলে, প্রাণ বুঝা হয় না। বেদান্তসূত্রে প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত আছে,—

"ন বায়ু ক্রিয়েৎ পৃথগুপদেশাৎ"

পৃথক্ উপদেশ নিবন্ধন প্রাণ শব্দে বায়ু বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া, এই উভয়ের কিছুই বুঝায় না। ঐ প্রাণাদি বায়ু যাহার শক্তিতে সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার নামই "প্রাণ"। ব্যষ্টি বা সমষ্টি জগতের ইচ্ছা

ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মক যে চিচ্ছক্তি বা প্রণব, তাহার নামই "প্রাণ"। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে।—

"বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথঃ।
তদ্ বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চক্ চ সাম চ॥"

পুরুষের বাক্যই ঋক্ (মন্ত্র) স্বরূপ, প্রাণই সাম স্বরূপ এবং "ওঁ" এই অক্ষরই উদ্‌গীথাখ্য প্রণব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-শক্তির সংযমই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াশক্তির সম্বন্ধ অতি অল্প মাত্র। কারণ শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ অবস্থায়ও প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। তবে প্রাণায়ামে অধিকারী হইবার জন্য প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একটি অবলম্বন বটে।

দেহমধ্যস্থ প্রাণকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অবলম্বনে আমরা ক্রমে হৃৎপিণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হই। ঐ হৃৎপিণ্ডটি পাঁচটি ছিদ্রবিশিষ্ট। ঐ পাঁচটি ছিদ্র হইতে যে পাঁচ প্রকার বায়ু দেহমধ্যে সতত সঞ্চার হইতেছে, তাহা পঞ্চপ্রাণবায়ু নামে অভিহিত। উক্ত হৃৎপিণ্ডের পূর্ব্বদিকের ছিদ্রপথে যে বায়ু সঞ্চালন হইতেছে, ঐ প্রবাহিত শক্তির নাম প্রাণ। এই প্রাণশক্তির নামই আদিত্য। ইনি চক্ষুতে সতত প্রতিষ্ঠিত এবং নাভিস্থ বৈশ্বানর দ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ড তেজোময় করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই তেজোময় আদিত্য ঐ হৃৎপিণ্ডের পূর্ব্বদিক্ হইতে উদিত। এ জন্য শ্রুতি আদিত্যকে বাহ্যপ্রাণ বলিয়াছেন।

উক্ত হৃৎপিণ্ডের পশ্চিমদিকে যে দ্বার বা ছিদ্র আছে, তাহা হইতে অপানবায়ু প্রবাহিত হয় এবং তদ্দ্বারা দেহস্থ অধোদিকের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই অপানাখ্য শক্তির নাম অগ্নি। বাক্য এই অপানাখ্য শক্তির দ্বারা স্ফুরিত হয়।

উক্ত হৃৎপিণ্ডের উত্তরদিকে যে দ্বার বা ছিদ্র আছে, তাহা হইতে সমানবায়ু সঞ্চারিত হয়। ঐ বায়ুশক্তি ভুক্তদ্রব্যের ও বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা বিধান করে, তদ্ধেতু উহা সমানবায়ু নামে অভিহিত হয়। এই সমানাখ্য শক্তিই মন এবং ইনিই বরুণ, ইনিই জল বা বৃষ্টি উৎপাদন করেন।

ঐ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকে যে দ্বার বা ছিদ্র আছে, তাহাতে ব্যানবায়ু সঞ্চারিত হয়। এই বায়ুশক্তি অতীব বীর্য্যশালী, এজন্য সময় সময় উহা প্রাণ ও অপানবায়ুকে নিগৃহীত করিয়া নানারূপে দেহমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। এই শক্তিই শ্রোত্র, ইনিই চন্দ্রমা। ইহার দ্বারাই সমস্ত শরীরে রস সঞ্চালন হইয়া দেহপোষণ হয়।

ঐ হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে যে দ্বার আছে, তাহা হইতে উদানবায়ু সঞ্চারিত হয়। এই উদানশক্তি, সকল শক্তিকে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করিয়া জীবাত্মার উৎকর্ষ সাধনার্থ কর্ম্ম সমাধান করে। এ নিমিত্ত ইনি উদান নামে প্রসিদ্ধ। এই উদানাখ্য শক্তিই আকাশ এবং ইনিই ওজঃ বা বুদ্ধি স্বরূপ। ("ওজস্বী মহাস্বান্ ভবতি") (১) এই বুদ্ধির সাহায্যে, কৌশল বা জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি সাধিত হয়। সুতরাং এই বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তিকে অবলম্বন করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র বায়ু-রোধন দ্বারা প্রাণায়াম সাধিত হয় না।

উক্ত প্রাণবায়ুর সমষ্টিজীবনীশক্তির স্থান হৃৎপিণ্ড। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে মস্তিষ্কের সহিত এই হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সম্বন্ধ আছে এবং অনাহত বা মহর্লোক হইতে বায়ুতত্ত্বের শক্তি প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডে, তথা হইতে ফুস্ফুসে সঞ্চারিত হইয়া উহা জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু নাম ধারণ করে।

(১) এই উদানবায়ুকে যন্ত্রবিজ্ঞানে কৃত্রিমভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জড়বৈজ্ঞানিকগণ সাব্‌মেরিণ জ্যাপ্‌লীন্ ইত্যাদি নানাবিধ অত্যদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছেন। আর আমরা হা করিয়া দেখিতেছি। (৫ম স্তর দেখ)

দেহের ভিতর যতপ্রকার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত আছে, তন্মধ্যে এই ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ-উপলব্ধি-যোগ্য। কোন মেশিন বা ক্রিয়া নিয়ামক যন্ত্রের ন্যায় ঐ ফুস্‌ফুসের গতিশক্তি, দেহ-যন্ত্রের অপর শক্তিগুলিকে পরিচালনা করিতেছে। ফুস্‌ফুসের ঐ গতিশক্তি নিরোধ করিয়া, যে শক্তি বলে উহা চালিত হয়, সেই মূলশক্তির নাম "প্রাণ" তাঁহার অনুসন্ধান করাই প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা অর্থ। ফুস্‌ফুসের গতির সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্বন্ধ অতীব নিকট হইলেও, শ্বাসপ্রশ্বাস যে, ঐ গতি বা স্পন্দন শক্তির নিয়ন্তা, তাহা নহে। বরং উহাই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির বিধায়ক। ফুস্‌ফুসের স্পন্দন-শক্তি বহিঃস্থ বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ ও সঞ্চালন করিতেছে। পূর্ব্ব-বর্ণিত হৃৎপিণ্ড কর্ত্তৃক আকর্ষিত প্রাণশক্তি, ফুস্‌ফুসকে স্পন্দিত করিয়া থাকে এবং ফুস্‌ফুসের ঐ স্পন্দনশক্তিবলেই বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষিত হয়। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া, প্রাণায়ামের বিধায়ক নহে অর্থাৎ প্রাণায়াম, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া নহে। যে প্রাণশক্তি, হৃৎপিণ্ড হইতে প্রবাহিত হইয়া ফুস্‌ফুসকে সঞ্চালন করিয়া থাকে, সেই "প্রাণকে" আয়ত্ত করাই "প্রাণায়াম"। যে চিচ্ছক্তি, স্নায়ুমণ্ডলীযোগে হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস ও মাংসপেশীগুলিকে স্পন্দিত করিয়া, ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার করিতেছে, তাহার নামই "প্রাণ"। প্রাণায়ামযোগে সেই প্রাণের অনুসরণ করিলেই আত্ম-দর্শন লাভ হয়। সুতরাং আত্ম-দর্শনই প্রাণায়ামের অভিব্যক্তি। এজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

প্রাণই বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বরাত্মক, পরমাত্মা, পরমেশ্বর। সেই প্রাণরূপ ব্রহ্মই সপ্তলোক ধারণ করিয়া আছে। সর্ব্বজগৎ প্রাণময় বা প্রাণই "সর্ব্ব-ব্রহ্মময়ং জগৎ"। সেই প্রাণের অনুসন্ধানই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। সুতরাং

তাহা একমাত্র বহিঃপ্রাণায়াম অর্থাৎ বাহিরের বায়ু, আকর্ষণ বিপ্রাকর্ষণ বা পূরক, কুম্ভক, রেচকে সমাধান হয় না। হংসাখ্য প্রাণাত্মাকে ঈড়া পিঙ্গলারূপ অপরাপ্রকৃতিখণ্ড হইতে ফিরাইয়া, সদ্‌গুরুর উপদেশানুযায়ী সূক্ষ্মাকারে সুষুম্নারূপ পরাপ্রকৃতিখণ্ডে, নাদোপরি "ব্রহ্মবিন্দুতে" যুক্ত করাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম যে, একমাত্র যোগির পক্ষেই অত্যাবশ্যক, তাহা নহে। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম, ব্রত, উপবাস, পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বাহ্যাভ্যন্তর অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের প্রাণায়ামই মূলস্বরূপ। প্রাণায়াম ভিন্ন দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি, নাড়ীশুদ্ধি, বায়ুশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি কিছু সম্ভবপর নহে। প্রাণায়াম দ্বারা ভূতশুদ্ধি না হইলে, কি মানসপূজা, কি বাহ্যপূজা বা কোন কর্ম্মেরই অধিকার জন্মে না। **অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা মানস-ক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে বাহ্য-মূর্ত্তিতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজা করিতে** হয়; ইহাই শাস্ত্রবিধি। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণজাতি সেই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য ও কৌশল বিস্মৃত হইয়া বিভগ্ন-রদ-বিষধরের ন্যায় সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত। প্রাণায়ামের শক্তি-অভাবে, গায়ত্রী প্রাণহীন ও যজ্ঞসূত্র গলপাশে পরিণত হইয়াছে। সমাজশীর্ষ ব্রাহ্মণজাতির এতাদৃশ অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আর্য্য-সন্তানগণেরও অধঃপতনের কারণ ঘটিয়াছে। তন্নিবন্ধন আজ শ্রদ্ধা, ভক্তি, সাহস, পুরুষকার, বল, বিক্রম, জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীক্ষা, কোন ক্ষেত্রেই প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি হইতেছে না; সর্ব্বত্রই যেন নির্জ্জীব। প্রাণায়াম বিস্মৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে মানবজীবনই যে নিষ্ফল হইয়াছে; মানবজাতি মধ্যেই যে, নিত্য নূতন দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হইয়া, অকালমৃত্যুর কারণ উদ্ভব হইয়াছে; কেবলমাত্র তাহাই নহে। আমাদের প্রাণায়ামশক্তির অভাবে, বহির্জগতের বায়ুস্তরগুলিও নিয়ত অবিশুদ্ধ-ভাব-সংক্রামকতায়

দূষিত হইয়া, বহিঃপ্রকৃতির যাবতীয় শক্তিকেও ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়াছে। তদ্ধেতু ধরিত্রী হইতে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর শস্য, সুখাদ্য ফল, সুপানীয় জল, সুস্নিগ্ধ সমীরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং দিবাকর ও চন্দ্রমা পূর্ব্ববৎ সুশোভনীয়, সুখদ কিরণ প্রদান করেন না। এ নিমিত্ত গবাদি জন্তু এবং অন্যান্য পশু, পক্ষিকুলও অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞের শক্তি-অভাবেই আমাদের স্বধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতেছে। এই প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞের ক্রিয়াই আমাদের "সহজ" বা স্বধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ৩য় অঃ

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি "প্রাণযজ্ঞ সহ" প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর; ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক। এই প্রাণযজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর এবং সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম-মঙ্গল লাভ করিবে। সুতরাং নিষ্কামভাবে এই প্রাণযজ্ঞ বা প্রাণায়ামই প্রকৃত পক্ষে স্বধর্ম্ম বা "সহজ" ধর্ম্ম; প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞ দ্বারা প্রাণের সংবর্দ্ধনা করিলে প্রাণও নিশ্চয়ই আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করিবে। এই "সহজাত" প্রাণযজ্ঞে অধিকার না হইলে, বাহিরের দ্রব্যযজ্ঞে অধিকারী হয় না। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণযজ্ঞই নিষ্কামকর্ম্ম. ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ঈদৃশ নিষ্কামকর্ম্মের কথাই গীতায় কর্ম্মযোগে বলিয়াছেন।—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

এই প্রাণঃ-বিষ্ণুর আরাধনার্থ প্রাণযজ্ঞ বা প্রাণকর্ম্ম ভিন্ন, অন্য কোন কর্ম্ম করিলে, এই লোকসকল কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! সেই প্রাণঃ-বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া. সেই স্বধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। আধ্যাত্মিকভাবে প্রাণায়াম বা প্রাণ-যজ্ঞ দ্বারা প্রাণের প্রতিষ্ঠা করাই জীবের স্বধর্ম্ম। "একোপ্রাণঃ কর্ম্ম, জীবের স্বধর্ম্ম, অধর্ম্ম বাকি নিশ্চয়" ইহাই কর্ম্মযোগ। এই প্রাণযজ্ঞ দ্বারাই অন্তর বাহিরের বায়ু বিশুদ্ধ হয়, মেঘ সুবৃষ্টি দান করে, পৃথিবী সুশস্য ও সুফল প্রসবরূপ অন্ন প্রদান করে, সূর্য্যও সুখদকিরণ প্রদানে সর্ব্বোতোভাবে জীবগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। এই প্রাণযজ্ঞ দ্বারাই "পৃথ্বি ত্বং শীতলাভব" হয়। আমরা আত্মজ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়াই সেই সহজাত প্রাণযজ্ঞরূপ প্রাণায়াম বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং স্বধর্ম্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন শক্তিহীন, শ্রীহীন, সম্পদহীন হইতেছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিও তদ্রূপ শোভাহীন, সম্পদহীন, শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে স্বধর্ম্মোদ্দীপক প্রাণায়ামের শক্তিকে জাগাইয়া তোলা। প্রাণায়ামের শক্তিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিমধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহে, প্রাণের স্পন্দন-শক্তি প্রবাহিত করিয়া, পরিদৃশ্যমান জগতে প্রাণের সাড়া উৎপাদন করা। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিদ্ যোগিঋষির বংশধরগণের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য নহে। আমরা আত্মজ্ঞান বা আত্মস্মৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করিলেই সমস্ত লুপ্তস্মৃতি আমাদের চিত্তে পুনরভ্যুদয় হইবে। আমরা বাহ্যপূজা দ্বারা দেবমূর্ত্তি বা দৈবশক্তি মধ্যে যদি প্রাণের স্পন্দন-শক্তি প্রবাহিত করিয়া, ইচ্ছামত দৈব-শক্তি দ্বারা কার্য্য পরিচালন করিতে পারি। এ বিশ্বাস যদি প্রকৃতই আমাদের চিত্তে দৃঢ়তর থাকে, তাহা হইলে, স্থূল মানব প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি

মধ্যেও যে, আমরা প্রাণের স্পন্দন প্রবাহিত করিয়া, প্রাণের সাড়া উৎপাদন ও ইচ্ছামত কার্য্য পরিচালন করিতে পারিব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

আমরা প্রাণায়ামবলে স্বীয় স্বীয় প্রাণশক্তি, যতই উচ্চতর ভাবে সংগঠন ও তাহার আকুঞ্চন সম্প্রসারণ করিতে সমর্থ হইব, ততই বিশ্বপ্রাণ আমাদের আয়ত্ত ও মানবকুল স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবে এবং সেই প্রাণায়াম সন্তাপে দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ, মোহ প্রভৃতি "বৈপ্রচিত্ত" দানবগণ আমাদের দেহরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া. আর্য্যদেশ হইতে পলায়ন করিবে। আমরাও "কলি" অতিক্রম করিয়া, অচিরাৎ "সত্যে উপনীত হইব। অতএব আত্মদর্শনের স্বরূপ সেই অন্তঃপ্রাণায়ামের প্রতি আর্য্যসন্তানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে! শাস্ত্রে উক্ত আছে—"প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ" প্রাণায়াম ব্যতীত সিদ্ধি কোথায়? তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধিই বা কিরূপে লাভ হইতে পারে? সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

প্রকারভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ।

প্রাণায়ামস্ত্রিধাপ্রোক্তা রেচকপূরককুম্ভকৈঃ।
সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ॥

রেচক, পূরক, কুম্ভকভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ, সহিত ও কেবলভেদে কুম্ভক দুইপ্রকার। বহিংস্থ-রেচক-পূরক বর্জ্জিত যে কুম্ভক, তাহাকে কেবলকুম্ভক বলে, উহারই নাম অন্তঃপ্রাণায়াম। বহিঃপ্রাণায়াম বা নাড়ীশুদ্ধিতে জীবনীশক্তি দেহস্থ সমুদায় নাড়ী হইতে নাভিস্থানে আকর্ষিত ও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ঐ শক্তি আচার্য্য বা গুরুকৃপাবশে কুণ্ডলীর চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে উর্দ্ধে সঞ্চারিত হয়। তদবস্থায় সুষুম্নাভ্যন্তরে ইচ্ছামত স্থানে তাহাকে উত্তোলন ও ধারণাদি করার নামই অন্তঃপ্রাণায়াম। আমাদের বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়াম, এই অন্তঃপ্রাণায়ামেরই ক্রিয়া।

উপনয়ন সংস্কারে আচার্য্য আত্মশক্তিবলে "মানবককে" ঐ অন্তঃপ্রাণায়ামের ক্রিয়াশক্তি প্রদানে, ব্রহ্মগায়ত্রী দীক্ষা প্রদান করেন। তদ্ধেতু ব্রাহ্মণ, উপনয়ন সংস্কার হইতেই দ্বিজ আখ্যায় অন্তঃপ্রাণায়ামের অধিকারী। ঐ অন্তঃ-প্রাণায়ামবশেই আত্মশক্তিস্ফুরণ হইয়া "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়। প্রাণায়াম সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি, অন্তঃপ্রাণায়ামের কথাই বলিয়াছেন।

"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥"

শ্বাসপ্রশ্বাসের বাহ্যগতি বিচ্ছেদ পূর্ব্বক সুষুম্নাপথে অন্তর্গতির নাম প্রাণায়াম। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃসূক্ষ্মঃ"

বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তিভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ। দেশ কাল সংখ্যাদ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ ও সূক্ষ্মতা যুক্ত উহাদের আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। (১)

---

(১) এই প্রাণায়ামেও ত্রিবিধ-ক্রিয়া-যোগের বিষয়, পূরক, রেচক, কুম্ভকভাবে বলা হইয়াছে। যথা—প্রথমতঃ প্রাণকে আকর্ষণ করা—তাহার নাম পূরক বা বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয়—রেচক বা অভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয়—কুম্ভক বা স্তম্ভবৃত্তি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত দেহের জীবনীশক্তিকে নাভিচক্র হইতে অপানবায়ুর সাহায্যে নিম্নোদরপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ভেদ করিয়া "অপানে জুহ্বতি প্রাণং"ভাবে প্রাণবায়ুতে হোম বা পূরক; পুনর্ব্বার নাভিকন্দস্থ প্রাণশক্তিকে প্রাণবায়ুর সাহায্যে ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড প্রবাহপথে আকর্ষণ করিয়া, প্রাণশক্তিসহ প্রাণবায়ুকে "প্রাণেহপানং তথাপরে" ভাবে, অপনাবায়ুতে হোম; তদ্বারা রেচকরূপ প্রাণসঞ্চারস্থানে (অভ্যন্তরবৃত্তিবলে) স্বভাবতঃ "প্রাণাপান গতীরুদ্ধা"—অবস্থা উদয় হয় অর্থাৎ উক্তরূপ পূরক রেচকে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হইয়া, স্তম্ভবৃত্তিরূপ কুম্ভক বা প্রাণের স্থিরতা সম্পাদন হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি উক্ত শ্লোকে, গীতোক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামের বিষয়ই বলিয়াছেন। আমরাও বেদোক্ত অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থিগণকে অন্তঃপ্রাণায়াম-যোগ বুঝাইবার জন্য পূরক, কুম্ভক, রেচকের ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ

বাহ্যবৃত্তি—স্থূলদেহ-প্রবাহী-শক্তিসমষ্টি জীবাত্মা বা কুণ্ডলীর সুষুম্নাপথে মণিপুরাদি হৃৎপ্রদেশে গতি। **স্তম্ভবৃত্তি**—হৃৎপদ্মে ঐ গতি স্থির। **অভ্যন্তরবৃত্তি**—ঐ গতি বিশুদ্ধাদি আজ্ঞাপদ্মে সঞ্চারণ। বৈদিকী সন্ধ্যায় এতাদৃশ অন্তঃপ্রাণায়ামের ক্রিয়া কৌশলের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার প্রণালী প্রদর্শন করা যাইতেছে।(২)

বাহ্যবৃত্তি, স্তম্ভবৃত্তি ও অভ্যন্তরবৃত্তিভাবে ক্রিয়াযোগ বিবৃত করিলাম। বহিঃপ্রাণায়ামে যেরূপ বাহ্যবায়ুর পূরক, কুম্ভক, রেচক, অনুষ্ঠানে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুশুদ্ধি ও নাড়ীশুদ্ধি সম্পাদন হয়, অন্তঃপ্রাণায়ামেও সেইরূপ দেহস্থ জীবনীশক্তি সমষ্টি-কৃত অবস্থায় সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে জীবাত্মার ঊর্দ্ধগতি সঞ্চারিত হইয়া ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি এবং আজ্ঞাপথে গ্রন্থিত্রয় ভেদ পূর্ব্বক, সহস্রদল বা সত্যলোকে পরমাত্মা বা "ব্রহ্মবিন্দুতে" বিশ্রাম বা জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব সম্পাদন হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দেশ, কাল, সংখ্যাদি বিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দেশ অর্থে প্রাণকে সপ্তব্যাহৃতি বা ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকের কোনস্থান বিশেষে ধারণাবশে স্থির রাখা। কাল—অর্থে ঐ প্রাণ কোন্ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, তাহার সময় নির্দ্ধারণ। সংখ্যা অর্থে—মন্ত্রদ্বারা অজপার সংখ্যা নির্ণয় এবং অবস্থা-বিশেষে সপ্তছন্দে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দীর্ঘ বা সূক্ষ্মভাবে পরিচালন। এনিমিত্ত অগ্নিরাদি সপ্তদেবতা প্রাণা-য়ামে বিনিয়োগ হয়। যথাযোগ্যস্থানে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ইহা বিবৃত করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য "আত্ম-দর্শন"। স্থূল দৃষ্টিতে এই সূক্ষ্ম বিষয়, যেন কেহ নিরীক্ষণ না করেন। কারণ তদ্দ্বারা কেবল বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা-জনিত বিষোদ্‌গার লাভ হয়। আমরা তাহাতে একান্ত অনিচ্ছুক, আত্মবিশ্বাসী সাধক, বর্ণিতমতে, গুরূপদিষ্টভাবে ক্রিয়াযোগ অনুশীলন করুন; নিশ্চয়ই সত্যতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন। ইহা আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি। "সত্যং সত্যং বদাম্যহং"।

(২) বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়াম স্থূলভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক ঐ স্থূল মধ্যেই জ্যোতিঃ ও সূক্ষ্মভাব নিহিত রহিয়াছে। মূলাধার বা ব্রহ্মস্থানে পূরক, হৃৎপদ্ম বিষ্ণু স্থানে কুম্ভক, মুখ ও নাসিকা মধ্যস্থ আজ্ঞা পদ্মরূপ শিবস্থানে রেচক।

উক্ত প্রাণায়াম মন্ত্রের ওঁভূঃ, মন্ত্রাত্মকশক্তিপ্রবাহে, নাভি হইতে শ্বাসের গতি ফিরাইয়া নিম্নোদর পথে মূলাধারভেদ। ওঁভুবঃ, স্বাধিষ্ঠান ভেদ —ওঁস্বঃ, মণিপুর ভেদ (১) ওঁমহঃ, অনাহত ভেদ,—ওঁজনঃ, বিশুদ্ধ ভেদ, ওঁতপঃ, আজ্ঞাভেদ—ওঁ সত্যং সহস্রদলপদ্মস্থ "ব্রহ্ম-বিন্দু" ধারণ পূর্ব্বক তদীয় জ্যোতিঃপ্রবাহমধ্যে, ওঁতৎ মন্ত্রে পরমাত্মাকে ব্রহ্মবিন্দুরূপে চিন্তা করিবে, পরে সবিতুর্মন্ত্রে উহা হইতে নাদরূপী মায়া অবলম্বনে গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর স্বরূপ সাধকের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত স্থূল দেহাদিরূপ জগৎ প্রসূত হইয়াছে, ধ্যান করিতে করিতে ললাটাদি আজ্ঞাচক্র হইতে ব্রহ্মসূত্রাশ্রয়ে মূলাধার অতিক্রম করিয়া, জীবাত্মাকে পুনঃ নাভিচক্রে সংস্থাপন করিবে। এই প্রাণায়াম মন্ত্রমধ্যেই স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্যোতিঃ ত্রিবিধ ভাবের ধ্যান আছে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিবৃত করা গিয়াছে। ঈদৃশ অন্তঃপ্রাণায়ামের শক্তিতেই কুণ্ডলী চৈতন্য হইয়া সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে ঊর্দ্ধগতি বিশিষ্ট হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণ দ্বিতীয়বার জন্মস্বরূপ দ্বিজ আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইয়া, ব্রাহ্মণের স্বদেহে প্রণব উদ্ধারের অধিকার জন্মে ও সহস্রদলস্থ ব্রহ্মবিন্দু-ধারণালক্ষ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় হয়। বুদ্ধি সুদৃঢ় না হইলে, বিন্দু-ধারণরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম সিদ্ধ হয় না।

প্রাণায়ামঃ পরোবিষ্ণুঃ পরমাত্মস্বরূপকঃ।
ব্রহ্মাতু পূরকোজ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে॥
রেচকস্তু তথা দেবো ব্রহ্মৈবাতু পরঃ শিবঃ।
মুখনাসিকয়োর্মধ্যে বায়ুসঞ্চারগোচরে॥

(১) মূলধারাদি ভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে।

উদঘাটয়েৎ কপাটং তু যথা কুঞ্চিকয়াহটাৎ।
কুণ্ডলীন্যাস্তথা যোগী মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ॥

"মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং উত্থাপ্য হৃদয়ার্কমণ্ডলং নিত্যাতদ্দেবতাবুদ্ধা"

যোগ-দর্শন

মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীশক্তিকে হৃদয়স্থ অর্কমণ্ডলে উত্থাপন করিবে, বুদ্ধিই তাহার দেবতা। অপানবায়ুর সাহায্যেই এই শক্তি উর্দ্ধে সঞ্চালিত হয়।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াম্।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্॥

শিবসংহিতা

কবাটের অর্গল মুক্ত করিলে, যেপ্রকার ঐ কবাট হটাৎ উদ্‌ঘাটিত হয়, সেই প্রকার যোগী কুণ্ডলিনীর সুষুপ্তি বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মোক্ষদ্বার বা সুষুম্না ভেদ করিয়া থাকেন। তান্ত্রিক মতে কুলকুণ্ডলিনী ও বৈদিকমতে জীবাত্মা মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। গায়ত্রী তন্ত্রে উক্ত আছে।

কুণ্ডল্যাঃ পরমোব্রহ্ম গতির্ব্বেদেষু নির্ণয়ঃ।

সমস্ত বেদাদিশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীর সুষুম্নাগতি পরব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর চৈতন্তশক্তি অন্তঃপ্রাণায়ামে সুষুম্নাপথে পরিচালিত হইয়া প্রণবস্বরূপে একাক্ষরব্রহ্মভাবে পরিণত হয়। প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তি অর্থাৎ যিনি অপরাপ্রকৃতিখণ্ডে অকার-উকার-মকারাত্মক ত্রিগুণ বাচক ভাবে ত্রিবলয়াকারে এবং পরা প্রকৃতি খণ্ডের নাদ রূপা অর্দ্ধমাত্রায়, অর্দ্ধবলয়ভাবে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে পরা ও অপরা প্রকৃতির সন্ধিস্থলে পরমাত্মার চিদংশ স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন; গুরূপদিষ্টরূপ অন্তঃপ্রাণায়ামযোগে তাহাকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মনালে মণিপুরে সঞ্চালন করিতে পারিলেই, তিনি একাক্ষর প্রণবাকারে উত্থিত হইয়া যোগিগণের মোক্ষপ্রদ হন। এতদ্ব্যতীত তিনি মূঢ়গণের বন্ধনের জন্যই মূলাধারে প্রসুপ্তা থাকেন। তন্নিবন্ধন, জীব, দেহাত্মবুদ্ধিতে অজ্ঞানভাবে বারম্বার জন্মমৃত্যুর অধীন ও অনিত্য মায়া-মোহ-পূর্ণ ভোগসুখে লালায়িত হয়। আর যাহারা গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান বা গুরুকৃপালব্ধ শক্তিবলে অন্তঃপ্রাণায়াম-যোগে পূর্ব্বোক্ত

বুদ্ধিমান সাধক আধারপদ্মে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে (জীব চৈতন্য) দৃঢ়রূপে অপানবায়ুতে আরোহণ করাইয়া (গুহ্যমূলস্থ) আকর্ষণাত্মক বলপ্রয়োগে ব্রহ্মমার্গে উর্দ্ধে চালনা করিবেন। এই ক্রিয়াযোগ সম্পাদন-জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অন্তঃপ্রাণায়াম কৌশল বিবৃত করিয়াছেন।

"অপানেজুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥"

গীতা ৪ অঃ

কেহ কেহ অপানবায়ুকে (পূরকরূপে) প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে (রেচকরূপে) অপানবায়ুতে হোম করেন। এরূপ করিতে করিতে "কেবল" নামক কুম্ভকযোগে প্রাণাপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রোধ হইয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া প্রাণ সকলকে প্রাণবায়ুতেই হোম করেন; ইত্যাকার প্রাণায়ামের নামই প্রাণযজ্ঞ। দেহমধ্যে এই প্রাণযজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন—

প্রকারে আত্মা পরমাত্মার মিলন সংঘটন করিতে পারেন তাহারাই যোগবিৎ বা যোগী, তাঁহারাই আত্ম-দর্শন লাভে সমর্থ হন।

কন্দোর্দ্ধং কুণ্ডলীশক্তিঃ সুপ্তামোক্ষায় যোগিনাম্।
বন্ধনায়চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ॥

অন্তঃপ্রাণায়ামবলে যেকাল পর্য্যন্ত ঐ শক্তি ব্রহ্মমার্গে উর্দ্ধে সঞ্চালিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত সুষুম্নামুখ উন্মুক্ত হয় না এবং জীবনীশক্তি বা "হং সঃ" আখ্য প্রাণবায়ু সুষুম্না পথে প্রবেশ করিতে পারে না।

তেন কুণ্ডলিনীতস্যা সুষুম্নায়া মুখং ধ্রুবম্।
জহাতি তস্মাৎ প্রাণোঽয়ং সুষুম্না ব্রজতি স্বতঃ॥

গান।

রাগিণী—বসন্তবাহার—তাল মধ্যমান।

(এই) দেহমাঝে প্রাণযজ্ঞ, কররে যজন,
আত্মসংযম হবে তরে, বশে রবে ইন্দ্রিয়গণ।
অপানে প্রাণ, প্রাণে—অপান, প্রাণযজ্ঞের এই ত বিধান,
গুরু না জানালে সন্ধান, শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না সাধন॥
প্রাণযজ্ঞ পয়ে যবে, প্রাণের স্থিরতা হবে,
(তখন) বিমল আনন্দ পাবে, করি "আত্মদরশন"।
সদ্‌গুরুর করুণা হ'লে, তবে সে অবস্থা মিলে,
(ঐ) "অন্তঃপ্রাণায়াম" বলে (ভবে) আসা যাওয়া হয় নিবারণ॥

যোগ সঙ্গীত

ইহা আর একটু বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অপানবায়ুর বিচরণস্থল গুহ্যমূল হইতে নাভির নিম্নস্থল পর্য্যন্ত ; প্রাণবায়ুর বিচরণ, বক্ষঃস্থল হইতে নাসারন্ধ্রের বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুলি পর্য্যন্ত ; আমরা অপানবায়ুর শক্তিতেই নাসাছিদ্র দিয়া বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং শ্বাস গ্রহণ অপানবায়ুর শক্তিবলে সাধিত হয়। ঐ শক্তি মূলাধার বা গুহ্যমূল হইতে সঞ্চারিত হইয়া, নাভি অভিমুখে নিম্নোদর পথে আসিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই আকর্ষণে, বহির্বায়ু নাসারন্ধ্রদিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হয় ; তদবস্থায় অপানের আকর্ষণাত্মক শক্তি, গুহ্য হইতে নাভিতে আসিতে থাকিলে, বহির্বায়ু প্রাণস্থান বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হয় ; তাহাতে প্রাণের ঊর্দ্ধগতি নিরুদ্ধ হইয়া, ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত হয়। অপানের আকর্ষণে প্রাণবায়ুর স্থান ঐ ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত না হইয়া সঙ্কুচিত অর্থাৎ বায়ু বহির্গত হইলে, অপানের আকর্ষণবৃত্তি প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণে অপানের

হোম হয়। অপরন্তু ফুস্‌ফুস্ প্রসারণে অর্থাৎ বহির্বায়ু প্রবেশে নিম্নোদর প্রসারিত হইয়া, অপানে প্রাণের হোম হয়; এইরূপ প্রাণ অপানের হোম হইয়া, উভয়ের ঊর্দ্ধাধোগতি নিরোধ পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ স্বভাবতঃ নিবৃত্তি হয়। তখন অপানাত্মক "সঃ"কাররূপ প্রকৃতিকে, প্রাণাত্মক "হং"কাররূপ পুরুষ বা শিবে হোম বা যোগ করিতে পারিলেই, প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনে "সোঽহং" মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদাত্মক সাধিত হয়। এই অবস্থায় সাধকের মনঃপ্রাণসহ দেহে এমন এক প্রশান্তভাব উদয় হয় যে, তদ্দ্বারা দেহ, মন, প্রাণ ও স্নায়ুমণ্ডলীর গতি আপনা হইতেই স্থির হইয়া অনির্ব্বচনীয় পরমাশান্তি লাভ হইয়া থাকে।

একটি সহজ উপায়দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাইতেছি, কোন পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে দুইদিক্ হইতে জোয়ার ভাটাদ্বারা জল হ্রাস বৃদ্ধির সুযোগ থাকিলে, যেরূপ সেই পয়ঃপ্রণালীর মধ্যস্থলের জলের স্থৈর্য্য বা স্তম্ভনশক্তির উদয় হইয়া, উভয়দিকের জোয়ার ভাটার গতি বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, সেইরূপ প্রাণে অপান এবং অপানে প্রাণের হোমরূপ বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তির আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণে, প্রাণ-অপানের গতি রুদ্ধ হইয়া, স্বভাবতঃ কুম্ভকরূপে স্তম্ভবৃত্তি উৎপাদন পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করিয়া, মনপ্রাণের স্থিরতা সম্পাদন করে। যে ক্রিয়াযোগে এই অবস্থা উদয় হয়, তাহার নামই অন্তঃপ্রাণায়াম। এই কৌশলে সাধক ইচ্ছামাত্র প্রাণের সংযম করিয়া প্রাণ জয় করিতে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববর্ণিত বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামশক্তিবলে, ঈড়া, পিঙ্গলা প্রবাহী "হংসাখ্য" জীবনীশক্তিকে অপানাকর্ষণে নাভিমূল হইতে নিম্নোদর পথে ফিরাইয়া ব্রহ্মমার্গে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুব্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুব্ ও জগতী এই সপ্তচ্ছন্দে, আকর্ষণ, উদ্বোধন, পরিচালন, আবর্ত্তন, সংযমন, উত্তোলন, উন্নমন ইত্যাদি সপ্তমাত্রাস্বরূপ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব

এই সপ্তদেবতা শক্তি বিনিয়োগে, ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক ভেদ পূর্ব্বক প্রাণাত্মাকে "ব্রহ্মবিন্দুতে" স্থিত করার জন্যই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক সন্ধ্যোপাসনায় তিনবার ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে নাভি, হৃদি, মূর্দ্ধা, ত্রিস্থানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গাখ্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রগ্রন্থি ভেদ সুসম্পন্ন হইয়া, অভ্যাসযোগ পরিপক বা সিদ্ধ হয়। অপরন্তু ইত্যাকারভাবে তিনবার (১) ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান বা পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ দ্বারা দশটি প্রণব উদ্ধার হয়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।

"গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্।
ত্রিজপেৎ সদশোঙ্কারং প্রাণায়ামোঽয়মুচ্যতে॥"

সশিরস্ক ও সপ্তব্যাহৃতি সংযুক্ত দশটি প্রণববিশিষ্ট গায়ত্রী তিনবার সুষুম্নাপথে জপ করার নামই অন্তঃপ্রাণায়াম। (২) এই অন্তঃপ্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, অতঃপর আর কোন প্রকার ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানের বিশেষ

---

(১) ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হইলে দ্বিজ, বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইলে বিপ্র, রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে, ব্রহ্মবিন্দুতে স্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মণাখ্যা লাভ হয়।

(২) এবম্বিধ বৈদিক প্রাণায়ামের সহিত তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তন্ত্রোক্ত যোনিমুদ্রা সাধনে সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রাণায়ামানুষ্ঠান তান্ত্রিক সাধকগণের পক্ষে আদিষ্ট। যাঁহারা বৈদিক দীক্ষার অধিকারী নহেন, তাঁহারা গুরূপদিষ্টমতে যোনিমুদ্রা অভ্যাসরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম অনুশীলন করিবেন। এ সম্বন্ধে শিবসংহিতায় উক্ত আছে—

"আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥
ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামবন্ধুক সন্নিভম্।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্॥

আবশ্যক হয় না। তখন প্রাণায়ামের চতুর্থাবস্থা লাভ হয়। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন।—

"বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ"

প্রাণায়ামের চতুর্থ অবস্থায় বাহ্য-শ্বাস-প্রশ্বাসের কিম্বা অভ্যন্তরস্থ সংকল্পবৃত্তিগুলির উপর কোন শক্তি-প্রয়োগের আবশ্যক হয় না; তখন ইচ্ছামাত্র প্রাণকে বাহিরে বা ভিতরে প্রয়োগ করা যায়।

অস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তয়াপিহিতমাত্মানং একীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥
গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্॥
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারপ্রবর্ষিণম্।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্॥
পুনরেবাকুলং গচ্ছেন্মাত্রা যোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণ সমাখ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতে॥
পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মকম্।
যোনি মুদ্রাপরাহ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অগ্রে পূরক দ্বারা মনকে মূলাধারে স্থাপন পূর্ব্বক, গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যস্থলে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহা আকুঞ্চিত করিয়া, পরে যোগসাধন আরম্ভ করিতে হইবে। এই যোনিমণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলে। বন্ধুক-কুসুমতুল্য কন্দর্পবায়ু কোটি কোটি সূর্য্যবৎ তেজোবিশিষ্ট ও কোটি কোটি শশাঙ্কবৎ স্নিগ্ধ। ঐ কন্দর্পবায়ুর ঊর্দ্ধভাগে (মধ্যদেশে) সূক্ষ্মশিখা স্বরূপিণী চৈতন্যরূপা পরমা কলা (কুণ্ডলিনী) অধিষ্ঠিতা আছেন। সাধক এরূপ ধ্যানান্তে ভাবনা করিবেন যে, আত্মা সেই পরমা কলা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হইয়াছেন; আর মন, প্রাণ ও আত্মার সহিত একীভূত কুণ্ডলিনী যথাক্রমে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই লিঙ্গ-

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥"

পাতঞ্জল দর্শন ।

উক্তপ্রকার অন্তঃপ্রাণায়াম হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়, অর্থাৎ চিত্তে স্বভাবতঃই সমুদায় জ্ঞান বিদ্যমান আছে যে তাহা সত্ত্বগুণময়, কিন্তু রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা ঐ আবরণ দূরীভূত হয়। প্রাণাত্মাকে কন্দচক্র হইতে নিম্নোদরপথে ফিরাইয়া, ব্রহ্মমার্গে মূলাধারাদি মণিপুর (স্বর্লোক) পর্যন্ত ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ,—প্রাণায়ামের প্রথমাবস্থা। বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ—দ্বিতীয়াবস্থা। রুদ্র-গ্রন্থিভেদ—তৃতীয়াবস্থা। পুনঃ পুনঃ ঐ তিনপ্রকার ক্রিয়াযোগাভ্যাসে পরমাত্মা বা ব্রহ্মবিন্দুর প্রকাশাবরণ উন্মুক্ত হইলে, ইচ্ছামত উঁহাকে ব্রহ্ম-বিন্দুতে যুক্ত করাই, প্রাণায়ামের চতুর্থ বা সিদ্ধাবস্থা। তদবস্থাতেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় 'আত্ম-দর্শন' হয়।

ত্রয়ভেদ-পূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া, ব্রহ্মমার্গে গমন করিতেছে। এইরূপে যখন কুণ্ডলিনী অকুলে (সহস্রারে) উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি বিসর্গস্থ দিব্য কুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই কুলামৃত আনন্দময়, শুক্ল, লোহিতবর্ণ (সত্ত্ব-রজোময়) ও তেজঃ সম্পন্ন, ইহা হইতে সুধা বর্ষণ হইতেছে। কুণ্ডলিনী, এইরূপে কুলামৃত পান করিয়া পুনর্ব্বার কুলস্থলে (মূলাধারে) প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ সাধক পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া যোগানুশীলন করিবেন। এইভাবে কুণ্ডলিনী যখন সহস্রারে আগত হন, তখন মূলাধারাদি ষট্ চক্র বা ষট্ পদ্মস্থিত ছয় শিব—"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" অর্থাৎ মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপুরে রুদ্র বা কালাগ্নি, অনাহতে ঈশ্বর বা নারায়ণ, বিশুদ্ধে সদাশিব ও আজ্ঞাচক্রে পরশিব, এই ছয় দেবতা ও ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি, কুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হন। পুনর্ব্বার যখন তিনি মূলাধারে বা কুলস্থানে প্রতিগমন করেন, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর হইতে ঐ সকল দেবতা ও শক্তিগণ পুনরাবির্ভূত হইতে থাকেন।

"ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ ॥"

পাতঞ্জল দর্শন।

তখন ঐ আত্ম-দর্শন-যোগবলেই মন সর্ব্বপদার্থের ধারণা-যোগ্যশক্তি লাভ করে। আমাদের বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়াম মন্ত্রে ঐ অন্তঃপ্রাণায়ামের কৌশল, সূচিত থাকা সত্ত্বেও বাহ্যবায়ু পূরক, কুম্ভক, রেচকাদি দ্বারা মন্ত্রের বিপরীতভাবে অনেকেই চিরজীবন স্থূলদেহের ক্রিয়া স্বরূপে প্রাণায়ামের অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। ঐ বেদোক্তমন্ত্রে কিন্তু বহিঃপ্রাণায়ামের

এই অন্তঃপ্রাণায়াম সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, বৈদিক তান্ত্রিক উভয় প্রকার সাধককেই পুনঃ পুনঃ এই ক্রিয়াযোগানুশীলন করিতে হয়; তজ্জন্য বৈদিকী সন্ধ্যায়ও তিনবার প্রাণায়াম অনুশীলন বিধান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

প্রণবেন সুসংযুক্তাং ব্যাহৃতিভিশ্চ সংবৃতাম্।
গায়ত্রী বা জপেদ্বিপ্রঃ প্রাণসংযমনে ত্রয়ম্ ॥
পুনশ্চৈব ত্রিভিঃ কুর্য্যাৎ পুনশ্চৈব ত্রিসন্ধিষু।
স বৈদিকং জপেমন্ত্রং লৌকিকং ন কদাচন ॥

এ সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন।—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

উক্ত শ্লোক দ্বারা রূপকভাবে অন্তঃপ্রাণায়ামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন তান্ত্রিক সাধক, ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া, ঐ কুলামৃত পরিবর্ত্তে বিষতুল্য মদ্যপান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধকগণ মনে রাখিবেন যে, এই ক্রিয়াযোগ (যোনিমুদ্রা) সাধনই তন্ত্রোক্ত অন্তঃপ্রাণায়াম। এই অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাসে অনন্ত-শক্তি লাভ হয়। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই যোগাভ্যাসবলে যোগসিদ্ধি, মুদ্রাসিদ্ধি, বায়ুসিদ্ধি, বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়; এমন কি সাধক মৃত্যুঞ্জয়ী পর্য্যন্ত হইতে পারেন। সুতরাং বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগমধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অন্তঃপ্রাণায়াম সকলেরই কর্ত্তব্য।

ক্রিয়া উক্ত হয় নাই, কারণ ভূঃ বা পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে উহার ক্রিয়াযোগ আরম্ভ; পরন্তু ঐ প্রাণায়ামের পূর্ব্বমন্ত্রে অন্তরস্থ সপ্তব্যাহৃতি, সপ্তচ্ছন্দ, সপ্তদেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগ হয়, ইহা পরিষ্কার ভাবে উক্ত আছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রের ভাব ও ক্রিয়াযোগের কৌশল না বুঝিয়া প্রাণায়ামের পরিবর্ত্তে, অনেকেই অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ঘ্রাণপীড়ন বা নাসিকা মর্দ্দন, কেহ কেহ বা শুদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন দ্বারাই প্রাণযজ্ঞ পণ্ড করিতেছেন। এ জন্যই সাধক গাহিয়াছেন।—

গান।

বিষয়—প্রাণায়াম।

রাগিণী সুরট মল্লার তাল ঝাঁপ।

প্রাণায়াম হ'ত যদি, (শুধু) বায়ুরোধনের ফলে—
(তবে) ডুবরী কিম্বা ভেক জা'ত, (তারাও) যোগী হ'ত কোন কালে॥

(জে'ন) জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং, ন মৃতো জ্ঞানবান্ ভবেৎ,
জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাদ্, যোগকর্ম্ম ন জোরবলে—
তস্মাদজ্ঞাননাশায়, আত্ম-জ্ঞান কর আশ্রয়
(তবে) ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হবে প্রাণায়াম-বলে॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং, প্রাণেঽপানং তথা পরে,
প্রাণাপান গতিরোধ, প্রাণায়াম তারে বলে—
পৃথ্বী-জল-তেজস্তত্ত্ব, বায়ু, আকাশ (এই) পঞ্চতত্ত্ব,
(তুমি) সুষুম্নায় ক'রে একত্ব, (কর) "যোগকর্ম্ম সুকৌশলে"॥

চিত্তাদি-সর্ব্বভাবেষু, পরমাত্মা হি ভাবনাৎ,
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং, প্রাণায়াম (হয়) জ্ঞান-বলে—

(তার) পূরকভাব সোঽহমিতি, কুম্ভক পরমাত্মায় স্থিতি
নিষেধনং প্রপঞ্চস্ত, (তার) রেচকভাব জ্ঞানানিলে ॥

(হ'য়ে) নিরাশী সংযতচেতা, **আত্ম-জ্ঞান**-যোগবলে,
(কর) শারীরং কেবলং কর্ম্ম, প্রাণ রেখে (ঐ) আজ্ঞাদলে—
(সদ্) গুরুর কৃপায় বুঝে মর্ম্ম, কর প্রাণায়াম-কর্ম্ম
(তাই) **যোগেশ্বরীর** যা যোগকর্ম্ম, (সবই) গুরু-কৃপা-শক্তি-বলে ॥

যোগেশ্বরী সাধন-সঙ্গীত।

অতএব অন্তঃপ্রাণায়ামই প্রকৃত পক্ষে প্রাণায়ামপদবাচ্য। অন্তঃপ্রাণায়ামে দ্বারা ভূতশুদ্ধি (১) বা পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ হওয়ায় অনিত্য বস্তুতে নিত্য-ভাব-রূপ

ভূতশুদ্ধি-যোগ।

(১) অন্তঃপ্রাণায়াম ব্যতীত ভূতশুদ্ধি হয় না, বেদে তত্ত্বশোধনই ভূতশুদ্ধিস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে।—

"ওঁ ভূত শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা,
ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা,
ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা,
ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস,
জ্বল, জ্বল, প্রজ্বলয় প্রজ্বলয় সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥"

জীবাত্মাকে মূলাধার হইতে আজ্ঞাপদ্ম পর্য্যন্ত সুষুম্নাভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মমার্গে পরমাত্মায় যোগ করিতেছি। এই যোগকর্ম্মে বায়ুবীজ "যং" আমার লিঙ্গ শরীরকে শুষ্ককর শুষ্ককর, এবং হে তেজস্তত্ত্বস্থ বহ্নিবীজ "রং" সেই শুষ্ক শরীরকে দগ্ধকর দগ্ধকর; এই (অন্তঃপ্রাণায়ামরূপ) যোগ সাধনে হে পরমাত্মন্। সুষুম্নাপথে মূলাধার পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হও প্রকাশিত হও, জ্বলিতে থাক জ্বলিতে থাক, প্রজ্বলিত হও প্রজ্বলিত হও, অর্থাৎ তোমার পরমজ্যোতির্দ্বারা আমার ব্রহ্মমার্গ উদ্ভাসিত হউক। আমি ভেদবুদ্ধিবশতঃ মায়ামোহাচ্ছন্ন অন্ধকারে অনুলোমে "হংসঃ"

ভ্রান্তি পরিহার হইয়া, ইন্দ্রিয়-বিষয় প্রত্যাহারযোগে মনোময়কোষে, সূক্ষ্ম-দেহের জ্ঞান লাভ হয়। অন্তঃপ্রাণায়াম, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়-যোগে সাধিত হয় এবং তদবলম্বনে প্রাণাত্মার দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া আত্ম-দর্শন লাভ হয়।

বহিঃ-প্রাণায়াম-যোগ।

যে প্রাণায়ামে বাহ্যবায়ুর সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্বন্ধ থাকে তাহাকে বহিঃ-প্রাণায়াম-যোগ বলে। বহিঃপ্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুশুদ্ধি নাড়ীশুদ্ধি ও নৈরুজ্য ইত্যাদি সম্পাদন হয়। বহিঃপ্রাণায়াম সমনু অর্থাৎ বীজমন্ত্রযুক্ত হইলে, তাদৃশ (পূরক-কুম্ভকাদি) কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে প্রথমশিক্ষার্থিগণের বর্ণপরিচয় ও ফলা শিক্ষা বিধান হয় মাত্র অর্থাৎ আরম্ভ অবস্থা ও ঘটাবস্থার কার্য্য হয়। (১) বহিঃপ্রাণায়াম সম্পূর্ণরূপে ঈড়া, পিঙ্গলা বা স্থূলদেহের কার্য্য; কারণ, ইহা দ্বারা কতকগুলি মুদ্রাদি ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান হইয়া, শারীরিকধর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত হয় মাত্র। জ্ঞান ও ভক্তির সহিত উহার সম্বন্ধ অতি সামান্য।

জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইহা মন বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। সুতরাং মনঃস্থির না হইলে, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমভাব আসিতেই পারে না। অন্তঃপ্রাণায়াম-

---

ছিলাম। এক্ষণে অন্তঃপ্রাণায়ামানুষ্ঠানে (ত্বৎসঙ্গ, ত্বংযুক্তে) "সোঽহং" স্বরূপে "অহং ব্রহ্মাস্মি" হইলাম। মায়ামোহাচ্ছন্ন দেহ ও ভূত সমষ্টি তোমাতে লীন হইল। আত্ম-জ্ঞান-যোগে ইত্যাকার গাঢ় চিন্তাযুক্ত ভাবের নামই ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি দ্বারা অহং জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

(১) প্রাণায়ামের চারিটি অবস্থা।—

"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ॥"

শিব সংহিতা

আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয় অবস্থা ও নিষ্পত্ত্যাবস্থা, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বশেই জ্ঞান-ভক্ত্যাদির উৎকর্ষ সাধন হয়। বেদের যে প্রকার দুইটি কাণ্ড, জ্ঞান ও কর্ম্ম; দেহেরও সেইরূপ দুইটি কাণ্ড; জ্ঞান ও কর্ম্ম। জ্ঞানকাণ্ড স্থূলদৃষ্টিতে দেহের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মস্তক; কর্ম্মকাণ্ড কণ্ঠের নিম্নভাগ। মস্তকহীন হইলে, যেমন দেহের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, অর্থাৎ দেহ পরিচালন বা রক্ষা হয় না; জ্ঞানের অভাবেও তদ্রূপ কর্ম্ম পরিচালন বা রক্ষা হয় না। দেহমধ্যস্থ সুষুম্নাই জ্ঞানকাণ্ড, ঈড়া-পিঙ্গলা কর্ম্মকাণ্ড। আমাদের মস্তিষ্কই ঐ সুষুম্নার মূলপ্রান্ত, ঐ সুবিস্তৃত সুষুম্নার মূলপ্রান্ত বা মস্তিষ্কমধ্যে, জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বা কোটর আছে। প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসূত্র-যোগে, ঐ সকল বিভিন্ন মণ্ডলে সূক্ষ্মকম্পন প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, তরঙ্গায়িত করিতে পারিলে, ঐ বিভিন্ন মণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার গুণধর্ম্ম বা জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি ভাবগুলি বিকাশিত হয়। কর্ম্ম-কাণ্ডরূপ ঈড়া-পিঙ্গলার সহিত সেই মূল বা মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। তন্নিবন্ধন সুষুম্নামূল বা মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান, ঈড়া-পিঙ্গলা বা কর্ম্মকাণ্ডে পরোক্ষ-ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানতাযুক্ত ঈড়া-পিঙ্গলার কর্ম্ম, মস্তিষ্ক বা সুষুম্নামূলে সঞ্চারিত হইতে পারে না। এ নিমিত্ত অজ্ঞান-যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা কখনও জ্ঞান লাভ হয় না। তন্নিবন্ধন হংসাখ্য জীব, ঈড়া-পিঙ্গলা ক্ষেত্রে, আত্ম-জ্ঞান-ভ্রষ্ট হইয়া, বদ্ধভাবে বিচরণ করে। গুরুদত্তশক্তি, অন্তঃপ্রাণায়াম যোগে, সেই হংসকে ফিরাইয়া, যখন সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধগামী করেন, তখনই মানবের পক্ষে পুনর্জ্জন্মরূপ আত্ম-জ্ঞানাবস্থা সূচিত হয়। ইহার নামই উপনয়ন বা দীক্ষা সংস্কার। এই জন্যই অধিকারী ভেদে, উপনয়ন বা দীক্ষা সংস্কারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসন্তানগণেরও কোন দৈবকর্ম্মে অধিকার নাই, অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র উন্মীলন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কর্ম্মের অধিকারী নহেন। অন্তঃপ্রাণায়াম-যোগে সেই জ্ঞাননেত্র উন্মীলন হইলেই, তখন কর্ম্মের অধিকারী হয়। এজন্য শাস্ত্রসম্মতভাবে "আত্ম-দর্শন-যোগ" গ্রন্থে

কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পরন্তু এই প্রাণায়াম প্রকরণেও অন্তঃপ্রাণায়ামের কৌশলই, পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। উক্ত প্রকারে জ্ঞানানুশীলনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য বা উপনয়ন অথবা দীক্ষা সংস্কারে সুষুম্নাপথ উন্মুক্ত হইলেই মূলস্থ "ব্রহ্মবিন্দু" স্বরূপ আত্ম-দর্শন বা "আত্মসাক্ষাৎকার" হয়। তদবস্থায় সাধক বা যোগী "আত্ম-দর্শন"-যোগবলে অনন্ত জ্ঞান লাভ করিয়া, অনাসক্তভাবে দেহ বা সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। তখন বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত-জ্ঞান, স্বভাবতঃই উদয় হয়। এজন্য প্রথমেই ব্রহ্মবিন্দু ধারণোদ্দেশ্যে তান্ত্রিক দীক্ষা সংস্কারেও সর্ব্বাগ্রে মানসপূজারূপ অন্তঃকর্ম্মের পরে অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান লাভের পরে বাহ্যপূজার বিধান হইয়াছে এবং অদ্যাপিও সেই ভাবেই গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান বা গুরূপদেশ প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে, শাস্ত্রসম্মত সেই গুরুদত্ত উপদেশ উপেক্ষা করিয়াই আর্য্যসন্তানগণ বিপথগামী হইতেছে এবং আত্মা বা স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া একমাত্র বাহ্য বা পরধর্ম্মে মজিয়াছেন। এজন্যই গীতা বলিয়াছেন।—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

বহিঃপ্রাণায়াম বা বায়ুশোধন-প্রণালী আর্য্যসন্তানগণমাত্রেরই কিছু না কিছু শিক্ষা আছে। সুতরাং গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধিভয়ে বহিঃ-প্রাণায়ামে মাত্র বায়ুশোধন, নাড়ীশোধনাদি বিষয়ক, প্রধান প্রধান ক্রিয়া-যোগগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

বায়ুশুদ্ধি-যোগ।

"পদ্মাসনস্থিতোযোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ
বিজ্ঞাননাড়ী দ্বিতীয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ॥"

শিব সংহিতা

যোগশিক্ষায় প্রবৃত্ত সাধক, জনসঙ্গরহিত হইয়া, প্রথমতঃ পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অঙ্গুলী দ্বারা বিজ্ঞান-নাড়ীদ্বয় (নাসিকাদ্বয়) নিরোধপূর্ব্বক কুম্ভক অভ্যাস করিবে।

নাড়ীশুদ্ধি-যোগ।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।
দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্য্যাদাত্মমলচ্যুতিম্ ॥"

অমৃতবিন্দু উপনিষৎ

"ওম্" এই একাক্ষরই পরব্রহ্মস্বরূপ অতএব "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্মময় মন্ত্রদ্বারা পূরক, কুম্ভক, রেচক, করিবে। ইহার প্রণালী সম্বন্ধে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

"ঈড়য়াবায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্।
শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ ॥
ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃষষ্ঠ্যা চ মাত্রয়া।
উকারমূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ প্রণবং জপেৎ ॥
যাবদ্বা শক্যতে তাবদ্ ধারণং জপসংযুতম্।
পূরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতম্ ॥
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ ॥
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য মাত্রৈঃ ষোড়শভিস্তথা।
মকারমূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ সুসমাহিতঃ ॥
পূরিতং ধারয়েৎ প্রাণং প্রণবং বিংশতিদ্বয়ম্।
জপেদত্র স্মরন্ মূর্ত্তিং মকারাখ্যং মহেশ্বরম্ ॥

যাবদ্বা শক্যতে পশ্চাৎ রেচয়েদীড়য়ানিলম্।

এবমেনং পুনঃ কুর্য্যাদীড়য়া পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে ॥”

প্রথমে ঈড়ানাড়ী দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক, ষোড়শবার প্রণব জপ দ্বারা অকারাত্মক ব্রহ্মমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। উকারাত্মক বিষ্ণুমূর্ত্তি চিন্তায় চতুঃষষ্ঠীবার প্রণব জপ দ্বারা ঐ বায়ু ধারণ বা কুম্ভক করিবে। অনন্তর দ্বাত্রিংশদ্বার প্রণব জপ করিতে করিতে পিঙ্গলা দ্বারা ঐ বায়ু রেচন করিবে। এতদ্ দ্বারা একটি প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাবে মকারাত্মক শুক্লবর্ণ শিবমূর্ত্তি চিন্তা পূর্ব্বক পিঙ্গলা দ্বারা বিলোমক্রমে উক্ত সংখ্যক প্রণব জপ করিয়া পূরক, কুম্ভক, রেচক করিবে। তৎপর ঈড়া নাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পূরক, কুম্ভক, রেচকাদি ক্রমে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিবে। ইহা দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি হয়। বৈদিক দীক্ষায় অনধিকারী সাধকগণ, ভ্রূ-মধ্যে অমৃত-শ্রাবী জ্যোৎস্নারাজি-বিরাজিত চন্দ্রবিম্ব স্বরূপ ‘হং’ বীজ দর্শন করিতে করিতে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ ‘যং’ জপ করণান্তর পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় ঈড়াদি ক্রমে পূরক, কুম্ভক, রেচকাদি যোগে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিবে। এতদ্বারা স্বভাবতঃই মূলবন্ধ ও উড্ডান-বন্ধ-যোগ হইবে এবং নাভিমূলস্থ বহ্নিতত্ত্বে, পায়ুমূলস্থ পৃথ্বীতত্ত্ব সম্মীলিত হইবে। তখন মণিপুরস্থ বহ্নিবীজ ‘রং’ মন্ত্র জপ দ্বারা বিলোমক্রমে সূর্য্যনাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় পূরকাদিক্রমে প্রাণায়ামানুষ্ঠানান্তর চন্দ্র বীজ ‘ঠং’ ষোড়শবার জপ দ্বারা, চন্দ্রনাড়ীতে পূরক, বরুণবীজ ‘বং’ চতুঃষষ্ঠীবার জপে সুষুম্নায় কুম্ভক, অতঃপর নাসাগ্রদেশস্থ চন্দ্রবিম্ব হইতে অমৃত ধারা প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত নাড়ী বিধৌত হইতেছে, এরূপ ধারণা করিয়া পৃথ্বী বীজ ‘লং’ মন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপান্তে সূর্য্যনাড়ীতে রেচক করিবে, ইহাকেই নাড়ীশোধন বলে। তান্ত্রিক সাধকগণ গুরূপদেশ মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইষ্টমন্ত্র জপ দ্বারাও নাড়ীশুদ্ধি এবং প্রাণায়ামাভ্যাস

করিতে পারেন। ইহাই বহিঃপ্রাণায়ামের প্রণালী। বহিঃপ্রাণায়াম অনুষ্ঠানে অষ্টবিধ কুম্ভক শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ ॥"

সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী এই অষ্টপ্রকার কুম্ভক, শাস্ত্রে নির্দ্ধারণ আছে। উল্লিখিত প্রকার নাড়ীশোধনরূপ প্রাণায়ামে যে কুম্ভকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই সহিতাখ্য কুম্ভক (১) অতঃপর অন্যান্য কুম্ভকের কথা বলা যাইতেছে। কিন্তু এই সকল কুম্ভকানুষ্ঠানের পূর্ব্বে দেহরক্ষোপযোগী কতকগুলি ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠিত না হইলে, ক্ষয়-কাশাদি নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য অগ্রে দেহরক্ষার ক্রিয়া-কৌশল এখানে কথঞ্চিৎ বিবৃত করা একান্ত আবশ্যক। যোগশাস্ত্রে ইহা মুদ্রাযোগ নামে অভিহিত। উহার প্রধান প্রধান কয়েকটি এস্থলে বিবৃত করা যাইতেছে।

মহামুদ্রা-যোগ।

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্ ॥
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রারভেদ্বায়ুসাধনম্ ॥ শিবসংহিতা

(১) রেচ্য চাপূর্য্য যঃ কুর্য্যাৎ সবৈ সহিতকুম্ভকঃ।
সহিতং কেবলঞ্চাপি কুম্ভকং নিত্যমভ্যসেৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য

বায়ু পূরণ ও রেচন এই দুই ক্রিয়াদ্বারা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে "সহিত কুম্ভক" বলে। সহিত ও কেবল এই দুইপ্রকার কুম্ভক নিত্য অনুষ্ঠান করিবে।

গুরূপদেশানুসারে বামপদের গুল্‌ফ দ্বারা গুহ্যদেশ ও উপস্থের মধ্যস্থ যোনিমণ্ডল নিপীড়িত করিয়া, দক্ষিণপদ প্রসারণ পূর্ব্বক হস্ততলযুগলদ্বারা অঙ্গুলী সকলের অগ্রভাগ ধারণ করিবে এবং নবদ্বার সংযত করিয়া চিবুক হৃদয়ের উপর রাখিবে। এরূপাবস্থায় চিত্ত, ব্রহ্মমার্গে রাখিয়া, বায়ুসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মহামুদ্রা-যোগ-সাধন-সময় প্রথমে বামপদে যেরূপ করিবে অতঃপর দক্ষিণপদের দ্বারাও সেইরূপ এবং সমান সংখ্যক প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে। (এই ক্রিয়াযোগানুশীলনে গুরূপদেশ একান্ত আবশ্যক, উভয় হস্তে পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ-সময় উভয় হস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীদ্বারা জ্ঞানমুদ্রা যোগানুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরন্তু দক্ষিণপদ প্রসারণ-কালে বামপদতল উরুর বামপার্শ্বে সংযুক্ত রাখিতে হয়। পুনঃ বামপদ প্রসারণকালেও সেই নিয়ম জানিবে)।

মহাবন্ধ-যোগ

ততঃ প্রসারিতৌ পাদৌ বিন্যস্য তাবূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগম্‌॥
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম্‌।
বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌ চ যঃ সুধীঃ॥
প্রথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহামুদ্রাযোগ আশ্রয় করিয়া, সেই প্রসারিত পদ উরুস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক মূলাধার আকুঞ্চন দ্বারা অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া, নাভিপ্রদেশে সমানবায়ুর সহিত একত্র করিবে এবং ঐ সময় প্রাণ-বায়ুকেও অধোমুখ করিয়া ঐ নাভিদেশে আনয়ন করিবে। এই প্রকারে প্রাণ ও অপানকে নাভিমূলে সমানের সহিত বদ্ধ ও রুদ্ধ করার নাম

মহাবন্ধ-যোগ। এই ক্রিয়া-যোগানুশীলনে যোগীর নাড়ীপুঞ্জ হইতে রস সকল উর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং নাড়ীর মলসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সাধক, এক একপদে এক একবার মহামুদ্রা-যোগ অনুষ্ঠান করিয়া, তদনন্তর প্রসারিত পদ উরুর উপরিভাগে রাখিয়া এই "মহাবন্ধ-যোগ" সাধন করিবে। মহাবন্ধ-যোগ ভিন্ন মহামুদ্রাযোগের কোন ফল হয় না। মহাবন্ধ-যোগ দ্বারা বায়ু সুষুম্নামধ্যে গমন করে এবং শরীরের পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জর দৃঢ় করে।

মহাবেধ-যোগ।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা॥
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতো ময়া।
বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্না মার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থি ভিনত্ত্যসৌ॥

যোগী এই প্রকার প্রাণ ও অপানের যোগ করিয়া ঐ বায়ু দ্বারা উদর পরিপূর্ণ পূর্ব্বক মহাবেধ-যোগ আশ্রয় করিবে। (উদরের উভয় পার্শ্বে হস্তের যে কণুইস্থল সংলগ্ন আছে তদ্দ্বারা উদরের পার্শ্বদ্বয় ধীরে ধীরে ক্রমে সন্তাড়িত করিবে বা চাপদিবে, ইহারই নাম মহাবেধ-যোগ। এই মহাবেধ যোগাভ্যাসে বায়ুদ্বারা সুষুম্নাস্থ দুর্ভেদ্য ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইয়া থাকে এবং সদ্‌গুরুপদিষ্টভাবে ইহা দ্বারাই অন্য দুই গ্রন্থিভেদ হয় ও কুণ্ডলিনী সহস্রারে পরমশিবে লীন হন; কিন্তু উক্ত ক্রিয়াত্রয় যথাক্রমে সাধন ভিন্ন অন্য দুইটি বিফল হয়।

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্ যোগী প্রযত্নেন করোতি-ত্রিতয়ং ক্রমাৎ॥

মহাবেধ-যোগ ভিন্ন কেবলমাত্র মহামুদ্রা-যোগ ও মহাবন্ধ-যোগের অনুষ্ঠান বিফল হয়, এজন্য যোগী যথাক্রমে এই তিনটিই সাধন করিবেন। এজন্য ইহাকে বন্ধত্রয় বলে। ইহা বিধিমত সাধন করিলে, বৃদ্ধব্যক্তিও পুনর্যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং শরীর নৈরুজ্য ও মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে।

জালন্ধরবন্ধ-যোগ।

রুদ্ধ্বাগলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধোজালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্ল্লভঃ॥

কণ্ঠসঙ্কোচ দ্বারা গলদেশের শিরা সকল রোধ সহকারে, হৃদয়ে চিবুক স্থাপন করিতে হইবে; ইহাকে জালন্ধরবন্ধযোগ বলে। ইহা দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাণিগণের সহস্রার হইতে যে সুধা ক্ষরিত হয়, নাভিমণ্ডলস্থ অগ্নি তৎসমুদায় শোষণ করিয়া থাকে, "জালন্ধর-বন্ধযোগ" করিলে ঐ অগ্নি, তাহা আর শোষণ করিতে পারে না। সাধক নিজেই তখন ঐ সুধাপান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু বা অমরত্বও লাভ করিতে সমর্থ হন। (খেচরী-যোগ, সমাধি প্রকরণে দেখ।)

মূলবন্ধ-যোগ।

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতঃ।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমাচরেৎ॥
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ।
অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোত্যধিকল্পিতম্॥

সুসংযতচিত্তে পাদমূল (গুল্‌ফ) কর্ত্তৃক গুহ্যপ্রদেশে নিপীড়িত করিয়া শক্তিসহকারে অপানবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ইহার নামই "মূলবন্ধ-যোগ" এতদ্দ্বারা প্রাণ-অপানবায়ুর ঐক্য

বা সমতা হয় এবং জড়ামরণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সদ্‌গুরূপদেশ-মত ক্রিয়া অবলম্বন করিলে, এই মূলবন্ধ-যোগ দ্বারাই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হয়।

উড্ডানবন্ধ-যোগ।

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানোবন্ধ এব স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ॥

নাভির ঊর্দ্ধ ভাগ ও নিম্নভাগ পশ্চিমাতন করিবে, ইহাকেই উড্ডানবন্ধ-যোগ বলে। (এমন ভাবে পশ্চিমাতন করিবে যেন মেরুদণ্ডে উদরচর্ম্ম স্পৃষ্ট হয়। ইহা সর্ব্বকষ্ট প্রণাশন, ইহা দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি, বায়ুশুদ্ধি হয়; জঠরানল উদ্দীপিত হয়। প্রত্যহ চারিবার অনুষ্ঠানে ছয়মাসে যোগী উদর সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ নাশ করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরু সন্নিধানে এই সকল ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করা আবশ্যক)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে। (কেহ কেহ ইহাকে উড্ডীয়ান-বন্ধও বলেন।)

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্ যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ॥

শাম্ভবী-যোগ।

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।
সা ভবেচ্ছাম্ভবীমুদ্রা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা॥

ভ্রূযুগলের মধ্যেদেশে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া একান্তমনে ধ্যানযোগে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিবে। ইহার নাম "শম্ভবীমুদ্রা-যোগ" ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপনীয়। এতদনুষ্ঠানে সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন, মহেশ্বর ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং মহেশ্বরঃ"। এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ মুদ্রাযোগ আছে; আত্ম-দর্শনেচ্ছুক যোগীর পক্ষে তাহার বিশেষ আবশ্যক নাই। পঞ্চতত্ত্ব ধারণাদির বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত

হইয়াছে। বহিঃপ্রাণায়ামানুষ্ঠানে দেহরক্ষাদি জন্য যাহা অভ্যাস-প্রয়োজন হয়, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। পূর্ব্বে যে অষ্টপ্রকার কুম্ভকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভ্যাস জন্য সাধকের পক্ষে মুদ্রাযোগ বলম্বন আবশ্যক। উক্ত অষ্টপ্রকার কুম্ভকমধ্যে সহিতাখ্য কুম্ভকের বিবরণ নাড়ীশুদ্ধি উপলক্ষে বলা হইয়াছে, অধুনা "সূর্য্য-ভেদন" নামক কুম্ভকের বিষয় বলা যাইতেছে।

সূর্য্য-ভেদন-কুম্ভক-যোগ।

পূরয়েৎ সূর্য্যনাড্যাচ যথাশক্তি বহির্ম্মরুৎ।
ধারয়েদ্বহুযত্নেন কুম্ভকেন জলন্ধরৈঃ।
যাবৎ স্বেদং নখকেশাভ্যাং তাবৎ কুর্ব্বন্তু কুম্ভকম্॥

প্রথমে জালন্ধর-বন্ধ নামক মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়া, সূর্য্যনাড়ীতে বায়ু পূরণ করিবে এবং যাবৎ নখ ও কেশ হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত না হয়, তাবৎ কুম্ভকসহকারে বায়ু ধারণ করিবে। সূর্য্যভেদন সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

উজ্জায়ী-কুম্ভক-যোগ।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বায়ুবক্ত্রেণ ধারয়েৎ।
হৃদ্গলাভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ॥
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জালন্ধরং ততঃ।
আশক্তিকুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ॥

বহিঃস্থিত বায়ু নাসিকাযুগল দ্বারা এবং অন্তরস্থিত বায়ু, হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, মুখাভ্যন্তরে কুম্ভকযোগে ধারণ করিবে। অনন্তর বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ-যোগানুষ্ঠান করিবে। এইরূপে শক্ত্যানুযায়ী কুম্ভক করিয়া, নিরাপদে বায়ু ধারণ করিবে, ইহাকেই

"উজ্জায়ী-কুম্ভক-যোগ" বলে। এতদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়, ইহার প্রভাবে কফরোগ, দুষ্টবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাশ, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শীতলী-কুম্ভক-যোগ।

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ।
সর্ব্বদা সাধয়েদ্‌যোগী শীতলী কুম্ভকং শুভম্‌।
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব দেহে প্রজায়তে॥

জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জঠরাভ্যন্তরে বায়ু পরিপূরণ করিবে। অতঃপর কুম্ভকযোগে কিয়ৎকাল সেই বায়ু ধারণ করিয়া নাসিকা দ্বারা বিরেচন করিবে। ইহাকেই "শীতলী-কুম্ভক-যোগ" বলে। এতদ্দ্বারা বাত, পিত্ত ও কফরোগ নিশ্চয় ধ্বংস হয়।

ভস্ত্রিকা-কুম্ভক-যোগ।

ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ॥
এবং বিংশতি বারঞ্চ কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকম্‌।
তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্ব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি॥

কর্ম্মকারদিগের "ভস্ত্রিকাযন্ত্র" অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালনার্থ জাঁতা যেরূপ সমাকৃষ্ট হয়, সেইরূপ নাসিকাদ্বারা বায়ু সমাকর্ষণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উদরাভ্যন্তরে চালনা করিবে। এইরূপে বিংশতিবার বায়ু পরিচালনা করিয়া কুম্ভক-যোগে ধারণ করিবে, পরে ভস্ত্রিকা দ্বারা যে প্রকারে বায়ু বিনিঃসৃত হয়, সেইরূপ নাসিকাদ্বারা বায়ু বিনিষ্ক্রান্ত করিবে। ইহাকেই

"ভস্ত্রিকা-কুম্ভক-যোগ" বলে। ইহা যথাবিধি বারত্রয় অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্দ্বারা দেহ নীরোগ হয়।

ভ্রামরী-কুম্ভক-যোগ।

বেগাদ্দোষং পূরকং ভৃঙ্গনাদং,
ভৃঙ্গীনাদং রেচকং মন্দমন্দম্।
যোগীন্দ্রানামেবমভ্যাসযোগা
চ্চিত্তে জাতা কাচিদানন্দলীলা॥

মূলবন্ধ ও উড্ডানবন্ধবলে, প্রথমতঃ বেগসহকারে ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ শব্দে পূরক করিয়া যথাশক্তি কুম্ভক করিবে। পরে ভ্রমরীগুঞ্জন-ধ্বনিবৎ শব্দে ধীরে ধীরে রেচন করিবে। ইহার নাম ভ্রামরী-কুম্ভক। এতদভ্যাসযোগে যোগীন্দ্রবৃন্দের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় রসানন্দ-লীলা-সমাবেশ হয়। ইহার অনুশীলন প্রণালী সুবিস্তৃতভাবে সমাধিপ্রকরণে লিখিত হইবে।

মূর্চ্ছা-কুম্ভক-যোগ।

সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরম্।
সন্ত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখং প্রদা॥
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দো জায়তে ধ্রুবম্॥

প্রথমতঃ অক্লেশে পূর্ব্বকথিত বিধানে কুম্ভকের আচরণ করিয়া যাবতীয় বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। তৎপরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে চিত্তকে সংযোজিত করিয়া মনকে আত্মার সহিত লয় করিবে। ইহাকে "মূর্চ্ছা-কুম্ভক-যোগ বলে। অন্তঃপ্রাণায়াম সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মিলে মনোমূর্চ্ছা ও কেবলী কুম্ভক-যোগ সিদ্ধি হয় না।

কেবলী-কুম্ভক-যোগ।

কেবলী-কুম্ভকের ক্রিয়াকৌশল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (১)

উপরোক্ত প্রকার বহিঃপ্রাণায়ামানুষ্ঠানিক কুম্ভকগুলি অনুশীলনে স্থূল-দেহে নানা প্রকার গুণ-ধর্ম্ম-শক্তির হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা হয়, একজন্য বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, জ্ঞানী গুরুর আশ্রয় ভিন্ন কোন সাধক স্বেচ্ছাচারভাবে কার্য্য করিয়া, দেহ অকর্ম্মণ্য ও জীবনীশক্তি ক্ষয় না করেন। নূতন শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য এ স্থলে গুরুকৃপালব্ধ কতিপয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে প্রকটিত করা হইল।

সূর্য্যভেদন ও উজ্জায়ী কুম্ভক স্বভাবতঃ উষ্ণগুণ-প্রদায়ক বটে, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় আবার শৈত্যগুণযুক্তও হয়। শীতলী ও সীৎকারী কুম্ভক (২) স্বাভাবিক শৈত্যগুণ প্রদায়ক, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় উষ্ণগুণ প্রদায়ী হয়। কিন্তু ভস্ত্রিকা-কুম্ভক, বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ-হারক বিধায়, উহা সকল সময়েই, শীত-উষ্ণাদির সমতা স্থাপন করে। এজন্য ভস্ত্রিকাকুম্ভক-যোগ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকর। প্রাণায়াম অভ্যাসে কোন কোন অবস্থায় সাধকের দেহে নানাবিধগুণ-বৈষম্য উপস্থিত হইতে পারে। সেই অবস্থায় তিনি যেন সর্ব্বসুখদ ভস্ত্রিকা কুম্ভকের অনুষ্ঠান করেন। অপরন্তু ভস্ত্রিকাকুম্ভক-যোগবলে সর্ব্বনাড়ীগত জীবনীশক্তি একত্রযুক্তে, ব্রহ্মমার্গে সঞ্চালিত ও উর্দ্ধগামী হয়। সুতরাং গুরূপদিষ্ট আত্ম-জ্ঞানযোগে

---

(১) রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ সবৈ কেবলকুম্ভকঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য

রেচক ও পূরক ভিন্ন ধারণাযুক্ত যে কুম্ভক তাহাকে, কেবল-কুম্ভক-যোগ বলে।

(২) পরিশিষ্টখণ্ডে যোগবলে যৌবন লাভ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপায় দেখ।

দৈহিক ভোগ সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রাণায়ামানুষ্ঠান করিতে পারিলে, তাহা আত্ম-দর্শন-লাভের পক্ষে বিশিষ্ট সহায়ক হয়, কিন্তু শুধু বায়ুরোধনের ফলে আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ হয় না। আর্য্যসন্তানগণ ইহা সতত মনে রাখিবেন। এজন্য সাধক গাহিয়াছেন—

"প্রাণের সাধনে, নাশিলে অজ্ঞানে,
মিটিবে সকল আশা—
"শিবত্ব" লভিবে, "অমর" হইবে,
ঘুচিবে ভবে যাওয়া আসা ॥"

অতএব আত্ম-জ্ঞানযুক্ত একমাত্র প্রাণায়াম বা প্রাণের সাধনবলেই "আত্ম-দর্শন" লাভ হয়।

প্রত্যাহার-যোগে আত্ম-দর্শন।

প্রত্যাহার অষ্টাঙ্গযোগের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রত্যাহার সাধন সম্বন্ধে মন বা মনোময়কোষের কার্য্যই প্রবল। মন এবং মনের বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভাগবতে উক্ত আছে।—

"অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ"

অহংতত্ত্বের সত্ত্বগুণের যে বিকারাবস্থা তাহার নামই মন; আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি মনের ইচ্ছাজনিত ক্রিয়া প্রকাশের দ্বার মাত্র। মনের ইচ্ছা ভিন্ন উহারা কোন ক্রিয়াশক্তি পরিচালন করিতে সক্ষম নহে। মন যখন ইন্দ্রিয়যুক্ত থাকে, তখনই ইন্দ্রিয় সচেতন; আর যখন আত্মযুক্ত থাকে, তখন উহারা অচেতন বা জড় তুল্য। এজন্য আত্মযুক্ত ভাবটি মনের অন্তর্ম্মুখ, আর ইন্দ্রিয়যুক্ত অবস্থাটি বহির্ম্মুখ। মনের ঐ বহির্ম্মুখী ক্রিয়া বন্ধ করিয়া, আত্মমুখী করার উদ্দেশ্যই সর্ব্বপ্রকার সাধনার অনুষ্ঠান। সেই উদ্দেশ্য, যে ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, তাহার নামই প্রত্যাহার।

সাধক যদি মনকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৈরাগ্যে স্থিত রাখিবার জন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত করিয়া সমস্ত কর্ম্মে ঐ দৃঢ়ভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার মন ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। মনের এই দৃঢ়তাই কর্ম্ম বা যোগসিদ্ধির প্রধান শক্তি। এজন্য সাধক বলিয়াছেন।—

"সাধন ভজন যা কর ভাই। মনটি খাঁটি আগে চাই ॥
মনটি যাহার বশে রয়। (তার')—সকল সাধন সিদ্ধি হয় ॥
মনটি খাঁটি না হ'লে পরে। গোষ্পদে ডুবে সাধক মরে ॥"

যে সাধক মনকে দৃঢ় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। প্রত্যাহার তাঁহার করতলগত জানিবে। আর যাঁহারা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবলে মনকে দৃঢ় করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া যতই চিৎকার করুন এবং যতই বাহ্যিক সন্ধ্যা পূজার আড়ম্বর করুন না কেন, তাঁহারা, যে কর্ম্মানুষ্ঠানে যখন যে স্থানে গমন করুন্ না কেন, সেই স্থানেই বিষয়াসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান শুধু "বদ্ধ নৌকার দাঁড় টানা" মাত্র। মনের ঐকান্তিক দৃঢ়তার অভাবেই মানব-প্রকৃতি পশুত্বে পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বধর্ম্ম, সমস্বরে বলিতেছে যে, সর্ব্বাগ্রে মনকে দৃঢ় কর। ইহার উত্তরচ্ছলে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, মনকে দৃঢ় করিবার উপায় কি? মন সতত চঞ্চল, তাহাকে কিরূপে স্থির করা যায়? তাহাদের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে যে, বনের সিংহ, ব্যাঘ্রকে কি করিয়া বাধ্য করা যায়? চেষ্টা বা পুরুষকারই মনকে বশীভূত করিবার পক্ষে প্রধান আশ্রয়। মন যখন যে ইন্দ্রিয়-বিষয়-যুক্ত হইয়া, প্রবৃত্তি-মার্গগামী হইতে চেষ্টা করে, তখনই পুরুষকারবলে তাহাকে ফিরাইয়া, নিবৃত্তি-পথে আত্মযুক্ত রাখিতে তৎপর হইলে, বন্য সিংহ-ব্যাঘ্রের ন্যায় মনও নিশ্চয়ই

বশীভূত হইবে। এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় বলিয়াছেন।—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥" ৬ষ্ঠ অঃ

হে মহাবাহো! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়। সুতরাং প্রথমেই দেখা আবশ্যক যে, কর্ম্মযোগ কি? মনকে আত্মযুক্ত রাখিয়া, নিষ্কামভাবে যে কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানের নামই কর্ম্মযোগ। প্রবৃত্তি-মূলক-বাসনা-কামনা পরিহার ভিন্ন, কর্ম্মযোগ সাধন হয় না। কারণ তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে মন কখনই আত্ম-যোগ-যুক্ত হইতে পারে না। এ জন্যই ভগবান্ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের প্রথমে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সংযম দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনাশক কামরূপ শত্রুকে বিনাশের জন্য বলিয়াছেন যে,

"এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥"

এরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিরূপ আত্ম-যোগে, মনোরূপ আত্মাকে নিশ্চল অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর। সুতরাং দৈনন্দিনভাবে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তাহা নির্ব্বাহজন্য দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবশে এরূপ ভাবে মনকে দৃঢ় করা আবশ্যক—যে সকল কর্ম্ম, আত্ম বা ভগবদ্ভাবযুক্ত নহে, তাহা কখনই করিব না এবং মিথ্যাকথা, পরনিন্দা, পরস্বাপহরণ (অপহরণ বলিতে কেবলমাত্র টাকা কড়ি, জিনিষপত্রই নহে; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে অপরের নাম বা যশ নষ্ট করিতে কিম্বা অপরের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তিও পরস্বাপহারক বা চোর

বলিয়া গণ্য।) কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতা প্রণোদিতভাবে মন বা আত্মাকে কখনও অবনত করিব না। বহু বাক্য ব্যয় বা মনের স্থৈর্য্য-নষ্টকর কোন কর্ম্ম বা বৃথা আমোদ প্রমোদ উপভোগে, মনকে কখনও প্রশ্রয় দিব না। রসনা তৃপ্তির জন্য কোন খাদ্য আহার কিম্বা বিলাসিতার জন্য কোন বেশভূষা ধারণ করিব না; কাহারও কোন স্তুতি বাক্যে বা মায়া-মোহে কিম্বা নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হইয়া স্বধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না। যাহা আহার করি, তাহা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ভগবানে অর্পণ জ্ঞানে, পবিত্রভাবে ও পবিত্র বস্তুর দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিব। যাহা পরিধান করিতেছি, তাহা ভগবান্‌কেই পরিধান করাইতেছি; ইহাই সতত মনে রাখিতে হইবে। কারণ এই দেহের ভিতরেই তিনি বিদ্যমান আছেন। সুতরাং সমস্ত কর্ম্মই ত তাঁহার। তাঁহার মল মূত্রই ত্যাগ করাইতেছি; তাঁহাকেই স্নান করাইতেছি; তাঁহাকে শয়ন করাইতেছি; অথবা তাঁহার পদেই আত্ম-সমর্পণ করিতেছি। নিদ্রায় তাঁহার ভাবে সমাধিস্থ হইতেছি। এ প্রকার যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে যোগযুক্ত থাকিয়া করিতে পারিলেই "তৎকুরুস্ব মদর্পণং" ভাবে কর্ম্মযোগসাধন করা হয়। তদ্ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই কামনা পরিহার হইয়া বিষয়-বৈরাগ্য-উদয় ও দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া থাকে এবং মন-প্রাণ-স্থির ও শান্তভাব ধারণ করে। সহসা কোন কারণে মন চঞ্চল বা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতেছে, বুঝিতে পারিলেই, দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ পুরুষকার বলে, মনকে ফিরাইয়া আত্ম-যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।
মারুতস্য লয়ো নাথস্তন্নাথং লয়মাশ্রয়॥ বরাহোপনিষৎ

মনঃ ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, মনের নাথ বায়ু, বায়ুর নাথ লয়স্বরূপ আত্মা, সেই বায়ুর প্রভু লয়স্বরূপ "আত্মাকে" অবলম্বন কর। কিছু দিন এরূপ

অভ্যাস করিলে, মন আত্ম-রসাস্বাদনে একবার বিভোর হইয়া গেলে, আর সে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুসরণ জন্য চঞ্চল হইবে না। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহারপদ্যানুবাদ।—

"স্বভাব চঞ্চল মন অতীব অস্থির।
যে যে বিষয়েতে ধায় হইয়া অধীর॥
সে সব বিষয় হ'তে বলে ফিরাইয়া।
রাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া॥ ২৫
ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে ভুলিবে সংসার।
কিছুমাত্র চিন্তা যেন নাহি আসে আর ॥২৬

গীতা ৬ অঃ

বন্য-হস্তীকে খেদায় পুরিয়া একবার পোষ মানাইতে পারিলে, সে আর বনে যাইয়া বাস করিতে চায় না। হঠাৎ কোন সময়ে একটুকু উশৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিলেও, মাহুতের অঙ্কুশাঘাতে শাসিত হইয়া থাকে। মনকেও সেইরূপ ভাবে আয়ত্ত ও প্রত্যাহৃত করিতে চেষ্টা করিবে। এতাদৃশ চেষ্টার নামই প্রত্যাহার। অজ্ঞানিগণ প্রত্যাহারের মর্ম্ম না বুঝিয়া অহোরাত্রের অধিকাংশ সময় মনকে কামনা-বাসনা-যুক্ত নানা কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখিয়া, ক্ষণেককাল মাত্র তাদৃশ অস্থির, বা চঞ্চল মনে, বাহ্যপূজাদি দ্বারা, বিষয়-বৈরাগ্য লাভের দুরাশা করিয়া থাকেন; জল ও অগ্নির একত্র অবস্থান সম্ভব বটে, কিন্তু কামনা ও বৈরাগ্যের একত্র অবস্থান কদাচ সম্ভব নহে। সুতরাং আত্মজ্ঞানযুক্ত অভ্যাস-যোগে মনকে একাগ্র ভাবে আত্মযুক্ত করিতে পারিলেই "আত্ম-দর্শন-যোগে" মন তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, সতত আত্মানন্দে বিভোর থাকিবে। ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলিও মনকে বহির্ম্মুখে আকর্ষণ না করিয়া অন্তর্ম্মুখে তাহারই অনুসরণ করিতে

বাধ্য হইবে। ইহার নামই জ্ঞানযুক্ত প্রত্যাহার বা প্রকৃত প্রত্যাহার। ঈদৃশ প্রত্যাহারি-যোগেই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের উক্তির পদ্যানুবাদ।—

আত্ম-জ্ঞান সুবিচার সতত অভ্যাস যাঁর
"জীবন্মুক্ত" হওয়া তাঁর কঠিন ত নয়।
"আত্ম-জ্ঞান' অভ্যাসেতে, ফিরে আর এ জগতে,
আঁধার মায়ার মুখ দেখিতে না হয়॥"

অন্যান্য শাস্ত্রও এতাদৃশ প্রত্যাহারের কথাই বলিয়াছেন।

"স্ব স্ব বিষয় সম্প্রযোগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার,
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥"

পাতঞ্জলদর্শন

ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয় সম্ভোগের অভাবে, যে অবস্থায় চিত্তের অনুগত হয়, অর্থাৎ অনুকূলতা আচরণ করে, তাহাই প্রত্যাহার বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান-যোগে মনকে সংযত করিতে পারিলে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সহজেই মনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন বলেন।—

"ইন্দ্রিয়াণাং স্ব স্ব বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ॥"

ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ক্রমে মনের অভ্যন্তরে নিশ্চলভাবে স্থাপিত করার নাম প্রত্যাহার। এ সম্বন্ধে গোরক্ষসংহিতা বলেন।—

"চরতাং চক্ষুরাদীনাং বিষয়েভ্যো যথাক্রমম্।
যৎ প্রত্যাহরণঞ্চৈব প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥"

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, স্ব স্ব বিষয়ে যথাক্রমে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থিরভাবে রাখাকে প্রত্যাহার বলে। এ সম্বন্ধে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা. মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছেন।—

"কর্ম্মাণি যানি নিত্যানি বিহিতানি শরীরিণাম্।
তেষামাত্মন্যনুষ্ঠানং মনসা যদ্ বহির্ব্বিনা॥"

যে সকল কার্য্য আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, বাহ্য-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, সেই সন্ধ্যোপাসনাদির মনে মনে অনুষ্ঠান করার নামও প্রত্যাহার। এবম্বিধ "প্রত্যাহার-যোগে" মানসিক শক্তির উন্নতি বিধানের চেষ্টাই আত্ম-দর্শন-যোগের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকার প্রত্যাহারের বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মনের একাগ্রতা ও স্থিতি স্থাপকতাই সকল কর্ম্মের মূল। মনোযোগ ভিন্ন বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠান ভূতের বেগার খাটা মাত্র। তাহা কদাচ সিদ্ধিদায়ক হয় না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রকৃতভাবে সন্ধ্যা-বন্দনায় মন যোগযুক্ত হয় না। এ জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—গুরুমুখে প্রথমেই আত্মজ্ঞান শ্রবণ করিতে হইবে, তৎপরেই মনন; এই মনন অর্থই মনের দৃঢ়তা সম্পাদন। মন দৃঢ় বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত হইলে অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হয়। সুতরাং কর্ম্মের মূল ধরিতে চেষ্টা করিলে, মনকেই সর্ব্বাগ্রে ধরিতে হইবে। একমাত্র মনের শক্তির দ্বারাই আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন।—

"মনস্থং মনোমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জ্জিতং।
মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগিনঃ॥"

যিনি মন ও মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন এবং যিনি মনস্থ হইয়াও মনের সংকল্প বিকল্পাদি-ধর্ম্মরহিত, যোগিগণ, পরমাত্মরূপী ঈশ্বরকে সেই

মন দ্বারা মনোমধ্যে দর্শন করিয়া, সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনের সাহায্য বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মনের দোষেই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। অতএব মনকে সর্ব্বদা বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য। একমাত্র মনের স্থিরতা দ্বারাই প্রত্যাহার এবং প্রত্যাহার বলেই আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ হয়। পরন্তু অভ্যাসই তাহার একমাত্র উপায়। অভ্যাস সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের উক্তির পদ্যানুবাদ—

"এক কার্য্য বার বার, অভ্যাস নামটি তার,
অভ্যাসই পুরুষার্থ বন্ধু-পিতা-মাতা।
অভ্যাস পুরুষকার, জীবের সর্ব্বস্ব সার,
"অভ্যাসই" সর্ব্বসিদ্ধি, সুখ-মোক্ষ-দাতা॥"

আত্মদর্শন যোগ

চতুর্থস্তর।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকরণ।

-:*:-

ধারণা-যোগে-আত্ম-দর্শন

ধারণা মানব জীবনের সর্ব্বপ্রধান উন্নতির একমাত্র পন্থা। পরিদৃশ্যমান জগতে মানববুদ্ধির দ্বারা যতপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে, ধারণাই তাহার মূল সূত্র। ঐ যে কুম্ভকার হাঁড়ি বা নানাপ্রকার মেটে পুতুল প্রস্তুত করিতেছে, ঐ যে স্বর্ণকার নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, ঐ যে সূপকার মহানসে নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। পরন্তু উহাদের এক এক শ্রেণীমধ্যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির একই প্রকার কর্ম্মের মধ্যেও ধারণার দৃঢ়তা ও গাঢ়ত্ব অনুসারে কর্ম্মের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জাতি যত উচ্চ ধারণাশীল, সেই জাতির জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম্মকরীশক্তি তত উন্নত। ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজনীতি সবক্ষেত্রেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে আর্য্যদেশ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের উন্নতিতে এক সময়ে ত্রিজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, উচ্চতর ধারণাশক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। আজ যে পাশ্চাত্য জাতি

আধুনিক যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানব জগৎকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছে, ঐ যে সাব্‌মেরিণ্‌, জ্যাপ্‌লীন্‌, এরোপ্লেনের নাম শুনিতেছ, বিগত ইউরোপের মহাযুদ্ধে, জার্ম্মণশক্তি যে কামানের সাহায্যে ১০ মন ওজনের গোলা ৭৫ মাইল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বহু নিরীহ জীবকুলের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, ঐ যে বৃটিশজাতি তাহাদের রাজনীতি-বুদ্ধি-কৌশলে প্রবল পরাক্রম সেই জার্ম্মণশক্তিকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র মানবজাতির উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসী হইয়াছে, তৎসমস্তই ধারণাশক্তির বিজয় ঘোষণা বুঝিতে হইবে। ধারণা ভিন্ন ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কোনক্ষেত্রেই মনে প্রতিযোগিতা বা বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির উদ্রেক ও তাহা দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয় না। তন্নিবন্ধন বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানেরও স্ফুরণ হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মের উন্নতির পরিবর্ত্তে, অবনতিই সূচিত হইতে থাকে। সংসারে যতপ্রকার দুর্ব্বলতার কারণ আছে, তন্মধ্যে ধারণাশক্তির ন্যূনতাই মানসিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। বর্ত্তমানে আর্য্যসন্তানগণ সেই মানসিক দুর্ব্বলতার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। শক্তি সামর্থ্য, অন্তরে নিহিত থাকা সত্ত্বেও, একমাত্র ধারণাশক্তির অভাবে আত্মজ্ঞান বা আত্ম-অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হইতেছে না। একমাত্র ধারণাশক্তির অভাবেই পুরুষকার বা সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "দৈব দৈব" বলিয়া চিৎকার করিয়া, হতাশবাণী প্রচার দ্বারা সমাজে আরও দুর্ব্বলতা সঞ্চার করিতেছে এবং কাপুরুষতাকে আশ্রয় করিয়া অবনতির চরম সীমায় নিপতিত হইতেছে। ঐ দৈব কথাটি যে কি, বোধহয় তাহাও একবার সুচিন্তিত ভাবে ধারণা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। কাপুরুষতার কুহকে ভুলিয়া ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—দৈব, যাহারা ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন তাঁহারাও বলেন—দৈব, যাঁহারা বৈশ্য বা বৈশ্যত্বের দাবী করিতেছেন তাঁহারাও বলেন—দৈব, আর

শূদ্র এবং তদিতরদিগের ত' কথাই নাই। দৈবই যদি সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা হয়, তবে প্রাক্তন বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল বা ইহজন্মের কর্ম্মফলের কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং এস্থলে শাস্ত্রবাক্যেরও অলীকতা প্রতিপাদন করা হয়। পরন্তু যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই দৈব শব্দবাচ্য হয়, তাহা হইলেও এজন্মের কর্ম্মশক্তির দ্বারা, সেই দৈবকে যে আয়ত্ত বা অতিক্রম করা যায়, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা দৈবকে শ্রেষ্ঠ না ভাবিয়া, দৃঢ়ভাবে সাধনা বা চেষ্টারূপ পুরুষকার আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক যে কোনপন্থা অবলম্বনে তাঁহারা অভীষ্ট, সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতমপুত্র শতানন্দ দৈবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পুরুষকার বা স্বীয় সাধন বলে একটা যুগ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। বিনা সাধনায় দৈব আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করে নাই। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু, মহিষাসুর প্রভৃতি রাক্ষস ও অসুরগণ, সাধনবলে দৈবকে বশীভূত করিয়া, ইচ্ছামত শক্তি লাভ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র সাধনবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। রত্নাকর সাধনবলে বাল্মীকিমুনি হইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণকে কোন দেবতা দয়া বা অনুগ্রহ করিয়া যোগিঋষি করেন নাই। সকলেই স্বীয় স্বীয় ধারণানুযায়ী সাধনা বা পুরুষাকার বলেই, আত্ম-শক্তি অর্জ্জন করিয়া ত্রিদিব পূজিত হইয়াছেন। দৃঢ় ধারণাযুক্ত পুরুষকারের অপ্রতিহত শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই ভগবান্ বশিষ্ঠ, শ্রীরামচন্দ্রকে স্পষ্ট বলিয়াছেন "দৈব" কাপুরুষের উক্তি। ধারণাহীন মূর্খেরাই দৈবজ্ঞানে অবিদ্যা বা কাপুরুষতাকে আশ্রয়

করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ধারণা বিশুদ্ধ ও দৃঢ় হইলে, পুরুষকারবলে অনায়াসে দৈবকে অতিক্রম করা যায় ও প্রভূত শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। ধারণাযুক্ত পুরুষকার বা সাধনবলেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। (আস্তিক্য-যোগের ৩০৯ ও ৩১০ পৃষ্ঠা দেখ।)

ধারণা শব্দের অর্থ—কোন একটি বিষয় বা বস্তুর উপর দৃঢ় বা সুনিশ্চিত ভাবে, একাগ্রতা স্থাপনের নাম ধারণা। আলোচ্য প্রবন্ধে ধারণা, যোগানুশীলনের একটি অঙ্গ বিশেষ; এক্ষেত্রে ধারণা অর্থ;—আত্মাতে দৃঢ়ভাবে চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন করা। সুতরাং ধারণা বুঝিতে হইলেই চিত্তের একাগ্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চিত্তের একাগ্রতা ভিন্ন ধারণা কখনও স্থিতি লাভ করিতে পারে না এবং কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভও হয় না। সন্ধ্যা-পূজা করিতে বসিয়া যদি বাজারের জিনিষের দর বা টাকা পয়সার হিসাব মনে উদয় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেরূপ সন্ধ্যা পূজাদ্বারা কোন কার্য্যই হয় নাই। অমনোযোগসহকারে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ বা কতকগুলি পুষ্প-দূর্ব্বা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে মাত্র। সুতরাং এই চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণ জন্য, শাস্ত্রসম্মতভাবে কোন একটি দেবমূর্ত্তিকে ইষ্টভাবে ধারণা-যোগে, সেই ধ্যান, সেই জ্ঞানভাবে, একটি পদার্থের উপর চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করিয়া যাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়, সন্ধ্যাপূজা তাহারই অনুশীলন মাত্র। কিন্তু আত্মজ্ঞানের অভাবে মানব কামনা-বাসনায় অভিভূত হইয়া, গুরুদত্ত সাধনা বা ইষ্টদেবের প্রতি লক্ষভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং নিরন্তর ভেদজ্ঞানে বহুমূর্ত্তির তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করায়, সে মহদুদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। যতদিন পুনরায় একমাত্র ইষ্ট বা উপাস্যদেবের উপর চিত্ত অর্পিত না হইবে, ততদিন ঐ প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠানদ্বারা কিছুতেই চিত্তের একাগ্রতা সাধন বা কোন একটি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইবে না। পক্ষান্তরে চিত্তবিক্ষেপজনিত

মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তদবস্থায় যোগের পরিবর্ত্তে বিয়োগ, বা চিত্তের বিভাগই সাধিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াও অধিকাংশেরই সেই কর্ম্ম-জনিত, জ্ঞান-বৈরাগ্য বা ঐ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন উচ্চতর ধারণা বদ্ধমূল না হওয়া প্রযুক্ত, শম-দম গুণও আয়ত্ত হইতেছে না। তাদৃশ দুর্ব্বল ধারণাবশেই যোগিঋষির বংশধরগণ আজ আত্মবিস্মৃত; আত্মাবস্থা পর্য্যালোচনা করাও আজকাল যেন তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের মনে ক্রমেই আত্ম-অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে। তন্নিবন্ধন নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও তাঁহাদের অধ্যবসায় বা পুরুষকার উদ্বুদ্ধ হইতেছে না। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অবনতির ইহাই একমাত্র কারণ। ধারণাশক্তির অভাবে ছেলে-বেলার পুতুল-খেলার ন্যায়, তাঁহারা কখন এটা, কখন ওটা লইয়া খেলা করিতেছেন মাত্র। আত্ম-বিশ্বাস, হীনহওয়ায় কোন বিষয়ের উপর একাগ্রতা বা দৃঢ় বিশ্বাস নাই॥

এ অবস্থায় ধারণা বা একাগ্রতা সিদ্ধি করিতে হইলে, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ভাবে কোন একটি বিষয় কিম্বা ইষ্ট বা উপাস্য দেবতার উপর দৃঢ়ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। তবেই ধারণা সিদ্ধ হইবে। অথবা চিত্তানন্দকর সৎ বা পবিত্র ভাবযুক্ত কোন একটি বিষয়ের উপর মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া একবারে তন্ময় হইতে হইবে। জীবনে যে কোন সময়, যে কোন কর্ম্মে বা স্বপ্নাবস্থায়ও যদি নির্ম্মল চিত্তপ্রসাদক কোন ভাবকে কেহ কখনও উপলব্ধি করিয়া থাক; যাহা স্মরণ হওয়া মাত্র বিমলানন্দে প্রাণ অভিভূত হয়, আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, তবে সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যমনে একমাত্র সেই বিষয়টি ধরিয়া রাখ। মহর্ষি পতঞ্জলি "যথাভিমত ধ্যানাদ্বা" এই সূত্রে, এবম্বিধ উপায়ও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম পন্থা বলিয়াছেন। অতীত শোক-দুঃখ-মায়া-মোহের কথা মনে

স্থান দেওয়া একেবারেই নিষেধ। কোন সামাজিক বা লৌকিকভাবে কোন দেহাত্মবোধীর সঙ্গ করা অথবা কোন উৎসবানন্দে অপর কোন চিত্ত-চাঞ্চল্যকর আমোদ প্রমোদে যোগদান করা, এ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

"স্ত্রী-ধনী-নাস্তিক-বৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥" ৬৩

নারদভক্তিসূত্র।

স্ত্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাব, ভাব প্রভৃতি বিষয়ক কোন কথা বা সঙ্গীতাদিও শ্রবণ করিবে না। এই সূত্র দ্বারা অসংযতচেতা নর-নারীর পক্ষে মাধুরী শ্রবণও নিষিদ্ধ। তদ্দ্বারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম ও বিসদ্ভাবের পরিবর্ত্তে অসদ্ভাব অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ধনবানের চরিত্র, নাস্তিকের চরিত্র, শত্রুর চরিত্র, অধার্ম্মিক লম্পট বা চাটুকার, ইহাদের চরিত্র শ্রবণেও পবিত্রতা নষ্ট বা উচ্চধারণার ব্যাঘাত উৎপাদিত হয়। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অপরের সহিত বাক্যালাপেও সংযত থাকিতে হইবে। এরূপ ভাবে একাগ্রতা অভ্যাসের প্রচেষ্টা দ্বারা ছয় মাস মধ্যে নিশ্চয়ই একাগ্রতাযুক্ত সিদ্ধি লাভ হয়। তখন ধর্ম্মকর্ম্ম যে কোন অনুষ্ঠানে ইচ্ছামাত্র চিত্ত একাগ্র হইবে। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ" পাতঞ্জলদর্শন

চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য আপনার অভীষ্টমত কোন একটি তত্ত্বাভ্যাস অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটিমাত্র বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, একাগ্রতা জন্মে এবং চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত হয়।

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥"

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারা অর্থাৎ যথানিয়মে পূরক, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়-বিষয়ের আকর্ষণে,

বহিঃস্থ বায়ুর ন্যায় দেহাভ্যন্তরে উনপঞ্চাশ প্রকার বায়ু, এক এক সময় এক এক ভাবে কুটিলগতিসম্পন্ন হইয়া, স্বীয় আধিপত্য বিস্তার জন্য কাম-ক্রোধাদি রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সাধক বা যোগী তাঁহার অন্তরস্থ চিত্তচঞ্চলকর, কন্দর্প ও ঝঞ্ঝাবাত অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-উদ্দীপক বায়ুগুলিকে অন্তঃপ্রাণায়াম ও শোধনাদি ক্রিয়া-কৌশলে একমাত্র প্রাণবায়ুতে পরিণত করিতে পারিলে, মনের একাগ্রতা ও ধারণা-শক্তি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু সন্নিধানে ঐ প্রাণায়াম শিক্ষা না করিয়া তাদৃশ কর্ম্মে ব্রতী হইলে, দৈহিক দুরারোগ্য পীড়াসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

তত্ত্বসাধন বা রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি দেহাভ্যন্তরে ধারণাভ্যাস দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সেইরূপ একাগ্রতা ও ধারণা-শক্তির বলে, ইচ্ছাশক্তিকে যথেচ্ছা পরিচালন পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধিকরা যাইতে পারে।

"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী ॥"

নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে, উত্তম গন্ধ, জিহ্বাগ্রে উত্তম রসাস্বাদন, তালুমধ্যে মনঃসংযোগের চেষ্টায় দিব্যরূপ দর্শন, জিহ্বা-মধ্যে স্পর্শজ্ঞান, জিহ্বামূলে শব্দজ্ঞান জন্মে। এতদ্ভিন্ন দেহস্থ পঞ্চতত্ত্বমধ্যে ক্রমশঃ চিত্তধারণ পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব-লয়-সাধন দ্বারা স্থূলদেহের অনুভূতি, লয় প্রাপ্ত হয়, (ইহার কৌশল প্রাণায়াম প্রকরণে বিবৃত করা হইয়াছে।) স্বীয়দেহস্থ বা পরদেহস্থ কোন ব্যাধির উপর চিত্ত ধারণ করিলে, সেই ব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। (কিন্তু অপরের শরীরের ব্যাধি অনেক সময় নিজশরীরে আবিষ্ট হইয়া গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।) মন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইলে, রজঃ, তমোভাব বিদূরিত হওয়ায় চিত্ত স্থির হয়। এই ভাবে চিত্তের একাগ্রতা সাধনের চেষ্টা করিলেই, ধারণাশক্তি

দৃঢ় ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন হইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞান-যোগে "অজপা" জপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পন্থা জানিবে। এরূপ ভাবে ধারণাশক্তি যখন গাঢ় হইতে থাকে, তখনই প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা আপনা হইতে উদয় হয়। তখন সাধক বা যোগী কোন অবস্থা দেখিয়াও দেখেন না, নিকটে কোন শব্দ বা বাক্যালাপ হইলে, তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় কোন শব্দ পরিগ্রহ করে না। এই ভাবে আহার-বিহারাদি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার অপরিগ্রহ অবস্থা আগত হয়। কারণ আত্ম-দর্শন-যোগে সাধকের চিত্ত আত্মায় সমাহিত থাকা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্রিয়াশীল হইলেও পরিগ্রহ অবস্থা থাকে না।

ধারণা-সাধন সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়গুলির সহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের কতদূর ঐক্য আছে, তাহাও দেখা উচিত। ধারণা সম্বন্ধে বেদান্ত-সারে উক্ত আছে।—

"অদ্বিতীয়বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা ॥"

অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয়স্বরূপ মনকে সুস্থিরভাবে রাখার নাম ধারণা। গোরক্ষসংহিতা বলেন—

"হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
মনসো নিশ্চলত্বেন ধারণেত্যভিধীয়তে ॥"

হৃদয়স্থ পঞ্চভূতের স্থানে তাহাদিগের অধিষ্ঠানরূপ প্রত্যগাত্মাতে মনকে সংযুক্ত রাখার নাম ধারণা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥"

শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ পুরুষেরা বলেন যে, যমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে যে মনকে স্থির করিয়া রাখা, তাহাকেই ধারণা বলে।

"ধারণাঃ পঞ্চধা প্রোক্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ পৃথক্ শৃণু।
ভূমিরাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ এব চ ॥"

ধারণা পঞ্চবিধ, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গুণ শ্রবণ কর। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ ক্রমান্বয়ে লয় করিয়া অর্থাৎ ক্ষিতি—জলে, জল—তেজে, তেজ—বায়ুতে, বায়ু—আকাশে ও সকলের অধিষ্ঠান, প্রত্যগাত্মাতে মনকে স্থির রাখার নাম 'ধারণা'। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন।—

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"

চিত্তকে দেশ বিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। অর্থাৎ গুহ্যদেশস্থ মূলাধারে বা পৃথ্বীমণ্ডলে, স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে) বা বরুণ-মণ্ডলে, মণিপুর বা নাভিদেশে তেজোমণ্ডলে, হৃদ্দেশে বা অনাহত বায়ুমণ্ডলে কণ্ঠদেশ বা বিশুদ্ধ আকাশমণ্ডলে অথবা নিজস্থান ভ্রূ-মধ্যদেশ আকাশচক্রে প্রাণময় ও মনোময়কোষের অভ্যন্তরে, সকলের অধিষ্ঠান একমাত্র প্রত্যগাত্মাতে মনকে স্থির করিয়া রাখার নাম ধারণা। সুতরাং শাস্ত্র বাক্য আলোচনায় দেখা যায়, এতৎ সমস্তই অন্তঃপ্রাণায়ামের অনুশীলন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। অন্তঃপ্রাণায়াম সম্বন্ধে "প্রাণায়াম-যোগে আত্ম-দর্শন" প্রকরণে বলা হইয়াছে।

"ধারণা-যোগ" সাধন সম্বন্ধে তত্ত্বসাধনাদি বা মনের একাগ্রতা সাধনার্থ পঞ্চতত্ত্বস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিত্ত ধারণ সম্বন্ধে উক্ত হইলেও, ধারণার মূলকেন্দ্র তপোলোক বা আজ্ঞাচক্র। ধারণা-যোগে ঐ তপোলোকে বা আজ্ঞাচক্রে চিত্ত স্থিত রাখিতে পারিলেই, তপস্যাদি সর্ব্ববিধ যোগ সিদ্ধ হয়। ইহা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন।—

"যানি যানীহ প্রোক্তানি পঞ্চপদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্‌জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি ॥" শিবসংহিতা

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চপদ্ম-বিজ্ঞানের যে ফল বা শক্তি, একমাত্র আজ্ঞাপদ্ম জ্ঞাত হইলেই, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থল যোগিদিগের পক্ষে বিশেষ ধারণা যোগ্য বলিয়া উক্ত আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতেও ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ ধারণ করিয়া সেই পরম পুরুষের ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়াছেন। তাহার পদ্যানুবাদ

"স্থির যোগবলে—সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি,
ভুরুদ্বয়-মধ্যস্থলে প্রাণ রক্ষা করি।
করেন কেবল ধ্যান, ভক্তিভরে যিনি,
সে দিব্য পুরুষোত্তমে প্রাপ্ত হন তিনি॥"

গীতা ৮।১০ অঃ

অতএব এ স্থলে ভুরুদ্বয়ের মধ্যস্থল আজ্ঞাদল বা তপোলোকের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক, কারণ আজ্ঞাপদ্ম ও ভ্রূমধ্য বুঝিতে, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সাধারণ লোকে গোলযোগ করিয়া ফেলেন অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র বুঝিতে ভুরুদ্বয়ের মধ্যস্থলই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সমস্ত চক্রই পৃষ্ঠবংশ-মধ্যগত সুষুম্নাভ্যন্তরে অবস্থিত। ভুরুদ্বয়ের ঠিক্ মধ্যস্থল হইতে ঐ পৃষ্ঠবংশ ভেদ করিয়া, একটি সূত্র পরিচালন কর এবং অপর একটি সূত্র উভয় কর্ণ কুহর ভেদ করিলে, ঐ উভয় সূত্রের ঠিক্ সংযোগস্থলে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ইহা শ্বেতবর্ণ দ্বিদল বিশিষ্ট। 'হ' ও 'ক্ষ' এই দুইটি বর্ণে সুশোভিত। অন্তরে এই চক্রে 'মহাকাল' নামে সিদ্ধ লিঙ্গ ও 'হাকিনী' নামে শক্তি আছেন।

"শরচ্চন্দ্রং নিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতম্।
পুমান্‌পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বানাবসীদতি॥" শিব সংহিতা

আজ্ঞাচক্রে শরচ্চন্দ্র সদৃশ ভাস্বর অক্ষরবীজ (প্রণব) দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ইনিই পরম পুরুষ। যিনি ইহা অবগত হন, তিনি শোক, তাপ কিছুতেই কাতর হন না। এই অক্ষরবীজ পরম তেজোময়, ইহার ধ্যান করিলে, অল্প আয়াসেই পরমসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে রুদ্রগ্রন্থি অধিষ্ঠিত। এই রুদ্রগ্রন্থিভেদ হইলেই, সাধক বিনাকষ্টে সহস্রারে বা সত্যলোকে উপনীত হইতে পারেন।

যোগসিদ্ধির পক্ষে তপোলোকের ন্যায় স্থান আর নাই। স্বর্গলোকবাসীর পক্ষেও ইহা দুর্লভ। তপোলোকই সাযুজ্য মুক্তিক্ষেত্র। মহাদেব বলিয়াছেন।

"সালোক্যং হি মহর্ল্লোকে সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যঞ্চ তপোলোকে নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধকে॥" শিব সংহিতা

মহর্ল্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য, তপোলোকে সাযুজ্য এবং তাহার ঊর্দ্ধে নির্ব্বাণ মুক্তি। এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তপোলোকে গতি প্রার্থনা করেন। এই তপোলোকের নামই বারাণসী পুরী। ইহা বরণা ও অসির সঙ্গমস্থল এবং ইহাই মুক্তত্রিবেণী নামে অভিহিত হয়।

"ঈড়া হি পিঙ্গলাখ্যাতা বরণাসীতিহোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ॥" শিব সংহিতা

ঈড়া নাড়ী 'বরণা' নদী নামে এবং পিঙ্গলানাড়ী 'অসী' নদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নাড়ীরূপা নদীদ্বয়মধ্যে বারাণসীধাম (কাশীধাম) ও বিশ্বনাথ শিব শোভমান আছেন। সাধক এই চক্র ধ্যান করিলেই, শিবত্ব লাভ করিতে পারেন। এ জন্যই কাশী সাযুজ্য মুক্তিক্ষেত্র, অর্থাৎ কাশীতে দেহত্যাগ বা সমাধিস্থ হইলে, জীব সাযুজ্য মুক্তিলাভে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। বারাণসী সম্বন্ধে উপনিষৎ বলিয়াছেন।

"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু—
রুদ্রস্তারকং ব্রহ্মব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতীভূত্বা
মোক্ষীভবতি, তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত,
অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চয়েৎ ॥" জাবালোপনিষৎ

বারাণসী ক্ষেত্র যে, অপরাপর স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এই স্থানে জীবমাত্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাকে জ্ঞান-উপদেশ প্রদান করেন। এই তারকব্রহ্ম নাম প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। অতএব অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রের সেবা করা কর্ত্তব্য, সে স্থান কখনই পরিত্যাগ করিবে না। সুতরাং এতদ্দ্বারা আজ্ঞাচক্ররূপ বারাণসী সেবা করার অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতিতেও উক্ত আছে—

"অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য
এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি।
স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ
য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥"

অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইব? তদ্বিষয় বর্ণনা করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। কেন না যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্ত স্থানেই তাঁহার অধিষ্ঠান। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে যে, বারাণসীক্ষেত্র তপোলোক। এস্থলে পরমাত্মার উপাসনা বা "আত্ম-দর্শন"ই কর্ম্ম। অতএব কাশীবাসিগণের

পক্ষে পরমাত্মারূপী একমাত্র বিশ্বনাথ দর্শনই কর্ত্তব্য স্বরূপে শাস্ত্র ব্যবস্থা। বিশ্বনাথ রূপহীন; দিব্যনেত্র বা অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং বারাণসী বা কাশীরূপ তপস্যাক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি বলে বিশ্বনাথরূপী পরমাত্মার দর্শনরূপ "আত্ম-দর্শন-যোগ" উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা এহেন মহাযোগক্ষেত্রে বহির্দৃষ্টিতে কামনা-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বহুমূর্ত্তির বাহ্যপূজায় নিরত থাকেন, তাঁহারা কি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, লক্ষ্য বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন না? অপরন্তু বিশ্বনাথের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, একাগ্রতা বা ধারণা যে কিরূপ সুদৃঢ়, সুধীগণই তাহা বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসন্তানগণের আত্ম-দর্শন-যোগের সহায়তায় তৎপুর হউন, তজ্জন্য এই "আত্ম-দর্শন-যোগ", আজ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

স্বধর্ম্ম পরায়ণ নরনারীবৃন্দ আত্ম-দর্শন-যোগে দেহ এবং বারাণসীক্ষেত্রের ক্ষেত্রতত্ত্ব অবগত হইয়া, যথাশাস্ত্রভাবে বারাণসীক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বিশ্বনাথরূপী পরমাত্মার সহিত, স্বীয় দেহক্ষেত্রের-আত্মারূপী ক্ষেত্রজ্ঞের লয় বা সাযুজ্য মুক্তির উদ্দেশ্য বিধানে দৃঢ় ধারণা সম্পন্ন হউন, তাহা হইলেই "আত্ম-দর্শন-যোগ" সফল হইবে।

এ ক্ষেত্রে সাধক বা যোগীর অন্তর্দৃষ্টি-নিবদ্ধ জন্য শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

"সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বরণায়াং নাশ্যাঞ্চমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন 'বরণা' ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন 'নাশী' ভবতীতি॥" জাবালোপনিষৎ

অত্রি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্ত স্থান কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বরণা ও নাশীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, বরণা ও নাশী কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহা সর্ব্ববিধ দোষ দূর করে

তাহাই বরণা, এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নষ্ট করিয়া দেয় তাহাকেই নাশী বলে। এই বরণা ও নাশী উভয়েরই সংযোগবলেই বারাণসী হইয়াছে, অর্থাৎ বরণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত বারাণসী কহে।

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে, অসি ও বরণা এই দুই মধ্যবর্ত্তী যে মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

প্রোক্ত অবিমুক্ত স্থানকে কেহ কেহ লৌকিক জগতের কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপে মনে করিয়া, তত্রত্য অধিবাসিগণকে বারাণসীর বহির্ভূত স্থলের প্রবৃজ্য বিধান অনুসারে কাম্যকর্ম্মাদিতে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। শাস্ত্রমর্ম্মমতে দেখা যায় তাহা ভ্রম পূর্ণ। কারণ অবিমুক্তক্ষেত্রে একমাত্র আত্মা-পরমাত্মার উপাসনাই অর্থাৎ বিশ্বনাথরূপ আত্ম-দর্শনই কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, অন্য কোন প্রকার কাম্য-কর্ম্মাদির ভাব নাই। শ্রুতি বাক্যানুসারে ইহার সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

"কতমঞ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ
স এষঃ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥" জাবালোপনিষৎ

লৌকিক ও পুরাণ অধিভূত অবিমুক্ত স্থান পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্ত স্থান বিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে অর্থাৎ বহির্জগতে যে যে অবিমুক্তস্থান কথিত আছে, তদ্ব্যতীত অবিমুক্তস্থান কি? ইহার উত্তর এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি তাহাকেই অবিমুক্তক্ষেত্র বলে। শাস্ত্রান্তরেও বর্ণিত আছে "ঈড়া ভোগবতী গঙ্গা" "পিঙ্গলা" "যমুনানদী।" যে ব্যক্তি এই দুয়ের অন্তরস্থ প্রয়াগস্থান বিদিত হইতে পারেন, সেই ব্যক্তিকে বেদবিৎ বলে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র, সুতরাং তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রুকুর মধ্যে উক্ত অবিমুক্তস্থান অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত ভ্রূ ও ঘ্রাণের সন্ধি স্থান অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সাধকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ করার কি কারণ আছে, তাহা প্রণিধান করা আবশ্যক। ইহা বুঝিতে হইলে, আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিবেণী সঙ্গমের ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আজ্ঞাপদ্মস্থ সুষুম্না হইতে ঈড়া নাড়ী প্রবাহিত হইয়া পরাবৃত্তভাবে বাম নাসা পুটে গমন করিয়াছে। ইহাই "বরণা" নদী নামে কথিত। ঐ প্রকার পিঙ্গলাও আজ্ঞাপদ্ম হইতে প্রবাহিত হইয়া আজ্ঞাপদ্মের বাম অংশ বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসা পুটে গমন করিয়াছে। ইহাই "অসি" নদী নামে অভিহিত। এই উভয় নাড়ী মধ্যে ঈড়া রজোগুণ ও পিঙ্গলা তমোগুণ বিশিষ্ট। উভয় নাড়ী পরাবৃত্ত ভাবে বাম ও দক্ষিণ নাসা পুটে গমন কালে পূর্ব্বোক্ত ভ্রূ-যুগল ও ঘ্রাণের সন্ধিস্থানে, পরস্পর মিলিত হইয়াছে। অপরন্তু যোগীর ধ্যান আশ্রয় স্বরূপ সুষুম্না, মস্তকের সহস্রদলকমল বা সত্যলোকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বা নির্গুণ "ব্রহ্ম-বিন্দু" হইতে বহির্গত হইয়া মস্তকের পশ্চাৎদেশ দিয়া আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আসিয়া দ্বিধারূপে বিভক্ত ভাবে, এক অংশ নিম্ন দিকে মূলাধার বা পৃথ্বীতত্ত্ব পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অপরাংশ প্রকৃতির সত্যাংশে আজ্ঞা-চক্র হইতে সম্মুখস্থ ললাট প্রদেশের অভ্যন্তর পথে, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া পূর্ব্বকথিত ভ্রূ ও ঘ্রাণ সন্ধিস্থ ঈড়া ও পিঙ্গলার সম্মিলন ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া, ঊর্দ্ধ দিকে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-বিন্দুর অপর প্রান্তে মিলিত হইয়াছে। ইহাই ভগবদ্গীতোক্ত "অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতা তস্য শাখা" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাচক্রের অধোভাগে মূলাধার পর্য্যন্ত বহু প্রশাখা যুক্ত নিম্ন শাখা এবং ঊর্দ্ধ দিকে মস্তকের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বকথিতমতে ব্রহ্ম-বিন্দুর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ শাখা। মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মবিন্দু বা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পরমাত্মার চৈতন্যাত্মক জ্ঞান-শক্তি এই আজ্ঞাচক্র হইতে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া, স্থূলদেহে প্রত্যাগত হয় বলিয়াই ইহার নাম আজ্ঞাচক্র বা মনশ্চক্র।

পরন্তু ললাটের নিম্ন প্রান্তে ভ্রূ-দ্বয় এবং ঘ্রাণের সন্ধিস্থলে ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না রূপী, তমোরজঃ সত্ত্ব বা ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির একত্র সঙ্গম স্থল এই ভ্রূ-মধ্য। এই স্থানে প্রবৃত্তি মূলক কাঁচা মন পাকা হইয়া আজ্ঞা চক্রস্থ পাকা মনের সহিত যুক্ত হয় বলিয়াই এই সন্ধিস্থলের অপর নাম "কূট"। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত অন্যান্য বিষয় পশ্চাৎ বিবৃত করা হইবে। যোগী বা সাধক এই ভ্রূ-মধ্যে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেই, মনের রজ-স্তমোগুণ সত্ত্বগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার ধারণা অচঞ্চল ও দৃঢ় হয়।

যোগী বা সাধকের প্রধান ধারণার বিষয় আজ্ঞাচক্র। অবলম্বন—ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না; কিন্তু সাধারণ লোকে পৃথ্বীতত্ত্ব বা মূলাধার-স্থল হইতেই ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার উদ্ভব কল্পনা করিয়া ঊর্দ্ধদিকে সহস্রদল বা সত্যলোক পর্য্যন্ত ইহার গতি কল্পনা করেন। এসম্বন্ধে আধুনিক অনেক গ্রন্থ প্রণেতাও সেই ভাবই বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা বড়ই ভ্রান্ত ধারণা; এই ধারণাবশেই জীব, সংসার ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হেতু দেহাত্মবোধী ভাবে ইন্দ্রিয় বৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। "আত্মদর্শন-যোগের" ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সত্যলোক বা সহস্রদল কমলস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বা "ব্রহ্ম-বিন্দুই" সুষুম্নার মূল। সুষুম্না সেই মূল দেশ হইতে বহির্গত হইয়া আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আসিয়া তমোরজোগুণের স্বরূপ ঈড়াপিঙ্গলা নামক দুইটি শাখা বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে সব্যাপসব্যভাবে অর্থাৎ বামে দক্ষিণে "কর্ম্মানুবন্ধিনী মনুষ্যলোকে" আরও বহুশাখা প্রশাখা প্রসারণ করিয়া মূলাধার বা পৃথ্বীতত্ত্ব পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত তত্ত্বে বা দেশবিশেষে চিত্তকে বিধৃত করিতে পারিলেই ধারণাযোগে, আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

আত্ম-দর্শন যোগ

চতুর্থ স্তর।

চতুস্ত্রিংশ প্রকরণ।

ধ্যান-যোগে আত্ম-দর্শন

ধ্যানের দ্বারা যে কত প্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। শিবস্বরূপ পরমাত্মা বা ইষ্টদেবের প্রতি ধারণা স্থির করিয়া, একান্ত মনে তাঁহার ধ্যান করিতে পারিলে, এই দেহেই ভগবৎ-বিভূতি ও তাঁহার প্রভূত শক্তি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিয়ৎ পরিমাণে তদীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও পুত্র কলত্রাদি সংসার-মায়ারূপ অজ্ঞানপাশ অনায়াসে ছিন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞান-জনিত-ক্লেশ-রাশি নিবারণের এবং জন্ম-জরা-মরণাদি সংসার-যাতনা-প্রশান্তির ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলনে তাহার পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া নিরন্তর তাহার চিন্তা বা ধ্যানে চিত্ত সংযম করিতে পারিলে, সাধক বা যোগী ইহকালে নিত্যশান্তি উপভোগ এবং দেহান্তরে দেবযানে তৎসকাশে গমন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হন; অতঃপর ঐশ্বর্য্য ভোগের তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে, পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মে লয় ও অনুপম আনন্দ প্রাপ্ত হন। অন্য কিছুতেই সেই সুখের অন্তরায় ঘটে না। ইহা ফলশ্রুতি বা কাল্পনিক বাক্যজাল নহে। ইহাই বেদান্তবাক্য।

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ" (শ্বেতাশ্বতর) অর্থাৎ আত্মধ্যান বা আত্মদর্শন পরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহ সংসারে জন্মমৃত্যুজরাদি ক্লেশ, শান্তিতে অতিক্রম করিয়া, দেহান্তে দেবযানপথে গমন পূর্ব্বক নিখিল বিশ্বের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, ভোগ ইচ্ছা নিবারণ হইলে, সেই পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত ও পূর্ণানন্দ লাভ করেন। সুতরাং তাহার উপায় স্বরূপ আত্ম-দর্শন-যোগ-লাভ-যোগ্য ধ্যানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিতে উক্ত আছে "অভেদ দর্শনং ধ্যানং" অর্থাৎ উপাস্য উপাসকের বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদদর্শনই ধ্যান। নচেৎ শিব বা ইষ্টদেবতার পূজা করিতে বসিয়া দুইহস্তে একটি পুষ্প লইয়া বিষয় বিক্ষিপ্তচিত্তে, উপাস্য দেবতার রূপ বর্ণনা সূচক একটা সংস্কৃত শ্লোক মৌখিক আবৃত্তি করিয়া নিজের মাথায় ও সম্মুখস্থ দেবমূর্ত্তির মস্তকে তাহা স্থাপন করিলে, তাদৃশ প্রকার "ফুল পড়া" কখনই ধ্যান বলিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ ঈদৃশ প্রকার অজ্ঞানযুক্ত "ধ্যান পাঠে", বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির লক্ষ লক্ষ বাহ্যপূজানুষ্ঠান দ্বারা চিরজীবনেও ধ্যানের উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এজন্যই পূর্ব্বে বাহ্যপূজাকে কঠিন বলা হইয়াছে। শিব বা ঈশ্বর পূজন, যোগের একটি অঙ্গ, বা যোগের নামান্তর মাত্র। অভ্যাসযোগে চিত্ত একাগ্রতার পক্ষে উহা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু আত্ম-জ্ঞান-যোগে মানস কর্ম্মানুশীলনে জ্ঞান পরিপক না হইলে, শুধু মৌখিক কতকগুলি শব্দমাত্র আবৃত্তি দ্বারা, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে। অনেকেই ধ্যানের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াশক্তি বুঝিতে না পারিয়া, কর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ ও কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে ধর্ম্মত্যাগী হওয়ায়, স্বধর্ম্মত্যাগীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অমূলক ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা নাশের জন্যই আত্ম-দর্শন-যোগের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

যে ব্যক্তি নাস্তিক ; তাহার ধারণা অপূর্ণ অর্থাৎ দৃঢ় নহে। তদ্ধেতু ধ্যানযোগে ইষ্টদেবতা বা আত্ম-দর্শন তাহার পক্ষে অসম্ভব। এক্ষেত্রে নাস্তিক ও আস্তিক বিচার করিতে হইলে, যাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই অর্থাৎ যিনি গুরূপদিষ্ট ভাবে পরমাত্মা বা ইষ্টদেবকে অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচরব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তিনিই নাস্তিক। কারণ ; আত্ম-জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহার আত্ম-বিশ্বাস নাই। যেহেতু ইষ্ট বা উপাস্য যে বিশ্বব্যাপী, এ ধারণা তাঁহার দৃঢ় থাকিলে, তিনি নিজে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাহিরের বস্তু নহেন, তখন তাঁহার উপাস্য বা ইষ্টদেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার ভিতরে আছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"স্বদেহে পূজয়েৎ দেবং নান্যদেহে কদাচন" অর্থাৎ নিজের দেহস্থ দেবতারই পূজা করিবে, অন্য দেবতার পূজা করিবে না। যদি সে বিশ্বাস থাকে, তবে নিজের ঘরে রত্ন আছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও সেই "আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা" অর্থাৎ নিজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান না করিয়া, যখন অন্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান, তখন তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধি বা মৌখিক নিশ্চয়তার, কোনই মূল্য নাই। সুতরাং তিনি আত্ম-"অবিশ্বাসী" ; যিনি আত্ম-অবিশ্বাসী তাঁহার ইষ্টদেবতার উপর কদাচ বিশ্বাস থাকিতে পারে না। তিনি অনায়াসে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে উপেক্ষা করিয়া অতি অপকৃষ্ট কামনা-বাসনা সংপূরণের জন্য, দেবতাজ্ঞানে যে কোন সাধারণ ভৌতিক পূজা করিতেও যখন কুণ্ঠিত হন না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার ইষ্টদেবের প্রতি অচল বিশ্বাস নাই। ইষ্টদেবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে নিশ্চয়ই গুরুর উপর বিশ্বাস নাই বুঝিতে হইবে। যাহার গুরুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহার গুরুদত্ত সন্ধ্যাপূজাদির ধারণা কখনও দৃঢ় হইতে পারে না। সুতরাং সন্ধ্যাপূজাদির অনুষ্ঠানে ধ্যানযোগের চেষ্টা এই সংসাররঙ্গভূমিতে

একটা অভিনয় মাত্রই হইয়া থাকে। অতএব যাঁহার আত্ম-বিশ্বাস নাই, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা নাস্তিক। ঈদৃশ আত্ম-অবিশ্বাসজনিত নাস্তিকতায় হিন্দুধর্ম্ম, বর্ত্তমানে রসাতলে যাইতেছে। এই আত্ম-অবিশ্বাসের ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই আত্ম-অবিশ্বাসের ফলেই সংযম ব্রহ্মচর্য্যের পুনরভ্যুদয় দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্ম-অবিশ্বাসের ফলেই স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধাও আজ কামনা-বাসনায় পরিণত হইতেছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান শ্রবণ-মননযুক্ত নিত্যকর্ম্ম বা অভ্যাসযোগে "অহংজ্ঞান" অর্থাৎ দেহাত্ম-ভ্রান্তিরূপ আত্ম-অবিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক আত্ম-বিশ্বাসযুক্ত দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে "সোঽহং" ভাবে ধারণাবদ্ধ হইয়া, ধ্যানযোগে অভেদ স্বরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ এবং সেই আত্ম-দর্শন-যোগে পুনঃ পুনঃ আত্ম-দর্শনের চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতপক্ষে ধ্যানের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয় বিষয় প্রত্যাহার করিয়া আত্মা বা ইষ্টদেবের প্রতি দৃঢ় ধারণাবশে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দর্শনের চেষ্টাই ধ্যান।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"

পাতঞ্জল দর্শন

যে ক্রিয়ার অনুশীলনে সেই "আত্ম-দর্শন"জনিত আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহাকে ধ্যান বলে। সুতরাং প্রত্যাহারযুক্ত ধারণাশক্তি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, সত্য-স্বরূপ উপাস্য বা ইষ্টদেবে যে একতানতা বা অভিনিবিষ্টতা বা একাগ্রতা, তাহার নামই ধ্যান। তদ্দ্বারাই নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই জ্ঞান-স্বরূপ দিব্যদৃষ্টি, অন্তর বাহ্য যে কোন পদার্থে একাগ্রতা সহকারে সংযোগ হওয়া মাত্রই, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। ঈদৃশ জ্ঞান সিদ্ধি লাভের চেষ্টাই ধ্যান। আপ্তবাক্য দ্বারাও ইহা সপ্রমাণিত—

"যদেব ধারণায়ামবলম্বনীকৃতং বস্তু তদাকারকারিতঃ
চিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তদা তদ্‌ধ্যানম্॥"

যোগদর্শন

ধারণা দ্বারা অবলম্বনীয় বস্তুবিশেষের জ্ঞান অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া, সেই বস্তুর স্বরূপতত্ত্বে চিত্তবৃত্তি নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলা হয়। সুতরাং উক্তপ্রকার প্রত্যাহার ও ধারণাযুক্ত ধ্যান সিদ্ধ না হইলে, আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, উপবাস, পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, প্রাণযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যযজ্ঞ ও তপস্যাদি যাবতীয় কর্ম্মমধ্যে কোনটিই সম্পন্ন হইতে পারে না। তাদৃশ ধ্যান-সিদ্ধি দ্বারাই অনিমা, লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। পরন্ত চতুর্দ্দশভুবনের যে কোন লোকের যে কোন তত্ত্ব অবগত হইতে কিম্বা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি জানিতে ইচ্ছা কর, ধ্যানসিদ্ধির আবশ্যক। কোন ব্যক্তির সম্বাদ বা তাহার হৃদয়ের ভাব কিম্বা যে কোন প্রাণীর ভিতরে কেহ প্রবেশ করিয়া, যে কোন তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা কর, ধ্যানসিদ্ধির আবশ্যক। অতীতস্মৃতি বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইলে, ধ্যান সিদ্ধিমাত্র সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। একমাত্র ধ্যানসিদ্ধি হইলেই, ইচ্ছাশক্তি বলশালী হইয়া থাকে। অবস্থায় যে কোন বস্তু বা পদার্থে দেবতা আকর্ষণের ইচ্ছামাত্রই দৈবশক্তি আবির্ভাব হয়। দেহের ভিতরে অন্য কোনও বল-বিক্রমশালী মনুষ্য কিম্বা পশুর বল আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা কর তাহাই আকর্ষিত হইবে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা স্থূলভাবে নশ্বর কোন বাহ্য-বিষয়ের জন্য ঐ অমূল্য শক্তি কদাচ অপচয় করিবেন না। ইহা বড়ই-প্রলোভনের জিনিষ। সাধক বা যোগিকে এই প্রলোভন দ্বারা, প্রকৃতি

নানাভাবে ভুলাইবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। সাধকের পক্ষে এই "ধ্যান-যোগ" পাশুপত অস্ত্র তুল্য। সুতরাং সাধক ধ্যান সিদ্ধি-বলে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া, সেই অবিনশ্বর বস্তু লাভ অর্থাৎ একমাত্র সেই "ব্রহ্মবিন্দু" বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কোন অনিত্য বস্তুর উপর কদাচ উহার প্রয়োগ করিবে না। তাহা হইলে, এই অস্ত্রের শক্তি অপচয় বা বৃথা ক্ষয় হইবে। বর্ণিত ভাবে সেই ব্রহ্মবস্তুকে সিদ্ধ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন।—

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥"

ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ

ওঁকার ধনুস্বরূপ, আত্মা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্মই সেই শরের একমাত্র লক্ষ্য। অপ্রমত্তভাবে সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেই, সেই শর ব্রহ্মবিন্দুরূপ লক্ষ্য পদার্থে বিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান সিদ্ধি পূর্ব্বক আত্মাকে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট করাইতে সমর্থ হইলেই, সেই আত্মাও তখনই ব্রহ্মময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার নামই "আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুঃ" অন্যথায় "আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" অর্থাৎ নশ্বর বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলেই, আত্মা আত্মার শত্রু হয়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আহার বিহারাদি হইতেও অতি প্রলোভনের জিনিব বিধায়, ইহার সাধন অবস্থা পঞ্চম স্তরে কথঞ্চিৎ ভাবে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা একাগ্রতার সহিত নিবিষ্ট মনে অর্থাৎ প্রত্যাহার, ও ধারণাযুক্ত ভাবে ধ্যানসিদ্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহারাই ঐ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন। মনে রাখিতে হইবে, সাধনাই সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। সাধনবলে লাভ না হয়, জগতে এমন কোন বিষয় নাই। সেই সাধনার মূল—চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়তা। প্রথম অবস্থায় গুরুভক্তি,

গুরুসেবা ও গুরুপ্রসন্নতা লাভের চেষ্টা; অপরন্তু ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রত্যাহার ও দৃঢ় ধারণা সম্পন্ন হইলেই, প্রকৃতভাবে ধ্যানের অধিকারী হওয়া যায়। চিত্ত নাশ বা চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তার নামই ধ্যান। এই ধ্যান, শাস্ত্রাদিতে দুই প্রকার বলিয়া কথিত। সগুণ ও নির্গুণ। এ সম্বন্ধে মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

"ধ্যানশ্চাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু।
সগুণং নির্গুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতম্॥"

চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তার নাম ধ্যান। এই ধ্যান সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার। সগুণ ধ্যান বহু প্রকার, তন্মধ্যে বেদজ্ঞগণ বেদোক্ত পঞ্চবিধ ধ্যানই উত্তম বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে ত্রিবিধ প্রকারই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধ্যান সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রে তিন প্রকারই উক্ত দেখা যায়।

"স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়স্তথা॥
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥"

স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ভেদে ধ্যান ত্রিবিধ—স্থূলধ্যান—ধাতু, পাষাণ ও মৃণ্ময়াদি সাকার মূর্ত্তি অবলম্বনে ইষ্টদেবতার যে চিন্তা বা তৎসম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথগ্ভাবে নাম ও বহিঃস্বরূপাদি ভাবনা করাকে স্থূলধ্যান বলে। ইহা পূর্ব্বেও বিবৃত করা হইয়াছে।

জ্যোতির্ধ্যান—তেজস্তত্ত্বের আশ্রয়ে প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ-শক্তি-প্রবাহে সুষুম্নাভ্যন্তরস্থ চিত্রাণিপথে জ্যোতির্ম্ময় ওঁকার স্বরূপে যিনি ঊর্দ্ধাধোভাবে বিস্তৃত আছেন; দেহের স্থান বিশেষে তাঁহার ঐ দিব্যজ্যোতির্ধারণা পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি দ্বারা তদাত্মভাবে চিন্তা করার নাম জ্যোতির্ধ্যান।

সূক্ষ্মধ্যান—বিন্দুময় পরব্রহ্মের অর্থাৎ অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্যোতির অন্তর্গত প্রকৃতি-পুরুষের যোগ বা মিলন-জনিত যে অব্যক্তভাব, তাহার চিন্তা করার নাম সূক্ষ্মধ্যান।

প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মধ্যানের অবস্থা মাদৃশ জনের পক্ষে ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। বড় বড় যোগিঋষিগণও তাহার সম্যক্ অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। সুতরাং আমি ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, যিনি জ্যোতির্ধ্যানে পরিপক্ক হইয়াছেন, জ্যোতির্ধ্যানে যাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই সূক্ষ্মধ্যানের অধিকারী তাঁহাকেও ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা সেই সূক্ষ্মধ্যানের উচ্চতম মধুর অবস্থা বুঝিতে হইবে। কারণ, সে আনন্দাবস্থা "যেন নিত্যই নূতন"। যাহা হউক ত্রিবিধ প্রকার ধ্যানের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ব্রত বা বিন্দুধারণে "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রকরণে দৃষ্টান্তস্বরূপ কতক আভাষ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত দেবতার ধ্যান, গায়ত্রী ও মন্ত্রমধ্যে ঐ ত্রিবিধ প্রকার ধ্যানের সমাবেশ আছে। স্থূলভাবে যিনি যে দেবতার উপাসকই হউন না কেন, স্থূলের পরে সকলকেই সেই এক জ্যোতির্ম্ময় জগতে পৌঁছিতে হইবে। সেই জ্যোতির্ম্ময় উচ্চ জগতে গমন করিলে, নিম্নজগতের স্থূল উপাস্য বা ধ্যেয় বস্তুগুলি, সকলেই এক বা সমানভাব বলিয়া জ্ঞানচক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তদবস্থায় সকলেরই ধ্যেয় বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা-জনিত ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। তখন সবই এক পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের জ্যোতিঃ বা জ্যোতিঃকণা বলিয়া জ্ঞান হয়। তদবস্থায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেই বিশ্বব্যাপ্ত অখণ্ডমণ্ডলাকার জ্যোতির্ব্রহ্মাণ্ডের, এক প্রান্তে, পুরুষ-প্রকৃতির ক্রিয়াজনিত স্থূল জগৎ; অপর প্রান্তে, প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-জনিত অভেদাত্মক অনন্ত-জ্যোতিঃ-শক্তি-সম্পন্ন, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মবিন্দু। তখন বুঝিতে পারিবে, ঐ ব্রহ্মবিন্দুই ব্রহ্ম-জগৎ, উহার

অন্তর্ভাগ—পরমব্রহ্ম, বহির্ভাগ—জ্যোতির্ব্রহ্ম, স্থূলভাগ—জীবব্রহ্ম। সবই এক ব্রহ্মময়। একমাত্র সেই নির্গুণ "সচ্চিদানন্দ" বিকাশ। তখনই সত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণের অবস্থা এবং ঐ ত্রিগুণের সমস্তই সত্বাত্মক জ্যোতিঃকণা ও ত্রিগুণাতীত বিন্দুই ত্রিগুণাত্মক মহাজ্যোতির্ম্ময়-শক্তিযুক্ত নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান হইবে। তখনই পুরুষ-প্রকৃতির পৃথকত্ব ও প্রকৃতি-পুরুষের অভেদাত্মক সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং আপনাতেই সেই প্রকৃতি-পুরুষের অভেদাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ "আত্ম-দর্শন" লাভ করিয়া সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, সেই প্রাণ, সেই আমি, আমি সেই ইত্যাকার অভেদজ্ঞানে বিগলিত হইয়া যাইবে। সেই অবস্থা ধ্যান করিয়াই সাধক গাহিয়াছেন।—

বিষয়—ধ্যান।

রাগিণী—সুরট মল্লার, তাল—ঝাঁপ।

(যাঁর) জ্যোতিতে যতীন্দ্র-জ্যোতিঃ (তাঁরে) দেখরে সহস্রদলে—
(সেই) জ্যোতির্ম্ময় প্রাণজ্যোতিঃ, (যে) জ্যোতিতে মন্‌প্রাণ ভুলে।

যদাদিত্যগতং তেজো, জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্,
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তাতে যে জ্যোতি উজ্জ্বলে—
(ঐ) নীরদ-নীহার-জ্যোতি (যাঁর) জ্যোতিতে যেথা পায় জ্যোতিঃ
হীরা মুক্তার জ্যোতির্বৃদ্ধি (হয়) আপনি সেই জ্যোতির বলে॥

অলৌকিক সেই জ্যোতীরাশি, যেন কোটি রবি শশী,
আলোকিছে দিবানিশি, সুনির্ম্মল (সেই) নভঃস্থলে—
যে যোগী সেই রূপ হেরে, (হয়) জীবন-মুক্ত ত্রিসংসারে
বাঁধিতে কি পারে তারে, লজ্জা-ভয়-কুল-শীলে॥

মায়ামোহ ঘুচে যায় তাঁর, ভয় ভাবনা থাকে না আর,
ভাবিয়ে সংসার অসার, ভাসে সে ভাব-হিল্লোলে—
(সদা) সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, সেই প্রাণ,
(জে'নে) সেই আমি, আমি সেই, (সে) সোঽহং ভাবে যায় গলে ॥

কঠোর তপস্যা ধ্যানে, শাস্ত্রপাঠ কি ধনদানে,
(ওরে) "সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং" দেখে নাই কেউ কোন কালে—
(হ'য়ে) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ,
(জীব) **আত্মজ্ঞান**-যোগে মজ', **যোগেশ্বরী** (ও) তাই বলে ॥

যোগেশ্বরী-সাধন-সঙ্গীত।

অতএব আত্মজ্ঞানযুক্ত ধ্যান ব্যতীত সেই পরমাত্মা বা ইষ্টদেবের স্বরূপত্ব বা স্বরূপতত্ত্ব লাভ করা যায় না। অপরন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্যোতিঃ ইহার কোন অবস্থারই, তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে— "সোঽহমস্মীতি যা বুদ্ধিঃ স চ ধ্যানে প্রশস্যতে" অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা বা ইষ্টদেব। এইরূপ অনুভব করাকে প্রশস্ত ধ্যান বলে। কোন দেবতার স্থূল ধ্যান করিতে হইলেও, তাহাকে আত্মস্বরূপ অভেদভাবে ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে, ব্রহ্মা উপদেশ করিয়াছেন।—

মর্ম্মস্থানানি নাড়ীনাং সংস্থানঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বায়ুনাং স্থানকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা কর্ম্মাত্মবেদনম্ ॥
এবং জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং সর্ব্বগং ব্যোমবদ্ দৃঢ়ম্।
অনন্তমচলং নিত্যমাদিমধ্যান্ত বর্জ্জিতম্।
স্থূলং সূক্ষ্মমনাকাশমসংস্পৃশ্যমচাক্ষুষম্।
ন রসং নচ গন্ধাখ্যমপ্রমেয়মনৌপমম্ ॥

আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণম্।
সর্ব্বাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্॥
অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিঃস্থং সর্ব্বতোমুখং।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃ পাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃ শিরঃ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ।
তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

সমস্ত মর্ম্মস্থান, ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান এবং বায়ু সকলের স্থান ও আত্মজ্ঞান যুক্ত কর্ম্মসকল, অনুষ্ঠান দ্বারা অবগত হইবে। আত্মাকে অবগত হইয়া যিনি, আত্মজ্ঞানযুক্ত আত্ম-দর্শন-যোগে জ্যোতির্ম্ময়, অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী আকাশ তুল্য দৃঢ়, অনন্ত, অচল, নিত্য, আদি-মধ্য-অন্তহীন, স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, অবকাশ রহিত, অসংস্পৃশ্য, চক্ষুর অগোচর, রস-গন্ধাদি বর্জ্জিত, অপ্রমেয়, উপমা রহিত, আনন্দস্বরূপ, জরাদিবিহীন সত্যস্বরূপ, সৎ ও অসৎ অখিলের কারণ, সকলের আধার স্বরূপ, বিশ্বরূপ, অবিনাশী, অজ, অব্যয়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, অন্তঃস্থিত, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বতোদৃষ্টি, সর্ব্বতঃপাদ, সর্ব্বতঃস্পর্শী, সর্ব্বতঃশির, যিনি পরব্রহ্ম, "আমি সেই ব্রহ্মময়", এইরূপ অনুভব করাকে, ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণ নির্গুণধ্যান বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিচরণশীল নিত্য ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারিণীগণের এই নির্গুণধ্যানই অনুষ্ঠেয়। এতদ্দ্বারাই সেই "ব্রহ্মবিন্দু"ধারণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। হিন্দুবিধবাগণের পক্ষে কাম্যকর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া মুক্তিপ্রদ তাদৃশ ধ্যান বা নিদিধ্যাসনের অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভক্তগণকে সেই পুরুষোত্তমেরই ধ্যান করিতে বলিয়াছেন।—(ভগবদ্গীতা ১৩ অধ্যা ১৩ হইতে ১৮ শ্লোক দেখ)

উপরোক্ত ভাবে নির্গুণব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, পূর্ব্ববর্ণিত জ্যোতির্ব্রহ্মেরই ধ্যান করিবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে,—

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে মনোর্দ্ধেচ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকম্।
ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেবহি॥"

ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যভাগে ও মনের ঊর্দ্ধভাগে যে ওঁকারময় শিখামালাযুক্ত জ্যোতিঃ বর্ত্তমান আছে, সেই জ্যোতিকেই ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান করিবে। ইহাকে তেজোধ্যান বা জ্যোতির্ধ্যান বলে। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং সর্ব্বকারণম্।
স্থাণুবন্মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং মধ্যদেহাৎ সমুত্থিতম্॥
জগৎকারণমব্যক্তং জ্বলন্তমমিতৌজসম্।
মনসালোক্য সোঽহং স্যামিত্যেতদ্ধ্যানমুত্তমম্॥"

যিনি দেহমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে দীপ্তি পাইতেছেন, সেই জগৎ কারণ, সর্ব্বকারণ, অব্যক্ত, অপরিমেততেজাঃ প্রদীপ্তশালী জ্যোতিঃ স্বরূপ অন্তরাত্মাকে মানস দ্বারা অবলোকন করিয়া অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোগে সেই "পরমাত্মাই আমি"; এরূপ নিদিধ্যাসন বা অনন্যমনে চিন্তা করাও উত্তম ধ্যান বলিয়া গণ্য হয়। অপরন্তু

"অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ম্।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে॥"

যাজ্ঞবল্ক্য

"আমি সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপ" ইত্যাকার ধ্যান করিবে। এইরূপে পরমাত্মার অনুভব করাকেও উত্তম সগুণ ধ্যান বলে। ভগবদ্গীতোক্ত "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয় প্রত্যাহার জনিত ভাবে মন হৃদয়ে

নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণাত্মাকে মূর্দ্ধ্নায় ধারণ পূর্ব্বক সদ্‌গুরূপদিষ্ট কৌশলযুক্ত ধ্যান যোগাবস্থায়, সেই একাক্ষর পরব্রহ্ম মন্ত্র অজপায় জপ করিতে করিতে প্রাণাত্মাকে প্রণবাকারে পরিণত করিয়া ইচ্ছামত স্থূলদেহের সহিত বিযুক্ত কিম্বা বিভক্তভাবে যদৃচ্ছা বিচরণ করা যাইতে পারে। ইত্যাকার ধ্যান-যোগে সেই জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মদেহের শক্তি, সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্যানাবস্থা সিদ্ধি লাভে এই দেহ পরিত্যাগ করাও যে, ক্রমে আয়ত্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। গুরুকৃপাবশে সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই ত্রিশক্তি একত্র হইলে. অসাধ্য সাধন হইতে পারে। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" এতৎ সম্বন্ধেও পঞ্চম-স্তরে বিবৃত করার চেষ্টা করিব।

সগুণ, নির্গুণ উভয়বিধ ধ্যানযোগেই প্রণব শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

> "প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণাময়তি নাময়তি বৈ তস্মাৎ
> প্রণবশ্চতুর্দ্ধাবস্থিতঃ ইতি বেদ-দেবযোনিঃ ধ্যেয়াশ্চেতি
> সন্ধর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখ-ভয়েভ্যঃ সন্তারয়তি ॥"
>
> শিখোপনিষৎ

ওঙ্কারের আর একটি নাম প্রণব। এই প্রণব সর্ব্বপ্রাণকে বিনম্র করে ও বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া রাখে। এই প্রণব চতুর্দ্ধা অবস্থিত এবং চারিবেদ ও দেবগণের উদ্ভব স্থান। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এই প্রণব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং সদ্‌গুরূপদেশমত ক্রিয়া-কৌশলে একমাত্র প্রণবের ধ্যানদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র-ধ্যানসিদ্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে যে—

> "কিমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যং কিং,
> তদ্ধ্যানং কো বা ধ্যাতা কশ্চিদ্ধ্যেয় ইতি ॥"
>
> শিখোপনিষৎ

যাবতীয় মন্ত্র ও সর্ব্ববেদের প্রথমে কাহার প্রয়োগ করিবে? ধ্যেয়মন্ত্র বা ধ্যানযোগ্য কি? এবং কি প্রকারে সেই ধ্যাতব্য মন্ত্রের ধ্যান করিতে হয়? সেই ধ্যানের অধিকারী কে? এবং সেই ধ্যানের ধ্যেয় পদার্থ কি? ও কোন দেবতা আমাদের প্রকৃত ধ্যেয়?

আস্যোত্তরমাহ "ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যম্।"

"ওম্" অক্ষরই সর্ব্বমন্ত্র-ব্রাহ্মণাদির দেবতা, "ওম্" অক্ষরই সর্ব্বমন্ত্র ও ধ্যানের প্রথমে প্রযুজ্য, ঐ "ওম্"ই প্রথম-প্রযুক্ত ধ্যানমন্ত্র ও ধ্যানের যোগ্য। সুতরাং ব্রাহ্মণ বা যোগীর পক্ষে এতৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। অপরন্তু—

"ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারো,
দেবাশ্চত্বারো বেদাশ্চত্বারঃ।" শিখোপনিষৎ

ওম্ এই অক্ষর ধ্যান করিবে, ইহা চতুষ্পাদ, অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ও গণদেবতাও চারিপ্রকার এবং ইহার বেদও চতুঃসংখ্য, ঋগাদি চারিবেদ "ওম্" অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। চতুষ্পাদ সম্পন্ন উক্ত ওঁকার এই অক্ষরই পরমব্রহ্ম, ইহার "অকার" প্রথম মাত্রা, পৃথ্বীলোক; ঋগ্বেদ, ব্রহ্মা গণদেব, অষ্টবসু ও গার্হপত্য অগ্নি, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (গার্হপত্য অগ্নির অপর নাম কোষ্ঠাগ্নি বসতি স্থান উদর, ভুক্তদ্রব্য পাক করে)।

উকার—দ্বিতীয় মাত্রা, অন্তরীক্ষ লোক, যজুর্ব্বেদ, বিষ্ণু গণদেবতা, একাদশরুদ্র ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ও অগ্নি দক্ষিণাগ্নি। (দক্ষিণাগ্নির অপর নাম জ্ঞানাগ্নি বসতিস্থান হৃদয়ে শুভাশুভ কর্ম্মের পরিজ্ঞান করে)।

মকার—তৃতীয়মাত্রা, স্বর্গলোক, সামবেদ, এবং রুদ্র গণদেবতা দ্বাদশ-আদিত্য ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহার ছন্দ, জগতী, অগ্নি, আহবনীয়।

(আহবনীয় অগ্নির অপর নাম দর্শনাগ্নি, ইহার বসতিস্থান মুখে, রূপ গ্রহণ করে সরস্বতী)।

লুপ্ত মকার—ইহার অবশিষ্ট চতুর্থমাত্রা, অথর্ব্ববেদ, ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ, গণদেবতা; সম্বর্ত্তক অগ্নি, ঋগাদি বেদচতুষ্টয়; ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বসু প্রভৃতি গণদেবতা সমস্তই একমাত্র পরমব্রহ্মস্বরূপ "ওম্" এই মন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারে প্রণব মাত্রার প্রত্যেকের দেবতা ও গণদেবতা ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। প্রণবের উপরস্থিত মাত্রা স্বপ্রকাশরূপিণী ও অতি মনোহর জ্যোতির্ম্ময়।

অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা লোহিতবর্ণ, দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ, তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপ শ্বেতবর্ণ, চতুর্থমাত্রা বিদ্যুৎপ্রায় দীপ্তিমতী সর্ব্ববর্ণশালিনী। ইহার দেবতা স্বয়ং ঈশ্বর। এই চতুর্মাত্রারূপী ওঙ্কার চতুষ্পাদ ও চতুঃশিরা। অকার, উকার, মকার, এবং নাদবিন্দু, এই চারিটি ওঙ্কারের চতুষ্পাদ। আর গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয় ও সম্বর্ত্তক এই অগ্নি চতুষ্টয় তাহার চতুর্মস্তক।

প্রণবের অর্দ্ধ: চতুর্থমাত্রা নাদবিন্দু লুপ্ত মকারস্বরূপ, উহার সূক্ষ্মরূপ পৃথক্, এবং অকার, উকার, মকার এই বর্ণ কূটস্বরূপ যে স্থূলরূপ, তাহা তিনভাগে বিভক্ত, যথা—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, সুতরাং প্রণবই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতস্বরস্বরূপ। এই ত্রিমাত্রার প্রথমমাত্রা অকার, দ্বিতীয়মাত্রা উকার, তৃতীয়মাত্রা মকার, ওঙ্কারের চতুর্থমাত্রা প্লুত স্বরূপ, সেই মাত্রা দ্বারাই ওঙ্কার প্রকাশিত আছে। সুতরাং এই ওঙ্কারই অনুপম মন্ত্র, ইহার উচ্চারণও অনুপম; এবং শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। (হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতস্বর উচ্চারণ পাণিনিকার কুক্কুটশব্দবৎ বলেন—কু—কূ—কূ!)

"স এব সর্ব্বান্ প্রাণান্ সকৃদুচ্চারিতমাত্রঃ,
স এব হ্যূর্দ্ধমুৎক্রাময়তীত্যোঙ্কারঃ ॥" শিখোপনিষৎ

যদি ওঙ্কার একমাত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে মন ও প্রাণ আপনা হইতে সুষুম্নাস্থিত গ্রন্থি সকল ভেদ করিয়া মূর্দ্ধা স্থানে গমন করিয়া থাকে। মন ঊর্দ্ধ প্রদেশে অর্থাৎ ভ্রূ-মধ্যে নীত হইলেই, নির্ব্বিষয় হয়। তখন চিত্ত কোন বিষয়াসক্ত না হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে। সুতরাং এই প্রণবের ধ্যান করা যোগীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনকে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, নির্ব্বিষয় বা স্থির হওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে যোগী বা সাধকের বিদিত থাকা আবশ্যক। নচেৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটু অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। আজ্ঞাচক্র ও ভ্রূ-মধ্য, ("ভ্রুবোর্ম্মধ্য") এই উভয় স্থলের বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রকরণে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থানে সে বিষয় আরও একটু বিশেষভাবে স্ফুরণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ণিত আজ্ঞাপদ্মের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ নাসিকামূলের ঈষদূর্দ্ধে ভ্রূ-যুগলের মধ্যভাগস্থ ললাটাভ্যন্তরে বিশুদ্ধজ্ঞান-জ্ঞেয় স্বরূপ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছে।

"তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধ্যান্তরাত্মা।
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণব বিরচনা রূপবর্ণঃ প্রকাশঃ॥
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসদ্ বিন্দুরূপী মকার
স্তদাদ্যে নাদোঽসৌ বলধবল সুধাধার সন্তানহাসী॥" ষট্‌চক্র

ঐ অন্তরাত্মা প্রদীপশিখা বিজলিত ওঙ্কার আকারে দিব্যজ্যোতির্ম্ময়। ঐ অন্তরাত্মার উপরিভাগে নাদশক্তিরূপা আধার অর্দ্ধচন্দ্রোপরি বিন্দুরূপী যে মকার সুশোভিত, ঐ মকারাত্মক বিন্দুর প্রান্তভাগে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমাসম নাদ শোভা পাইতেছে।

"ইহস্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতসি পুরং
নিরালম্বাং বদ্ধা পরমগুরুসেবাসুনিরতাং

সদাভ্যাসাদ্‌যোগী পরমসুহৃদাং পশ্যতি কলাং
ততস্তন্মধ্যাস্তঃ প্রবিলসিত রূপানপি সদা ॥"

ষট্‌চক্র

পরমগুরুসেবানিরত সাধক, যখন ঐ প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার পরমসুখময়স্থানে মন লয় করিতে পারেন, তখন গুরুপাদপদ্ম আরাধনার দ্বারা নিরলম্ব যোগ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই যোগ সম্বন্ধে শ্রুতিমূলক উপনিষদেও ব্যক্ত আছে। এই নিরালম্ব যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক, আত্মার দিব্যজ্যোতিঃকলা দর্শন করিয়া ঐ জ্যোতির্ম্মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও ধ্যানানুরূপ দেবতাদি দর্শন পূর্ব্বক আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদ ও তন্ত্রকে পৃথগ্‌ জ্ঞানে উপাস্য উপাসনা সম্বন্ধে সাধারণে ভেদবুদ্ধি প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা পরিহারার্থ এস্থলে শিববাক্য-স্বরূপ তন্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে, মূল উপাস্য বিষয় ও উপাসনা-প্রণালীমধ্যে তন্ত্র ও বেদে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পক্ষান্তরে মূলতঃ ভাবে প্রণবের উপাসনাই সর্ব্বসম্মত। সাধক আত্ম-জ্ঞান-যোগে দেহাত্মবোধ বিদূরিত করিতে পারিলেই, উপাস্য দেবতারও নাম-রূপ অন্তর্হিত হইয়া নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ, অনন্তজ্যোতির্বিশিষ্ট "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" প্রণবাকারে দিব্যনেত্রে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিবে। ধ্যানযোগে ঈদৃশ প্রকার ভেদজ্ঞান রহিত পরমাত্মার উপলব্ধির চেষ্টাই আত্ম-দর্শন-যোগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাগুক্ত নিরালম্বমুদ্রা ও জ্যোতির্দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরেও উল্লেখ আছে—

"করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্ ॥"

শিবসংহিতা ৫ম পটল

যোগী ব্যক্তি রসনাকে বিপরীত গামী করিয়া লম্বীকার অর্থাৎ আল্‌জিহ্বার উর্দ্ধস্থিত (গর্ত্তে) তালু কুহরে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক, ঐ স্থানে জিহ্বা স্থিরতর রাখিয়া ধ্যান করিতে থাকিবেন। উক্ত ধ্যানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ॥"

সাধক শিবনেত্র হইয়া ললাটাভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত বিবিধ প্রকার দিব্যজ্যোতির্ম্ময় অন্তরাত্মাকে ধ্যান করিলে, বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হয়। এতদ্ভিন্ন ভ্রূ-মধ্যেও এক প্রকার আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, "ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" উল্লিখিত ভাবে ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে তদ্দ্বারাও এক প্রকার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তদ্ভিন্ন হৃদয়ে এমন কি সর্ব্বাবয়বেও জ্যোতিঃ দর্শন হইতে পারে; ইহাও এক প্রকার যোগ। এই সকল যাবতীয় বিষয়েই সদ্‌গুরুর কৃপাপূর্ণ উপদেশ আবশ্যক; অন্যথায় দৈহিক নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে।

মনঃ সংযোগ ভিন্ন কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। আমাদের সাধনাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মই মনোজয় উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে মনোজয়ের চেষ্টা আবশ্যক ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং মনকে জয় করিতে হইলে মনস্তত্ত্বে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ বায়ুনিরোধাদি দ্বারা মনকে জয় করিতে বলেন, কিন্তু অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মদ্বারা কখনও সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। "বায়োরগ্রে বসেন্মনঃ" বায়ুর অগ্রে যে মনের গতি, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। এজন্য আমি মনোজয় করণার্থ বায়ুসাধনের পন্থা, সহায়ক ভিন্ন বিধায়ক বলিয়া কখনও স্বীকার করি নাই। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিযুক্ত "আত্ম-জ্ঞান"ই "আত্ম-দর্শন-যোগে"র পথপ্রদর্শক।—(এই পথপ্রদর্শকের সহিত যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেই ৺কাশীধাম

আত্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভার উদ্ভব)। শ্রবণ দ্বারা মনকে গঠিত করিয়া মনের দৃঢ়তা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। "আত্ম-দর্শন-যোগ" প্রকরণে ইহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। মনকে ঊর্দ্ধগামী করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে। পরন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মনঃসংযম ভিন্ন প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং মনস্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মজ্ঞান বলে মনকে ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিতেও ইহা উক্ত আছে—

"যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি'
অথ সমভ্যসেন্নিত্যং সম্মার্গগমনায়বৈ ॥"

অমৃতবিন্দু উপনিষৎ

যোগাভ্যাস দ্বারা মন স্বয়ং গন্তব্য স্থানের পন্থা স্থির করে, প্রাণ মনের সহায়তায় যে যে স্থানে গমন করিতে পারে, তত্তৎ স্থানের ভাবনাই মূলা-ধারাদিতে প্রাণের ব্রহ্মরন্ধ্র-প্রবেশের উপায়। সুতরাং নিরন্তর প্রাণের সম্যক গমনার্থ অর্থাৎ সুষুম্না মুখে প্রবেশার্থ মনের ধারণা ও ধ্যানাদি যোগাভ্যাস করিবে। এই প্রকার যোগাভ্যাস ভিন্ন কি প্রকারে প্রাণের গমন হয়, কেহ তাহা অবগত হইতে সমর্থ নহে। যোগনিরত হইয়া উহার অন্বেষণ করিলেই, সত্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। কূটস্থে কাঁচা মনকে পাকা করিয়া মনের অবস্থিতিক্ষেত্র আজ্ঞাপদ্মে আত্ম-দৃষ্টি-যুক্ত করিতে পারিলেই, আত্মদর্শন লাভ হয়। গুরূপদিষ্ট অভ্যাসযোগে ভ্রূ-দ্বয়মধ্য বা ললাটস্থ ইন্দ্রিয়গত মনকে আজ্ঞাপদ্মস্থ অতীন্দ্রিয় মনে লয় করিতে পারিলেই কাঁচা মন পাকা হইয়া অত্যদ্ভুত অলৌকিক শক্তি জন্মিয়া থাকে। ঐ মন তখন দশ ইন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ দ্বারের কোন সহায়তা ভিন্ন সমস্ত কার্য্য আত্ম-শক্তিবলে করিতে সমর্থ হয়। তখন ইন্দ্রিয়াদি ও সমস্ত ষড়রিপুসহ যাবতীয় প্রকৃতি তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া পরিচালিত হয়। এতাদৃশ অতীন্দ্রিয়

থাকা মনই সাধনার পক্ষে উপযোগী। ললাটস্থ ইন্দ্রিয়গত মন সাধনার পক্ষে উপযোগী নহে। সাধারণতঃ জড়বিজ্ঞান বলে ঐ ইন্দ্রিয়গত মনের উপর পার্থিবশক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক কিছু কালের জন্য মনের ক্রিয়া স্থগিত করিয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন এবং সেই প্রকারে কেহ কেহ ভৌতিক দেবমূর্ত্তি পর্য্যন্ত দর্শন করাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তৎসমস্তই ভূয়া বাজি মাত্র। গিল্টি করা অলঙ্কার পরিধানে দুই চারি দিনের জন্য দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা, রূপব্যবসায়ীদের পক্ষেই সম্ভব এবং তাদৃশ সৌন্দর্য্যে, রূপজ-মোহাভিভূত একমাত্র কৃষ্ণ বিদ্বেষী "কৃষ্ণাত্মজ"-সেবিগণই, পতঙ্গাদিরন্যায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার পরিণাম অনুতাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনের মূলশক্তি আজ্ঞাপথে অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে মন ঈড়াপিঙ্গলার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গত উপাধি লইয়া ললাটে "ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটেস্তু নাসিকায়াস্তু মূলতঃ" অর্থাৎ নাসিকা মূলের ঊর্দ্ধে ও ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থ ললাটে আসিয়া কার্য্য করে। সাধারণ অবস্থায় আমরা সেই মনেরই সন্ধান পাইয়া থাকি। স্থূল-বিষয়াসক্ত বহির্মুখগামী পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক এই মন পরিচালিত হয়, এজন্য উহাকে ইন্দ্রিয়গত মন বলে; আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত মূল মনঃ শক্তিকে অতীন্দ্রিয় মন বলে। ভূত প্রপঞ্চের সংযোগ হেতু ললাটস্থ মন স্থূলাতীত সূক্ষ্ম বিষয় কদাচ ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য, সে সতত দৈহিক-সুখ-ভোগে আসক্ত থাকে। প্রত্যাহার ধারণা-যুক্ত ধ্যান বলে ঐ বিষয়াসক্ত ললাটস্থ মনের বিষয়-নৈর্ম্মল্য-দূরীভূত করিয়া তাহাকে আজ্ঞাপদ্মস্থ অতীন্দ্রিয় মন বা আত্মায় যুক্ত করার নামই "যোগ" ইহাই মনোজয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রকরণের বর্ণিত মতে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগস্থ সুষুম্না পথে ব্রহ্মবিন্দু হইতে নিবৃত্তি মূলক শক্তি এবং সম্মুখস্থভাগ হইতে প্রবৃত্তি মূলক শক্তি আসিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবিষ্ট

। তপোবলে মনের প্রবৃত্তিমার্গে গতি রুদ্ধ করিয়া, নিবৃত্তি মার্গে র্থাৎ অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগতে সেই ক্ষরাক্ষরাতীত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম "ব্রহ্মবিন্দুর" সহিত তাহাকে যুক্ত করার নামই "যোগসিদ্ধি" বা জীবন্মুক্তি, এবং সেই অবস্থার নামই "ব্রহ্ম বিন্দুতে বিশ্রাম।" এ নিমিত্ত যাঁহারা গুরূপদিষ্ট ভাবে যোগানুশীলন দ্বারা স্বীয় মনকে ইন্দ্রিয়-বিষয়-প্রবৃত্তিগামী স্তর হইতে নিবৃত্তি-গামী অতীন্দ্রিয় স্তরে নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই "ধ্যান-যোগে" আত্ম-জ্যোতিঃ বা "আত্ম-দর্শন" লাভ করিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ হন। এই রূপে নিদিধ্যাসন বা অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ ধ্যানযোগে ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রিয়গত "ক্ষর" মনকে সংযত করিয়া, অতীন্দ্রিয় "অক্ষরব্রহ্মরূপী" প্রণবাত্মায় যোগ বা লয় করিতে সক্ষম হইলেই, ধ্যান যোগের পরিপক্কতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। তদবস্থায়ই অন্তর্ব্বহির্ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ে আত্ম প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বভূতে "আত্ম-দর্শন" যোগ্য শক্তি লাভ হইয়া থাকে। আত্ম-দর্শন-যোগ ভিন্ন কথনও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মবিন্দু লক্ষ্যে সর্ব্বপ্রথম ললাটস্থ তেজোময় প্রণবরূপী প্রাণের ধারণায়, চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে ॥"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ

সদ্‌গুরুর উপদেশে প্রণব আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারাই চিত্তনিরোধ আরম্ভ করিবে। প্রথম অধিকারীদের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঐ সাধনের সহিত অব্যক্ত পরব্রহ্মের (বিন্দুর) চিন্তা করিবে। এতাদৃশ ধ্যানের ফলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্ম-দর্শন লাভ হয়। সুতরাং প্রণবই যোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহা বেদ, তন্ত্র, গীতা, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বীকার্য্য। এস্থলে তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

কঠোপনিষৎ

এই ওঁকারই ব্রহ্মলাভের অন্যান্য আলম্বনের মধ্যে প্রধান আলম্বন। ইহার তুল্য অন্য শ্রেষ্ঠ আলম্বন নাই। এই ওঁকার স্বরূপ আলম্বনকে বিদিত হইলে, মানব ব্রহ্মধামে অর্চ্চিত হয়।

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥"

কঠোপনিষৎ

এই ওঁকার অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। এই ওঁকারাত্মক অক্ষরই পরব্রহ্মস্বরূপ। এই ওঁকার আরাধনা বা ধ্যান করিয়া, যিনি যাহা বাসনা করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অক্ষরব্রহ্ম হইতে অভিলাষ করেন, তিনি তাহা লাভ করিতে স র্থ হন। সুতরাং স্বীয় প্রাণাত্মাকে প্রণবাকারে পরিণত এবং 'ধ্যান-যোগে' ইচ্ছামত ব্রহ্মরন্ধ্রপথে সমুদ্গত করিয়া, বহির্জগতেও যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করা যায়। শাস্ত্রপ্রমাণে তাহা সিদ্ধান্ত হইল। যোগী ইচ্ছামাত্র জপযুক্ত ধ্যান-যোগে, প্রণব সহিত আনয়াসে অভেদাত্মভাব লাভ করিতে পারেন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্।
ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধি মোৎপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ॥

(পাতঞ্জল, স পা,)

সেই ব্রহ্মের বাচক "প্রণব"। এই প্রণব, ধ্যান-যোগে জপ করিতে করিতে এবং তাঁহার অর্থ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাতে একত্ব হওয়া যায়। নিয়ত প্রণব জপ ও স্বদেহ মধ্যে তাঁহাকে চৈতন্যরূপে ভাবনা করিলে সমস্তযোগবিঘ্ন অপসারিত হয় এবং চৈতন্যময় আত্মাকে দর্শন করা ও

জানা যায়। এই শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিলে দেহ হইতে ইচ্ছামাত্র জ্যোতিঃ নির্গমন করা যায়। ইহার সাধন-সঙ্কেত নিম্নে বিবৃত হইল।

অত্যুজ্জ্বল তীব্র আলোকে আলোকিত কোন গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, গৃহস্থিত আলোকরশ্মি যেরূপ বায়ুচাপে ঘনীভূত হইয়া, সামান্য একটি সূক্ষ্মরন্ধ্র পাইলেও ঐ রন্ধ্রপথে গাঢ়ভাবে বাহিরে বিকীর্ণ ও প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ গৃহেরও সর্ব্বদ্বার সংযমন-অর্গলে রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য" অবস্থায়, মনকে অতীন্দ্রিয়ভাবে প্রণবাত্মক জপকৌশলে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রাখিতে পারিলে, প্রাণাত্মা তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রণবাকারে স্বভাবতঃই ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে সমুদ্গত হইতে থাকে। তদবস্থায় দেহস্থ অন্যান্য দ্বারপথে বহি-র্বিষয়-জড়িত, বায়ু গমনাগমন যত বন্ধ হইবে, ভিতরে অন্তঃপ্রাণায়াম-নিবদ্ধ মনের চাপে, প্রাণ তত গাঢ় বা ঘনীভূত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রণবাকারে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে উদ্গত হইবে। সাধারণতঃ স্থূলচক্ষে তাহা গোচরীভূত না হইলেও, ঘনীভূত শক্তির তারতম্যানুসারে, সৌরকরোজ্জ্বল জলদমালা অথবা ধূমকেতুর ন্যায় উহা প্রকাশিত হয়। পরন্তু সূক্ষ্মবিজ্ঞান উদ্ভূত আলোকচিত্র সাহায্যে তাহার প্রতিবিম্ব যে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণও "আত্ম-দর্শন-যোগ"বলে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানযুক্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্যোতিঃ-শক্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সর্ব্বভূতে "আত্ম-দর্শন" লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা অন্ধ; তজ্জন্যই সেই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানতত্ত্ব অনুশীলনে শক্তিহীন হইয়া, জগৎ সমক্ষে আত্ম-অবিশ্বাসরূপ নাস্তিকতা-বাদ প্রচার করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করি না। অধিকন্তু পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রশক্তিকে অলৌকিক শক্তি মনে করিয়া, বিস্ময়ে

অভিভূত হই। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি একাগ্রভাবে তন্ময় হইয়া ধ্যান করিলে, অবশ্যই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় বলিয়াছেন।—

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥"

১৩শ অঃ

তিনি জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন। স্থাবর জঙ্গমেও তিনি আছেন। সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয়। অজ্ঞানিগণের তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের সন্নিকটস্থ। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞানীর চক্ষে অবিভক্তরূপে প্রতীয়মান। সেই জ্ঞেয় বস্তু স্থিতি কালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু।

অতএব সেই সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তুই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিই জ্যোতির্ব্রহ্মস্বরূপে প্রণবাকারে প্রতিষ্ঠিত; ইহা শ্রুতিবাক্য।

"পরংব্রহ্ম প্রতিষ্ঠাপ্য প্রণবপ্রত্যয়েন তু।
প্রণবেন স্বয়ং দেব একোনিত্যস্বরূপধৃক্॥"

পরমব্রহ্ম প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত। স্বদেহে প্রণবের প্রত্যয় অর্থাৎ সাধনা-বলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা জানিতে হয়। তাহা হইলেই তোমার নিত্যস্বরূপবাচক প্রণবের সহিত একস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ জ্ঞানাকারে তোমার দেহস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার হইতে

স্বভাবতঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সুতরাং যোগীর পক্ষে "আত্ম-দর্শন-যোগ"-স্বরূপ সেই প্রণবই একমাত্র ধ্যেয়বস্তু।

"তস্মাত্তন্নিত্যং সেবেত সর্ব্বাঙ্গৈঃ পরমেশ্বরং।
ওঁকারেতু সমারোপ্য পরংব্রহ্ম বিচিন্তয়েৎ॥"

সেই নিত্য পরমেশ্বরবাচক ওঁকার পরব্রহ্মে সম্যক্ আরোপ পূর্ব্বক, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ঐ ব্রহ্মবস্তু প্রণবের বিশেষরূপে চিন্তা করিবে।

"ওঁকারো ভগবান্বিষ্ণুস্ত্রয়োমাত্রাস্ত্রয়াক্ষরাঃ।
তস্যোচ্চারণমাত্রেণ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

ওঁকারই ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রিমাত্রা—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং ত্রি-অক্ষর—অকার, উকার, মকার। তাহার উচ্চারণ মাত্রেই জীব পরমব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হয়।

"ওঁকারপ্রভবা দেবা ওঁকারপ্রভবাঃ স্বরাঃ।
ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥"

ওঁকারের প্রভাবই সকল দেবতা এবং স্বর অর্থাৎ স্বরগ্রাম, বর্ণাদি এবং শ্বাস প্রশ্বাস সংজাত হইতেছে। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ ত্রৈলোক্য অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং জীবদেহাদি সর্ব্বপদার্থ ওঁকারের প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে।

"অষ্টাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি ব্রহ্মা বিষ্ণুশিরাত্মকং॥"

এই ওঁকার মূলাধারাদি ষট্পদ্ম এবং নাদ অর্থাৎ আত্মা ও বিন্দু এই অষ্টাঙ্গ বিভক্ত। ভূর্ভুব স্বঃ (মহঃ জন তপঃ) নাদবিন্দু এই চতুষ্পাদ। এবং নাভি হৃদি মূর্দ্ধা এই ত্রিস্থান; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর (প্রাণাত্মা)

এবং ব্রহ্ম (শিব) এই পঞ্চদেবতায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র ত্রিদেবতাত্মকে জীব-শরীরে বিরাজিত আছেন।

"ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রাঞ্চ ত্রয়মাত্রাং ত্রয়াক্ষরম্ ।
ত্রিমাত্রং সার্দ্ধমাত্রঞ্চ প্রণবঞ্চ বিশেষতঃ ॥"

ত্রিস্থান নাভি হৃদি মূর্দ্ধা, ত্রিমাত্রা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত,—মাত্রাত্রয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাত্মকে ত্রিমাত্রা—উৎপত্তি স্থিতি লয় এবং অর্দ্ধ মাত্রা মায়াতীত জ্ঞানশক্তি যোগে প্রণব বা ওঁকার আকৃতি স্বরূপে বিশেষ ভাবে অবস্থিত পরব্রহ্ম। এই প্রণবাত্মক পরব্রহ্মই সাধনা বা যোগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। ইহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি কাহারও ভেদজ্ঞান উৎপাদনের আশঙ্কা নাই। "আত্ম-দর্শন-যোগে" সকলেই ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া, ভেদজ্ঞান পরিহার করিবেন। এই প্রণব সম্বন্ধে বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলে আমার উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন।—

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বমান ॥" চৈতন্য চরিতামৃত

অতএব বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণও মহাপ্রভুর বাক্য স্মরণ করিয়া "আত্মদর্শন-যোগবলে এই পার্থিব দেহমধ্যে সেই বেদের নিদান ঈশ্বর স্বরূপ, প্রণবের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের স্বরূপ আত্মজ্ঞান শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অবলম্বনে, প্রণব আশ্রয় করিলে তদ্দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে নিশ্চয় যথেষ্ট রূপে আত্মোন্নতি [illegible] হইবে।

বৈদিকী সন্ধ্যার মূল অর্থই প্রণবের উচ্চার, এবং উদ্গীথাবয়ব গায়ত্রীই প্রণব; তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে উক্ত সন্ধ্যার রুদ্রোপস্থান বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

"ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
উদ্ধ´লিঙ্গং বিরুপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥"

যিনি ঋত অর্থাৎ একাক্ষর প্রণবাত্মক ও সত্য অর্থাৎ অনন্ত অব্যয় অবিনশ্বর পরমব্রহ্ম স্বরূপ, যিনি রূপহীন হইয়াও "সাধকানাং হিতার্থায়" নবঘনশ্যাম কৃষ্ণবর্ণ ও বামভাগে তড়িতাভ গৌর অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণে "অর্দ্ধনাড়ীশ্বররূপে" বা মিলনাবস্থায় শক্তি উৰ্দ্ধে উত্তোলনে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং বিরূপাক্ষ (অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি হইতে বিরূপ) অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত অক্ষি বা দৃক্‌শক্তি যাঁহার সেই বিশ্বরূপ, সেই ওঁকারাত্মক যুগল মূর্ত্তিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। (সাঃ বিঃ)

সন্ধ্যায় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া চিরজীবন একমাত্র স্থূলদেহের কর্ম্ম বা কতকগুলি শব্দ আবৃত্তিতে ধ্যান বা সন্ধ্যার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে। সন্ধ্যাই পরম ধ্যান-যোগ। সেই পরমাত্মাকে সম্যগ্‌রূপে ধ্যান করার নামই সন্ধ্যা। সুতরাং সন্ধ্যা মানসকর্ম্ম, শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন।

যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সংধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥
নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।
সন্ধিনা সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্॥

ব্রহ্মোপনিষৎ

যে সময় জীবাত্মা, বুদ্ধিসহযোগে পরমাত্মাকে অভেদ ভাবনা করে, তাহার নাম সন্ধ্যা। সুতরাং আত্ম-ধ্যানই সন্ধ্যা নামে অভিহিত। এ জন্যই এই প্রকার সন্ধ্যা অবশ্য করণীয়। এই সন্ধ্যা করিতে সলিলের (জলের) বা সন্ধ্যোপচারাদির আবশ্যক হয় না। মন্ত্রপাঠ জন্য বাগিন্দ্রিয়াদির কষ্ট অনুভূত হয় না। ঈদৃশ সন্ধ্যা-প্রভাবেই জীবের একত্ব জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায়, অনিত্য-মায়া-মোহ-জনিত সুখ-দুঃখে অভিভূত

করিতে পারে না। ইহার নামই প্রকৃত সন্ধ্যা বা সম্যগ্ রূপে ধ্যান-যোগ। নিত্য-ব্রহ্মবিচরণশীল, ব্রহ্ম-দণ্ডধারী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহাই "নিত্য কর্ম্ম" স্বরূপে একান্ত অনুষ্ঠেয়। ঐ সন্ধ্যা মধ্যে স্থূল, জ্যোতিঃ, সূক্ষ্ম এই ত্রিবিধ ধ্যানভাবই বিদ্যমান আছে। তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ঐ ত্রিবিধ ধ্যান মধ্যে সূক্ষ্ম বা নির্গুণধ্যানই শ্রেষ্ঠ। ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"স্থূলধ্যানাচ্ছতগুণং তেজোধ্যানং প্রচক্ষতে।
তেজোধ্যানাৎ লক্ষগুণং সূক্ষ্মধ্যানং বিশিষ্যতে॥"

স্থূলধ্যান হইতে জ্যোতির্ধ্যান শতগুণে শ্রেষ্ঠ; তেজোধ্যান হইতে লক্ষগুণে সূক্ষ্মধ্যান শ্রেষ্ঠ; সূক্ষ্মধ্যান সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।

"ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী॥"

"আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ সদ্বৃত্তি দ্বারা বিষয়ান্তরকে অবলম্বন না করিয়া যে অবস্থান অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানে চিত্ত সমাধিস্থ করা তাহাই পরমানন্দ-দায়িনী ধ্যান বলিয়া কথিত। ইত্যাকার ধ্যান ভাবালম্বনেই সমাধি অবস্থা লাভ হয়। ইহাই "ধ্যান-যোগের" মূলতত্ত্ব। এতাদৃশ ধ্যানাবস্থার নামই "আত্ম-দর্শন-যোগ"।

আত্ম দর্শন যোগ

চতুর্থ স্কন্ধ।

পঞ্চত্রিংশ প্রকরণ।

সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ।

(বাহ্য-পূজা।)

আত্ম-দর্শন-যোগে সিদ্ধাবস্থাই সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন। সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন ভাবোদয় হইলেই, চৈতন্য সমাধি অবস্থা লাভ হয়। ইহাই মানবের অমৃতত্ব। প্রত্যাহার ও ধারণাযুক্ত ধ্যানবলেই মানব এই অমৃতত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারে। এতাদৃশ ধ্যান-যোগে মানব যখন "আত্ম-দর্শন" লাভের অধিকারী হয়, তখন প্রকৃতভাবে সে বুঝিতে পারে যে, আজীবনকাল দেহাত্মবোধজনিত ভেদজ্ঞান বা কুসংস্কারবশে প্রতিনিয়ত যাহাকে 'আমি' 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, অলীক স্বপ্ন মাত্র। তামসিক সংসার-মোহ-নিদ্রা বা সুষুপ্তি অভিভূত থাকাই ঐ স্বপ্নাবস্থার কারণ। জ্ঞানদাতা গুরুকৃপাবশে জ্ঞানস্বরূপ জাগ্রতাবস্থা লাভ করিয়া দেখিতেছি, সেই স্বপ্নাবস্থায়-"আমিত" প্রকৃত "আমি" নহি, সেই আমি ত আমার স্বরূপ নয়, আমিই যে একমাত্র, নিত্য, আমিই যে একমাত্র বুদ্ধ, আমিই যে একমাত্র সত্য ও শুদ্ধ, আমি

যে সততই মুক্ত; আমি ত বদ্ধ নহি। আমি যে একমাত্র "সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিবোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং", ইত্যাকার ভাবপ্রবণতায় সাধক গাহিয়াছেন—

গান।

(রাগিণী টোরী ভৈরবী—তাল একতালা)

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি।
কে "আমি" আমাতে আছে কি রতন॥
কোন্ শক্তি বলে, বেড়াই চ'লে ব'লে।
কার অভাবে হবে দেহ অচেতন॥
দেহ মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার।
তাহাতেই বলি—"আমি" বা "আমার"॥
প্রাণ গেলে চ'লে হবে শবাকার।
কেবা কার কোথা রবে ধন জন॥
প্রাণেরি চাঞ্চল্যে জীবভাব ঘটে।
চঞ্চলতা গেলেই সকল আশা মিটে।
স্থির হ'লে প্রাণ দেখি আজ্ঞা পটে।
"প্রণব" আকারে বাঁকা বিশ্ববিমোহন॥
অপরূপ সেই-রূপের মাধুরি।
দৃষ্টিমাত্রে করে (আমার) মন-প্রাণচুরি॥
সে কেমন ভাব বুঝাইতে নারি।
(তখন) সকলি পাশরি মুদিয়ে নয়ন॥

যোগসঙ্গীত

আমিই অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার ও অখণ্ডরূপে সতত দেদীপ্যমান; আমিই যে সেই পরমাত্মা বা "সোঽহমস্মি"। এতদিন ভেদ বুদ্ধিতে যাঁহাকে আমা হইতে পৃথক্ জ্ঞান পূর্ব্বক যাঁহার অনুভূতি প্রাপ্ত হই নাই, এখন দেখিতেছি, সে এদেহ মন্দিরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত "সে,"-ই যে "আমি" এই "আমি"কে ধরিতে না পারিয়া অন্ধের ন্যায়—'তুমি' 'তুমি' করিয়া ঘুরিয়াছি। কিন্তু সেই 'তুমিকে'ত কখন ধরিতে পারি নাই। ধ্যানাবস্থায় বা "আত্ম-দর্শন-যোগে" সেই "আমিকে" যখন চিনিতে পারিয়াছি, তন্মুহূর্ত্তেই যেন "তুমি" ভাবের পৃথক্ সত্বার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তখনই দিব্যনেত্রে দেখিতেছি যে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে "তুমি" ভাবে পৃথক্-কেহ নাই, যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি সবইত "আমি", আমিই যে সর্ব্বময়; সর্ব্বভূতেই যে আমার সত্বা বিরাজিত, ধ্যান যোগে ঈদৃশ আত্ম-তত্ত্ব-প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলেই তখন মানব বুঝিতে সমর্থ হয় যে—

"নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহীবনস্থোভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপাঃ ॥"

হস্তামলক।

আমি মনুষ্য দেবতা কিম্বা যক্ষ নহি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ কিম্বা ভিক্ষুক নহি; আমি নিজবোধস্বরূপ "আত্মা"। ইহাই সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগের উপযোগী ধ্যান-যোগ-লব্ধ জ্ঞান।

পূর্ব্বোপদিষ্ট কতিপয় জ্ঞানপিপাসু শিষ্যবন্ধুকে "আত্ম-দর্শন-যোগ" উপদেশ প্রদানাবস্থায়, একটি প্রধান শিষ্য সঙ্গে "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন" সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইয়াছিল তাহা এস্থলে প্রশ্নোত্তর ভাবে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

শিষ্য—গুরুদেব! এখন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের মধ্যে চিত্ত ব্যাকুলতা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দয়া প্রকাশে আমাদের সেই ব্যাকুলতা নিবারণে কৃতার্থ করুন।

গুরু—বৎস! চিত্ত ব্যাকুলতা বড়ই উত্তম জিনিষ। যদি তাহা আত্ম-তত্ত্ব বা ভগবৎ প্রাপ্তিবিষয়ক হয়। আচ্ছা তোমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় কি তাহা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়া বল।

শিষ্য—গুরুদেব! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, মানস পূজাপেক্ষা "বাহ্য-পূজা" কঠিন, তাহা সময়ান্তরে বলিবেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, চিত্ত গঠিত না হইলে, বাহ্য-পূজার অধিকার জন্মে না। কিন্তু চিত্ত গঠন হওয়া গুরুকৃপার উপর নির্ভর। "আত্ম-দর্শন-যোগ" উপদেশ ভাবে আপনি মানস-পূজা শিক্ষা প্রদান করিয়া যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের বিষয় সহজ কৌশলে অষ্টাঙ্গ যোগ শিক্ষা প্রদান ক্রমে, বর্ত্তমানে সমাধিতত্ত্বে "সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ" উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাহ্য-পূজার বিষয়টি সম্বন্ধে আর কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। আপনি এ পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে যোগশিক্ষা দিয়াছেন, আমরা অনেকেই ভবদীয় কৃপাবশে তৎ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি এবং আমাদের স্বধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম বা সন্ধ্যা-পূজাদির বিশদজ্ঞান আপনার উপদিষ্ট "আত্ম-দর্শন যোগ মধ্যেই যে বিদ্যমান আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার উপদেশে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি যুক্ত আত্মজ্ঞানবলে আত্ম-দর্শন-যোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ছাড়িয়া আর [illegible] চিত্ত নিয়োগ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। খোসা ধরিয়া টানাটানি করিতে আর ইচ্ছা নাই; কিন্তু আপনার মুখে সেই বাহ্য পূজার উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের

চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আপনি যথার্থই কি বাহ্যপূজার বিরোধী?

গুরু—বৎস! ঠিক উপযুক্ত সময়েই এই উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি কদাচ বাহ্যপূজার বিরোধী নহি; পরন্ত সমধিক পক্ষপাতী। বাহ্যপূজা ভিন্ন আত্ম-দর্শন যোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়না। তবে মানসপূজার অধিকারী না হইয়া, দেহাত্মবোধে চির জীবন একমাত্র অনিত্য ভোগ সুখের লালসায় ভেদজ্ঞানে, নানামূর্ত্তির বাহ্য-পূজাড়ম্বরে বর্ত্তমানে আর্য্যসন্তান গণের সংযম ও একাগ্রতা নষ্ট এবং মানসিক উন্নতির বিনিময়ে অবনতি, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাহ্য-পূজানুষ্ঠানে জ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা বৃদ্ধির কারণ কি? তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে যে, জ্ঞান বা মুক্তির উদ্দেশ্য বিহীন কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানীর বংশধরগণ লক্ষভ্রষ্ট বা পতিত হইতেছে। সুতরাং যে কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মজ্ঞান হ্রাস বা আত্ম-অবিশ্বাস উৎপাদন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, যে কর্ম্মানুষ্ঠান মানবের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া পশুত্বে পরিণত করে, সেই প্রকার ঘোর অজ্ঞানতামূলক কর্ম্ম, কখনই স্বধর্ম্ম রক্ষার উপযোগী বলিয়া শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। তদ্ধেতু আমি ঐ প্রকার অশাস্ত্রীয়, অজ্ঞানতা-প্রতিপাদক ও স্বধর্ম্মাপহারক কর্ম্মানুষ্ঠানের নিশ্চয়ই বিরোধী; প্রত্যুত সুসংস্কার প্রয়াসী। এজন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল কুসংস্কার নিবারণের চেষ্টায় বাহ্য-পূজাদি অনুষ্ঠান বিষয়ের দোষগুণ নানা স্থানে নানাভাবে বহুপ্রকার সমালোচনা করিয়া তোমাদের ভ্রান্তধারণা অপনোদন ও চিত্ত শুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি। যে উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম, জ্ঞানীর বংশধরগণকে অজ্ঞানীর আকারে পরিণত করে, যে অজ্ঞানতাযুক্ত কর্ম্ম তাঁহাদের আত্ম-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে আত্ম-অবিশ্বাসোৎপাদন করে, যে আত্ম-বিশ্বাস হীন কর্ম্মানুষ্ঠানে, আধ্যাত্মিক বা আত্মশক্তির ধ্বংস সাধিত

হয়, যোগি-ঋষির বংশধরগণের পক্ষে সে কর্ম্ম নিশ্চয়ই অকর্ম্ম; সে কর্ম্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্র অসম্মত নিষিদ্ধ কর্ম্ম। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে তাহার পরিবর্ত্তন ও সুসংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়।

বাহ্যপূজার উদ্দেশ্যই 'সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন'। দশবিধ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানযোগে, প্রথমে "আত্ম-দর্শন" লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, বাহ্যপূজার শক্তি অর্জ্জন হয় না। তজ্জন্য বাহ্যপূজা, মানসপূজা হইতেও কঠিন বলা হইয়াছে। প্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগবর্ণিত কোন কর্ম্মানুশীলন বাদ দিয়া, সংযমহীন অবশীকৃত মনে, একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা সাহায্যে কতকগুলি শব্দসমষ্টি আবৃত্তি দ্বারা বাহ্যপূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে কি?

শিষ্য—আজ্ঞে না; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। বরং তদ্দারা উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে, ইহা ধ্রুব সত্য। যম, নিয়ম, আসন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধানযোগে আত্ম-দর্শন বা মানস-পূজা ভিন্ন কখনও বাহ্য-পূজার অধিকার হয় না। পরন্তু তাদৃশ বাহ্য-পূজা যে কেবল একটা অভিনয় মাত্র, তাহা আপনার কৃপায় "আত্ম-দর্শন-যোগ" অনুশীলনে, এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ঐ সকল অন্তঃকর্ম্ম ভিন্ন মনঃসংযোগ, চিত্তস্থির ও শুদ্ধি এবং একাগ্রতা সাধন হয় না। একাগ্রতা সাধন ভিন্ন উপাস্য বা ইষ্টদেবতার প্রতি স্থিরলক্ষ্যে ধারণা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পরন্তু ধারণা সিদ্ধি ভিন্ন ধ্যানের দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বাহ্যভাবে ইষ্টমূর্ত্তি বা শিবপূজা প্রকৃতই কঠিনকর্ম্ম বটে। [illegible] "আত্ম-দর্শন-যোগে" ইহা বেশ বুঝিয়াছি যে, অন্তঃপ্রাণায়াম যোগে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রত্যাহার ও ভূতশুদ্ধি না হইলে, শুধুমাত্র অসংযত মনে বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন দেবমূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কারণ ইচ্ছা শক্তির গাঢ়ত্ব ভিন্ন, ঐ সকল মূর্ত্তিতে

প্রাণাত্মার আবাহনাদি অসম্ভব। সুতরাং মানসপূজা বা সংযমাদি যোগানুষ্ঠান দ্বারা ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তি দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রস্তর, ধাতব, মৃণ্ময়াদি কোন দেবমূর্ত্তিতে বাহ্য-পূজানুষ্ঠান প্রকৃতই ছেলেখেলা মাত্র। আমরা যতদিন একমাত্র ঐ বাহ্য-ভাবে কর্ম্ম করিয়াছি, ততদিন কিছুতেই তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনি বলিয়াছেন প্রথম শিক্ষার্থিগণের লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্ম ঐ সকল সাকার মূর্ত্তির বাহ্যপূজা শাস্ত্রে বিধান আছে, ইহা সত্য বটে; কিন্তু অন্তঃ প্রাণায়ামযোগে, ইন্দ্রিয়-বিষয় প্রত্যাহারের চেষ্টা ও মানসক্ষেত্রে উপাস্ত দেবতার সাকার মূর্ত্তির ধারণা পরিপক্ক বা সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় তৎপর না হইয়া, অনেকেই চিরজীবন কেবল মাত্র-অনিত্য ভোগসুখ-জনিত, কামনা-বাসনা-পূরণেচ্ছায়, ভেদ-জ্ঞানে, বহুমূর্ত্তির পিছনে পিছনে ছুটাছুটি নিবন্ধন, গুরূপদিষ্ট উত্তম "মানস-পূজার" স্মৃতি ও উদ্দেশ্ত বিস্মৃত হইতেছেন। আত্ম-জ্ঞানের অভাবই যে উহার কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরন্তু উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব। যাহাহউক এ সকল বিষয় পূর্ব্বেই বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য আপনার প্রসাদে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় "আত্ম দর্শন-যোগের" পথে আসিতে পারিয়াছি। সদ্‌গুরূপদিষ্ট ভাবে আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-দর্শন-যোগের অনুবর্ত্তী না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবের এই ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইবে না। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বুঝিতে বাকী আছে। আপনি বলিয়াছেন যে, বাহ্য-পূজার অর্থ—"সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন" ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

গুরু—আচ্ছা বৎস! বাহ্যপূজার উদ্দেশ্য বুঝাইতেছি। সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শনের উদ্দেশ্যেই বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তোমরা কতদূর অধিকারী হইয়াছ, তাহা বুঝিবার জন্য আমি ক্রমে কতকগুলি প্রশ্ন করিব।

শিষ্য—আজ্ঞা করুন্।

গুরু—বৎস! মানসপূজা বা যোগানুশীলন দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছ কিনা, তুমি ঐ দেহ নও, তুমি "দেহী" বা "আত্মা"। তুমিই "শিবোঽহং" ভাবে "শিব"।

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ! আমি যখন দেহ নই, তখন আমিই যে শিবস্বরূপ এ জ্ঞান সতত রাখিবার চেষ্টা না করিলে, আত্ম-জ্ঞান দৃঢ় হইবে কেন? এবং নিদিধ্যাসনরূপ অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে না পারিলেই বা, 'আত্ম-দর্শন-যোগ' সিদ্ধ হইবে কেন? কিন্তু প্রভো! একমাত্র শিবপূজার কথা শুনিয়া অজ্ঞানিগণ যাহাতে ভেদবুদ্ধিপরায়ণ না হয়, সে জ্ঞানটি পরিস্ফুট থাকা প্রয়োজন। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য সকলের পক্ষে উপাস্য দেবতা জ্ঞানে একমাত্র শিবপূজার বিধি কেন?

গুরু—বৎস! বেশ কথা উত্থাপন করিয়াছ। আচ্ছা বৎস! নিত্যপূজা-উপলক্ষে প্রতিদিন যে শিবপূজা কর, সেই শিবের রূপ কি বলিতে পার? তাহা কি শিবের স্থূলরূপ না সূক্ষ্মরূপ?

শিষ্য—আজ্ঞে সে সূক্ষ্মদেহ বা প্রকৃতি পুরুষাত্মক লিঙ্গদেহ।

গুরু—সর্ব্বলোকপূজিত সেই শিব যদি স্থূলাবয়ব বিশিষ্ট না হন, যদি তাহা প্রকৃতি-পুরুষ-অভেদাত্মক লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সেই শিবই যোগিঋষিগণের পরমারাধ্য প্রণবাত্মক শিব স্বরূপ সহস্রদলবাসী 'বিন্দুরূপী' পরমাত্মা বা নাদরূপাশক্তিযুক্ত অভেদাত্মক 'বিন্দুব্রহ্ম' বা পরব্রহ্ম।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ।
পঞ্চধা পঞ্চদৈবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে॥"

উক্ত পঞ্চদেবতার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহা মাত্র দ্রষ্টব্য যে, প্রণবাত্মক ঐ পঞ্চদেবতামধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অকার, উকার,

মকারাত্মক ত্রিমাত্রা ঈশ্বর প্রাণাত্মা স্বরূপ অর্দ্ধনারীশ্বরে চিচ্ছক্তি, তদ্ধেতু অর্দ্ধমাত্রা এবং "শিব" প্রকৃতি-পুরুষ অভেদাত্মক বিন্দু বা পরব্রহ্ম। কোন কোন উপনিষদে ইহাঁকে "ঈশান" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"বিষ্ণুর্ম্মনসি নাদান্তে পরমাত্মনি স্থাপ্য ধ্যেয়মীশানং
প্রধ্যায়ন্তীশা বা সর্ব্বমিদং প্রযুক্তম্ ॥"

শিখোপনিষৎ

অপরাপর দেবতা সত্ত্বেও ঈশানের ধ্যানের কি প্রয়োজন? উহার হেতু এই যে, তিনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়োগকর্ত্তা, তাঁহারই আদেশে এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। সুতরাং তিনিই একমাত্র ধ্যেয়।

"সর্ব্বজ্ঞানযোগধ্যানানাং শিব এক এব ধ্যেয়ং
শিব ওঁকার সর্ব্বমন্ত্যং।" ইতি চ শ্রুতিঃ

শিব অখিল জ্ঞানের জ্ঞেয়, অখিল-যোগের গম্য এবং অখিল-ধ্যানের ধ্যেয়। সেই শিব ওঁকার স্বরূপ। সুতরাং সেই ওঁকাররূপী সূক্ষ্মশিবই একমাত্র সকলের ধ্যেয়।

অতএব সেই "বিশ্বাত্মং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং" ওঁকারস্বরূপ বিন্দুরূপী পরমেশ্বর শিব বা পরমাত্মাই সকলের আরাধ্য। তদ্ধেতু তাঁহার উপাসনায় যোগী, ঋষি, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, কাহারও কোন দলাদলি থাকিতে পারে না। এইজন্ত শিবলিঙ্গরূপ সূক্ষ্মদেহই পূজার বিধি। শালগ্রামও তদ্রূপ রূপহীন বিষ্ণু। তজ্জন্ত বাহ্য-পূজায় শালগ্রামও সকলেরই অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণ শালগ্রামেরই নিত্য অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। উক্ত শালগ্রাম বা বিষ্ণুও সাকার দেবতা নহেন। উহাও লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ। যাঁহারা অগ্নিহোত্রী তাঁহারা একমাত্র অগ্নির উপাসক। উহাও ব্রহ্মার তেজোময়দেহ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ। সুতরাং বর্ণিত তিনটি উপাস্তই মূলে

একমাত্র অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মবস্তু। কাজেই সূক্ষ্মবস্তুর উপাসনা সূক্ষ্মভাবে ভিন্ন স্থূল বা বাহ্য-পূজায় অসম্ভব। সূক্ষ্ম মানসক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তি নিরোধসম্পন্ন অন্তঃকরণে, স্থূল ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিরহিত, সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় ভাবে, স্থিরচিত্তে দৃঢ় ধারণাযুক্ত ধ্যানরূপ "অভেদদর্শন"ই সূক্ষ্মউপাসনা বা পূজা; যোগ ইহার নামান্তর মাত্র। ইহা মানসপূজা উপলক্ষে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

শিষ্য—তবে শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম ও অগ্নির বাহ্য-পূজা করা হয় কেন? পরন্তু আপনিও বাহ্য-পূজা অস্বীকার করেন না। আপনি ত বলেন যে, বাহ্য-পূজার জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্বভূতে "আত্ম-দর্শন-যোগ" সিদ্ধ হয় না।

গুরু—হাঁ বৎস! তাহাই ঠিক্। ঐ যে শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম এবং তেজস্বরূপ সর্ব্বভুক্ অগ্নি, উহাই অন্তর্জ্জগতস্থ "আমার আত্মস্বরূপ" জ্ঞানের লক্ষ্যস্থল মাত্র। সেই আত্ম-লক্ষ্যে সর্ব্বভূতেই তাঁহাকে দর্শন বা আত্ম-দর্শন করিতে হইবে। ইহাই বাহ্য-পূজার সঙ্কল্প বা উদ্দেশ্য। দিব্য-জ্ঞান-নেত্রে সতত সেই রূপহীন, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার প্রতি অবিচ্ছেদে ও একাগ্রভাবে লক্ষ্য স্থির রাখার নামই আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্তাবস্থা। অন্তর্জ্জগতে ঈদৃশ যোগ-যুক্তাবস্থার নামই "মানস-পূজাযোগে আত্ম-দর্শন"। বহির্জ্জগতেও যাহাতে সর্ব্বভূতে সেই আত্ম-বিকাশ-সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ অন্তর বাহিরে তাদৃশ আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্তাবস্থায়, নিজকে সর্ব্বভূতে সর্ব্বময় উপলব্ধি-কৃতজ্ঞানে, "সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ" ভাবে চৈতন্য-সমাধি অবস্থা লাভ হইতে পারে, তজ্জন্যই বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান। সুতরাং এই বাহ্য-পূজাই "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ" সিদ্ধির প্রধান উপায়। এজন্যই মানস-পূজার পরে বাহ্য-পূজা অনুষ্ঠেয় বলিয়া, শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই শাস্ত্রবাক্য ও গুরূপদেশানুযায়ী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই, মানস-পূজাদ্বারা জ্ঞান পরিপক্ব অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত, বাহ্য-পূজার অধিকারী হইতে পারে না। ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া আসিতেছি।

শিষ্য—গুরুদেব! বড়ই সুন্দর উপদেশ এবং বড়ই উচ্চজ্ঞানের বিষয়। এখন কিরূপে "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ" সিদ্ধ হইতে পারে, তদুপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করুন। বাহ্য-পূজায় এতাদৃশ উচ্চ জ্ঞানলাভ হয়, পূর্ব্বে আর কখনও ইহা শুনিতে পাই নাই।

গুরু—বৎস! "আত্ম-দর্শন-যোগে" যাঁহাকে তুমি অভেদ্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেছ, সেই প্রণবাত্মা শিবই তুমি; ইহা ঠিক ধারণা আছে ত?

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ! আমি শিবস্বরূপ, কিন্তু আমার পার্থিবদেহ শিব নয়।

গুরু—পার্থিবদেহের কথা পরে বলিতেছি। আচ্ছা তাহা হইলে তোমার ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট, সকল দেহমধ্যেই তুমি শিব বা পরমাত্মারূপে বিরাজিত আছ।

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ! শুধু আমার অবয়ব বিশিষ্ট দেহ কেন, সর্ব্বঘটেই যে, আমি আত্মারূপে দেদীপ্যমান। আপনার কৃপায় "আত্ম-দর্শন-যোগে" তাহাও উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু আমি ত ঘট বা দেহ নহি।

গুরু—বৎস! আরও উত্তম জ্ঞান বটে; তাহা হইলে তুমি ঘটস্থ বা সর্ব্বদেহস্থ দেহী। আত্ম-দর্শন বা মানস-পূজাদ্বারা ইহা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এখন দেহ বা ঘট কি পদার্থ তাহাই বুঝিতে হইবে; ঐ পার্থিব দেহটা তোমার স্থূল বা সাকার অবস্থা, কেমন?

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ! এই পার্থিব দেহটাই আমার স্থূল বা সাকার অবস্থা। লিঙ্গশরীর আমার সূক্ষ্মদেহের অবস্থা। তদতিরিক্ত আমি জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা বা শিব এবং আরও বুঝিয়াছি যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতিতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহ গঠিত

তন্মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতদ্বারা স্থূলদেহ উৎপন্ন, এজন্যই ইহাকে ভৌতিক দেহ বলে।

গুরু—সাধু, বৎস! সাধু, সাধু, তাহা হইলে তোমার লৌকিকচক্ষে দৃশ্যমান যাবতীয় স্থূল বা পার্থিব দেহই ঐ পঞ্চভূতে গঠিত।

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ! পার্থিব দেহই ঐ পঞ্চভূতে গঠিত এবং স্থাবর-জঙ্গমাদি স্থল ও জলচর সমস্তই ঐ পঞ্চভূতে সৃষ্ট, তাহাও বুঝিয়াছি, তবে দেহের পার্থক্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সকল দৈহিক উপাদানগুলির মধ্যে একটু ইতর বিশেষ আছে।

গুরু—হাঁ বৎস। ঐ সকল দৈহিক ভূতগুলিমধ্যে একটু বৈষম্য আছে বটে, কিন্তু প্রথমে নিজের অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া যেমন পরতত্ত্ব বুঝিয়াছ, সেইরূপ নিজের স্থূলদেহতত্ত্ব বুঝিয়া অপরের স্থূলদেহতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। তোমার ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল বা পার্থিবদেহের ক্ষিতি বা মাটীর অংশ আট আনা, অপ বা জলের অংশ দুই আনা, তেজ বা অগ্নির অংশ দুই আনা, মরুৎ বা বায়ুর অংশ দুই আনা, ব্যোম বা আকাশের অংশ দুই আনা, পঞ্চ উপাদানে মোট ষোল আনায় স্থূলদেহ।

শিষ্য—গুরুদেব! আপনার কৃপায় তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এখন দয়া করিয়া বাহ্য-পূজায় "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগে"র উপায়টি বুঝাইয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু—বৎস! ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিবলিঙ্গটি শিবের স্থূলদেহ নহে; উহা শিবশক্তি অভেদাত্মক সূক্ষ্মদেহ। স্থূলের অর্থই বাহ্য। এস্থলে "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগে"র কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবে। এখন ঐ পার্থিব শিবপূজা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অভিপ্রায় একটু জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। শিবপূজা পদ্ধতিতে উক্ত আছে যে—

"অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তত করিয়া, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্যাদি উত্তম ধাতবপাত্রে, ত্রিদল-বিল্বপত্রের মধ্যদল-পৃষ্ঠোপরি, তাঁহাকে বসাইবে"। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ শিবলিঙ্গ প্রস্তত করা বিধান এবং এস্থলে অঙ্গুষ্ঠের সহিত তুলনা হইল কেন? পরন্তু বিল্বপত্রের মধ্যদল-পৃষ্ঠোপরি তাঁহা স্থাপন করার উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য—বিল্বপত্রের মধ্যদল ও পৃষ্ঠ সম্বন্ধে এই মাত্র অনুমান হইতেছে যে, তমো-রজঃ-স্বরূপ ঈড়া, পিঙ্গলা নামক দুইটি পত্র ত্যাগ করিয়া, সত্ত্বগুণস্বরূপ সুষুম্নাস্থ চিত্রানি নাড়ীরূপ মধ্যদল উহার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণের মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই।

গুরু—আচ্ছা বৎস! তাহা হইলে তোমার সূক্ষ্মদেহটি একবার চিন্তা কর। সেই হৃৎপদ্মস্থ "অঙ্গুষ্ঠ" পরিমিত দীপকলিকা, যাহার বলে তোমার দেহাদির আবশ্যকীয় কর্ম্ম অর্থাৎ আবর্ত্তন, সঙ্কোচন, প্রসারণ, উন্নমন, বিধারণ ও প্রচ্ছর্দ্দন প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়াবলম্বনে জীবনীশক্তির যাবতীয় গতি নিয়মিত হইতেছে, যাহার ঊর্দ্ধগতি বিধায়কটির নাম পুরুষ বাচক প্রাণাখ্য "হং"কার এবং অধোগতি বিধায়কটির নাম প্রকৃতি বাচক অপানাখ্য "সঃ"কার। হৃৎপদ্মবাসী সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপকলিকাই ঊর্দ্ধাধো গতিতে প্রাণ এবং অপান বায়ুকে যথাযোগ্য ভাবে সঞ্চালিত করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন।—

"ঊর্দ্ধংপ্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥"

কঠোপনিষৎ।

যে আত্মা, হৃদয় হইতে প্রাণ বায়ুকে ঊর্দ্ধদেশে উন্নীত করেন এবং অপান বায়ুকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করেন, সেই হৃদয়-পুণ্ডরীকবাসী প্রাণাত্মাকে

ভজনা করা কর্ত্তব্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর ও প্রাণিগণ সতত তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভাগবতে উক্ত আছে—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥"

যাহারা (জীব) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজনা করে না এবং তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করে না, তাহারা গন্তব্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণও মূল পন্থা বিস্মৃত হইয়া ঈদৃশ অধঃপতনের পথে আসিয়াছে। সুতরাং "আত্ম-দর্শন-যোগ" ব্যতীত পুনরভ্যুত্থানের অন্য উপায় নাই।

তোমার স্থূলদেহ যেরূপ সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া আছে এবং তারই মধ্যে স্থূলদেহের ক্রিয়াসমূহ নিবদ্ধ রহিয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ তোমার সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম সেরূপ নহে। ঐ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সূক্ষ্মদেহ সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই তাহার ক্রিয়াশক্তি বিস্তৃত, তাহা বোধ হয় আত্ম-দর্শন-যোগবলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। এজন্য শাস্ত্র তাঁহাকে বিশ্বভুক্ ঈশ্বর পুরুষ বলিয়াছেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রং সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্ ॥"

নারায়ণোপনিষৎ

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থান আশ্রয় করিয়া, সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও বিশ্বভুক্-প্রাণাত্মা রূপে সমস্ত জগৎকে প্রীত করে।

ঐই প্রাণাত্মা যেমন তোমার সূক্ষ্মদেহ, তদ্রূপ তোমার অন্তেবাসক বিন্দুরূপী শিবেরও লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ। এই সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়াই স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহরূপ প্রাণাত্মার প্রবাহ, প্রণবাকারে ঊর্দ্ধগতিতে "ব্রহ্মবিন্দুতে"

লয় প্রাপ্ত হয়। ছায়া যেরূপ কোন পদার্থকে আশ্রয় ভিন্ন প্রকাশ পায় না, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও তদ্রূপ ঐ সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় ভিন্ন স্থূলদেহে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না।

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ! এ সকল তত্ত্ব অনেক পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপিও নূতন শিক্ষার্থিগণের বোধগম্য জন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ দ্বারা বিষয়টি বেশ পরিস্ফুট হইতেছে। নচেৎ শিবলিঙ্গ অর্থাৎ পার্থিব শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠের অন্যূন প্রস্তুত করা, কেন শাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং অঙ্গুষ্ঠের সহিত তাঁহার তুলনারই বা উদ্দেশ্য কি, তাহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইত। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে ঐ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহও একটি কোষ স্বরূপ, অর্থাৎ স্থূলদেহ যেরূপ অন্নময়কোষ বিশেষ অজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদেহও তদ্রূপ প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময়-কোষত্রয় বিশেষ বিজ্ঞানময়।

গুরু—হাঁ বৎস। যথার্থ প্রণিধান করিয়াছ, এখন বাহ্য-পূজার উদ্দেশ্যে যে পার্থিব শিবলিঙ্গ বিল্বপত্রোপরি স্থাপন করিবার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা বিন্দুরূপী পরমাত্মস্বরূপ শিবের সূক্ষ্মদেহরূপ কোষত্রয় মাত্র। মানস ক্ষেত্র হইতে পরমাত্মার সূক্ষ্ম-জ্যোতিঃকণা প্রণব-প্রবাহে "ওঁপিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ভাবে আকর্ষণ পূর্ব্বক "হ্রাং হ্রীং স্থিরোভব" ভাবে ঐ প্রবাহ তাহাতে স্থিতরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা বাহ্য দৃষ্টিতে অষ্টমূর্ত্তি আকারে অর্থাৎ "ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইহাই বাহ্য-পূজা। এইরূপে সর্ব্বভূতে ও মন-বুদ্ধি-অহংকারাদি যাবতীয় প্রকৃতিমধ্যে সর্ব্বময় ভাবে শিবরূপী পরমাত্মার অস্তিত্ব বা বিকাশ সন্দর্শন করাই বাহ্য-পূজার উদ্দেশ্য; এতাদৃশ জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্ব ভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ সিদ্ধ হয়।

শিষ্য—আর একটু পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইলে ধন্য হইব।

গুরু—"সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইহাতে জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের যত মাটী সমস্তই মহেশ্বরের "সর্ব্বমূর্ত্তি"। এইরূপ যত জল সবই তাঁহার 'ভবমূর্ত্তি' যত তেজ বা অগ্নি সবই তাঁহার 'রুদ্রমূর্ত্তি', যত বায়ু সবই তাঁহার 'উগ্রমূর্ত্তি', যত আকাশ সবই তাঁহার 'ভীমমূর্ত্তি', সর্ব্বজীবের সূক্ষ্মদেহাশ্রয়ী দশ ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক পরিচালিত, সেই একাদশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ মন তাঁহার পশুপতিমূর্ত্তি, বুদ্ধি তাঁহার "সোমমূর্ত্তি", অহংকার তাঁহার "সূর্য্যমূর্ত্তি"।

শিষ্য—আজ্ঞা হাঁ। সব তাঁহারই মূর্ত্তি বুঝিলাম।

গুরু—(বাধা দিয়া) থাম বৎস! তাহা হইলে সমস্ত মাটী যদি তাঁহার মূর্ত্তি হয়, তবে তোমার স্থূলদেহের যে অর্দ্ধাংশ মাটী তাহাও সেই পরমাত্মা-রূপী "শিবমূর্ত্তি"। দুই আনা যে জল, তাহাও সেই ব্রহ্ম স্বরূপ , এইরূপ অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি ভূতগুলি সবই তোমার সেই পরমাত্মা বা শিবমূর্ত্তি। এই প্রকার দৃশ্যমান জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বপ্রকার পঞ্চভূতই তোমার বিশ্বব্যাপক আত্মস্বরূপ জ্ঞানে "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন" কর। পরন্তু জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের সচরাচর যাবতীয় স্থূল পদার্থাবলম্বনে তোমার স্থূলবুদ্ধির বহির্ভূত যত জীব বা সূক্ষ্মদেহস্থ মন, বুদ্ধি, অহংকারাদি পদার্থ আছে, তৎসমস্তই সেই বিন্দুরূপী পরম শিব বা পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপে "আত্ম-দর্শন-যোগ" দৃষ্টিতে, তোমার সহিত অভেদাত্মক ভাবে, সমস্তই তোমার বা আত্মার বিশ্বব্যাপক বিরাট মূর্ত্তি। তোমার অন্তর বাহির সবই সেই অখণ্ড বিরাট-ব্রহ্ম-স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক স্থূলে তিনি, প্রত্যেক সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মও তিনি। বৃহৎও তিনি, আবার ক্ষুদ্রও তিনি; অণু হইতে অণুও তিনি, আবার বৃহদ্বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে বৃহত্তরও তিনি। এইরূপে,—স্থলে তিনি, জলে তিনি, বায়ুতে তিনি, আকাশে তিনি, মনেতে তিনি, বুদ্ধিতে তিনি, অহংকারেও তিনিই বিরাজিত। তিনিই আত্মা, তিনিই

অন্তরাত্মা, তিনিই জ্ঞানাত্মা, এবং তিনিই পরমাত্মা। আবার তিনিই ক্ষিতি, তিনিই অপ, তিনিই তেজ, তিনিই মরুৎ, তিনিই ব্যোম; তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই গ্রহ নক্ষত্র, তিনিই আলো, তিনিই তিমির, তিনিই জলবিন্দু, এবং তিনিই অনন্ত বারিধি; বৃক্ষও তিনি, লতাও তিনি, পশুও তিনি. পক্ষীও তিনি, কীটও তিনি, পতঙ্গও তিনি; সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ-বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভাবে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া তিনি বিরাটরূপে অবস্থান করিতেছেন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

গীতা ১৩ অঃ

তিনি ইন্দ্রিয়গুণগ্রামের আবাসস্থান, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, সঙ্গ শূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্ত্বাদিগুণরহিত, অথচ সত্ত্বাদি গুণের পালক।

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

গীতা ১৩ অঃ

তিনি জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন। স্থাবর জঙ্গমও তিনি, সূক্ষ্মাদি অস্ত রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। অজ্ঞানিগণের পক্ষে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের সন্নিকটস্থ। তিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ, 'শিব' স্বরূপ,—এই দেহাভ্যন্তরস্থও তিনি, স্থূলদেহও তিনিই, সুতরাং এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ই "তিনি" বা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সর্ব্বময় "আমি" হয় তিনিই—আমি, না হয় আমিই—তিনি, অভেদ। অতএব সর্ব্বভূতেই "আমি"; একমাত্র আমিই বিশ্বময়।

"ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদৈস্তু গুণভেদেন সম্মতম্।
তদ্ব্রহ্মং দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিবম্॥
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্নিচ্ছয়া বিকরোতি চ॥"

একব্রহ্ম দ্বিবিধ সগুণ ও নির্গুণ। এই উভয়বিধ ব্রহ্মই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। মায়াশ্রিত ব্রহ্মই সগুণ এবং মায়াতীত ব্রহ্মই নির্গুণ।

স্বেচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিভিন্ন ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিধান করেন। তিনিই বেদোক্ত সহস্রশীর্ষ পুরুষ।

"সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতোস্পৃত্যত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

বেদপুরুষসূক্ত

সহস্র অর্থাৎ অনন্তশির সর্ব্বজ্ঞ অক্ষি ও পাদ সমন্বিত পুরুষ; অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ ও সর্ব্বভূমি (সপ্তলোক) প্রকাশে আত্মজ্যোতিতে অধিষ্ঠিত। দশাঙ্গুল প্রমাণ এই হৃদয়াভ্যন্তরে সদা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় বিভূতিযোগে বলিয়াছেন।—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

গীতা ১০ অঃ

হে গুড়াকেশ! ভূতগণের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা আমি। ভূতগণের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকও আমি। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগ-পরায়ণ যোগী ভিন্ন, তাঁহাকে সাধারণ চক্ষে দর্শন করা যায় না। ইহাও তাঁহারই বাক্য।—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" গীতা ৬ অঃ

যোগ দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সর্ব্বভূতকে আত্মার অভেদ দর্শন করেন। ইহাই নিত্য সন্ধ্যা পূজাদি বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাদৃশ প্রকার বাহ্য-পূজানুষ্ঠানের নামই "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ"। এজন্য তিনি আরও বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" গীতা ৬ অঃ

যিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন করেন এবং আমাতে (আত্মাতে) জীবমাত্র দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।

অতএব আমরা যদি বাহ্য-পূজা বা সর্ব্বভূতে "আত্ম-দর্শন-যোগ" বলে জ্ঞান লাভ করিয়া, আমাদের দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ মধ্যে তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি, আমরা যদি আমাদের জীবন রক্ষোপযোগী সমস্ত পদার্থমধ্যেই পরমাত্মময় শিবের অনুভূতি লাভ করিতে পারি, তবে আর ইন্দ্রিয় সংযমাদি দুষ্কর বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে কেন? এবং সংসার ছাড়িয়া স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া "গাছতলাবাসী"ই বা হইতে হইবে কেন? সমস্ত পদার্থ হইতে মিথ্যা মায়া-মোহের আবরণ উন্মুক্ত

করিয়া যদি দৃঢ় বিশ্বাসবলে সমস্ত পদার্থকে আত্মা বা পরমেশ্বরের আবরণে আবৃত করিয়া লইতে পারি, তবে আর উহার মধ্যে আমাদের মোহকর অনিত্য আসক্তির বিষয় কি থাকিবে? সুতরাং গার্হস্থ্যআশ্রম, যোগ-তপস্যার প্রতিকূল মনে করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে বন জঙ্গলে যাইতেই হইবে, শাস্ত্র তাহা বলেন না। আমাদের শাস্ত্রবাক্য এই যে, তাহাদের প্রতি যে অনিত্য মায়া-মোহের আসক্তি, তাহাই ত্যাগ কর। এই আসক্তি ত্যাগের নামই "সর্ব্বত্যাগ"। তাহাই তীব্র বৈরাগ্য। "সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ"ই তাহার একমাত্র উপায়। দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে যদি ঐ আসক্তি ডাকিনীকে একবার সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধগামী করিয়া "আত্ম-দর্শন-যোগ"বলে তাহাকেও আত্মা বা ব্রহ্মজ্যোতির আবরণে আবৃত করিয়া ফেলিতে পার, তবে ঐ "আসক্তি" যে দিকে যখন দৃষ্টি করিবে, সেই দিকে তোমার আত্ম বা ভগবদ্দর্শন হইবে, সে আরও চমৎকার। তখন তোমার ভোগের জিনিষ, বিলাসিতার জিনিষ, চিরজীবন যাহা ভোগ বিলাসিতার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ, সে সমস্ত পদার্থ বা বিষয়-গুলিই আত্মা বা ব্রহ্মজ্যোতির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, তন্মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ-সত্তার উদ্ভব, তোমার স্থূল চক্ষে প্রতিভাত হইবে। সুতরাং সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগরূপ বাহ্য-পূজা আশ্রয় করিয়া সংসারের যাবতীয় পদার্থ ও বিষয়গুলি একমাত্র আত্মা বা ভগবৎ ভাবে আচ্ছাদন করিয়া ফেল। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র কি বলিয়াছেন দেখ—

"ঈশা বাস্যমিদংসর্ব্বং, যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ॥"

ঈশোপনিষৎ

জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই ঈশ্বরভাবে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগবলে সর্ব্বভূতকে আত্মায় বা ঈশ্বরভাবে আচ্ছাদন করিতে পারিলে, তখন তুমি সেই দিব্যনেত্রে যেদিকে যখন

দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাই তখন ভগবৎ বিভূতি মনে করিয়া, নিয়ত চৈতন্য-সমাধিতে "সচ্চিদানন্দ" ভাবে বিভোর হইয়া থাকিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন।—

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

গীতা ৬ অঃ

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে (আত্মাকে) একত্বে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, বিষয় সকলে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন। সুতরাং আত্মস্বরূপ উপাস্য বা ইষ্টদেব সেই একত্বের চরম আদর্শ। বহির্জগতে কাশীধামস্থ ৺বিশ্বনাথরূপী পরমাত্মাই সেই একত্বের আদর্শস্বরূপ শিবশক্তি অভেদাত্মক পূর্ণ ব্রহ্ম। অতএব আত্মস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী উপাস্য বা ইষ্টদেব উপেক্ষা করিয়া, অপরন্তু কাশীবাস করিয়া, ৺বিশ্বনাথ সন্নিধানে যাহারা আত্মবিস্মৃতি হেতু ভেদজ্ঞানে দ্বৈতের অনুগামী হয়, তাহারা শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘনকারী ও আত্মপ্রবঞ্চক।

শিষ্য—(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) গুরুদেব! ধন্য হইলাম, এরূপ জ্ঞানলাভ বর্ত্তমানে সকলের ভাগ্যে ঘটে না বলিয়াই কর্ম্মদোষে, অন্ধের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতেছে।

গুরু—থাম বৎস! সংসারে কয়জনে জ্ঞান পাইবার ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানীর অনুসরণ করিয়া থাকে? এবং জ্ঞান পাইলেই বা কি হয়? যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান আশ্রয়ে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় না হইবে, যে পর্য্যন্ত নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদিই, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ স্বরূপে আধ্যাত্মিক ভাবযুক্ত অভ্যাস-যোগ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাসে, আর্য্যসন্তানগণ একাগ্রতা সহকারে আত্ম-দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুলচিত্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই।

শিষ্য—ঠিক্ কথা প্রভো! আপনার কৃপায় আমরা ধন্য হইয়াছি। এস্থলে আর একটি কথা এই যে, শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইল, আপনার পূর্ব্ববর্ণিত বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সূক্ষ্মদেহস্বরূপ শালগ্রাম ও অগ্নি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বিবৃত করিলে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয়।

গুরু—বৎস! ঠিক্ কথাই বলিয়াছ। আমি "একত্বে"ই সব দেখিতেছিলাম, তাই পৃথক্ করিয়া কিছু বলি নাই। এখন সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। আচ্ছা বৎস! শালগ্রাম পূজার প্রধান মন্ত্র স্মরণ কর। "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা"। এই "পরমাত্মনে স্বাহা" বুঝিলেই সব বুঝিবে, ইহাই যথেষ্ট। গীতা উপনিষদের বাক্যে বিষ্ণু বা শালগ্রামের বিষয় স্ফুরণ হইয়াছে।

শিষ্য—অগ্নি বা যজ্ঞের বিষয়টি?

গুরু—তাহাও ঐ যজ্ঞাগ্নি স্থাপনের মন্ত্রটির দ্বারাই বুঝাইব, প্রথম অগ্নিস্থাপনের মন্ত্র সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত "ওঁ ভূর্ভুর্বস্বরোম্" এই মন্ত্রে অগ্নিকে স্থণ্ডিলের উপর আত্মাভিমুখে সংস্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।

"ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপ মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

ইহার অর্থ প্রায় গীতার শ্লোকদ্বারাই বুঝিতে পারিবে। অতঃপর ব্যাহৃতি ও মহাব্যাহৃতিহোম, রুদ্রজপ ইত্যাদি যাহা কিছু তৎসমস্তই সূক্ষ্ম আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্ভূত যোগ-পদবাচ্য। সুতরাং প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবে, সমস্ত বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয়গুলিমধ্যে মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সকলের লক্ষ্যই মুক্তি এবং একমাত্র পন্থা "আত্ম-দর্শন-যোগ"। আত্ম-দর্শন-যোগ বলেই সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ হয়।

আত্ম-দর্শন-যোগ

চতুর্থ স্তর।

ষট্‌ত্রিংশ প্রকরণ।

আত্ম-দর্শন-যোগে সমাধি।

সমাধি আত্ম-দর্শন-যোগের পূর্ণাবস্থা। সমাধির অপর নাম ব্রহ্মসত্তার বা ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞান। আত্ম-দর্শন-যোগ ভিন্ন সমাধি অবস্থা লাভ হয় না। সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শনই, আত্ম-দর্শন-যোগের সিদ্ধাবস্থা এবং সেই সিদ্ধাবস্থাই সমাধি লাভের প্রথম সোপান। আত্মা বা পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও একাগ্রতা বলেই আত্ম-প্রত্যক্ষ এবং পুনঃ পুনঃ সেই প্রত্যক্ষ ফলেই সর্ব্বভূতে আত্ম-বিকাশ, পরন্তু সর্ব্বভূতে সেই আত্মার সন্দর্শন ঘটিলেই সমাধিযোগ্য যোগসিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। "সমাধি" নাম শুনিয়াই কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, স্থাবরের ন্যায় নিশ্চল, কাষ্ঠ প্রস্তরাদির ন্যায় কঠিন ও জড়াবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বুঝি সমাধি হয়। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। কারণ কাষ্ঠ প্রস্তরাদির ন্যায় জড় বা অচৈতন্যাবস্থাই যদি সমাধি হয়, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে জড় বা অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ত তাহা সমাধি বলিয়া গণ্য হইতে পারে? তবে আর এজন্য যোগ সাধনাদির প্রয়োজনীয়তা কি? যে কোন প্রকার দৈহিক আঘাত দ্বারা সংজ্ঞারহিত, অথবা তীব্র-শোক-দুঃখজনিত মানসিক অবসন্নতা, কিম্বা সুষুপ্তি; অথবা কতকটা

বিষাক্ত দ্রব্য সেবনাদিদ্বারা, যে কোন উপায়ে তাদৃশ জড়াবস্থা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, তদবস্থায় যখন মানসিক উন্নতি বা জ্ঞানের বিকাশ সাধন হয় না, তখন উহাকে কিছুতেই সমাধি বলা যাইতে পারে না। সমাধির অর্থ ই "আত্ম দর্শন-যোগে" আত্মা বা পরমেশ্বরের সহিত একত্ব ভাবযুক্ত হইয়া, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত-জ্ঞান-সমুদ্র হইতে নানাবিধ অমূল্যরত্ন স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রকাশক পরমতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আত্মশক্তি বৃদ্ধি করা। আমাদের পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণও তদুদ্দেশ্যেই সমাধি যোগাবলম্বনে ত্রিদিব-বাঞ্ছিত অপরাজেয় আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া, আবশ্যক ও ইচ্ছামত জগতের প্রভূত মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাহা বিনিয়োগ করিতেন। এজন্য তাঁহারা জগৎ-পূজ্য হইয়াছিলেন। এই সমাধিযোগে সিদ্ধ না হয়, জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, ব্রহ্মার-ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর-বিষ্ণুত্ব, শিবের-শিবত্ব, সমস্তই এই সমাধিযোগের ফল। সমাধিযোগের শেষসীমা অনন্ত; যতই অগ্রসর হও দেখিতে পাইবে, সেই অনন্তের অন্ত নাই। সুতরাং যাঁহারা সমাধিকে একমাত্র জড়ত্ব বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের যুক্তি তর্কের সীমাতেও পৌছিতে পারেন নাই। পরন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ আত্ম-দৃষ্টি বিহীন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন" এই সমাধি তত্ত্বের প্রথম সোপান। এই সমাধির পূর্ব্বাবস্থায় যোগী বা সাধকের মধ্যে আট প্রকার ভাবোদয় হয়, সাধারণ ভাষায় লোকে তাহাকে "ভাবাষ্টক" বলে।

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ। এতন্মধ্যে সুখ কিম্বা দুঃখ হইতে যে ইন্দ্রিয়-কর্ম্মজনিত-জ্ঞান অর্থাৎ সংজ্ঞাশূন্যতাবস্থা আগত হয় তাহাকে প্রলয় বলে। এই প্রলয়াবস্থায় হঠাৎ সাধক বা যোগী ভূপতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হয়।

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ॥" যোগদীপিকা

এই সকল ভাবোদয় সঙ্গে সঙ্গে সমাধি অবস্থা আগত হইতে থাকে। যোগী তখন আত্ম-দর্শন-যোগে বিভোর থাকিতে সততই ইচ্ছা করে। কারণ আত্ম-দর্শন-যোগ দ্বারা তাঁহার আত্মা-পরমাত্মার অভেদত্ব স্বভাবতঃই সম্পন্ন হয়। এতাদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ অবস্থার নামই সমাধিযোগ। যখন জীবাত্মা, একমাত্র ব্রহ্ম-বিন্দুতে অবস্থিত হয়, সেই অবস্থার নামই প্রকৃত সমাধি। বহু ভাগ্যফলে জীবের এই পরমানন্দকর সমাধিযোগ লাভ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—

"সমাধিশ্চ পরোযোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ॥"

"বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী, সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ॥"

জন্ম-জন্মান্তরীণ বহু ভাগ্যবলে সমাধি নামক উৎকৃষ্ট যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানদাতা গুরুকৃপা বা গুরুপ্রসন্নতা লাভ হইলে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই, সমাধিযোগ লাভ হয়। দিনে দিনে বিদ্যা, গুরু ও আত্মার প্রতি যাঁহার প্রতীতি জন্মে ও দিনে দিনে যাঁহার মনের প্রবোধ হইতে থাকে, সমাধিযোগ সাধনে সেই যোগীপুরুষই প্রকৃত

অধিকারী হইয়া থাকেন। সুতরাং গুরুপ্রীতিতে বা গুরূপদেশে একান্ত অনুরাগ ভিন্ন সমাধিযোগ কথনই লাভ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে গুরু ও গুরুবাক্যে চিত্ত একাগ্র রাখিয়া সমাধি অভ্যাস করিলে, অচিরেই "আত্ম-দর্শন-যোগে" সমাধি অবস্থা লাভ হয়।

চৈতন্য ও জড়ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। ইহারাও আবার প্রত্যেকে অবস্থাভেদে তিন তিন প্রকার। সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ করিয়া "সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ" অর্থাৎ মায়াকল্পিত জীব ও জগৎকে মিথ্যাবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানে স্বরূপাবস্থিত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের প্রতীক্ষায় জীবিতকাল পর্য্যন্ত যে অবস্থান করেন, তাঁহারাই চৈতন্য সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দবস্তুনি।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাদ্হৃদয়ে বাথবা বহিঃ॥
সবিকল্পোঽবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধোহৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা॥
কামাদ্যাশ্চিত্তসাদৃশ্যাত্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনাম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥
অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ সপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দ বিদ্ধোঽয়ং সবিকল্পঃ সমাহিতঃ॥
স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্য শব্দাবুপেক্ষ্য তু।
নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যান্নির্ব্বাতস্থলদীপবৎ॥
হৃদিব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমাধিরাদ্যঃ সন্মাত্রে নামরূপে পৃথক্ স্থিতে॥

অখণ্ডৈকরসং বস্তু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্‌।
ইত্যবিচ্ছিন্ন-চিন্তেয়ং সমাধিমধ্যমো ভবেৎ ॥
স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাত্তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ।
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্‌ভির্ন্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্‌ ॥"

শাঙ্করভাষ্য

"সচ্চিদানন্দ" পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। নাম-রূপ কল্পিত বা মিথ্যা; ইহা নিশ্চয় করিয়া, নামরূপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে বা বাহ্যে সর্ব্বদাই সমাধি আশ্রয় করিবে। হৃদয় বা অন্তর সমাধি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে, দুইপ্রকার। আবার সবিকল্প সমাধিও দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধভেদে দুইপ্রকার। ভাবাভাব চিত্তের কামাদিবৃত্তিসমূহও, ভাবাভাব ধর্ম্মশালী। কারণ চিত্তের, সদ্ভাবে তাহাদিগের সদ্ভাব ও চিত্তের অভাবে তাহাদিগের অভাব। জাগ্রতাবস্থায় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃত্তিসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ একবৃত্তির পর অপর বৃত্তির উদয় হয়। চিত্ত কখনও বৃত্তিশূন্য থাকে না। একবৃত্তির লয় হইলে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপর বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। পরন্তু সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে চিত্তের লয় হওয়ায়, আর কোনরূপ বৃত্তিরও উদয় হয় না। সেই চিত্তবৃত্তির বিবিধ প্রকার বিকৃতাবস্থা, তাহার ভাব ও অভাব এবং তদুভয়ের সন্ধিস্থল যিনি স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ করেন, তিনিই প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। অপরোক্ষভাবে ইহা অবগত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিবে অর্থাৎ দৃঢ়তার জন্য পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। ইহাই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প-সমাধি। এই দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধিদ্বারা প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অনুভূতি দৃঢ় হইলে, সেই অসঙ্গ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য বা "পরমাত্মাই আমি" এইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপ দৃঢ় ভাবনাকে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পসমাধি বলে। পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা যখন চিত্ত সুস্থির হইয়া, স্বরূপের সহিত একত্ব লাভ করিবে, তখন দৃশ্য ও শব্দ উভয়েই আপনা হইতে অন্তর্হিত হইবে। তখন কেবল স্বয়ংসাক্ষী ও সাক্ষ্যভাবরহিত অখণ্ড "সচ্চিদানন্দ"-স্বরূপ পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকিবে এবং চিত্ত নির্ব্বাতদীপকলিকারন্যায় নিশ্চল হইয়া তদাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই নির্ব্বিকল্পসমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এই ত্রিবিধ অন্তর সমাধির ন্যায়, ত্রিবিধ বাহ্য-সমাধির অভ্যাস করিবে। বাহ্যভাবেও "সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন-যোগে" কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কল্পিত নাম ও রূপ অংশকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের অধিষ্ঠান "সচ্চিদানন্দ"স্বরূপ পরব্রহ্মেতে চিত্তের যে সমাধান, তাহাকেই প্রথমোক্ত দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পসমাধি বলা যায়। বর্ত্তমানে বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠানাদি এই ভাবে পরিবর্ত্তিত বা সুসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, সর্ব্বভূতে-আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া, চিত্ত সমাধিযোগ্য ভাবে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। অপরন্তু অখণ্ড একরস "সচ্চিদানন্দ" ভাবে সর্ব্বাধিষ্ঠান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে অবিচ্ছেদে ও অভেদভাবে অর্থাৎ আপনার স্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভেদভাবে চিন্তা করা, দ্বিতীয়—শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পসমাধি বলিয়া উক্ত হয়। আর স্বরূপানন্দানুভূতিজন্য চিত্তের যে স্থির বা স্তব্ধীভাব অর্থাৎ স্পন্দনরহিতাবস্থা, ইহাই তৃতীয়—নির্ব্বিকল্পসমাধি বলিয়া উক্ত হয়। নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা ও মানসপূজার অনুশীলনে ইহা অভ্যাসকরাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই ত্রিবিধ হৃদয়গত অর্থাৎ মানসকর্ম্ম এবং ত্রিবিধ বাহ্য-অবগত এই ষড়্‌বিধ সমাধি অভ্যাসদ্বারা নিরন্তর কালক্ষেপ করিবে। ইহার যে কোন একপ্রকার সমাধিভাব ভিন্ন সাধক বা যোগী কদাচ অবস্থান করিবে না। শাস্ত্রানুসারে এই

উদ্দেশ্য সুসাধন জন্যই নিত্যকর্ম্ম স্বধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠেয়। এ নিমিত্ত তাদৃশ নিত্যকর্ম্মই "আত্ম-দর্শন-যোগের পূর্ব্বাভ্যাস" স্বরূপে কথিত হইয়াছে। এরূপভাবে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান হইলেই, তদ্দ্বারা হৃদগ্রন্থি ছিন্ন ও সর্ব্ব সংশয় নষ্ট হইয়া "আত্ম-দর্শন-যোগে" সাধক বা যোগী প্রকৃত সমাধি অবস্থা লাভের যোগ্য হইতে পারেন। শাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" মুণ্ডকোপনিষৎ

আত্ম-দর্শন-যোগে হৃদ্‌গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি) অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্যভাব নষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞেয়বস্তুবিষয়ক মনের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং প্রারব্ধ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়।

যাঁহারা আত্মবিস্মৃত বা আত্ম-অবিশ্বাসবশে অনিত্য-সংসার-মায়া-মরুতে কামনা-বাসনা-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, একমাত্র ভোগ-সুখের আশায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন এবং সত্য মিথ্যা যে কোন উপায়ে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে মনুষ্যত্বের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে বা ধর্ম্মের সঙ্গে; লুকোচুরি খেলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তাঁহারা এতাদৃশ সংসার-মোহ-জনিত-চিত্ত-বিক্ষোভ-নিবৃত্তি-জন্য সর্ব্বদা ভগবদ্বাক্য মনে রাখিবেন যে—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং"

যাঁহারা বিষয়-চিন্তানিরত মনে সন্ধ্যা-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম একমাত্র বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। পরন্তু তাহাই নিত্যকর্ম্ম নামে কেবলমাত্র ভোগ-সুখের জল্পনা কল্পনা করিয়া, দ্বেষ-হিংসা-পরশ্রীকাতরতায় অভিভূত হইয়া, পরনিন্দার সূত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বিষয়-মোহে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহারাও মনে রাখিবেন যে, তাঁহাদের এই সন্ধ্যা-পূজার বাহ্য-আড়ম্বরাবরণে-আবৃত মানসিকভাব সমূহ ভগবান্ দেখিতেছেন, শুনিতেছেন ও বুঝিতেছেন। কারণ তিনি—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

সেই অমৃতস্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বত্র বিরাজিত। যখন যাহা মনে করিতেছ, যাহা অনুষ্ঠান করিতেছ, দর্শন করিতেছ, শ্রবণ করিতেছ, যাহা মৌখিক ভাবে প্রকাশ করিতেছ, তৎসমস্তই তিনি অন্তর-বাহিরে থাকিয়া বিদিত হইতেছেন। যে কর্ম্মোদ্দেশ্যে যখন যেখানে যাইতেছ, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিয়া, সমস্তই পরিজ্ঞাত হইতেছেন। একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেই দেখিবে, তোমার অগ্রে তিনি, পশ্চাতে তিনি, উত্তরে তিনি, দক্ষিণে তিনি, ঊর্দ্ধে তিনি, অধোভাগেও তিনিই বিরাজিত।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥" মণ্ডুকোপনিষৎ

ইহা মনে রাখিতে হইবে, অথবা সম্মুখে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিলে, তদ্দৃষ্টে চিত্তচাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইবে। অন্তর্ব্বাহ্যে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি পূর্ব্বক ক্রমে চিত্ত সমাহিত ও সমাধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজিত।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোঽপ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ ॥"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

জীবপুরুষের অবয়ব অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায়, তিনি সংকল্প, অহংকার, বুদ্ধি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একমাত্র আশ্রয়; এই জীব-পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মস্বরূপ উপাস্য বা ইষ্টদেবতাকে অভ্যন্তরে দর্শন করিতে পারেন। এতাদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে

পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে স্মরণ রাখিলে, চিত্ত সমাহিত বা সমাধি প্রথারূঢ় হইবে। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করা, তাঁহার নাম জপ করা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা, তাহাও আত্মজ্ঞানভাবযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন।—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"

ঈশোপনিষৎ

হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! জ্যোতির্ম্ময় (সূর্য্য-মণ্ডল) আচ্ছাদন দ্বারা সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যরূপী তদীয় আরাধনায় এবং প্রকৃতরূপে স্বধর্ম্ম সেবায় আমি সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছি। সুতরাং যাহাতে আমি সত্য ও আত্মস্বরূপ তদীয় রূপ দেখিতে সমর্থ হই, তদ্রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গের সেই হিরণ্ময় আচ্ছাদন পাত্র উন্মোচন কর। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন।

"তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্"। সঃ পাঃ

সেই সমাধি সময়ে অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধাবস্থায় দ্রষ্টা (পুরুষ) স্বরূপে অবস্থিতি করেন; সুতরাং তদনুরাগে সাম্যাবস্থায় সেই শিবস্বরূপ পরমাত্মায় একত্বরূপে অবস্থিতির নামই "আত্ম-দর্শন-যোগ"। এতাদৃশ যোগযুক্ত অনন্যস্মরণবলেই সমাধি অবস্থা লাভ হয়। শরীর হইতে মনকে পৃথগ্ জ্ঞান করিয়া পরমাত্মার সহিত একত্ব ভাবাপন্ন করাকেই সমাধি বলে। সমাধি ষড়্বিধ যথা—

(১) ধ্যানযোগ সমাধি। (২) নাদযোগ সমাধি। (৩) রসানন্দ-যোগ সমাধি। (৪) লয়যোগ সমাধি। (৫) ভক্তিযোগ সমাধি। (৬) রাজযোগ সমাধি।

১। ধ্যানযোগ-সমাধি—ভ্রূ-যুগলের মধ্যে স্থিরদৃষ্টি পূর্ব্বক একান্ত মনে "আত্ম-দর্শন-যোগে" বিন্দুময় ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই বিন্দুস্থলে চিত্ত নিয়োজিত করিবে। অনন্তর শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে আনয়নপূর্ব্বক, শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশকে জীবাত্মা মধ্যে সমানয়ন করিবে। এইরূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া "সচ্চিদানন্দ"ভাবে "স্বরূপ" চিন্তা করাই ধ্যানযোগসমাধি।

২। নাদযোগ-সমাধি—রসনার নিম্নভাগে জিহ্বামূল ও জিহ্বা যে শিরা কর্তৃক সংযুক্ত আছে, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কোন সদ্‌গুরূপদিষ্ট-ভাবে, ঐ শিরা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সর্ব্বদা জিহ্বার নীচে রসনাকে পরিচালিত করিবে এবং রসনাকে নবনীত দ্বারা দোহন পূর্ব্বক লৌহযন্ত্র (সাঁড়াশী) দ্বারা জিহ্বাকর্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যহ এইরূপ করিলে, জিহ্বা দীর্ঘতা লাভ করে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা জিহ্বা এরূপ লম্বিত করিবে যে, উহা অনায়াসে উর্দ্ধগামীভাবে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। উক্ত প্রকার খেচরী যোগ অবলম্বনে (১) রসনা উর্দ্ধগামী করিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিলেই, নাদযোগ সমাধি লাভ হয়।

---

(১) খেচরীমুদ্রাযোগ।

কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥ যোগদীপিকা

রসনাকে বিপরীতগামিনী করিয়া তালু কুহরে প্রবেশিত করিবে। পরে স্থির দৃষ্টিতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চিত্ত ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। এই খেচরী যোগ অনুশীলন করিতে হইলে, [illegible] বিপরীতগামিনী করিবার জন্য ছেদন, দোহন, চালনাদি কতকগুলি ক্রিয়া আবশ্যক।

ছেদনচালনদোহৈঃ কলাং ক্রমেণ বর্দ্ধয়েৎ।
সা যাবদ্ ভ্রূমধ্যং স্পৃশতি তদা সিদ্ধিঃ খেচরী॥

৩। রসানন্দ-যোগ-সমাধি।—রাত্র্যর্দ্ধাংশ অতীত হইলে, যে স্থানে কোন প্রাণীর শব্দ কর্ণগোচর হয় না, সেই স্থানে গিয়া সাধক নিজ হস্ত দ্বারা স্বীয় কর্ণ যুগল বদ্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিলে, সাধক দক্ষিণশ্রোত্রে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবে। ঐ সকল শব্দ দেহমধ্য হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে ঝিল্লিবৎ, পরে বংশীধ্বনী, তদনন্তর মেঘগর্জ্জন, পরে ঝর্ঝরি নামক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, অতঃপর ভ্রমরের গুন্‌গুন্ ধ্বনি শুনিতে পাইবে। অনন্তর কাংস্য, ঘণ্টা, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আনন্দ দুন্দুভি ধ্বনি কর্ণগোচর হইবে। যে স্থান হইতে ঐ সকল সুমধুর শব্দ সমুত্থিত হয়, মনকে সেই স্থানে সমাহিত করিতে পারিলেই, রসানন্দ-যোগ সমাধি হয়। ইহাই ভ্রামরী যোগ।

এই যোগ সাধন সময় জিহ্বাচ্ছেদন চালন ও দোহন করিতে হয়। তদ্দ্বারা রসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই খেচরীযোগ সিদ্ধি হয়। সদ্গুরুপদিষ্টমতে নিম্নলিখিত ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিবে।

স্নুহীপত্রনিভং শস্ত্রং সুতীক্ষ্ণং স্নিগ্ধনির্ম্মলম্।
সমাদায় ততস্তেন রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ॥
ততঃ সৈন্ধবপথ্যাভ্যাং চূর্ণিতাভ্যাং প্রঘর্ষয়েৎ।
পুনঃ সপ্তদিনে প্রাপ্তে রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ॥
এবং ক্রমেণ ষণ্মাসং নিত্যং যুক্ত সমাচরেৎ।
ষণ্মাসাদ্রসনামূলশিলাবন্ধঃ প্রণশ্যতি॥

স্নুহীপত্রবৎ তীক্ষ্ণ বিমল ও স্নিগ্ধ অস্ত্র দ্বারা রসনার নিম্নভাগস্থ শিরামূল রোম পরিমাণ সূক্ষ্মভাবে ছেদন করিবে। তৎপর সৈন্ধব ও হরীতকীচূর্ণদ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এই ভাবে ছয় মাস ছেদন ঘর্ষণ করিলে রসনা বিপরীতগামিনী হইয়া কপাল কুহরে প্রবিষ্ট হইবার প্রতিবন্ধক শিরাসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়। এতদ্দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মরণ নিবৃত্তি হয়

৪। লয়-যোগ-সমাধি—সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কর্ণযুগল অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা, নয়নযুগল তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা, নাসিকাদ্বয় মধ্যমাযুগল দ্বারা ও বদন অনামিকা-কনিষ্ঠা-যুগল দ্বারা নিরোধ করিবে এবং প্রাণবায়ুকে "কাকীমুদ্রা" যোগে সমাকর্ষণ পূর্ব্বক অপানবায়ুসহ সম্মিলিত করিতে হইবে। এইরূপে দেহস্থ ষট্পদ্ম চিন্তাপূর্ব্বক "হুঁ ওঁ হংসঃ" এই মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডলী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সহস্রারে সমানয়ন পূর্ব্বক নিজকে শক্তিময় ভাবনা করিতে করিতে পরমাত্মা স্বরূপ শিবের সহিত সঙ্গমাসক্ত হইয়া শৃঙ্গাররসে মগ্ন থাকিবে। এরূপ জ্ঞান দ্বারা আনন্দময় অভিন্নভাবে মিলিত হইলে, অহংব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান হইবে। ইহার নামই লয়যোগ সমাধি।

৫। ভক্তিযোগ-সমাধি—শান্ত ও একাগ্রভাবে ভক্তিযোগে পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়দেশে ইষ্টদেবের স্বরূপ ভাবনা করিবে, এরূপ অনুষ্ঠান করিলে, আনন্দাশ্রুপাত হয় ও শরীর পুলকিত হয়; পরন্তু ইহা দ্বারা চিত্তের উন্মীলন হয়, ইহার নাম ভক্তিযোগ সমাধি।

৬। রাজ-যোগ-সমাধি।—বৃত্তিসমূহ নিরোধ করিয়া চিত্তকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে। ইহাই রাজ-যোগ-সমাধি। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।—

"নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥ শঙ্করোপনিষৎ

নির্ব্বিকার ভাবে ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি দ্বারা অন্যান্য বৃত্তি-সমুদয়ের সম্যগ্‌রূপ যে বিস্মৃতি, তাহাই জ্ঞান নামক সমাধি বলিয়া উক্ত। সদ্গুরূপদিষ্ট ভাবে "আত্ম-দর্শন-যোগ" ভিন্ন কোন অবস্থাতেই কোন সমাধি সিদ্ধ হয় না। সমাধির স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥
পাতঞ্জলদর্শন

কেবলমাত্র আত্মা আছেন এরূপ আভাস জ্ঞান থাকিবে, আর অন্য পদার্থ জ্ঞান কিছুই থাকিবে না, এই ভাবে ধ্যেয় আত্মাতে যে চিত্তের লয় তাহার নাম সমাধি। পূর্ব্বোক্ত সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির ন্যায় মহর্ষি পতঞ্জলি "সম্প্রজ্ঞাত" ও "অসম্প্রজ্ঞাত" দ্বিবিধ সমাধির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ ভাষায় ইহাকে চৈতন্য ও জড় সমাধি বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং নামের পার্থক্য ভিন্ন মূলে কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়না। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় শ্রুতিতেও উক্ত আছে।

"ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা।
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ ধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ॥
প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদায়কম্।
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনঃ প্রিয়ঃ॥" মুক্তিকোপনিষৎ

যখন অহংকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মাকারে চিত্তের বৃত্তি হইতে থাকে, তাহাকে 'সম্প্রজ্ঞাতসমাধি' বলে। ইহা ধ্যানাভ্যাসের উৎকর্ষতাবশতঃ সম্পন্ন হয় এবং যখন চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যাইবে, সেই অবস্থার নাম 'অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি'। ইহা পরমানন্দ প্রদায়ক এবং যোগিগণের প্রিয়বস্তু।

"জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি
তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানং সবিকল্পসমাধিঃ॥" বেদান্তসার

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ত্রিপুটির জ্ঞান সত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি।

"জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া
বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানং নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ॥"
বেদান্তসার

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ভিন্ন ভিন্ন ত্রিপুটির জ্ঞানের অভাব হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারচিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি।

"সমাধিব্রহ্মণিস্থিতিঃ"। গারুড়োপনিষৎ

পরব্রহ্মে নিশ্চলভাবে চিত্তের স্থিতিকে সমাধি বলে। অপরন্ত—

"অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে॥"

পরব্রহ্মে চিত্তের তন্ময়ত্ব হইয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই ভাবে যে স্থিতি তাহাকে সমাধি বলে।

উভয়োরাত্মনোরৈক্যং সমাধিশ্চ বিধীয়তে।

যথা সংক্ষীয়তে প্রাণোমনশ্চৈব বিলীয়তে॥" গোরক্ষ সংহিতা

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাবে যে স্থিতি তাহা সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। ঐ সমাধিকালে মন ও প্রাণ উভয়েই লয় প্রাপ্ত হয়।

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ"। দত্তাত্রেয় সংহিতা

জীবাত্মার ও পরমাত্মার সমতাবস্থাই সমাধি বলিয়া কথিত হয়। ভগবদ্‌গীতায় জড় ও চৈতন্য দ্বিবিধ সমাধির সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্॥
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ১৮ অঃ

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ভাবে ধৃতি দ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ এবং রাগ দ্বেষ অপসারিত করিয়া নির্জ্জনবাসী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর ও মন সংযতকারী, সর্ব্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া

সম্যগ্ রূপে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক অহংকার, বল, দর্প কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম (আমি আমার ভাব রহিত) শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান। ইহাই গীতোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধিভাব। পরন্তু অর্জ্জুনকে সবিকল্প সমাধির ভাবও বলিয়াছেন।—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥" গীতা ১৮

সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী মৎপরায়ণ ভক্ত আমি (আত্মা) যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, এবং যাহা বাক্য-মনের অগোচর পরমভক্তি (অভেদজ্ঞান) দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে সেইরূপ জ্ঞাত হন। অনন্তর আমাকে স্বরূপ জানিয়া, আমাতে প্রবেশ করেন; অর্থাৎ আমিই হইয়া যান, তদবস্থায় একত্বভাবে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! তুমিও চিত্তদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণভাবে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। সুতরাং সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় সেইরূপ মচ্চিত্ত ও মদ্গতভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, অন্তর-বাহিরে সতত ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকা যায়। তখন তৎপ্রসাদাৎ, অর্থাৎ পৃথগ্ভাব বিদূরিত হইয়া "মৎপ্রসাদাৎ" ভাবে চিত্ত স্থিত হয়। ইহার নামই চৈতন্যসমাধি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সদ্গুরূপদিষ্টক্রমে ইহার যে কোন ভাবাবলম্বন ব্যতীত দেহাত্মবোধে যে কোন বাহ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা যজ্ঞ-হোমাদি

কোন কর্ম্মই সমাধির যোগ্য নহে। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলেই হোম হয় না, যিনি ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণের হোম করিতে পারেন, তিনিই সমাধিসম্পন্ন যথার্থ যাজ্ঞিক। এ সম্বন্ধে বেদে উক্ত আছে—

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি

যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ। সামবেদ ছান্দোগ্য

যদি কোন লোক এই বিশ্বব্যাপী বিরাটপুরুষের উপাসনা না জানিয়াই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে উপেক্ষা করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় তাহা নিষ্ফল হয়। সুতরাং অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ প্রকৃত হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে জীবনঘৃতের আহুতিরূপ সমাধিযোগই প্রকৃত হোম জানিবে।

এইরূপ সমস্তকর্ম্মমধ্যে সমাধি অবস্থা আনয়নের চেষ্টাই শাস্ত্রোদ্দেশ্য। পরন্তু তাদৃশ সমাধিদ্বারাই প্রভূত শক্তিস্বরূপ বিপুলজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা যদিচ্ছাভাবে অলৌকিক কর্ম্ম সকলও সাধন হইতে পারে। ক্ষুধা-পিপাসাদি জয় এমন কি মৃত্যুজয়ী পর্য্যন্ত হইতে পারে। পরিশিষ্ট ভাগে (পঞ্চম স্তরে) এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

সবিকল্প সমাধি অবস্থাতেই ঐ সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় দ্বৈতভাব কিছুমাত্র থাকে না। অহংভাব পরিত্যক্ত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি হয়। পরন্তু সেই অবস্থাটি যে কিরূপ তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। যেহেতু মনও তাহা মনন করিতে সমর্থ নহে, কারণ মন সে অবস্থায় সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাই স্বপ্রকাশরূপ পূর্ণব্রহ্মভাবে স্থিতি অবস্থা। তাহা বাক্য ও মনের অতীত, অতএব মন ও প্রাণকে পরব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মাতে সতত যুক্ত রাখাই যথার্থ সমাধি এবং সেই সমাধিলাভের একমাত্র উপায় "আত্ম-দর্শন-যোগ"।

আত্ম-দর্শন-যোগ

চতুর্থ স্তর।

সপ্তত্রিংশ প্রকরণ।

আত্ম-দর্শন-যোগে মুক্তি।

সাধারণতঃ জীবমাত্রেই মুক্তি প্রয়াসী। বন্ধনে থাকিতে কেহই ইচ্ছা করেন না সত্য, কিন্তু বন্ধনপাশ যদি একটু মোলায়েম হয়, অর্থাৎ যদি বাসনা বা আসক্তির সুবর্ণ শৃঙ্খল হয়, তবে আর সে বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। সুতরাং সংসারে প্রকৃত বন্ধন কি এবং প্রকৃত মুক্তিই বা কি তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। লৌকিক দৃষ্টিতে পরাধীনতাকেই বন্ধন বলিয়া মনে করেন। সে ক্ষেত্রে পরাধীনতা জিনিষটি কি? এবং কেনই বা সে পরাধীন হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বন্ধন মুক্তির কেহ চেষ্টা করেন না; ফলে দেহাত্মবোধই বন্ধনের কারণ। অনাত্ম-পদার্থে আত্মজ্ঞান করাই এই বন্ধনের কারণ। মায়া-মোহ, স্বার্থপরতাই এই বন্ধনের কারণ। নচেৎ মানব বদ্ধ কোথায়? নিজ-বাসভূমেই পরাধীন। অর্থাৎ স্থূলদেহের রিপু ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়াই, পরাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার "আত্ম-দর্শন-যোগে" অবলোকন কর, দেখিবে একমাত্র মনই তোমার বন্ধনের কারণ। তোমার মনই পরাধীনতার কারণ। মন সতত প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া তোমার বন্ধন

ঘটাইতেছে। আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলনে মনকে নিবৃত্তিমার্গে পরিচালন কর, দেখিবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া তুমি "জীবন্মুক্ত" হইবে।

বন্ধন ও মুক্তি মনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বাসনা বা প্রবৃত্তি-যুক্ত মনই "বদ্ধ" এবং বাসনাহীন নিবৃত্তি-বিযুক্ত মনই "মুক্ত"। এসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্বাসনয়াঽযুক্তং মনোবদ্ধং বিদুর্ব্বুধাঃ।
সম্যগ্‌ বাসনয়া ত্যক্তং মুক্তমিত্যভিধীয়তে॥"

মুক্তিকোপনিষৎ

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন বাসনাযুক্ত মনকেই বদ্ধ বলা যায়। আর যে মন বাসনা বিমুক্ত, তাহাকেই মুক্ত বলিয়া জানিবে। সুতরাং বেদোক্ত সাধন চতুষ্টয় অর্থাৎ (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। (২) ইহপরকালে ফলকামনা শূন্যতা। (৩) শম-দমাদি সাধন। (৪) মোক্ষাভিলাষ। পুরুষকারবলে এই সাধন চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়া, সতত বাসনা হইতে মনকে বিমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে বেদান্ত বলিয়াছেন,—

"আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্‌॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্‌।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ॥
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।
তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥" বেদান্ত-দর্শন

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফল-ভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ষড়্‌বিধগুণ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব; ইহাই সাধনচতুষ্টয় নামে অভিহিত। "দৃশ্যমান জগৎ মি[illegible]"

"একমাত্র ব্রহ্মই সত্য" এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে। তদ্রূপ এই দেহ মিথ্যা, দেহী বা আত্মাই সত্য। সুতরাং সেই সত্যবস্তু পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া, দেহাত্মবোধে বাসনাজালে জড়িত হওয়ায় বন্ধনের কারণ ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মরূপ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান সেই বন্ধনমুক্তির উপায়স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ হইলেও, 'আত্ম-জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত, বর্ত্তমানে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই মুক্তি বা স্বধর্ম্মরক্ষার পরিবর্ত্তে বিপরীত ফলপ্রসূ হইতেছে। সুতরাং "আত্ম-দর্শন-যোগের" অনুসরণে, বন্ধন ও মুক্তির প্রকার নির্দ্ধারণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সদ্‌গুরুকৃপায় আত্ম-দর্শন-যোগে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেই দেখিবে যে,—

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্ব্বিবেকোদিতবোধবহ্নিরজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্‌ ॥
শ্রুতি

তুমি পরমাত্মস্বরূপ, তোমার অজ্ঞান সংযোগজনিত অনাত্মপদার্থে আত্ম-বন্ধন হইয়াছে এবং সেই বন্ধনহেতু সংসারে যাতায়াত বা বহুবিধ সন্তাপ ঘটিয়াছে। আত্মা কি ও অনাত্মা কি, এই দুইটির বিষয় বিচার দ্বারা সতত জ্ঞানরূপ অনল, অজ্ঞানকর্ম্ম ও বাসনাকে মূলের সহিত ভস্মীভূত করে।

"অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্‌।
কঃ শক্নুয়াদ্‌বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥"
বিবেকচূড়ামণি

আত্মপ্রযত্ন ভিন্ন শতকোটি কল্পেও কেহ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিরূপ পাশবন্ধ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না।

"ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা ॥"

যোগ দ্বারা মোক্ষ হয় না, অথবা সাংখ্য দ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা হয় না, কেবল "ব্রহ্ম" ও "জীব" এই উভয়ের একত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। সদ্‌গুরু আশ্রয় ভিন্ন কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ,—

"শাস্ত্রজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ॥"

শাস্ত্র সকল চিত্তবিভ্রমের কারণ, তত্ত্বজ্ঞ (সদ্‌গুরু) হইতে মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ আত্ম-তত্ত্ব বিদিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনা পরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥"

যেমন ঔষধ সেবন ব্যতীত কেবল 'ঔষধ ঔষধ' উচ্চারণ দ্বারা ব্যাধি ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মভাব ব্যতীত, কেবল 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' বা "অহং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যকথন দ্বারা মুক্তভাব ঘটে না।

"অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি॥" শঙ্কর-দর্শন

শত্রুবধ না করিয়া ও নিখিল ধরণীর ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া, স্বয়ং আপনাকে নৃপতি বলিলে কি রাজা হওয়া যায়? সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলন ব্যতীত কেবল শাস্ত্র-আবৃত্তি বা মৌখিক বিচারে অনিত্য বাসনাবন্ধন হইতে কদাচ মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

"পুনর্জ্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতিসংভৃষ্টবীজবৎ।
বহুশাস্ত্রকথাকন্থা রোমন্থেন বৃথৈব কিম্॥"

মুক্তিকোপনিষৎ

অতএব পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুর স্বরূপ মলিনা বাসনাকে আধ্যাত্মিক সন্তাপে ভর্জ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে, সতত আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলনে তৎপর হইবে। অন্যথায় কেবল শাস্ত্রবাক্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ দ্বারা, কখনও জ্ঞান বা মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি কেবল মৌখিকভাবে ব্রহ্মবিচারে তৎপর, অথচ নিজে অনুশীলন বিহীন, তিনি "চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র" অধ্যয়ন করিয়াও "আত্মতত্ত্ব" উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যা পণ্ডশ্রম মাত্র। তদ্দ্বারা মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। সংসারাসক্তিই বন্ধন, আসক্তি ত্যাগই মুক্তি। সুতরাং সেই মুক্তির নামই ত্যাগ। নচেৎ ত্যাগ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অপ্রাপ্ত বস্তু অর্থাৎ যাহা এখনও প্রাপ্ত হও নাই, তাহার আবার একটা ত্যাগ কি? কেবলমাত্র তাহার আসক্তিবন্ধন হইতে মুক্ত থাকা মাত্র। তোমরা যাহাকে ত্যাগ বল, উহা প্রকৃত ত্যাগ নহে; ইহার নাম আত্মরক্ষা। মানুষ হইয়া যদি আত্মরক্ষা করিতে না পার, তবে যে মনুষ্যত্ব ডুবিয়া যাইবে* পুরুষকারবলে তুমি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চল, মুক্তি আসিয়া তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেই দেহাত্মভাব ঘুচিয়া যাইবে, কারণ দেহাত্মবোধ ত ইতর-প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান আছে। সুতরাং দেহাত্মভাব দূর হইলেই তখন দেখিবে যে, "আমি স্বয়ং" জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বগত, অব্যয়, স্বপ্রকাশ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রহিত, অমৃতস্বরূপ, "সচ্চিদানন্দ"; তাহাই অবিরত স্মরণ রাখ, তখন আর মুক্তির উদ্দেশ্যে শুদ্ধা বাসনাও থাকিবে না। কারণ যে স্বয়ং মুক্ত, তাহার আবার মুক্তির বাসনা কোথায় স্থান পাইবে? তখন তোমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সকলই সমান বলিয়া বোধ হইবে। তখন তুমি নিদ্রিতাবস্থায়ও নিজকে "জ্যোতির্ম্ময়" স্বরূপে দর্শন করিয়া সদানন্দে বিভোর থাকিবে। ইহা প্রত্যক্ষলব্ধজ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

"বেদ এব পরং জ্যোতির্জ্যোতিস্কামোজ্যোতিরানন্দয়তে ॥"

ব্রহ্মোপনিষৎ

যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি সুষুপ্তি অবস্থায় কেবলমাত্র পরমজ্যোতিঃ পদার্থেরই অনুভব করেন, এই জ্যোতিঃপদার্থই আনন্দস্বরূপ। সুতরাং নিদ্রাবস্থায়ও আনন্দই অনুভব করা যায়। এতাদৃশ আনন্দাবস্থা লাভ করিবার জন্য "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের অর্থে জীব ও ব্রহ্মকে সতত ঐক্যজ্ঞান রাখিতে হইবে।

"যৎ পরংব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥"

কৈবল্যোপনিষৎ

যে পরমব্রহ্ম বৃহৎ অর্থাৎ দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরস্থ,, সমস্ত প্রাণী হইতে অভিন্ন, সকল কার্য্য ও কারণের আধার স্বরূপ পরিব্যাপক, অথচ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং নিত্য পদার্থ, সেই "তৎপদ"বাচ্য পরমব্রহ্মই "ত্বং" পদের প্রতিপাদ্য। আবার 'ত্বং' পদবাচ্য বস্তুও "তৎপদ" বস্তু হইতে অভিন্ন অর্থাৎ "ত্বং পদবাচ্য জীব," আর "তৎপদবাচ্য পরমাত্মা" একই পদার্থ। কেবল মায়া দ্বারা "ত্বং" পদবাচ্য জীব কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান করিয়া থাকে; মায়া মুক্ত হইলেই, জীব ও পরমেশ্বরে অভেদ হইয়া যায়। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার প্রকাশক সেই "পরব্রহ্মই আমি"। এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, মানব সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

"আত্ম-দর্শন-যোগের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা ব্রহ্মবিন্দুতে বিশ্রাম।" ইহা প্রথম প্রকরণে বলা হইয়াছে। মুক্তির নাম শুনিলেই, যাঁহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করা আবশ্যক। মুক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ১। জীবন্মুক্তি বা স্বদেহ মুক্তি। ২। মরণান্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন।—

"পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদিলক্ষণ শ্চিত্তধর্ম্মঃ।
ক্লেশরূপত্বাদ্বন্ধো ভবতি তন্নিরোধং জীবন্মুক্তিঃ॥"

মুক্তিকোপনিষৎ

আমি কর্ত্তা ভোক্তা সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি বৃত্তি চিত্তের ধর্ম্ম। এই প্রকার বৃত্তি পুরুষের ক্লেশদায়িনী ও বন্ধনের কারণ। এই সমস্ত বৃত্তি নিরোধকেই জীবন্মুক্তি বলে। জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিতে হইলেও, "আত্ম-দর্শন-যোগের" অনুশীলন আবশ্যক। দৃঢ় আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত আত্ম-বিশ্বাস ভিন্ন কোন প্রকার মুক্তি লাভেরই সম্ভাবনা নাই। জীবন্মুক্তি সংজ্ঞায়ও যোগিগণের প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন আবশ্যক। যথা—

১। জ্ঞানরক্ষা। ২। তপঃ। ৩। বিসম্বাদাভাব। ৪। দুঃখ-নিবৃত্তি। ৫। সুখাবির্ভাব।

১। জ্ঞানরক্ষা।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্ম-দর্শন-যোগ লাভের পর পুনঃ সংশয় বিপর্য্যয়ভাব আর যাহাতে উদয় না হয়, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করাই "জ্ঞানরক্ষা" নামক প্রথম আবশ্যকতা।

২। তপঃ।—চিত্তের একাগ্রতাই "তপঃ" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই পরম "তপঃ"। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষগণের চিত্তবৃত্তি প্রশমিত হইলে, যে একাগ্রতা হয়, তাহাই প্রকৃত "তপঃ"। এতাদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যশীল। ইঁহাদের সম্বন্ধে স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।—

"যদ্যেকো ব্রহ্মবিদ্ ভুঙ্‌ক্তে জগত্তর্পয়তেঽখিলম্।
তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদে দেয়ং যত্‌কিঞ্চিদ্ বস্তু কিঞ্চন ॥"

যদি একজন ব্রহ্মবিদ্ ভোজন করান হয়, তাহা হইলে নিখিল জগতের তৃপ্তি সাধন করা হয়। অতএব দেয় বস্তু যদি কিছু থাকে, ব্রহ্মবেত্তাকেই দান করিবে। ইহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য। এতাদৃশ ব্রাহ্মণ-রক্ষণোদ্দেশ্যেই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে "ব্রাহ্মণায়াহং দদে"। সুতরাং এই প্রকার গুণ অর্জ্জন ও যথাশাস্ত্রভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া, যজ্ঞোপবীত বা ব্রহ্মসূত্রের পরিবর্ত্তে "পৈতা বা গলসূত্র" ধারণ এবং জ্ঞান শিখার পরিবর্ত্তে বহিঃস্থ কেশগুচ্ছ ধারণেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবেত্তার চিহ্ন নহে। শাস্ত্রও ইহাই বলিয়াছেন।—

"সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥
জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥
অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বানিতরে কেশধারিণঃ ॥"

ব্রহ্মোপনিষৎ

যে জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতশালী ব্যক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাঙ্কর্য্যবশতঃ অব্যক্তস্বরূপ সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গ নবতন্ত্রময় সূত্র (উপবীত) অর্থাৎ যাহা জ্ঞান-স্বরূপ এবং যাহার তত্ত্বসমূহ প্রকৃতি জ্ঞানে, মহৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মসূত্রবিৎ ও যজ্ঞোপবীতধারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানশিখা ধারণ করিয়াছেন এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ও

জ্ঞানযজ্ঞোপবীতধারী তাঁহারাই উত্তম জ্ঞানবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অগ্নিশিখাও পরাভূত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-শিখাধারী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকেই শিখী বলা যায়। যাহারা জ্ঞান ও তপঃ সম্পন্ন না হইয়া, কেবল বহিঃশিখা ধারণ করে, তাহারা কেবল কেশগুচ্ছধারী মাত্র।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ॥"

ব্রহ্মোপনিষৎ

যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় উপবীত আছে, তিনিই সমস্ত ব্রাহ্মণের আশ্রয় স্বরূপ। ইহা ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তিনিই বিষ্ণুবিদ্ ও বিষ্ণুস্বরূপ। সুতরাং কেবলমাত্র বহিঃস্থ গলসূত্র ও কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিদ্ তপস্বী বা জ্ঞানী নহেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশের সম্মান দাবী করেন, তাঁহাদের এতৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়। আত্ম-দর্শন-যোগে তাঁহারা ব্রাহ্মণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই, তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনমাত্র লোক সর্ব্বপাপ বিমুক্ত বা পবিত্র হইবে।

"যস্যানুভবপর্য্যন্তং বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥'

ইতি স্মৃতি

আত্ম-স্বরূপানুভূতি দ্বারা যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই সকলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। এতাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষের "তপঃ" স্বধর্ম্ম ও লোকরক্ষার নিমিত্তই হইয়া থাকে। (শাস্ত্রে ইহাদিগকেই জঙ্গমতীর্থ নামে উক্ত হইয়াছে,) ইহা "তপঃ" নামে দ্বিতীয় প্রয়োজন।

৩। বিসম্বাদাভাব।—জীবন্মুক্ত পুরুষগণের ধ্যান ও সমাধি হইতে উত্থান অবস্থায় সংকৃত স্তুতি ও অসংকৃত নিন্দাবাদাদিতে চিত্তবৃত্তির কোনরূপ বিকার না হইয়া সমতাভাব থাকাকে "বিসম্বাদাভাব" বলে।

"জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাং নম্নু মোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্ব্বিবদামহে॥"

বিদ্যারণ্য

তত্ত্বনিষ্ঠ আত্মজ্ঞ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া, আমাদের আনন্দানুভব হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীনদিগকে দেখিয়া কেবল অনুশোচনা হইয়া থাকে। পরন্তু তাহাদের সহিত বিবাদ করার ইচ্ছা নাই, ইহাই "বিসম্বাদাভাব" নাম তৃতীয় প্রয়োজন।

৪। দুঃখ নিবৃত্তি।—ঐহিক দুঃখনিবৃত্তি ও আমুষ্মিক দুঃখনিবৃত্তি ভেদে ইহা দ্বিবিধ। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানসমূহ সমূলে নিবৃত্ত হইলে "আত্ম-দর্শন-যোগে" সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক আত্মার সহিত চিত্তের তদাকার-ভাব প্রাপ্তি হওয়াতে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ হওয়া সত্ত্বেও ঐহিক সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।

"আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥"

বেদান্ত দর্শন

যে পুরুষ স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে জানিয়াছেন, তিনি আর কি ইচ্ছা করিয়া এবং কি কামনা করিয়া জীর্ণত্বাদি শারীরিক ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ ও শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হইবেন? এই জ্ঞানের দ্বারাই ঐহিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ এতাদৃশ আত্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে আর দেহাত্মবোধ থাকিতে পারে না। পরন্তু জ্ঞান

দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের সমূল নাশ বশতঃ আমুষ্মিক বা পারলৌকিক দুঃখ সমূহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।—

"এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং
কিমহং পাপমকরবম্ ॥"

বেদান্তসূত্র

এতাদৃশ "আত্ম-দর্শন-যোগ"যুক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে,—কেন আমি উত্তম কর্ম্ম করি নাই" "কেন আমি পাপ করিয়াছি" এরূপ ভাবনায় তাপ দিতে পারে না, ইহাই "দুঃখনিবৃত্তি" নামক চতুর্থ প্রয়োজন।

৫। সুখাবির্ভাব।—"আত্ম-দর্শন-যোগ-বিযুক্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান এবং তৎকৃত আবরণ ও বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলে, কোন প্রকার বাধা না থাকাতে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দের যে অনুভব তাহাই "সুখাবির্ভাব" নামে কথিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে।—

"সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসোনিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥"

বেদান্ত দর্শন

সমাধি দ্বারা যাহাদিগের চিত্তগত মলসমূহ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই নির্ম্মলচিত্ত পুরুষদিগের আত্মাতে নিবিষ্টজন্য যে সুখাবির্ভাব হয়, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না। স্বীয় অন্তঃকরণেই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাই সুখাবির্ভাব নামক পঞ্চম প্রয়োজন।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচার দ্বারা উপলব্ধিকৃত "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এরূপ দৃঢ়তর যে অপরোক্ষজ্ঞান তাহাই জীবন্মুক্তি লাভের উপায়। "জীবন্মো জ্ঞানলাভঃ স্যাৎ" ইতি চ শ্রুতি অর্থাৎ

জীবিতাবস্থায়ই জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। সুতরাং "আত্ম-দর্শন যোগে" জীবন্মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য বিষয়ে যে সকল সাধন ও নিয়মাদি সম্বন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা কেবল অপ্রশান্ত, অপরিপক্ক ও অদৃঢ়জ্ঞানসম্পন্ন সাধকদিগের নিমিত্ত। যাঁহারা "আত্ম-জ্ঞান-যোগ"যুক্তভাবে মহাবাক্যের বিচার অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার সম্যগ্ অভেদভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, অনিত্য মায়া ও বিষয়-বাসনাসমূহ হইতে আপনাকে বিশেষভাবে অনাসক্ত ও মুক্তজ্ঞান করিয়া দৃঢ়তার সহিত "সচ্চিদানন্দ স্বরূপে" স্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। তাঁহাদের চিত্তে কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে না। তাঁহারা প্রারব্ধ সাপেক্ষিত দেহস্থিতিকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, প্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ-জন্য উদাসীনভাবে জীব ও জগতের মঙ্গল বিধানেই সতত তৎপর থাকেন। আপনার স্বরূপ হইতে তাঁহারা কখন বিচ্যুত হন্ না অর্থাৎ ভ্রমবশে কখনও তাঁহারা দেহাত্মবোধে কোন ভোগ-সুখের কামনায় অভিভূত হন্ না। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বিশেষরূপে উক্ত আছে। (গীতা ৫ম অঃ ১৩।১৭।১৮ শ্লোক দেখ)

এস্থলে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের ভেদবুদ্ধি পরিহার হয়, ইহা শুনিয়া ইদানীং অনেকেই সংযম, তিতিক্ষাশূন্যভাবে সর্ব্বাগ্রে জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম তুলিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়া, জীবন্মুক্ত পুরুষ সাজিতে চেষ্টা করেন। পরন্তু ভগবানের উদ্দেশ্য-পূর্ণ-বাক্যের বিকৃত অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টায়ও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু তাঁহারা কি জাতিভেদ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? কখনই না। তাঁহারাও যখন কুকুর শৃগালের সহিত একত্র আহার, কি অন্যান্য ইতর প্রাণীর খাদ্য খাইয়া কদাচ তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, তাঁহারাও যখন জিহ্বার রসাস্বাদন পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এটা তিক্ত, ওটা মিঠা, এটা ভাল, ওটা মন্দজ্ঞানে, বস্তুর ভিন্ন ভিন্নরূপ আস্বাদ পরিগ্রহ করিয়া

আহার করেন; অপরন্তু তাঁহারাও যখন স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিকে ভেদচক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা যে জাতিভেদ অস্বীকার করেন একথা বলা যায় না। সুতরাং অন্তরে অন্তরে স্বস্বভাব, অমুক্ত জীবের ন্যায় ভোগাসক্তশীল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে মুখে মুখে জীবন্মুক্ত বলিয়া, ঘোষণা পূর্ব্বক যোগ তপস্যাহীন ভাবে একমাত্র খাদ্য খাওয়াজনিত জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া, একাকার ভাবে, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা কথনই বিবেক সম্মত নহে। স্থূলদেহে কর্ম্ম থাকিলে, বাহিরে ভেদবুদ্ধিও একটু দেখা যাইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ঐ ভেদবুদ্ধি "জ্ঞান" নহে, উহা দেহাত্ম-বুদ্ধিরই অন্তর্গত বটে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠ, শ্রীরামচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"হে রামচন্দ্র! আমি বাসনাহীন সমাধিলাভ করিয়া তোমাকে অভেদজ্ঞানের উপদেশ দিতেছি; তথাপি দৈহিক ভেদবুদ্ধিবশে তোমার পৌরহিত্যও করিতেছি এবং তুমি শিক্ষার্থী, আমি শিক্ষক, এরূপ ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছি; বস্তুতঃ জানিবে, আমার অভেদজ্ঞান ও নিষ্কামসমাধি ঠিক্ সুস্থির আছে। বায়ুর হিল্লোল, শাখাপল্লবে দৃষ্ট হইলেও, মূলকাণ্ডকে কিছুতেই টলাইতে পারে না"। যোগবাশিষ্ঠ।

ভগবান্ বশিষ্ঠ জড় সমাধি অপেক্ষা চৈতন্য সমাধিই অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, তিনি বলেন, "অহংজ্ঞানশূন্য হওয়াই উত্তম সমাধি, জড়তা লাভের নাম সমাধি নহে"। এনিমিত্ত তিনি জীবন্মুক্ত অর্থাৎ সংসার অনাসক্তভাবে থাকিয়াই, শ্রীরামচন্দ্রকে স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"অন্তঃসংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃসর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥"

যোগবাশিষ্ঠ

হে রাঘব! অন্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে অনাসক্ত ভাবে সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাক।

"ত্যক্ত্বাহং কৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ।
অগৃহীত কলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব॥"

হে রাঘব! "আমি করিতেছি" এই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া প্রশান্তচিত্তে, আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই শোভা পাইতেছে, কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুমিও তদ্রূপ সংসারে সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত অথচ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া বিচরণ কর।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ইত্যাকার "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" হইয়া, সংসারাশ্রমে স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভগবদগীতায় ঈদৃশ জীবন্মুক্ত জ্ঞানিগণের কর্ম্মাচরণের সহিত অজ্ঞানিগণের কর্ম্মের তুলনা করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলিয়াছেন—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"

গীতা ৩ অঃ

হে ভারত! অজ্ঞানীরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জ্ঞানীরাও তাহাই করেন বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর কর্ম্ম, আসক্তিযুক্ত এবং জ্ঞানীরা লোকের উপকারার্থ অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া অজ্ঞানীকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর কর্ম্ম অনাসক্তভাবে প্রারব্ধ ক্ষয়, এবং অজ্ঞানীর কর্ম্ম আসক্তিবশতঃ বন্ধনেরই কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অজ্ঞানিগণ যাহাতে মুক্তির আদর্শ প্রাপ্ত হন জ্ঞানিগণ তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই ভগবদ্বাক্যের মর্ম্ম।

অতএব যোগানুশীলন করিতে হইলেই যে, সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে হইবে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণও তাহা বলেন না। সংসার বলিতে অনেকে স্ত্রী পুত্র এবং টাকাকড়ি অর্থাৎ গৃহসামগ্রী বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নহে; সংসার অর্থই এই স্থূলদেহ, এ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে উক্ত আছে—

"স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধশরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ।"

গৌতম সূত্র।

জীবের অদৃষ্ট বা প্রাক্তনবশে উৎপন্ন স্থূল শরীর গ্রহণই সংসার। সুতরাং শরীরত্যাগ না হইলে, সংসারত্যাগ হইতে পারে না। যে স্থানে যাও, সেই স্থানেই সংস্কার লইয়া যাইতে হইবে। অতএব দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিলে, প্রকৃতপক্ষে সংসার ত্যাগ করা হয়। সংসার শব্দে গৃহস্থাশ্রম কল্পনা করিলেও, সর্ব্বপ্রামাণ্য ভগবদগীতায়ও সংসারত্যাগের বিষয় কথিত হয় নাই, পরন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সংসারাশ্রমে থাকিয়াই, স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম-যোগানুশীলন করিতেই উপদেশ করিয়াছেন। তিনি ভক্তিযোগের উপদেশ প্রদান কালে বলিয়াছেন যে—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"

১২ অঃ

যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। অপরন্ত যাঁহার শত্রুমিত্র, মানাপমান, নিন্দাস্তুতি সম্মানজ্ঞান তাদৃশ যোগীই জীবন্মুক্ত এবং তিনিই ভগবানের প্রিয়। এই ভগবদুক্তি প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, সংসারাশ্রম ছাড়িয়া বনবাসী

হইলে, পশুপক্ষী বৃক্ষলতার সহিত অবস্থান করিয়া তাহার মানাপমান, নিন্দাস্তুতি, শত্রুমিত্র সমদৃষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা কিরূপে পরীক্ষা হইতে পারে? সুতরাং সংসারাশ্রমরূপ বহু প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা সংযম ও অনাসক্তভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই বীর এবং প্রকৃত দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত; তাঁহারাই জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে ভগবানের প্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। "আত্ম-দর্শন-যোগ" অবলম্বনে সংসারাশ্রমিগণ জীবিতকাল পর্য্যন্ত এতাদৃশ স্বদেহমুক্তির পন্থাই অনুসরণ করুন। তাহা হইলে, বিদেহমুক্তির জন্য তাহাদিগকে আর বিশেষ কোন চিন্তা করিতে হইবে না। ইহার নামই (বিদেহ মুক্তিস্বরূপ) জীবন্মুক্তি। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহাই কথিত হইয়াছে।

"শারীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জ্জিতম্।
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

দত্তাত্রেয়

যিনি কেবল শরীর নির্ব্বাহার্থে প্রবৃত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, যিনি সমস্ত কার্য্যে শোক-মোহ ইত্যাদি রহিত হন এবং শুভাশুভফল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

"কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানাতি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

দত্তাত্রেয়

বিবিধ শাস্ত্রে যে যে কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, তাহার কিছুমাত্র বিদিত থাক বা না থাক, যিনি সমুদয় কর্ম্মকে ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

"অনাদিবর্ত্তিভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্ব্বৈরং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

দত্তাত্রেয়

অনাদিবর্ত্তি অর্থাৎ সমকালসঞ্জাত প্রাণিগণের জীবাত্মাকে যিনি শিবস্বরূপ জানিয়া কখনও কোন প্রাণীর প্রতি শত্রুতা করেন না, বরং যাবতীয় জীবের পরমবান্ধব হন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

"গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।
সোঽহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

মানসিক ধ্যানযোগে জ্ঞানিগণের দেহমধ্যে প্রথমে যে আত্ম-দর্শন হয়; তাহাকেই মন বলে, সেই মনই জীবাত্মা নামে অভিহিত; সেই বায়ু সদৃশ মন, আকাশস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়, পরন্তু "আত্ম-দর্শন-যোগে" আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি এই প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনিই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

"ঊর্দ্ধংধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

যিনি ধ্যানদ্বারা ঊর্দ্ধস্থিত আকাশের ন্যায় পরমাত্মাকে ভাবনা করেন, অর্থাৎ সমাধিতে যাঁহার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, সেই সাধকের মনকে বিজ্ঞান বলা যায়। যাঁহার মন শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সাধকই জীবন্মুক্ত।

"হৃদি ধ্যানেন পশ্যতি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোঽহং 'হংসে'তি পশ্যতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

যিনি হৃদিমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মনকে প্রকাশ করিতেছেন, আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি ধ্যানযোগে ইহা জানিতে পারেন এবং এইরূপে যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া, অন্তরে ও বাহিরে সংস্থিত পরমাত্মাকে "আত্ম-দর্শন-যোগে" সতত দর্শন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত।

শিবশক্তী মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
চিদাকাশং হৃদং "সোঽহং" জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

জীবন্মুক্তি গীতা

শিবশক্তি যেরূপ একাত্মা সেইরূপ আমার দেহ ও মন একই পদার্থ, এই দেহ মন সম্বলিত ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড এবং বাহ্যদৃশ্য বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়েই এক পদার্থ; অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশে আমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাত্মা ইহা স্বতঃসিদ্ধ জানিয়া যিনি পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত জানিবে। "আত্ম-দর্শন-যোগে" জীবন্মুক্তির ইহাই বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহার নামই স্বদেহমুক্তি। অতঃপর মরণান্মুক্তি-স্বরূপ বিদেহমুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতেছে—

"জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতোজ্ঞানবান্ ভবেৎ
জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাৎ॥" শ্রুতি

জ্ঞানবিনা মুক্তিলাভ হয় না, মৃত্যুর পরও জ্ঞান হয় না; জীবিতাবস্থাতেই জ্ঞানলাভ আবশ্যক।

"উপাধিবিনির্ম্মুক্তঘটাকাশবৎ প্রারব্ধক্ষয়াদ্‌বিদেহমুক্তিঃ।

মুক্তিকোপনিষৎ

যখন উপাধি বিনির্ম্মুক্তঘটাকাশের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া দেহ নষ্ট হয়, সেই অবস্থাকে "বিদেহমুক্তি" বলে। ইহার অপর নাম মরণান্মুক্তি।

মুক্তিকোপনিষদে পাঁচ প্রকার বিদেহমুক্তির বিষয় উল্লেখ আছে। (১) সালোক্য। (২) সারূপ্য। (৩) সামীপ্য। (৪) সাযুজ্য। (৫) কৈবল্য বা নির্ব্বাণ।

এ সম্বন্ধে মহাভক্ত ও মহাবীর হনুমানজীর মুক্তিবিষয়ক প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে—

"দুরাচাররতো বাপি মন্নাম ভজনাৎ কপে।
সালোক্য মুক্তিমাপ্নোতি নতু লোকান্তরাদিকম্॥"

মুক্তিকোপনিষৎ

হে কপিবর! দুরাচারপরায়ণ হইয়াও যদি আমার নাম ভজনা করে, তবে সালোক্য মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের সমলোকে স্থান প্রাপ্তি হয়। তাঁহার অন্যলোকে গতি হয় না। এই নাম ভজনার অর্থ বুঝিতে হইলে, সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে অনন্যমনে ইষ্টনাম অজপাযোগে জপ করিতে পারিলেই জীব, দস্যু রত্নাকরের ন্যায় সাধনাবলে, মহামুনি বাল্মীকি সদৃশ শক্তি ও মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

"কাশ্যাস্তু ব্রহ্মনালেঽস্মিন্ মৃতো মত্তারমাপ্নুয়াৎ।
পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে স মহেশ্বরঃ
জন্তোর্দক্ষিণকর্ণেতু মত্তারং সমুপাদিশেৎ॥
নির্দ্ধূতাশেষপাপৌঘা মৎসারূপ্যং ভজত্যয়ম্।
সৈব সালোক্যসারূপ্যমুক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

মুক্তিকোপনিষৎ

যে ব্যক্তির কাশীক্ষেত্রে ব্রহ্মনালে মৃত্যু হয়, সে মানব আমার তারোপদেশ (প্রণব উপদেশ) লাভ করিয়া, পুনরাবৃত্তি রহিতা মুক্তি

প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মনাল ব্যতীত কাশীর যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন মহেশ্বর প্রাণীর দক্ষিণকর্ণে আমার তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ প্রদান করেন তদ্দ্বারাই জীবসমূহ অশেষ পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, আমার সারূপ্যমুক্তি (ঈশ্বরের সমানরূপ) প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তি কথিত হইয়াছে।

"সদাচাররতো ভূত্বা দ্বিজো নিত্যমনন্যধীঃ।
ময়ি সর্ব্বাত্মকে ভাবো মৎসামীপ্যং ভজত্যয়ম্।
সৈব সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য মুক্তিরিষ্যতে॥" মুক্তিকোপনিষৎ

যে দ্বিজাতি সদাচার পরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে সর্ব্বস্বরূপ আমাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, সেই ব্যক্তি আমার সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"গুরূপদিষ্টমার্গেন ধ্যায়ন্ মদ্রূপমব্যয়ম্।
মৎসাযুজ্যং দ্বিজঃ সম্যগ্ ভজেদ্‌ভ্রমরকীটবৎ॥
সৈব সাযুজ্যমুক্তিঃ স্যাদ্‌ব্রহ্মানন্দকরী শিবা।
চতুর্ব্বিধা তু যা মুক্তির্ম্মদুপাসনয়া ভবেৎ॥" মুক্তিকোপনিষৎ

যে দ্বিজগণ গুরূপদিষ্ট পদবীর অনুসরণ করিয়া, আমার অবিনাশী 'স্ব'-রূপ ধ্যান করে, সে ব্যক্তি ভ্রমর-কীটের ন্যায় আমার সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই সাযুজ্য মুক্তি, জীবগণের পরম কল্যাণদায়িনী এবং ব্রহ্মানন্দোদ্বোধিনী। এই সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তির কথা বলা হইল। ইহা আমার (পরমাত্মার) উপাসনা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। ধারণাযোগে দেহমধ্যে স্থান-বিশেষে, সেই "আত্মারামের" ধ্যান করিতে পারিলে, উক্ত পাঁচ প্রকার মুক্তিই সিদ্ধ হয়। মুক্তি সম্বন্ধে শিবোক্ত তন্ত্রে চারি প্রকার মুক্তির বিষয় দৃষ্ট হয়।

"সালোক্যং হি মহর্লোকে সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যঞ্চ তপোলোকে নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধকে ॥"

দেহস্থ ঊর্দ্ধ সপ্তলোক মধ্যে যে সাধক হৃৎপদ্ম বা মহর্লোকে পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাঁহারা সালোক্যমুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা বিশুদ্ধপদ্ম বা জনলোকে ধ্যান করেন, তাঁহারা সারূপ্যমুক্তি লাভ করেন, যাঁহারা আজ্ঞাপদ্ম বা তপোলোকে ধ্যান করেন, তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, ইহার ঊর্দ্ধে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাণমুক্তির নামই কৈবল্যমুক্তি বা "ব্রহ্মবিন্দুতে বিশ্রাম"। কৈবল্যমুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্র ও উপনিষৎ কেহই তাহার স্বরূপ বর্ণনা করেন নাই।

"জ্ঞানাদেব কৈবল্যং প্রাপ্যতে, তমেব বিদিত্বাতি,
মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়,
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥" ইতি শ্রুতি

জ্ঞান ভিন্ন কৈবল্য মুক্তি লাভ হয় না। উপনিষদে উক্ত আছে—

"কৈবল্যমুক্তিরেকৈব পারমার্থিকরূপিণী"

মুক্তিকোপনিষৎ

উক্ত চারি প্রকার মুক্তি ভিন্ন আর এক প্রকার মুক্তি আছে, তাহাকে কৈবল্যমুক্তি কহে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি। উপনিষদেও কৈবল্যমুক্তির জন্য জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই কৈবল্যমুক্তির স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে অবস্থায় মনের পৃথক্ সত্ত্বা সর্ব্বতোভাবে লয় পায় অর্থাৎ মনের মননশক্তি যে ভাবে থাকে না, সে ভাবের অবস্থা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন। জীবিত থাকা সত্ত্বে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই সেই কৈবল্য-মুক্তির আভাস পাওয়া যায়, নির্ব্বিকল্প সমাধিই তাহার অভিব্যক্তি।

তবে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, স্বদেহ বা জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই যোগী সেই কৈবল্যমুক্তির রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র ঘট নাশে ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হয় মাত্র। যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা দেহধারণ করেন মাত্র। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।—

"জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতোভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃ শ্রুতিঃ॥"

যাঁহার জীবদ্দশাতে বিদেহ কৈবল্যরূপ মুক্তি লাভ হয়, দেহান্ত হইলেও তিনি তদ্রূপই থাকেন। ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশ তুল্য কেবল উপাধি নাশ মাত্র। কিন্তু যজুঃ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, অতি অল্পমাত্র ভেদদর্শী পুরুষের সংসার বন্ধনের ভয় আছে। এ সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"সৌম্যাম্বুত্বে তরঙ্গত্বে সলিলস্যাম্বুতা যথা।
সমৈবাব্ধৌ তথাদেহঃ স দেহ মুনিমুক্ততা॥" যোগবাশিষ্ঠ

হে সৌম্য! যেমন জলধির স্থির জল ও তরঙ্গায়িত জল আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বোধ হইলেও, তাহা অভেদ; জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ স্বদেহমুক্তি বা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি দুইই প্রায় একরূপ হয়।

"নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাং।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা॥" যোগবাশিষ্ঠ

আত্মজ্ঞান-বিচার-পরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষদিগের জীবদ্দশাতে যে মুক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি তাহাকেই বিদেহ মুক্তি বলে। দেহান্ত হইলেও তাহা তদ্রূপই থাকে, ইহা অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিতে বিচার করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। জনকাদি ঋষিগণকে "বিদেহ" বলা হইত; ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা দেহধারণ অবস্থাতেই বিদেহমুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

"আত্মজ্ঞানেন নষ্টেঽস্মিন্ সাবিদ্যে স্ব-শরীরকে।
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥" শিবগীতা

জীবও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান হইলেই, অবিদ্যা-যুক্ত স্বদেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। জীব কেবল আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত থাকে; ইহাই "বিদেহ"মুক্তি।

"তীর্থে বান্ত্যজগেহে বা যত্র যত্র মৃতোঽপি বা।
ন যোগী পশ্যতে গর্ভং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ॥" অবধূতগীতা

তীর্থই হউক বা অন্ত্যজগৃহেই হউক, যোগী যথায় তথায় মৃত হউক না কেন, তাঁহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যোগীর অপ্রাপ্য কিছুই নাই, ইহপরকাল মুক্তি তাঁহাদের ইচ্ছামাত্র সিদ্ধ হইতে পারে। মরণান্মুক্তি সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যত্র তত্র মৃতোজ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ ॥" উত্তরগীতা

যেরূপ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী আকাশ, উপাধিবিনাশে সেই মহাকাশেই বিলীন হয়, তদ্রূপ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হউক না কেন, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাদ্বারা দেখা যায় যে, উপনিষৎ বলিয়াছেন—(১) সালোক্য। (২) সামীপ্য। (৩) সারূপ্য। (৪) সাযুজ্য। (৫) কৈবল্য বা নির্ব্বাণ।

তন্ত্র বলিয়াছেন—(১) সালোক্য। (২) সারূপ্য। (৩) সাযুজ্য। (৪) কৈবল্য বা নির্ব্বাণ।

উপনিষৎ বলেন মুক্তি পাঁচ প্রকার। তন্ত্র বলেন মুক্তি চারিপ্রকার। এই দুই মতের বিচার মীমাংসা, মাদৃশ জনের পক্ষে ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই

কিন্তু প্রত্যক্ষোপলব্ধজ্ঞান অর্থাৎ যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হওয়াও কাপুরুষতা। সুতরাং মুক্তি সম্বন্ধে আমার গুরুকৃপালব্ধ প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞান এই যে, সংসারে যতপ্রকার বন্ধন আছে, ততপ্রকারই মুক্তি। সালোক্য-সারূপ্যাদি-মধ্যে যখন সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাহা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ সূক্ষ্মদেহের মুক্তির জন্য পুনর্ব্বার তাহাদিগকে স্থূলদেহ ধারণ করিতে হইবেই হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, একমাত্র কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি ভিন্ন জন্মমৃত্যু নিবৃত্তি হয় না।

"ইতি চতুর্ব্বিধামুক্তি র্নির্ব্বাণঞ্চ তদুত্তরম্।
জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতা॥
যা মুক্তিঃ কথিতাসদ্ভিস্তন্নির্ব্বাণং প্রচক্ষ্যতে॥"

চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পর নির্ব্বাণ বা কৈবল্যমুক্তির বিষয় বলিতেছি, জীব পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া যে মুক্তি লাভ করে, তাহাকেই সৎপুরুষেরা নির্ব্বাণ বা কৈবল্যমুক্তি বলিয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সূক্ষ্মদেহের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্তি বলিয়া গণ্য নহে, অপরন্তু স্থূলদেহ ধারণ না করিয়াও, সূক্ষ্মদেহের মুক্তি সম্ভবপর নয়, ইহাও শাস্ত্রবাক্য। তদ্ধেতু আমরা সূক্ষ্মদেহের মুক্তির জন্যই এই স্থূল মানবদেহ ধারণ করিয়াছি, "আত্ম-দর্শন-যোগে" ধ্যানসমাধি, বলে আমাদিগকে সেই মুক্তির পন্থা পরিষ্কার করিতে হইবে। সালোক্য সারূপ্যাদি মুক্তির অবস্থা এই দেহেতেই উপলব্ধি করা যায়, অর্থাৎ এই দেহ বর্ত্তমান রাখিয়াই বিদেহ অবস্থায় পরমাত্মা বা ভগবানের সালোক্য হইতে পারি, সারূপ্য হইতে পারি, সাযুজ্য হইতে পারি। "সামীপ্য"ত আছিই,

এমন কোন পদার্থ নাই যে, ভগবানের "সামীপ্য" ছাড়িয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে, তিনি ভিন্ন জগতে যখন বিন্দুমাত্রও স্থান নাই, তখন কে বলিবে যে পরমাত্মা বা ভগবানের সামীপ্যে অবস্থান করিতেছেন না? তবে কাহারও পক্ষে সামীপ্যও বটে, কাহারও পক্ষে অসামীপ্যও বটে, কারণ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় অবিচ্ছেদে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে পারেন, তিনি বুঝিবেন যে আমি তাঁহার (ভগবানের) সামীপ্যেই আছি, আর যে ব্যক্তি, অজ্ঞান অনিত্য-সংসার-মায়া-মোহ-জনিত ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগ-সুখে সতত মুগ্ধ, সে যে ভগবানের সমীপে বাস করিতেছে, ইহা কখনও জ্ঞান করিতে পারে না বলিয়াই, তাহারা দূরে দূরে ভগবান্ বা ইষ্টদেবকে খুজিয়া থাকে। কোন অন্ধব্যক্তির সমীপে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও সে যেমন তাহার সমীপস্থ সেই পরমোপাদেয় খাদ্যসামগ্রী দেখিতে না পাইয়া, দূরবর্ত্তীস্থানে গমন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, উহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এ জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "আমি জ্ঞানীর নিকট সপ্রকাশ, অজ্ঞানীর নিকট অপ্রকাশ" স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন যে, "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ" সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার সামীপ্য মুক্তির একটা পৃথগ ভাব জ্ঞাপন করা সম্ভবতঃ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।

আমার বিবেচনায় সদ্গুরুকৃপায় জ্ঞাননেত্র উন্মীলন হওয়া মাত্রেই মানবের সামীপ্যমুক্তি লাভ হয়। পরন্তু সেই দিব্যদৃষ্টি বলে "আত্ম-দর্শন-যোগ" লাভ করিতে পারিলে, এই দেহেই সাধক বা যোগীর ইচ্ছামাত্র ধ্যানাবস্থায় সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্যমুক্তি লাভ হইতে পারে অর্থাৎ ভগবান্ বা ইষ্টদেবতার, সালোক্যভাবযুক্ত ধ্যানাবস্থাই সালোক্যমুক্তি। সারূপ্য-ভাবযুক্ত ধ্যানাবস্থাই—সারূপ্যমুক্তি, সাযুজ্য-ভাবযুক্ত ধ্যানাবস্থাই—সাযুজ্যমুক্তি। সুতরাং এই দেহ বিদ্যমানেই যখন উক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আর দেহত্যাগের পরে উক্ত প্রকার মুক্তিলাভের

জন্য লালায়িত হওয়ার আবশ্যকতা কি? যাঁহারা আত্মশক্তিবলে এই দেহে উক্তপ্রকার মুক্তির অধিকারী হইতে না পারেন, তাঁহারা দেহান্তরে যে তাদৃশ মুক্তিলাভ করিবেন তাহা দুরাশামাত্র। "আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত" যোগী কেবলমাত্র ঐ সকল মুক্তিকেই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি বলিয়া মনে করেন না। কারণ যোগী যখন সূক্ষ্মদেহ হইতেও নিজকে মুক্ত মনে করিয়া, আত্ম-দর্শন-যুক্ত ধ্যান-যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা লাভ করেন, তখন কৈবল্যমুক্তি আপনা হইতে আসিয়াই তাঁহাকে বরণ করিয়া থাকে। সুতরাং যিনি "আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত"ভাবে প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা নিজকে "অহং ব্রহ্মাঽস্মি"রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যে "নিত্যমুক্ত"। তাঁহার আবার মুক্তির জন্য চিন্তা করিতে হইবে কেন? তিনি এই দেহধারণ অবস্থায় সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও কৈবল্য সর্ব্ব-প্রকার মুক্তির অবস্থাই ত ইচ্ছামাত্র উপলব্ধি পূর্ব্বক, "সচ্চিদানন্দ"ভাবে সতত বিভোর হইয়া, জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রারব্ধ সাপেক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়-বিষয়-অনাসক্ত জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে, এই দেহেই সর্ব্বপ্রকার মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়, ইহাই মুক্তি সম্বন্ধে মদীয় গুরুকৃপালব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান। গুরূপদিষ্টমতে একমাত্র আত্ম ধ্যান বা আত্মোপাসনা দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়। ইহা বেদবাক্য,—তাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

"আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ"
"সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ" "আত্মেবোপাসীত ॥"

ধীর পুরুষ আত্মারই নিত্য উপাসনা করিবেন, অন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিবেন না। যে পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি দ্বারা মুক্তিলাভ না হয় সে পর্য্যন্ত আত্মারই উপাসনা করিবে। "একমাত্র আত্মাই উপাস্য জানিবে।" অষ্টাদশ পুরাণাদি প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসও শারীরিক সূত্রে

বলিয়াছেন,—"আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।" যে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ না হয়, সর্ব্বদা "আত্মার" উপাসনা করিবে।

অতএব "আত্ম-দর্শন-যোগ"ই মুক্তি এবং "আত্ম-দর্শন-যোগই" একমাত্র মুক্তির পন্থাস্বরূপ। মনে রাখিও তুমি দেহে বদ্ধ নও, দেহাত্মবোধরূপ অজ্ঞানতায় বদ্ধ হইয়াছ; "আত্ম-দর্শন-যোগে" দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ কর, তখনই সর্ব্বপ্রকার স্বদেহ, বিদেহমুক্তির অধিকারী হইবে এবং সতত নিজকে "মুক্ত" বলিয়াই তোমার জ্ঞান হইবে। তখন আর জন্ম মৃত্যুর পার্থক্য থাকিবে না। এই নীতির অনুসরণ ব্যতীত যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিবেন মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; তাঁহারা পুনর্ব্বার শত শতগুণে বন্ধনের দিকে যাইতেছেন; ইহা ধ্রুবসত্য জানিবে। সুতরাং এই দেহরক্ষা করিয়াই সতত "আত্ম-দর্শন-যোগে" মুক্তির অনুসন্ধান কর, পুনর্ব্বার জন্মমৃত্যুর ইচ্ছা করিও না, এই দেহে থাকিয়াই তুমি ইচ্ছামাত্র জন্মমৃত্যু লাভ করিতে পার, দেহরক্ষা করিয়া, কেন জীবন্মৃত বা বিদেহ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর না; তাহা হইলে মৃত্যুজনিত ক্লেশ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না, অথচ মুক্তি করতলগত হইবে। "আত্ম-দর্শন-যোগ"ই তাহার একমাত্র পন্থা। মুক্তি নিজের ইচ্ছাধীন। আত্মজ্ঞানযুক্ত দৃঢ়বিশ্বাস ও গুরুভক্তিবলে "আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলনে" তৎপর হও, জন্মমৃত্যুর গোলক ধাঁধা ঘুচিয়া যাইবে। তখন "আত্ম-দর্শন-যোগে" দেখিতে পাইবে।—

"জন্মমৃত্যু মাত্র কথা দুটো সার,
"স্থিতি" হ'লে "প্রাণ" মৃত্যু হ'বে কার,?
যাবে মাত্র কেবল ঘটেরই আকার,
মহাকাশে—আকাশ পশিবে তখন ॥"

অতএব যদি নিত্য সুখ-শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে সদ্‌গুরূপদিষ্ট ভাবে "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয় করিয়া জীবন্মুক্তি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হও।

"অকারে উকারে মিলাও উকারে মকারে,
মকারে মিলাও "উমা" সেই পরাৎপরে।
স্থূল সূক্ষ্ম ভাব ছাড়ি মিলি সে "কারণে"
হও "সৎচিদানন্দ" "আত্ম" দরশনে ॥"

ঈদৃশ প্রকার যাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সকল জীবের মঙ্গল সাধন হয়, সেরূপ কার্য্যে অর্থাৎ সর্ব্বভূতে হিতে রত হও। স্মরণ রাখিও, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মের উদ্ধার, কর্ম্মের উদ্ধার, জাতির উদ্ধার, সমাজের উদ্ধার, কিম্বা দেশের উদ্ধার কিছুই সম্ভবপর নয়। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে পরদুঃখে কাতর হইতে পারে না। অতএব বৃথা আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-তৃষ্ণা-জনিত অনিত্য-সুখ-ভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্ম-জ্ঞান-যোগে "আত্ম-দর্শন" লাভ করিয়া, নিত্যসুখে সুখী হও। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, তিনিই যোগী। তিনিই সতত "সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে" অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্মনির্ব্বাণ স্বরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

"যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারাম স্তথান্ত র্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥"

অতএব সর্ব্ব প্রকার মুক্তির একমাত্র পন্থা—

"আত্ম-দর্শন-যোগ"

আত্ম দর্শন যোগ

পঞ্চসপ্তত্র—পরিশিষ্ট।

সহজে-যোগ-সিদ্ধির উপায়।—

অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে॥
ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতি দুঃখদা॥
গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥

শিবসংহিতা

সম্প্রতি কি প্রকারে শীঘ্র যোগ সিদ্ধি হয় তাহা বলা যাইতেছে, ইহা জ্ঞাত হইলে, সাধক যোগসাধন বিষয়ে দুঃখ প্রাপ্ত হন না। এই যোগবিদ্যা সদ্‌গুরুর মুখ হইতে লাভ করিলে বীর্য্যবতী হয়। গুরূপদেশ ভিন্ন অন্য কোনরূপ সাধনে নিরত হইলে অর্থাৎ জ্ঞানী গুরুর নিকট হইতে যোগবিদ্যা লাভ না করিয়া, অপর কোন অজ্ঞানী প্রমুখাৎ অথবা কেবলমাত্র পুস্তক সাহায্যে যোগ লাভের চেষ্টা বিফলমাত্র অর্থাৎ নির্ব্বীর্য্য বা শক্তিহীন; অপরন্তু কষ্টদায়ক জানিবে। যাঁহার যোগে অধিকার নাই, তিনি কখনও এই জ্ঞান

প্রদান করিতে পারেন না। যিনি সচেষ্ট হইয়া তাদৃশ জ্ঞানী গুরুকে পরিতোষ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশানুযায়ী যোগশিক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

"শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদ্‌যত্নেন সাধয়েৎ॥"

শিবসংহিতা

আত্ম-জ্ঞানযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণমধ্যে, যিনি বিশেষ গুরুভক্তিমান্ তিনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। অন্যকেহ কোন প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন না। অতএব সচেষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে প্রথমতঃ জ্ঞানী গুরুর নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করা বিধেয়। যিনি বিষয় সংসক্ত, যিনি অবিশ্বাসী, যিনি গুরুপূজা শূন্য, যিনি অবিরত বহুজনের সঙ্গে বসবাস করেন, যিনি অনৃতবাক্যে ও মিথ্যা ব্যবহারে নিরত, যিনি নির্দ্দয়বাক্য ব্যবহার করেন, অথবা যিনি গুরুকে সন্তুষ্ট না করেন, তাঁহার কোনরূপেই যোগসিদ্ধ হয় না।

"ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্॥"

শিবসংহিতা

"নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে" এরূপ জ্ঞান থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম উপায়। সিদ্ধির দ্বিতীয় উপায় শ্রদ্ধা; তৃতীয় উপায় গুরুপূজা; চতুর্থ উপায় সমভাব অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন। পঞ্চম জিতেন্দ্রিয়তা; ষষ্ঠ পরিমিত ভোজন; এতদ্ভিন্ন যোগসিদ্ধির সপ্তম আর কোন উপায় নাই।

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং।
কর্পূরং নিস্তুষং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্॥ শিবসংহিতা

ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বুল, কর্পূর, নিস্তুষদ্রব্য, (খোসারহিত মুদ্গ চনক প্রভৃতি) মিষ্টদ্রব্য, সুলক্ষণাক্রান্ত উত্তম মঠ, সূক্ষ্মবস্ত্র এই সমস্ত সেবন করা যোগিগণের কর্ত্তব্য। "সিদ্ধান্তবাক্য" শ্রবণ, সর্ব্বদা নিঃসঙ্গভাবে সংসারে অবস্থান যোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য। যে সময় বায়ু সূর্য্যনাড়ীতে অর্থাৎ পিঙ্গলায় থাকিবে তখন ভোজন এবং যে সময় বায়ু চন্দ্রনাড়ীতে অর্থাৎ ঈড়ায় থাকিবে তখন শয়ন করা যোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য।

সদ্যোভুক্তেঽতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তেবুধৈঃ।

শিবসংহিতা

ভোজন করিবার অব্যবহিত পরে অথবা অতিক্ষুধার সময় যোগাভ্যাস করা উচিত নহে। এতৎসঙ্গে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করাও আবশ্যক।

সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎকার্য্য সাধকম্।
জ্ঞানানাং বহুধা হ্যেয়ং যোগবিঘ্নকরা হি সা॥

দত্তাত্রেয়

যাহা সকলের সারভূত ও কার্য্যসাধক তাদৃশ জ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) চর্চ্চা করিবেন। কেন না জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ নানাপ্রকার জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে যোগসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটে।

ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপিকল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥

দত্তাত্রেয়

যিনি ইহা জ্ঞেয়, ইহা জ্ঞেয় করিয়া, নানা পন্থায় বিচরণ করেন, তিনি সহস্র কল্পেও প্রকৃত জ্ঞেয় পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন্ না। এ নিমিত্ত "আত্ম-দর্শন-যোগ" গ্রন্থে একমাত্র "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ বিচার

দ্বারা আত্মজ্ঞান-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রথম কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। কারণ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, জগতের যাবতীয় জ্ঞানই সহজে লাভ হইয়া থাকে, ইহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।

ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনোধ্যানে নিবেশয়েৎ॥ দত্তাত্রেয়

সঙ্গত্যাগ, ক্রোধ জয়, ইন্দ্রিয়-সংযম ও আহার লাঘব করিয়া, বুদ্ধি পূর্ব্বক দ্বার বিধানে মনকে ধ্যানে নিয়োজিত করিবে। সাধক সচ্চিন্তা, সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সদালাপকেই জীবনের চিরসঙ্গী করিবে।

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ॥ দত্তাত্রেয়

বাগ্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড, মনোদণ্ড এই দণ্ডত্রয় যে যোগীর আয়ত্ত হইয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী এবং তিনিই মহাযতি জানিবে। সাধকের এতাদৃশ অভ্যাস যোগই আত্ম-দর্শন-যোগ সিদ্ধির সহজ উপায়।

২। যোগবলে ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের উপায়।—

"কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ" পাতঞ্জল দর্শন

যোগী সিদ্ধাসন বা পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া, তালুমূলে জিহ্বা সংস্থাপন পূর্ব্বক কণ্ঠকূপে সংযম করিলে, ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি হয়।

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে॥

শিবসংহিতা

যে সাধক জিহ্বাগ্র, কণ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে প্রাণযুক্ত করিয়া, নিপীড়িত করিবেন, তাহার ক্ষুধা পিপাসা নিদ্রা বা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবে না।

এতদ্দ্বারা যৌবনশ্রীও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও উপায় আছে, তাহা জ্ঞানী গুরু সন্নিধানে শিক্ষা করা আবশ্যক।

৩। যোগবলে ভূত-ভবিষ্যৎ জানিবার উপায়।—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-যোগে চিত্ত সমাহিত করিয়া, অতীত ও সঞ্চিত সংস্কারের উপর সংযমন করিতে পারিলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ অভ্যাস-যোগে স্থূলস্মৃতি স্থূলসংস্কার সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। সূক্ষ্মভাব সূক্ষ্মজ্ঞান, সূক্ষ্মচিন্তার মধ্যে সব নিহিত আছে। এ সকল তত্ত্বের মূল বিষয় পূর্ব্বে আত্ম-দর্শন-যোগের প্রথম ও তৃতীয় স্তরে বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম প্রত্যাহারলব্ধ সপ্তবিধ সূক্ষ্মধারণা বলে অণিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইলে, সমাধিযোগে সূক্ষ্মজ্ঞানের সূক্ষ্মঅনুভূতি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধক যাবতীয় তত্ত্ব ইচ্ছামত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হয়।

৪। যোগবলে প্রাণিগণের শব্দার্থ উপলব্ধি করিবার উপায়।—শব্দমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। তোমার ভিতরে নিয়ত সমস্ত শব্দই ধ্বনিত হইতেছে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। বাহিরে এমন কোন শব্দ নাই, যাহা তোমার ভিতরে না আছে। ভিতরের শব্দে অন্তরস্থ মনের কোন বৃত্তি বিশেষকে জাগরিত করে, বাহিরের শব্দেও মনের বহির্বিষয়ের কোন এক বৃত্তিকে তদ্রূপ জাগরিত করিয়া দেয়। এই উভয় প্রকার শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, ঐ শব্দকম্পনপ্রবাহে মনকে জ্ঞান-মার্গে (সুষুম্না) মস্তিষ্কে প্রবাহিত করিয়া, সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়জ্ঞান উপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। তদবস্থায় মস্তিষ্ক হইতে একপ্রকার প্রতিক্রিয়া শক্তি যাহা ইন্দ্রিয়-বিষয়-মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে, যোগবলে ঐ প্রবাহের

অর্থাৎ কম্পন, উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়া ইহাদের শক্তি ধারণা-যোগ্য ভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিবার শক্তি লাভ করিয়া, যখন যে কোন প্রকার শব্দের উপর সংযমন করিবে, তৎক্ষণাৎ যে প্রকার অর্থ প্রকাশের জন্য ঐ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে; তাহা মনুষ্যকৃত, দৈবকৃত, অথবা পশু, পক্ষী ইত্যাদি যে কোন প্রাণী কর্ত্তৃক হউক না কেন, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

কোন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে হইলেও তাদৃশ যোগযুক্ত ভাবে চিত্ত সংযমনের আবশ্যক, নচেৎ "আজিমগড় গিয়া" বুঝিতে, আজি মরগিয়াই বুঝিবে। এজন্যই সংযম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিয়া শাস্ত্র পাঠ করা প্রাচীন যোগিঋষিগণের আদেশে বা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানে সেই উপদেশ উপেক্ষা করিয়া সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান অভ্যাসের কোন ধার না ধারিয়া, শাস্ত্রের শব্দ আবৃত্তি করাতেই প্রকৃত-ভাবে শাস্ত্রার্থ জ্ঞান হইতেছে না। তন্নিবন্ধন কেবল "পঞ্চম্যন্ত" "ষষ্ঠ্যন্ত" লইয়াই বাক্‌বিতণ্ডা হয় মাত্র। যাঁহারা মনুষ্যকৃত শব্দ বা শাস্ত্রবাক্য উপলব্ধি করিতে, শাস্ত্রসম্মতভাবে চেষ্টা না করেন, তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ এবং দেবতা ও পশু, পক্ষী ইত্যাদির ভাষা বা শব্দার্থ কিরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবেন? প্রাচীন আদর্শে আত্ম-দর্শন-যোগ আশ্রয় করিলে, দেখিতে পাইবে সমস্ত তত্ত্বই মিলিয়া গিয়াছে; তখন সমস্ত বিষয়ই সহজ বলিয়া জ্ঞান হইবে। যাঁহারা তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রের, শব্দজ্ঞান শিক্ষা না করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট ঐ শব্দ অর্থহীন "টরে টকা, টরে টকা"মাত্র। আর যাঁহারা শিক্ষাবলে উহার কম্পনশক্তি, অনুভূতিশক্তি ও প্রতিক্রিয়া শক্তি অর্থাৎ প্রত্যয় শক্তির মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন; তাঁহারাই ঐ টরে টকার অর্থ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং শব্দের রূপ বা ধাতু প্রত্যয় কণ্ঠস্থ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শব্দার্থ-

বোঝা হওয়া যায় না। শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, শব্দের প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যয়লব্ধজ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইবে, নচেৎ ভাষাজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ হয় না। যথা—"উপবাস"; উপপূর্ব্বক বসধাতু ঘঞ্ প্রত্যয়ের যোগে উপবাস শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে উপ শব্দের অর্থ-সামীপ্য, বস ধাতুর অর্থ বাসকরা; ঘঞ্ প্রত্যয় বা ঘঞ্ বর্ণদ্বয়ের যৌগিক কম্পন প্রবাহে ঐ উপবাসের প্রকৃত অর্থ সামীপ্যবাস (ভগবৎ সমীপে বাস) উপলব্ধি হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা বিধানে কণ্ঠস্থ বিদ্যার প্রভাবে উহার প্রকৃত শব্দার্থ উপলব্ধি বা অনুভূতি হইল না; কেবল অনশন, লঙ্ঘন কণ্ঠস্থ হইল মাত্র। কাজেই বুঝিতে হইবে, ঐ কণ্ঠস্থ বিদ্যায় প্রকৃতপক্ষে শব্দার্থের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের জ্ঞানলাভ হয় নাই। কারণ "ঘঞ্" এর প্রকৃতি প্রত্যয় বোধ হইল না। তদ্ধেতু অভিধানে উপবাস শব্দের অর্থ লিখিত হইল— অনশন প্রভৃতি, কিন্তু শব্দ ও ধাতু কাহারও সহিত ঐ অর্থের কোন সম্পর্ক নাই এবং প্রত্যয়-যোগেও ইহা সিদ্ধ হইল না। সুতরাং সংযম-ব্রহ্মচর্য্যরূপ যোগানুশীলনের অভাবে, ভাষা বা শব্দার্থজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যাকরণের ধাতু প্রত্যয়গত শব্দের রূপ কণ্ঠস্থ করিলেই, শাস্ত্রার্থ বা শব্দার্থ উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্রে উপবাস অর্থ অনশন বা লঙ্ঘন বলিয়া উক্ত হয় নাই।

উপ-সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নতু কায়স্য শোষণম্॥

বরাহোপনিষৎ

পরমাত্মার সমীপে, জীবাত্মার অবস্থিতির-নাম উপবাস; কিন্তু শরীর শোষণকে উপবাস বলে না; কারণ তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। উপবাস-যোগে-আত্ম-দর্শন-প্রকরণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

শব্দার্থ বা শাস্ত্রার্থ বোধের জন্য সংযম বা যোগাভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন। সংযম বা যোগাভ্যাস দ্বারা নির্ব্বেদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৈরাগ্য

উপস্থিত হইলে, অতঃপর শাস্ত্র আলোচনা করাই ঋষিবাক্য বা শাস্ত্র বিধি। সুতরাং সংযম বা যোগাভ্যাসবলে আমরা যখন মনুষ্যকৃত শব্দেরই প্রকৃততত্ত্ব (প্রত্যয়) উপলব্ধি করিতে পারি না, তখন দেবতার ভাষা, অপদেবতার ভাষা বা পশু পক্ষীর ভাষা কিরূপে বুঝিব? আত্ম-দর্শন-যোগাবলম্বনে সংযম-অভ্যাস করিলেই, আমরা ইচ্ছামাত্র সর্ব্বভাষা বা সমস্তশব্দার্থবিৎ হইতে পারি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগিঋষিগণ যোগবলে সেই শক্তি লাভ করিতেন। আমার উক্তির উপর কেহ সন্দেহ করিলে, তিনি এ বিষয় শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সংযম-ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া, প্রত্যক্ষানুভূতির চেষ্টা করিলেই, আমার বাক্যের সত্যতা ঠিক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে; নচেৎ কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে প্রকৃতভাবে শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি না হওয়ায় ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইবে না। এতৎ সম্বন্ধে একটি শাস্ত্র প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিত-রেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ
প্রবিভাগ-সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ পাতঞ্জল

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় বা জ্ঞান ইহাদের পরস্পর পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে। উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে, সর্ব্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। উৎসাহী পাঠক পাঠিকাগণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, আমার উক্তির সত্যতা নির্ণয় করিলে আমি ধন্য হইব;

৫। যোগবলে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিবার উপায়।—মানবচরিত্রে যতপ্রকার সংস্কার আছে, তাহার এক একটি করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কৃতকর্ম্ম-জনিত যত

সংস্কার আছে, তৎসমস্তই আমাদের এই দেহাভ্যন্তরে "গ্রামোফোন-রেকর্ডস্থ সঙ্গীতের ন্যায়" অদৃশ্য অবস্থায় অন্তর্নিহিত আছে। স্থূল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধির একাগ্রতার সূক্ষ্মভাগ, (জ্ঞানরূপ পিন্) তপোবল-মার্জ্জিত চিত্ত-রেকর্ডের, যে কোন একটি সংস্কারের উপর আরোপ করিব, তখনই তাহা হইতে পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অতীত কাহিনী, সেই সুর, সেই তান, সেই লয়, সেই ভাব, সেই হাসি, সেই কান্না, সেই অভিনয় সমস্তই প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এই প্রকারে পৃথক পৃথক্ ভাবে বিশ্লেষিত যত সংস্কার আছে, ইচ্ছামাত্র যখন যেইটির উপর সংযমন করিব; তখনই তাহার সমস্তবৃত্তান্ত আমরা অবগত হইতে সমর্থ হইব। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়; কারণ—বাল্য অথবা যৌবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছি, যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, পরবর্ত্তিকালে ক্রমে নূতন নূতন সংস্কারের স্তর পড়িয়া তাহাকে আবৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছে; কিম্বা কালপ্রবাহে স্বাভাবিকরূপে ক্রমে উহা সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া স্থূলধারণার অতীত অবস্থায় লুক্কায়িত বা সহজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তন্নিবন্ধন বাল্যজীবনের অনেক স্মৃতি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মনে কর বাল্যজীবনে একটি গান করিতে; তুমি এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। এমতাবস্থায় চিন্তাশক্তির প্রবাহ দ্বারা ঐ বাল্য সময়ের সূক্ষ্মসংস্কারের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে পারিলে, যখন সেই স্তরে কম্পন উপস্থিত হইবে, তখনই ঐ সূক্ষ্ম সংস্কারগুলির মধ্যে একটা তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, সেই স্মৃতি-বিলুপ্ত-সঙ্গীতটির, যে কোনও অংশ তোমার চিত্তে ভাসিয়া উঠিবে। তখন উহার একটি অভিজ্ঞান যেই তুমি ধরিতে সমর্থ হইবে, অমনি ক্রমশঃ সমস্ত অংশগুলি ধৃতিশক্তিবলে নিশ্চয়ই তোমার পরিগৃহীত হইবে। যদি এই ভাবে আমরা বিশ বৎসরের লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধারে সমর্থ হই, তবে ক্রমে পঞ্চাশ, একশত, পাঁচশত বৎসর অতীতের এবং এইরূপে পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের বিলুপ্তবৃত্তান্ত বা বিবরণ, যাহা সূক্ষ্মাকারে

আমাদের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধারে কেন সমর্থ হইব না ? তবে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের লুপ্তস্মৃতি পুনরাবিষ্কারে, চিন্তাশক্তির একাগ্রতা যত প্রয়োজন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের লুপ্তস্মৃতি আবিষ্কারেচিন্তাশক্তির একাগ্রতা ও তন্ময়তা ততোধিক প্রয়োজন ; ইহা বলাই বাহুল্য। এই রূপে তাহারও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, চিন্তাশক্তির ঘনীভূত প্রবাহবলে, সঞ্চিত এক একটি সংস্কারের উপর আরও অত্যধিকভাবে কম্পন উৎপাদন করা আবশুক। এইরূপেসংস্কারগুলির উপর চিন্তাশক্তির প্রবাহ যত ঘনীভূতভাবে প্রবাহিত করা যাইবে, সূক্ষ্ম সংস্কারগুলির মধ্যে কম্পন বা স্পন্দনশক্তি ততোঽধিক গাঢ়ভাবে তরঙ্গাকারে সমুত্থিত হইতে থাকিবে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মনের একাগ্রতাবলে চিন্তাশক্তির গাঢ়তা উৎপাদন করিতে পারিলেই, আমরা এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারি। অতএব মনের একাগ্রতা সাধন ও চিন্তাশক্তির গাঢ়তা উৎপাদনই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। ইহার নামই কর্ম্মযোগ! এই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে স্থূল-বিষয়-পরিগ্রহ হইতে সংযত রাখিতে হইবে। সাধক মন প্রাণে যতক্ষণ সূক্ষ্মভাব অবলম্বন করিতে চেষ্টা না করিবেন, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলিকেও স্থূলবিষয় পরিগ্রহ হইতে কিছুতেই সংযত করিয়া, সূক্ষ্মতত্ত্বমধ্যে সূক্ষ্মপদার্থের অন্বেষণে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। স্থূলদেহের ভাবে সূক্ষ্ম-দেহের বিজ্ঞানতত্ত্ব লাভ হয় না ; সূক্ষ্মদেহবিজ্ঞান লাভ না হইলে, সূক্ষ্ম-দেহনিবদ্ধ পূর্ব্বজন্ম বা অতীত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথন্তাসংবোধঃ।" অপরিগ্রহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব্বজন্মকথা স্মৃতিপথে উদয় হয়। এ নিমিত্ত সূক্ষ্মদেহের জ্ঞান আবশুক। সুতরাং সূক্ষ্মদেহ-তত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে, আমাদিগকে আত্ম-জ্ঞানের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবেই

হইবে। সেই আত্ম-জ্ঞান-যোগ-যুক্ত অবস্থায় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করিতে পারিলেই, তখন আমরা আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকারী হইতে পারিব এবং সেই আত্মদর্শন-যোগবলে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে অনায়াসলব্ধ হইবে। অতএব একমাত্র আত্ম-দর্শন-যোগবলে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সকল তত্ত্বই লাভ হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষকার সম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধকের পক্ষে ইহা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম্মও নহে। যাঁহারা বি, এস্‌সি ; এম এস্‌সি ; সিভিল সার্ভিস্ পাশ করিতে সাহসী হন, তাঁহারা কি অধ্যাত্মতত্ত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন না ? অবশ্যই পারেন। মনের একাগ্রতাই সমস্ত যোগ-সিদ্ধির মূল।

৬। **যোগবলে অপর ব্যক্তির মনোভাব জানিবার উপায়।**—প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবয়ব বিভিন্ন প্রকার, ঐ বিভিন্নপ্রকার অবয়বমধ্যে প্রত্যেকের শরীরে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে; যদ্দ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। কোন যোগী ঐ বিশেষ চিহ্নের উপর সংযমন করিলে, তখন তাহার মনের অবস্থা জানিতে পারেন। কিন্তু অপর ব্যক্তির মনের ভাব কি, তাহা জানিতে হইলে, এক্ষেত্রে তাঁহাকে দুইবার সংযমন করিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে তাহার মনের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, ঐ মনের উপর পুনরায় সংযমন করিলে, যোগী সেই ব্যক্তির মনের সমুদয় ভাব জানিতে সমর্থ হইবেন। (আত্ম-দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য)

৭। **যোগবলে চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকের তত্ত্ব জানিবার উপায়।**—পৌর্ণমাসীতে পরিপূর্ণ চন্দ্রের উপর সংযমন করিলে, যোগী চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকের সমুদয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। (আত্ম-দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য)

৮। **যোগবলে নক্ষত্রের গতিবিধি উপলব্ধি করিবার উপায়।**—ধ্রুবনক্ষত্র বা অন্য কোন নক্ষত্রের গতিবিধি জানিবার ইচ্ছা হইলে, যোগী ধ্রুবনক্ষত্রে সংযমন করিবেন। একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র অবলম্বনেই সমস্ত নক্ষত্রের গতিবিধি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অথবা বিশেষ বিশেষ যে কোন নক্ষত্রের উপর সংযমন করিলে, তদ্দ্বারাই তাহার গতিবিধি বা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। (আত্ম-দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য)

৯। **যোগবলে অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার উপায়।**—আত্ম-দর্শন-যোগবলে যোগীর যখন সমস্ত বন্ধনের কারণগুলি শিথিল হইয়া যায় এবং দেহস্থ নাড়ী সমূহের তত্ত্ব অর্থাৎ দেহস্থ চিত্ত-প্রচারের স্থানগুলি তিনি যখন অবগত হইতে পারেন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগী যে দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই দেহের ক্রিয়াসঞ্চালনশক্তি ও গতিবিধিগুলি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, তিনি অপর দেহেরও ক্রিয়াসঞ্চালনশক্তি ও গতিবিধি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। রেলগাড়ীর কোন ইঞ্জিনচালক, ইঞ্জিনপরিচালনশক্তি ও ঐ শক্তি-প্রবাহ-যন্ত্রের ক্রিয়া বা গতি সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ করিলে, সে যেমন অপর যে কোন রেলগাড়ীর ইঞ্জিন অনায়াসে পরিচালন কিম্বা অপর কর্ত্তৃক পরিচালিত ইঞ্জিনের গতি বা ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছামত দ্রুত অথবা মৃদু কিম্বা বন্ধ করিতে সমর্থ হন, ইহাও প্রায় তদ্রূপই জানিবেন। বেশীরভাগ এই যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। মূলগ্রন্থে এ সমস্ত তত্ত্বই যথাযথ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। জ্ঞান রাখিতে হইবে, আত্মা যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, মনও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী; মন আত্মার অংশ মাত্র। যেমন অগ্নি ও অগ্নিকণা। সুতরাং মূলে কোন ভেদ নাই। দেহস্থ ঊনপঞ্চাশটি বায়ুকে একমাত্র প্রাণবায়ুতে পরিণত

করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেহস্থ সমুদয় নাড়ী বা স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যদিয়া ইচ্ছামাত্র ঐ সকল ক্রিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকিবে। প্রোক্ত উনপঞ্চাশটি বায়ু, প্রাণবায়ুতে পরিণত করার ক্রিয়া কৌশলে, যোগীকে স্বীয় স্নায়ুমণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার উপায় অভ্যাস করিতে হইবে। এই সকল কৌশলযুক্ত ন্যাস ও প্রাণায়ামাদি, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। সেই লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত মৃণ্ময়, পাষাণ বা ধাতবমূর্ত্তিতে দেবদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি ঐ সকল মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে শক্তি জন্মে, তবে ইচ্ছামাত্র অপরের দেহে বা কোন মৃতদেহে তাদৃশ ক্রিয়া সঞ্চালনশক্তি কার্য্যকরী হইবে না কেন? মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র প্রাণই আমাদের অবলম্বন। ভূতশুদ্ধি বা তত্ত্বশোধন-যোগে পঞ্চভূত, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তপদার্থের উপর সপ্তবিধ সূক্ষ্মধারণা অভ্যাস হইলে, সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে যোগীর পক্ষে ইচ্ছামাত্র, যে কোন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করা সুসাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ মনের সূক্ষ্মভাবের প্রতি সংযমন করা আবশ্যক।

"মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্যাবিশতে যদা।
মানসীং ধারণাং বিভ্রন্মনঃ সূক্ষ্মঞ্চ জায়তে॥" দত্তাত্রেয়।

মনের দ্বারা সকল জীবের মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং মানসী ধারণার সংযমন করিয়া, সূক্ষ্মমনোরূপে উৎপন্ন হইবে। অনন্তর সূক্ষ্মবুদ্ধিতত্ত্ব আশ্রয় করিতে পারিলে, দেবতা গন্ধর্ব্বের দেহেও প্রবেশ করা যায়।

দেবানামসুরাণাং বা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাম্।
দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপ্নোতি চ ক্বচিৎ॥ দত্তাত্রেয়

তখন দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতির দেহেও সাধক প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু কখনও আসক্ত হন না। এতৎ সম্বন্ধে সমস্ত

তত্ত্ব ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব ; কারণ—তাহা অব্যক্ত। যাহা ব্যক্তযোগ্য তাহাও এক একটি বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতে হইলে, পৃথক্ পৃথক্ এক একখণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। পূর্ব্বে ইহার সাধন প্রণালী ও নাড়ী বা স্নায়ু সমূহের তত্ত্ব যথাসম্ভব বলা হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, যোগীরা ইচ্ছা করিলে, অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্জ্জীবদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গুরুকৃপাবশে এ সম্বন্ধে মদীয় একটি অনায়াসলব্ধজ্ঞান এই যে, কোন নির্জীব দেহে প্রবেশ করিলে, যোগীর স্থূলদেহের সম্বন্ধ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় না। সুতরাং নিতান্ত অপরিহার্য্য কারণ ভিন্ন কোন যোগী নির্জ্জীব দেহে প্রবেশ করিয়া এ তত্ত্ব পরীক্ষা না করেন।

১০। যোগবলে অন্তর্দ্ধান হইবার উপায়।—দেহের আকৃতি বা রূপের উপর সংযমন করিয়া ঐ আকৃতি বা রূপ অনুভব করিবার শক্তি স্তম্ভিত হইলে এবং চক্ষুর প্রকাশ শক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে, যোগী লোকচক্ষে অন্তর্দ্ধান হইতে পারেন। তদবস্থায় তিনি যে প্রকৃতই অন্তর্হিত হন তাহা নহে, স্থূলকে সূক্ষ্মে নিহিত করেন মাত্র ; অর্থাৎ শরীরের আকৃতি ও শরীর এ দুইটিকে যোগবলে পার্থক্যসাধন করেন, (ইহার ক্রিয়াকৌশল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) কিন্তু সাধককে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যোগের শক্তি বা একাগ্রতা সিদ্ধ হইলে, সাধক যখন কোন বস্তুর আকার বা তদাকার বিশিষ্ট বস্তুকে পরস্পর পৃথক্ করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার পক্ষে এরূপ অন্তর্হিত হইবার শক্তিলাভ সম্ভব হইবে। আমরা সতত যাহা উপলব্ধি বা দর্শন করি, তাহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলেই বুঝিবেন যে, কোন পদার্থের আকৃতি বা রূপ ও আকার বিশিষ্ট সেই পদার্থ, পরস্পর যখন যুক্ত হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

(পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া আকার প্রাপ্ত হয়।) সুতরাং সেই প্রণালী বা সূক্ষ্মতত্ত্বানুশীলনে কোন পদার্থের রূপ ও সেই আকার বিশিষ্ট পদার্থের পার্থক্যের উপর সংযমনশক্তি সঞ্চার করিলে, সেই পদার্থের আকৃতির অনুভূতিশক্তির উপর যে একটা আবরণ নিপতিত হয়, যোগীমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। তদবস্থায় সাধারণ কোন লৌকিকদৃষ্টি সেই আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন মানবের অন্তরালে দেবতা বা কোন সূক্ষ্ম-আত্মার গতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও যোগবলহীন মানব তাহা উপলব্ধি বা দর্শন করিতে পারেন না। অতএব বস্তুর স্থূল সূক্ষ্মের বিভিন্নতা বা পার্থক্যের উপর সংযমন অভ্যাস করিলেই যোগী লোকচক্ষে অন্তর্দ্ধান হইতে পারেন।

১১। যোগবলে দেহত্যাগ ও দেহত্যাগের সময় জানিবার উপায়।—যোগবলে দেহত্যাগ করিতে হইলে, যোগীদিগকে প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ প্রান্তে পৌছিতেই হইবে; জ্ঞানই তাহার রাজবর্ত্ম। যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ সীমায় লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাদৃশ জ্ঞানের নামই আত্ম-জ্ঞান। আমাদিগের অভ্যন্তরে তাহা সতত দেদীপ্যমান থাকিলেও, ইন্দ্রিয়-বিষয়-জনিত-অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায়, সচরাচর উহা বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। যোগবলে সেই অজ্ঞানান্ধকার উন্মুক্ত হইলেই, রাহুমুক্ত দিবাকরের ন্যায় চিদাকাশে সেই আত্ম-জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এ নিমিত্ত যোগী সেই অজ্ঞানের নিরাশ সাধন মানসেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ গুরুদত্ত জ্ঞানবলে সেই অজ্ঞানরাহু সন্তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেই, আত্মজ্ঞান (দিব্যজ্ঞান) উদ্ভাসিত হয়। তখন ঐ জ্ঞানবলে জ্ঞান-শক্তি, বুদ্ধি-সাধনজন্য যতই তৎপর হইবে, ততই বুদ্ধিবৃত্তি সাধককে অনন্তজ্ঞানের পথে প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারে পৌছাইয়া দিবে। তখন ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বজ্ঞতাও

লাভ হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু অপর জ্ঞানদ্বারা তাহাকে লাভ করিতে হয়; সেই অপর বা প্রাথমিক জ্ঞানের নামই গুরুদত্ত জ্ঞান। (১) মূল জ্ঞান আমাদের ভিতরেই অবস্থিত আছে।

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

যোগসূত্র

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুরও গুরু, যেহেতু তিনি কালদ্বারা সীমাবদ্ধ নন; সুতরাং সেই জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টাই আমাদিগের কর্ম্ম। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান বৃদ্ধি সম্ভব; অজ্ঞানের অনুসরণে কখনই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই তত্ত্বানুশীলন করিতে হইলে, মনকে অতিবৃহৎ ও অতিক্ষুদ্র এই দুইয়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে পরিচালিত করিতে হইবেই হইবে। সেই পরিচালনাবস্থায় মন যখন সমাধিরূপ পূর্ণ-একাগ্রতাবশে পূর্ণ চৈতন্যময় প্রদেশে উপনীত হয়, তখনই আমরা সহজলব্ধ জ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। যোগী সেই উচ্চতর জ্ঞানাতীতস্থললক্ষ্যে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মনের গতিশক্তি পরিচালিত করিয়া, যখন সূক্ষ্ম প্রারব্ধকর্ম্মস্থল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তখনই দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা তাঁহার ইচ্ছাধীন হয় অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুর শক্তিলাভ হয়; অথবা কোন কোন যোগী এই দেহ বর্ত্তমান রাখিয়াও ইচ্ছামত নূতন ভাবে দেহের আকৃতি অথবা শক্তিগঠন পূর্ব্বক দেহের ভোগকাল বৃদ্ধি করিয়া লন। (সাধারণতঃ উহাকে যোগবলে পরমায়ু বৃদ্ধি করা বলে) কিন্তু এতদূর্দ্ধে গমন করা বড় সহজ কথা নহে।

---

(১) অজ্ঞান কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞান আবৃত আছে। সেই আত্মজ্ঞানের মুক্তি সাধনোদ্দেশ্যেই গুরুদত্ত জ্ঞানরূপমন্ত্রযোগে, গ্রহণকালীন পুরশ্চরণাদি শাস্ত্র ব্যবস্থা। অন্তর্দ্দৃষ্টি ভিন্ন বাহ্যদৃষ্টি বা একমাত্র বাহ্যানুষ্ঠানে পুরশ্চরণের ফল সিদ্ধ হইতেছে না।

এই ক্ষেত্রটি দেহ পরিত্যাগের বড়ই সন্ধিস্থল, এস্থলে প্রাণপ্রবাহের গতিশক্তিকে অর্গলবদ্ধ না করিয়া, সর্ব্বোচ্চজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইলে, নিমিষে দেহত্যাগ হইয়া যায়, তখন আর পুনর্গমনের শক্তি থাকে না। এ ক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যালোচনায় ইহাই অনুমান হয় যে, আত্মরক্ষা অর্থাৎ দেহত্যাগের আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনরূপ কর্ম্ম প্রারম্ভে, শাস্ত্রে শিখাবন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে, শিখা অর্থে কেশগুচ্ছ নহে; জ্ঞানশিখা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে বহিরর্থে কেশগুচ্ছ বন্ধন অনুকল্প মাত্র। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নহে; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উচ্চতর জ্ঞানার্থিগণকে বিশেষ প্রণিধান সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার বিষয়।

মনই দেহ গঠনের কর্ত্তা; ইহা শাস্ত্রানুমোদিত। ইদানীং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-মধ্যেও ইহা স্বীকৃত হইতেছে। সুতরাং যদি মনের শক্তি দ্বারা দেহগঠনের সম্ভব হয়, তবে মনের শক্তিবলে দেহত্যাগ করা কিম্বা দেহকে যতকাল ইচ্ছা, স্থায়ী করা অথবা ইচ্ছামত দৈহিক শক্তিবৃদ্ধি করাও যে সম্ভব হইতে পারে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং যোগবলে মনের সেই স্বাভাবিক গঠন শক্তিকে আরও উচ্চতর জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিলে, আমরা মৃত্যুকেও যে ইচ্ছাধীন করিতে পারি, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমাদের শাস্ত্রেও সে প্রমাণের অভাব নাই। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

"ইচ্ছয়া যদি শরীরবিসর্গং জ্ঞাতুমিচ্ছসি সখি তব বক্ষ্যে।
ব্যাহরন্ প্রণবমুন্নয় মূর্দ্ধাভিদ্য যোজয় স্বজাত্মনি কায়ম্॥

হে সখি! যদি তুমি ইচ্ছাক্রমে দেহ পরিত্যাগের উপায় অবগত হইতে অভিলাষিণী হও, তবে প্রণব উন্নয়ন্-যোগে প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী করিয়া মূর্দ্ধাভেদ পূর্ব্বক পরমাত্মযুক্ত ভাবে শরীর পরিত্যাগ কর।

অতএব সাধনা বা পুরুষকারবলে এই শক্তি লাভ করা যায়, ইহা শাস্ত্র বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মাহাত্মা ভীষ্ম, পিতৃ-আশীর্ব্বাদবলে এই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। গুরুকৃপা ব্যতীত এই যোগ সিদ্ধ হয় না।

"প্রভঞ্জনং মূর্দ্ধ্নি গতং সবহ্নিং ধিয়া সমাসাদ্য গুরূপদেশাৎ।
মূর্দ্ধানমুদ্ভিদ্য পুনঃ খমধ্যে প্রাণাং স্ত্যজোঙ্কারমনুস্মর ত্বম্॥

গুরূপদেশানুসারে বহ্নির সহিত প্রাণবায়ুকে বুদ্ধিযোগে মূর্দ্ধ্না স্থানে স্থিত করিয়া, মহাকাশ তত্ত্বে প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু পরিত্যাগ কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায়ও এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। গুরূপদেশমতে তাহার কৌশল প্রণিধান না করিলে, তজ্জন্য শাস্ত্র দায়ী নহেন। এতদ্ভিন্ন স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুর সময় জানিতে ইচ্ছা করিলে, যোগবলে তাহাও অবগত হওয়া যায়।

আমাদের মনের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম সংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে যেগুলি অদূরবর্ত্তী ক্রিয়াশীল, তাহার ফল শীঘ্র লাভ হয়। আর যে গুলির বীজ এখনও সূক্ষ্মভাবে লুকায়িত আছে, তাহা দূরবর্ত্তী ফলপ্রদ বুঝিতে হইবে। উহাদের উপর সংযমন করিলে, যোগী দেহত্যাগের নিরূপিত সময় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। এমন কি কোন্ দিন কোন্ সময় (কত দণ্ড কত পলে) তাহার দেহত্যাগ হইবে, তাহাও তিনি জানিতে ইচ্ছা করিলে, সক্ষম হন। এতদ্ভিন্ন মৃত্যু অরিষ্ট বা লক্ষণের উপর সংযমন করিলেও, যোগী মৃত্যুর সঠিক সময় জানিতে পারেন। আত্ম-দর্শন-যোগবলে অসাধ্য সাধন হয়; আত্মদর্শী যোগীর অপ্রাপ্য কিছুই নাই; ইহা ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিয়া, যোগে রত হইলে, তখন প্রত্যক্ষফল উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবে। নচেৎ কেবলমাত্র কথায় ইহা

বুঝিতে কি বুঝাইতে চেষ্টা করা উভয়ই বিড়ম্বনা মাত্র। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন।—

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদপরান্ত-
জ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ পাতঞ্জল দর্শন

১২। যোগবলে দেহে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির উপায়—

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, এ সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ১৪ অঃ

হে মহাবাহো! সত্ত্ব-রজস্তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত নির্ব্বিকারদেহীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। উক্ত গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ দেহীকে জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা সুখে আবদ্ধ করে। রজোগুণ রাগাত্মক (অনুরাগাত্মক) তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও আসক্তি দ্বারা কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ, জ্ঞানকে ভ্রান্তিজনক বিষয় আচরণে আকর্ষণ করিয়া প্রমাদে আবদ্ধ করে। এইগুণত্রয় অতিক্রম না করিয়া কাহারও পক্ষে গুণাতীত ব্রহ্ম বা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, মুক্তির প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা সেই চরম মুক্তি ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও সাংসারিক শোক-দুঃখ-মায়া-মোহ প্রভৃতি দারিদ্রতার বন্ধন হইতে সততই মুক্তির অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও রজস্তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানময় সত্ত্ব-গুণে না পৌছা পর্য্যন্ত, দুঃখ-দারিদ্র্যের কবল হইতে কেহই উদ্ধার পাইতে পারেন না। সুতরাং কি গৃহী, কি যোগী, কি সাধক, কি কর্ম্মী, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, সকলের পক্ষেই সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় স্বীয়

দেহে সত্বগুণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একদিন না একদিন মানব মাত্রকেই এই চেষ্টা করিতে, হইবেই হইবে। সত্বগুণ বৃদ্ধি ভিন্ন কোন প্রকার উন্নতি বা কার্য্যসিদ্ধির আশা নাই। সত্বগুণ বৃদ্ধির শক্তি সকলের পক্ষেই আয়ত্ত হইতে পারে, কারণ উহা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয়ঃ সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা॥ গীতা ১৪ অঃ

হে ভারত! কদাচিৎ রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া সত্বগুণ উদ্ভূত হয়, কখনও সত্ব এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ উদ্ভূত হয়, এবং কখনও বা সত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয়। (ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত মনের চঞ্চল অবস্থাই ইহার কারণ) আমরা প্রণিধান করিলে, আমাদের মধ্যেই ঐ গুণত্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারি। হংসাখ্য প্রাণ, ঈড়া ছাড়িয়া পিঙ্গলায়, এবং পিঙ্গলা ছাড়িয়া ঈড়ায় যাইবার সময় সুষুম্না মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; ঐ "হংসঃ" যখন ঈড়ায় থাকে তখন তমোগুণ; তদবস্থার কর্ম্ম—বিবেকভ্রংশ উদ্যম-হীনতা, কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানরাহিত্য ও মিথ্যাভিনিবেশ। উহা যখন পিঙ্গলায় থাকে তখন রজোগুণ; তদবস্থার কর্ম্ম লোভ,—প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা সকামকর্ম্ম করণেচ্ছা) উদ্যম (আরম্ভ) অশান্তি (অলস ভাব) বিষয় তৃষ্ণা; পরন্তু ঐ "হংসঃ" যখন সুষুম্নায় থাকে তখন সত্বগুণ; তদবস্থায় দেহের সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেই সত্বগুণকে যদি আমরা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে রজস্তমোগুণ আপনা হইতে নিস্তেজ হইয়া যাইবে; অথবা ইচ্ছামাত্র সত্বগুণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া সকল কর্ম্মকে সত্বময় করিয়া আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান করিতে পারি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সত্বগুণকে ধরিয়া রাখিবার উপায় কি? উপায়

এই যে, মনে উহার বিপরীত ভাব উদয় হইতে না দেওয়া। সত্ত্বগুণ রক্ষার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে ঐ সকল প্রতিবন্ধক সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করা। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।" যোগসূত্র

যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, তাহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে অর্থাৎ রজস্তমোভাব উদয় হইলেই, তাহার বিপরীত চিন্তা দ্বারা দেহের সর্ব্ব দ্বারে সত্ত্বগুণের বিষয়গুলির উপর সংযমন করিতে হইবে। এই ভাবে "মৈত্র্যাদিষু বলানি" মৈত্র ইত্যাদি গুণগুলির উপর সংযমন করিলে, ঐ গুণগুলি অতিশয় প্রবল হইবে এবং সত্ত্বগুণ ইচ্ছামাত্র আপনা হইতে বৃদ্ধি হইবে।

১৩। যোগবলে স্থূল-দেহ-তত্ত্ব জানিবার উপায়।—আমরা স্ব স্ব দেহসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষাগার হইতে ক্রমেই দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব শিক্ষা বিলুপ্ত হইতেছে। বিজাতীয় শিক্ষালয় সমূহে যেটুকু স্থূলদেহ সম্বন্ধে শিক্ষার বিধান আছে, তাহা আমাদের শাস্ত্র বা স্বধর্ম্মের অনুকূল নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা আমাদের দেহ-তত্ত্ব-জ্ঞান-সিদ্ধ হয় ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। আমাদের টোল চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত বিদ্যাপীঠগুলিও ইদানীং কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি অধিকাংশ ভাবে প্রসব করিতেছেন; প্রকৃতভাবে বেদান্ত বা দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কদাচিৎ যে দুই চারিটি বৈদান্তিক বা দার্শনিক ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহারা প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। পরন্তু কি দেহতত্ত্ব, কি আত্মতত্ত্বশিক্ষা শুধু পুস্তক পঠন পাঠনাদি কণ্ঠস্থ বিদ্যায় সুসম্পন্ন হয় না। সাধনা বা অনুশীলন ভিন্ন বিদ্যালাভ হইতে পারে

আমাদের শাস্ত্র তাহা বলেন না। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগশিক্ষার্থি-গণের পক্ষে স্থূলদেহতত্ত্ব উপলব্ধি-জনিত-জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র কণ্ঠস্থ বিদ্যা বা মৃতজন্তুর শব ব্যবচ্ছেদে কিম্বা কোন জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদে, প্রকৃতভাবে দেহতত্ত্বের গবেষণা হয় না। পরন্তু তাহার সহিত আমাদের স্বীয় দেহের কোন সংস্রব আছে, ইহাও মনে হয় না।

যোগবল লাভ করিতে হইলে, আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণের আদর্শে দেহতত্ত্বানুশীলন করিয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। মন একাগ্র করিয়া, দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর গতিবিধি ও প্রত্যেক স্নায়ুমধ্যে বায়ুর গমনাগমন জনিত—আকুঞ্চন, প্রসারণ, প্রচ্ছর্দ্দন, বিধারণাদি ক্রিয়াশক্তি-গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাহ্য বিষয়ে মনের গতি বন্ধ রাখিয়া, অন্তর্ব্বিষয়ে তাহাকে পরিচালন করিতে পারিলেই, আমরা দেহযন্ত্রের যন্ত্রী, কে? তাহার অনুসন্ধানও প্রাপ্ত হইতে পারি এবং তৎপরিচালিত ক্রিয়া নিয়ামক যন্ত্রের স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতি শক্তির সহিত আমাদের মনের সূক্ষ্মশক্তি পরিচালন করিলেই, স্নায়বীয়শক্তি প্রবাহগুলি, কিরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট এবং কোন শক্তিপ্রবাহ কিরূপ ভাবে দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহতত্ত্ব সম্পূর্ণই আমাদের আয়ত্ত হয়; পরন্তু মনও, যে সকল স্নায়বীয় শক্তি দ্বারা স্বাভাবিক সঞ্চালিত হয়, সেই সকল স্নায়বীয়শক্তি-প্রবাহগুলি আমাদের ধারণার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, মনোজয় বা মনের চাঞ্চল্য রহিত করা আমাদের পক্ষে সহজ বা সুসাধ্য হয়। অতএব দেহ বা দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও স্নায়ুমণ্ডলীমধ্যে, যে শক্তিপ্রবাহ সর্ব্বদা সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেই, দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানোদয় হইবে।

অত্র গ্রন্থে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে মনের সূক্ষ্মশক্তি পরিচালন কৌশল দ্বারা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয়

উপলব্ধিপ্রণালীমাত্র বলা যাইতেছে। প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-যোগে "হুংসাধ্য" প্রাণপ্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে কন্দ বা নাভিচক্রে ধারণ পূর্ব্বক সুষুম্না-প্রবাহিত পঞ্চপ্রাণ-প্রবাহ-মার্গে শক্তি-সঞ্চালন করিলে, দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চপ্রাণবায়ুর সাহায্যে, আমরা দেহের যাবতীয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই; অপরন্তু ঐ পঞ্চপ্রাণের পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চবর্ণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হওয়ায়, তৎসঙ্গে সঙ্গে "পঞ্চাশদ্বর্ণমাতৃকার" অবয়ব, সংস্থান, উচ্চারণ, বিনিয়োগাদি ভাবসহ শরীরস্থ পঞ্চাশদ্ বায়ুর সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক উনপঞ্চাশদ্বায়ুকে একমাত্র প্রাণবায়ুতে পরিণত করিতে সক্ষম হই। এই ভাবে, মনঃপ্রাণ ঐক্য ও একাগ্র হইলে, তখন আর কোন কর্ম্মই দুঃসাধ্য বলিয়া জ্ঞান হয় না। এ নিমিত্ত নাভিচক্রে সংযমনের পূর্ব্বে বায়ুপঞ্চকের বর্ণ পরিজ্ঞাত থাকিলে, যোগীর পক্ষে দেহতত্ত্ব জানিবার পথ সুগম হয়। উক্ত পঞ্চবর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

রক্তবর্ণ-মণিপ্রখ্যঃ প্রাণবায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপানস্তস্য মধ্যে তু ইন্দ্রগোপক-সন্নিভঃ॥
সমানস্তস্য মধ্যে তু গোক্ষীর-স্ফটিক-প্রভঃ।
অপাণ্ডুর উদানস্তু ব্যানোঽপ্যর্চি সমপ্রভঃ॥ অমৃত বিন্দু

প্রাণবায়ু রক্তবর্ণ মণিবদ্ বর্ণ বিশিষ্ট ও সমুজ্জ্বল। গুহ্যমধ্যস্থ অপানবায়ু, ইন্দ্রগোপ নামক কীটেরন্যায় বর্ণযুক্ত। নাভিদেশমধ্যস্থ সমানবায়ু গোক্ষীর ও স্ফটিকবৎ শুভ্র, কণ্ঠদেশস্থ উদানবায়ু পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ শুক্ল পীত মিশ্রিত এবং সর্ব্ব দেহব্যাপী; ব্যানবায়ু অগ্নিজ্বালাবদ্ বর্ণ বিশিষ্ট ও অতীব সমুজ্জ্বল। এই ভাবে বায়ু পঞ্চকের বর্ণতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, নাভিচক্রে সংযমন করিলে, সমস্ত দেহতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্"

১৪। যোগবলে স্থূলদেহ স্থির রাখিবার উপায়।—স্থূলদেহকে স্থির রাখিতে পারিলে, প্রায় সমস্ত কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। স্থূলদেহ স্থির করার নামই অন্নময়কোষ সাধন। দেহ স্থির হইলেই, প্রাণময়াদিকোষে গমন পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু আমরা স্থূলদেহকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মে একমাত্র বাহ্যানুষ্ঠানই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ মনে করিয়াই ভুল করিতেছি। স্থূলদেহ স্থির রাখিবার আবশ্যকতা মূলগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহার কৌশলও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু স্থূলদেহতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার সহজ কৌশল আশ্রয় করিয়া, স্থূলদেহ স্থির করিবার কৌশল বিদিত হওয়ার চেষ্টাই সাধকের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। যোগবলে ইচ্ছামাত্র দেহস্থির করিতে সমর্থ না হইলে, অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন হয় না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্" অর্থাৎ কূর্ম্মনাড়ীতে সংযমন করিলে, শরীরের স্থিরতা সম্পাদন হয়, সুতরাং দেহে কূর্ম্মনাড়ীর সংস্থান কোথায়, যোগ শিক্ষার্থিগণকে অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাণিগণের কন্দস্থানই কূর্ম্মনাড়ীর মূলকেন্দ্র; এজন্য উহাকে নাভিচক্র বা নাভিমূল বলা হইয়া থাকে। এই কূর্ম্মনাড়ীকে আশ্রয় করিয়া সাড়েতিনকোটি নাড়ী স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে মানবদেহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। (১) তন্মধ্যে দ্বিসপ্তসহস্র নাড়ীসংস্থান সাধারণতঃ যোগিগণ বিদিত

---

(১) সার্দ্ধত্রিকোটি নাড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্।
নাভিক[illegible]তাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ স্থিতাঃ॥

* কেহ কেহ ব[illegible]ফুস্ ফুস্ মধ্যে কূর্ম্মনাড়ী ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে, নাভিচ[illegible] কূর্ম্ম সংস্থান আছে ঐ কূর্ম্ম যোগযুক্তে হৃৎপিণ্ড হইতেও শত শত নাড়ী প্রবা[illegible]ত হইয়াছে, এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন যে "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ"।

হইয়াছেন ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত নাড়ীর মূল নাভিস্থলে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কূর্ম্মনাড়ীর এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে,
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধভাগে হস্তপাদৌ চ বামে,
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ন্তথা।
পঞ্চপঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ॥

নাভিস্থ কূর্ম্ম, তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত, বামভাগে তাহার মুখ ; দক্ষিণভাগে তাহার পুচ্ছ ; তাহার বামহস্ত এবং বামপদ শরীরের ঊর্দ্ধদিকে এবং দক্ষিণহস্ত দক্ষিণপদ অধোদিকে সংস্থিত ; উহার মুখ ও পুচ্ছে দুই দুইটি করিয়া চারিটি এবং বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকের হস্তপদে পাঁচ পাঁচটি করিয়া বিংশতিনাড়ী ; সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী এবং তাহা হইতে বহু শাখা প্রশাখানাড়ী হৃৎপিণ্ড ও সুষুম্না-বহির্গত স্থূলনাড়ীগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহে অবস্থিত আছে। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষভেদে ঐ কূর্ম্মের অবস্থান বিপরীত ভাবাপন্ন। "স্ত্রীণামূর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুংসাং পুনরধোমুখং" অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয় দেহে কূর্ম্ম ঊর্দ্ধমুখ এবং পুরুষজাতীয় দেহে ঐ কূর্ম্ম অধোমুখে অবস্থিত। (১) ঐ কূর্ম্মের মুখ বা পুচ্ছ হইতে যে দুইটি নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে, তাহার একটি হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাভাবে বিভক্ত হইয়াছে। অপরটি কণ্ঠকূপের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত

(১) কূর্ম্মের বিপরীত সংস্থান হেতু পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে নাড়ী ধরিয়া রোগ নির্ণয় করা চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশ। ভাগ্য নির্ণয়াদি ক্ষেত্রেও তাদৃশ ব্যবস্থা।

বিস্তৃত হইয়া, সেই স্থান হইতেও নানাভাবে নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ কণ্ঠকূপের নিম্নস্থ কূর্ম্মপথই যোগিজনের দৃষ্টিগম্য। ঐ কণ্ঠকূপের নিম্নস্থ কূর্ম্মে সংযমন বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলেই, সমস্ত স্থূলদেহে সেই শক্তি বিকীর্ণ হইয়া দেহ ও চিত্ত স্থির হয়।

"কণ্ঠকূপাদধঃ স্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনোদত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ ভৃশম্॥

শিবসংহিতা

কণ্ঠকূপের নিম্নভাগে মনোহর কূর্ম্মনাড়ী আছে, যোগী সেই স্থলে মনো-নিবেশ করিলে, উত্তমরূপে চিত্ত স্থির হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি যে বলিয়াছেন, "কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্" তাহাও ঐ দেহ ও চিত্ত উভয়ই স্থৈর্য্য করা অর্থ বুঝিতে হইবে।

উক্ত কূর্ম্মনাড়ীর নিম্নদেশ হইতে নিম্নোদর পথে মেঢ্রদেশ পর্য্যন্ত যে নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই বজ্রাখ্য নাড়ী নামে অভিহিত। ঐ বজ্রাখ্য নাড়ী সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধদিকে মস্তক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

"বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমেঽস্যাজ্জ্বলন্তী" ষট্চক্র

"বজ্রাখ্যা কীদৃশী? মেঢ্রদেশাৎ শিরসি মস্তকোপরিগতা শীর্ষ পর্য্যন্তং ব্যাপ্তা" অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী মধ্যে বজ্রাখ্য নাম্নী অপরা এক নাড়ী মেঢ্রদেশ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত পরিগতা ও দেদীপ্যমানা আছে "তন্মধ্যে চিত্রিণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা"। উক্ত বজ্রাখ্যনাড়ী-মধ্যে আদ্যন্ত প্রণবযুক্তা যোগিগণের ধ্যানগম্যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা চিত্রিণী নামে অপরা এক নাড়ী আছে। উক্ত আদ্যন্ত প্রণবযুক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা ওঁকারজ্যোতিঃ দীপ্যমানা চিত্রিণীনাড়ীকে পূর্ব্বোক্ত বজ্রাখ্যনাড়ী আবৃত করিয়া রাখায় ঐ বজ্রাখ্যনাড়ীকেও এ স্থলে কেহ কেহ কূর্ম্মনাড়ী নামে অভিহিত করেন। কেহ কেহ বা বজ্রহস্তাও বলিয়া থাকেন।

"প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্।
বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা ॥ চণ্ডী

কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযত করিয়া "হংসঃ" আখ্য জীবাত্মাকে নিম্নোদর পথে ঐ বজ্রহস্তা বা বজ্রাখ্যনাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে, ঐ বায়ুপঞ্চক আপনা হইতে যেন স্থির হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহ যেন স্থির হইতেছে এরূপ উপলব্ধি হয়। সুতরাং দেখা যায় যে সর্ব্বাগ্রে কূর্ম্ম-নাড়ীই যোগীর পক্ষে স্থিতি বা আসন-স্বরূপ। এ নিমিত্ত আমাদের নিত্য-কর্ম্ম শিবপূজাদিতে দেহমনঃপ্রাণাদি স্থির করিবার জন্য শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে ঐ কূর্ম্মনাড়ীরূপ আসন শুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। আসনশুদ্ধির মন্ত্রেও তাহাই পরিস্ফুট আছে।

"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
"কূর্ম্মো" দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং ॥

একমাত্র বাহ্যদৃষ্টিবশে এই আসনশুদ্ধির অর্থ ইদানীং অনেকেই বুঝেন না, কেহ কেহ বা কূর্ম্ম বুঝিতে কেবলমাত্র কূর্ম্ম অবতারই বুঝিয়া থাকেন। যদ্যপি সেই কূর্ম্ম অবতারের ভাবেই ইহার প্রকৃত অর্থ হইত, তাহা হইলে, বরাহ অবতারেও যখন ভগবান্ ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তখন বরাহদেবতাই বা উক্ত হইল না কেন? সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, স্থূলার্থে মন্ত্র প্রয়োগ হয় নাই। আসনের উদ্দেশ্য দেহ ও মনঃপ্রাণ স্থির করা। এতদবস্থায় মন্ত্রের সূক্ষ্মার্থই প্রণিধান করিয়া এ স্থলে কূর্ম্মনাড়ীই বুঝিতে হইবে; এবং পৃথ্বি শব্দে পৃথ্বীতত্ত্ব বা আধার পদ্মই মনে করিতে হইবে। কারণ কূর্ম্মনাড়ীর পৃষ্ঠে আধার পদ্ম বা পৃথ্বীলোক অবস্থিত

বহুদৃষ্টান্ত আছে। বলাকর্ষণার্থে সমরক্ষেত্রেই যে বলবৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তাহাও নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের বলও আকর্ষণ করা প্রয়োজন হয়। এজন্য স্বয়ং ভগবান্‌কেও সময় সময় মনুষ্য ও পশুবল আকর্ষণ করিতে হইয়াছে। মানবগণের পক্ষে, ইচ্ছামত বলাকর্ষণ, যোগবল ভিন্ন সম্ভব নহে। তদুদ্দেশ্যে "আত্ম-দর্শন-যোগই" একমাত্র আশ্রয়নীয়। আত্ম-দর্শন-যোগে সমস্ত শক্তি, সমস্তবলই আকর্ষণ করা যায়। একমাত্র দৈহিক বলে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। তাই সাধক গাহিয়াছেন।—

সেই বলাতীত বল কররে সম্বল
(হ'লো) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র—যে বলে বলি ॥

১৮। যোগবলে সিদ্ধপুরুষ দর্শনের উপায়—

আমাদের মস্তকাভ্যন্তরস্থ সহস্রদলে যে মহাজ্যোতিঃ দেদীপ্যমান আছে, তৎসম্বন্ধে মূলগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মস্তিষ্কস্থ ঐ পরমজ্যোতিতে সংযমন করিলে, সিদ্ধ পুরুষ দর্শন লাভ হয়। "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্" এই সিদ্ধ অর্থে যে কেবল মাত্র "সিদ্ধপুরুষগণকে" বুঝাইতেছে তাহা নহে। যোগী ঐ পরমজ্যোতিঃ দর্শন করিতে সক্ষম হইলে, তিনি আত্ম-দর্শন-যোগ-সিদ্ধ-অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন, আত্ম-দর্শন-যোগের প্রকৃততত্ত্ব তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়; এই জ্যোতিষ্মান পদার্থই আত্ম-দর্শন-যোগের প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই সাধক গাহিয়াছেন।—

"(যাঁর) জ্যোতিতে যতীন্দ্র জ্যোতিঃ (তাঁরে) দেখরে সহস্রদলে,
(সেই) জ্যোতির্ম্ময় প্রাণজ্যোতিঃ যে জ্যোতিতে মনপ্রাণ ভুলে।"

(গ্রন্থকার বিরচিত যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত দ্রষ্টব্য।)

এই সিদ্ধপুরুষ অর্থে সেই আদিদেব পরমপুরুষ, পরমাত্মা পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম, কোন্ কোন্ শাস্ত্রে তাঁহাকে মহাবিষ্ণু বলে, কেহ বা তাঁহাকে

পরমশিব বলেন, কিন্তু তিনি উপাধি রহিত নির্ব্বিকার; এজন্য তাঁহার উপাসনাকে কেহ কেহ শূন্যোপাসনা বলেন; তিনি ত্রিগুণাতীত, এজন্য তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ এজন্য তাঁহাকে "সচ্চিদানন্দ" বলা হয়। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের ধাতুস্বরূপ, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল সেই সিদ্ধপুরুষ হইতেই সমুদ্ভূত, তিনি রূপহীন সুতরাং চক্ষুর অগোচর। তিনি নিশ্চল নির্ব্বিকল্প, নিয়ত একরূপে বিরাজমান; তিনি আধারহীন ও আশ্রয়হীন, তাঁহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত সংসার বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনিই আত্মা, তিনিই অন্তরাত্মা, তিনিই জ্ঞানাত্মা এবং তিনিই পরমাত্মা, তিনি সতত স্বপ্রকাশ হইলেও, মায়ামোহ (অবিদ্যা) আচ্ছন্ন লোকচক্ষে অদৃশ্য; একমাত্র জ্ঞানচক্ষেই যোগী তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি জ্ঞানীর চ'ক্ষে স্ব-প্রকাশ; অজ্ঞানীর চ'ক্ষে অপ্রকাশ, তাঁহার দর্শনই সিদ্ধপুরুষ দর্শন, তাঁহার দর্শনই পুরুষোত্তম দর্শন, তাঁহার দর্শনই আত্ম-দর্শন, তাঁহার দর্শনই ব্রহ্ম-দর্শন, তাঁহার দর্শনই "বিশ্বরূপ-দর্শন" তাঁহার সাক্ষাৎই আত্ম-সাক্ষাৎকার", তাঁহার সাক্ষাৎই "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ"। তাঁহাতে যুক্ত অবস্থার নামই "যোগ" তাঁহারই সাক্ষাৎ, তাঁহাতেই যুক্ত এবং অভেদাত্মস্বরূপে তাঁহারই দর্শনের নাম, "আত্ম-দর্শন-যোগ"। সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগই ধ্যান (সন্ধ্যা) আত্ম-দর্শন-যোগই পূজা, আত্ম-দর্শন-যোগই জপ, আত্ম-দর্শন-যোগই ব্রত, আত্ম-দর্শন-যোগই উপবাস, আত্ম-দর্শন-যোগই সমাধি এবং আত্ম-দর্শন-যোগই মুক্তি। সেই পরাৎপরের প্রতি ঐকান্তিকতাই ভক্তি, তাঁহাতে সমাহিতই মুক্তি, তাঁহাতে স্থিতিই বিশ্রাম বা শান্তি। তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞাতা, সুতরাং তিনিই মতি, তিনিই গতি, তিনিই ত্রাতা।

"তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি মহেশ্বর।
তিনি কালী, তিনি দুর্গা, অভেদ ঈশ্বর॥"

তিনি স্ত্রী নন, তিনি পুরুষ নন, তিনি নপুংসকও নন। তিনি স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনি স্থূল হইতে স্থূলতর, পরন্তু তিনিই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। তিনিই বিন্দু, তিনিই নাদ, তিনিই প্রণব, সুতরাং তিনিই নাদবিন্দু, তিনিই ব্রহ্মবিন্দু, তিনিই তেজোবিন্দু, তিনিই অমৃতবিন্দু এবং তিনিই ধ্যানবিন্দু। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অচ্যুত, অব্যয়, এ নিমিত্ত বর্ণদ্বারা কদাচ তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না। একমাত্র তাঁহার দর্শনে সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয় বলিয়া "মূর্দ্ধ জ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় অর্জ্জুনের সেই "সিদ্ধদর্শন" বা "বিশ্বরূপ-দর্শন" হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় তাহাই "বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, উহারই নাম "আত্ম-দর্শন যোগ" ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। (১)

---

(১) সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

উপাধিরহিতং স্থানং বাঙ্মনোঽতীতগোচরম্।
স্বভাব-ভাবনাগ্রাহ্যং সঙ্ঘাতৈকপদোজ্ঝিতম্॥
আনন্দং নন্দনাতীতং দুষ্প্রেক্ষ্যমজমব্যয়ম্।
চিত্তবৃত্তি-বিনির্মুক্তং শাশ্বতং ধ্রুবমচ্যুতম্॥
তদ্ব্রহ্মাণং তদধ্যাত্মং তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণম্।
অচিন্ত্যচিত্তমাত্মানং তদ্ব্যোম পরমং স্থিতম্॥
সর্ব্বঞ্চ পরমং শূন্যং ন পরং পরমাৎপরম্।
অচিন্ত্যমপ্রবুদ্ধঞ্চ ন চ সত্যং ন সংবিদুঃ॥
পরং গুহ্যমিদং স্থানমব্যক্তং তন্নিরাশ্রয়ম্।
ব্যোমরূপং কলাসূক্ষ্মং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদং॥
ত্র্যম্বকং ত্রিগুণং স্থানং ত্রিধাতুং রূপবর্জ্জিতম্।
নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পঞ্চ নিরাধারং নিরাশ্রয়ম্॥

আত্মজ্ঞান ভিন্ন যোগসিদ্ধি বা সেই সিদ্ধদর্শন হয় না। যোগিবলে সেই পরমজ্যোতিঃতে সংযমন করিতে পারিলেই সিদ্ধদর্শন লাভ হয়।

১৯। যোগবলে দূরবর্ত্তী শব্দ শ্রবণ করিবার উপায়।—আকাশের গুণ শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ও শব্দগ্রহণ, সুতরাং কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযমন করিলে, আকাশতত্ত্বের গুণবলে যোগী বহু দূরের শব্দও যে শ্রবণ করিতে পারেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ; ইহার নামই দিব্যকর্ণ লাভ। সাধনা দ্বারাও এই শক্তি সমাধান হয়।

"অহর্নিশং পিবেদ্ যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্‌দর্শনং খলু॥"

শিব সংহিতা

যে যোগী দিবানিশি কাকচঞ্চুদ্বারা বায়ু পান করিবেন, তাঁহার দূরশ্রুতি দূরদৃষ্টি জন্মে এবং তিনি অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারেন।

২০। যোগবলে শরীর হইতে ইচ্ছামাত্র জ্যোতিঃ নির্গমনের উপায়।—দেহ হইতে ইচ্ছামাত্র জ্যোতিঃ নির্গমনের বা প্রণবাকারে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রণব জ্যোতিঃ বহির্গত করিবার উপায় বা ক্রিয়া কৌশল, পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে ; পরন্তু দেহের মধ্যে কোন্ স্থানে কোন্ বায়ুর সংস্থান, কোন্ বায়ুর কিরূপ গতি, কোন্ বায়ুর কিরূপ ক্রিয়া তাহাও উক্ত মূল গ্রন্থেই বিবৃত করা

অশূন্যে শূন্যভাবঞ্চ শূন্যাতীতমবস্থিতম্।
মুনীনাং তত্ত্বযুক্তঞ্চ ন দেবা ন পরং বিদুঃ।
লোভং মোহং ভয়ং দর্পং কামক্রোধঞ্চ কিল্বিষম্॥ তেজোবিন্দু

হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে সংক্ষেপে একটিমাত্র তত্ত্ব বলা যাইতেছে যে, এই কর্ম্ম সাধনে দেহমধ্যস্থ সমান বায়ুই বিশিষ্ট সহায়ক। অন্তঃপ্রাণায়াম-বলে আমরা জানিতে পারি যে, দেহমধ্যে প্রত্যেক বায়ুরই ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। ঐ ঐ স্তর ইচ্ছামাত্র অতিক্রম করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলেই; বায়ুজয় সিদ্ধ হয়; তদবস্থায় যে কোন কার্য্য সাধনের জন্য যে বায়ুস্থির বা কম্পন আবশ্যক, ধারণাযোগে সেই ভাবে কার্য্য করিতে পারিলেই, সেই বায়ুশক্তি জয় করা আমাদের আয়ত্ত হয়। (১) এ ক্ষেত্রেও তাদৃশ উপায়ে সমান বায়ু জয় করিতে সক্ষম হইলেই, দেহ হইতে ইচ্ছামাত্র জ্যোতির্নির্গমন হইতে পারে। পরন্তু সংযমন শক্তিতে ঐ বায়ু ঘনীভূত করিয়া প্রাণযুক্তে উদ্ধগামী করিতে পারিলে, ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রণবাকারে উহা বহির্গত হইতে থাকে। (ধ্যানযোগে আত্ম-দর্শন প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

২১। যোগবলে জলে নিমজ্জন ও দেহ কণ্টক বিদ্ধ না হওয়ার উপায়।—পূর্ব্বোক্ত কৌশলে দেহস্থ উদান নামক বায়ুপ্রবাহ বিজিত হইলে, তদবস্থায় দেহ অতিশয় লঘু হয়। (২) তদ্ভিন্ন প্লাবনী অভ্যাসেও ইহা সুসাধিত হইতে পারে।

অন্তঃপ্রবর্ত্তিতোদারমারুতা পূরিতোদরঃ।
পয়স্যগাধেঽপি সুখাৎ প্লবতে পদ্মপত্রবৎ॥

প্লাবিনী-যোগ

বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও ভিতরের বায়ু পরিত্যাগ না করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিবে। তাহাতে বক্ষাদি উদরমধ্যে যে, বায়ু সঞ্চিত থাকে তৎকর্ত্তৃক বক্ষাদি উদর প্রসারিত বা স্ফীত হইয়া প্লাবনীকুম্ভক অনুষ্ঠান

(১) নাসাগ্রে ধারণং গার্গি বায়োর্ব্বিজয় কারণম্। যাজ্ঞবল্ক্য
(২) শরীরং লঘুতাং যাতি পদাঙ্গুষ্ঠে তু ধারণাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য

হয়। যোগী ঐ কুম্ভক অভ্যাস বলে অগাধজলে পদ্মপত্রবৎ ভাসিয়া থাকিতে পারেন। উদানবায়ু জয়দ্বারা দেহ ইচ্ছামত লঘু ও গুরু করা যায়। উদানবায়ুর শক্তি অমোঘ, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উদানবায়ু সিদ্ধি করিতে পারিলে ; জলে নিমজ্জন, দেহে অস্ত্রাঘাত ও কণ্টক বিদ্ধ প্রভৃতি হইতে পারে না। এমন কি অগ্নির দাহিকাশক্তিও প্রতিহত হয়। ভক্তকুলচূড়ামণি প্রহ্লাদ গুরুসন্নিধানে এই যোগশিক্ষা লাভ করিয়া জলে, অগ্নিতে, অস্ত্রাঘাতে, আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা অদৃষ্টবাদরূপ ভীরুতা বা একমাত্র অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত না হইয়া, যদি আত্মশক্তি বা সাধনাবলে উহা লাভ হইতে পারে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে, ঐ শক্তিলাভের জন্য অবশ্যই আমাদের মধ্যেও তাদৃশ জ্ঞানী গুরু লাভের চেষ্টা হইত। অবশ্য ভগবদিচ্ছায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু গুরূপদিষ্টভাবে আত্মশক্তির সাধন ভিন্ন কেহই ভগবৎকৃপা লাভে অধিকারী হন নাই। সুতরাং আত্ম-অবিশ্বাসবশেই আমরা আজ শক্তিহীন। আত্ম-বিশ্বাসী সাধকের প্রতিই ভগবানের দয়া হয়, বিনা সাধনায় কেহই ভগবানের দয়া বা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সাধনবলে এই শক্তিলাভের জন্য আমাদের শাস্ত্রেও উপদেশ রহিয়াছে—

"উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্ব সঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।"

পাতঞ্জল

উদান নামক বায়ুজয়ের দ্বারা যোগী জলে বা পঙ্কে মগ্ন হয় না এবং কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে ও ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারেন। যে স্নায়ু-শক্তিপ্রবাহ আমাদের ফুস্‌ফুসাদি দৈহিক সমস্ত যন্ত্রের উপর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, পূর্ব্বোক্ত কৌশলে যখন তাহাকে জয় করা যায়, তখন যোগী জলমগ্ন, কণ্টক বা অস্ত্রফলকে বিদ্ধ হন না, ক্রমে তাঁহার স্নায়বীয় ও পৈশী-শক্তি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তখন তাঁহাকে প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে

নিক্ষেপ করিলে, অগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। (১) পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ রাসায়নিক বিজ্ঞান সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে উদানবায়ুর উপাদান বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাব্‌মেরিণ, জেপ্‌লীনাদি নানা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া, আজ সমস্ত জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছেন। (২) আর আমরা অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্‌ যোগিঋষির বংশধরগণ কি না, একমাত্র ইন্দ্রিয়-বিষয়-মদে মত্ত হইয়া, সেই পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরবসহ আত্মশক্তি ধ্বংস করিতেছি। আত্ম-দর্শন-যোগবলে যাহাতে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া পূর্ব্বশক্তির পুনরভ্যুদয় হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ চেষ্টাই "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" প্রতিজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের শিক্ষা মন্দির গুলিতে তাদৃশ ধর্ম্ম শিক্ষার বীজ রোপণ-জন্য বদ্ধপরিকর হইতে

---

(১) ন চ মূর্চ্ছা ক্ষুধাতৃষ্ণা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ রোগো জরামৃত্যু দেবদেহঃ প্রজায়তে॥
নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ।
ন দেহং ক্লেদয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্নভুজঙ্গমঃ॥
লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সমাধির্জায়তে ধ্রুবম্‌।
কপালবক্ত্র সংযোগে রসনা রসমাপ্নুয়াৎ॥ খেচরি-যোগ

কপাল কুহরে রসনা সংযোগ দ্বারা এই শক্তি লাভ হয়। প্রহ্লাদ, গুরুসন্নিধানে এই যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। (আত্ম-দর্শন-যোগসমাধি দ্রষ্টব্য)

(২) সাব্‌মেরিণ জেপ্‌লীন্‌ যে নূতন আবিষ্কৃত এবং একমাত্র পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক প্রসূত, তাহা আধুনিক ইংরেজী শিক্ষাভিমানিগণ স্বীকার করিতে পারেন, কারণ তাহারা ঘরের কিছু খবর রাখেন না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দুর্য্যোধন দ্বৈপায়নহ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্বৈপায়নহ্রদে তাঁহাদের সাব্‌মেরিণ (ডুবোজাহাজ) ছিল। চণ্ডী ও রামায়ণে পুষ্পকরথ বা জেপ্‌লীনের উল্লেখ আছে। সুতরাং পুরাকালেও আর্য্যদেশে উহার প্রচলন ছিল।

হইবে। ইহাই আমাদের স্বধর্ম্মমূলক "জাতীয়শিক্ষা," এই স্বধর্ম্মমূলক শিক্ষার একমাত্র পন্থা "আত্ম-দর্শন-যোগ"। আত্ম-দর্শন-যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলাদলী নাই, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এমন কি হিন্দু, মুসলমানেরও কোন বিবাদ বিসম্বাদের কারণ নাই; যেহেতু প্রত্যেকেই যার যার স্বধর্ম্ম আদর্শ রাখিয়া স্ব স্ব দেহরূপ ধর্ম্মমন্দিরে আত্ম-শক্তি-বৃদ্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আত্ম-দর্শন লক্ষ্যে দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সংগঠন, মনুষ্যমাত্রেরই স্বধর্ম্ম; ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম পূর্ব্বক আত্ম-শক্তির উদ্বোধন, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই সার্ব্বজনীন স্বধর্ম্ম আদর্শ রাখিয়া আত্ম-দর্শন-যোগের অনুসরণে মনোবৃত্তি সুগঠিত হইলেই, তদ্দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম প্রবাহিত হইবে। তখন আর শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম্য, খৃষ্টিয়ানগণ মধ্যে, বিভিন্ন-জাতি-ধর্ম্মগত বৈষম্যভাব উপলব্ধি হইবে না। এইভাবে ত্রিবিধ অসহযোগনীতি পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়া প্রকৃত স্বরাজলাভের পন্থা সুগম হইবে। ইহাতে মানবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার আছে। অতএব মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষাকল্পে "আত্ম-দর্শন-যোগ" পঠন পাঠন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সাধনা, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষেই সর্ব্বপ্রকার আত্মোন্নতির একমাত্র সহজ ও সুগম পন্থা। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় বা কোনপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা ২ অঃ

এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের প্রারম্ভে বিফলতা নাই, প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই, এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও জীবকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।

২২। **যোগবলে আকাশগামী হইবার উপায়।**—আমাদের দেহ মধ্যে ব্যোম, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পাঁচটি তত্ত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মূর্দ্ধা হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত আকাশতত্ত্ব, ভ্রূমধ্য হইতে হৃদয় পর্যন্ত বায়ুতত্ত্ব, হৃদয় হইতে পায়ু পর্য্যন্ত তেজস্তত্ত্ব, পায়ু হইতে জানু পর্য্যন্ত জলতত্ত্ব, জানু হইতে পাদ পর্য্যন্ত ক্ষিতিতত্ত্ব। আকাশতত্ত্ব হইতেই সমস্ত তত্ত্ব উৎপত্তি এবং আকাশতত্ত্বের গুণ পরবর্ত্তী চারিটী তত্ত্বেই বিরাজিত আছে, পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ করিতে, নিম্নস্থ চারিটী তত্ত্বকে একমাত্র আকাশতত্ত্বেই লয় করিতে হয়; ইহার ক্রিয়া কৌশলাদি পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে; তদনুসারে ক্রিয়া সাধিত হইলে, ঘটস্থ আকাশের সহিত বিশ্বাকাশের সম্বন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন ঐ উভয় আকাশতত্ত্বের উপর সংযমন করিলে, দেহ ক্রমশঃ লঘু হইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হয়; ইহাও পূর্ব্ববর্ণিত উদানবায়ুর খেলা মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই উদান বায়ুর শক্তি বিশ্লেষণে অধুনা নানা প্রকার যন্ত্রবিজ্ঞান আবিষ্কার হইয়াছে। পুরাকালেও দশাননের পুষ্পক রথাদি আকাশ ও বায়ুতত্ত্ব গবেষণাবলেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

আকাশতত্ত্বে সংযমনের কৌশল এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগী সর্ব্বভূত জয় করণান্তর "নিরাশীরপরিগ্রহঃ" ভাবে পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন (সংযমন) করিবেন।

"মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি।" শিবসংহিতা

ঐরূপ ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে মনোনাশ এবং ব্যোমপথে গমনাগমন করিবার শক্তি লাভ হয়।

"বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগনে বিজিতানিলঃ।"

মূলবন্ধযোগের অভ্যাসে সাধক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উত্থিত হইতে পারেন। (আত্ম-দর্শন-যোগ দ্রষ্টব্য)

২৩। যোগবলে ইন্দ্রিয়জয় করিবার উপায়।—আমাদের অনিত্য সুখ-দুঃখের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়-বিষয়-তৃষ্ণার মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হই, নচেৎ আমাদের আত্মা, নিত্য, শুদ্ধ ও নির্ব্বিকার; সুতরাং সুখ-দুঃখের অতীত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এইগুলি আত্মার এক একটি যন্ত্র মাত্র; ইহাদের সাহায্যে তাঁহার বাহ্যবিষয়-উপলব্ধি বা দর্শন হয় মাত্র। আত্মারূপ দ্রষ্টার সহিত প্রোক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ দর্শনশক্তিগুলি যখন স্থূলভাবে এক বলিয়া ধারণা হয়, তখনই আমরা অহঙ্কাররূপ অজ্ঞানে অভিভূত হই; ইত্যাকার ভাবকেই শাস্ত্রে অস্মিতা বলে। "দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা" অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একত্বভাবই অস্মিতা। আত্মা ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত সমুদয় বৃত্তিগুলির সহিত নির্লিপ্ত, সর্ব্বব্যাপী ও আকার রহিত এবং অনন্ত জানিয়াও অহঙ্কাররূপ অজ্ঞানবশে মনোবৃত্তির সহিত তাঁহাকে একভাব ধারণা করিয়া, আমরা অনিত্য সুখ-দুঃখ ও মায়া-মোহের নিপীড়নে ব্যথিত হই। তথাপিও উহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিতে সহজে প্রবৃত্ত হই না, কারণ ইহা ঐ অহংজ্ঞান বা অস্মিতার কার্য্য; (১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যাহারবশেই ইন্দ্রিয়গণ জয় করা যায়। "ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়ানাম্" অর্থাৎ সাধক যখন ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যপদার্থের রূপের আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী ভাবে আত্মার সহিত যুক্ত রাখিতে সক্ষম হন, তখনই

---

(১) অহংজ্ঞান বা অস্মিতা নাশ করিবার পক্ষে আত্মজ্ঞানই একমাত্র মহৌষধি।

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ গীতা ৫অঃ

সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া, নিখিল বস্তুজাত প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ আত্ম-জ্ঞান সেই অজ্ঞান নাশ করিয়া পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে।

ইন্দ্রিয়গণ বশতাপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হইলেই, যোগীর সমস্ত স্নায়ুগুলিসহ বায়ুমণ্ডলী, স্বাভাবিকরূপে "আত্ম-দর্শন-যোগের" অনুকূল গতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহারাই আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়ক হয়। সুতরাং যোগী ইচ্ছামত এই শক্তি পরিচালন জন্য উক্ত ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়-অভিমুখী গতি, তদানুষঙ্গিকজ্ঞান এবং ঐ জ্ঞান বিষয়ীভূত অস্মিতা বা অহং প্রত্যয় ও উহাদের ত্রিবিধভাব অর্থাৎ প্রথমে যে পদার্থ তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা; তৎপরে ঐ পদার্থের আকার সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান আছে, তাহা; অতঃপর যে অহংভাব দ্বারা ঐ পদার্থ দর্শন হইতেছে, তাহা; এই ভাবত্রয়ের উপর ক্রমশঃ সংযমন করিলে, ইন্দ্রিয়জয় সহজ-সাধ্য হয়। তদবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়-বিষয়-জনিত কোন স্বাভাবিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও, ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। গুরূপদিষ্ট-ভাবে মহামুদ্রাযোগ, যথানিয়মে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তদ্দ্বারাও সহজে ইন্দ্রিয় সংযম সুসাধিত হয়, ইহা শিববাক্য।—

"বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণম্।" শিবসংহিতা

মহামুদ্রাযোগ অনুষ্ঠানে যাবতীয় সুখবাঞ্ছিত সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া থাকে। (প্রাণায়াম প্রকরণ দ্রষ্টব্য) অন্তঃকর্ম্ম ব্যতীত একমাত্র বহিরনুষ্ঠানে অহংজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। অহংজ্ঞান বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ ইন্দ্রিয় সংযম সুসাধিত হয় না।

২৪। যোগবলে যৌবনলাভের উপায়।— বাল্য, যৌবন ও জরা প্রত্যেক দেহেরই স্বাভাবিক পরিণতি; কাল ইহার নিয়ন্তা, ইহা সত্য বটে; কিন্তু গাঢ়চিন্তাশক্তি প্রবাহে কালের সূক্ষ্মগতি দেহ বা কোন পদার্থমধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া, যথাবস্তুকরূপে দেহ বা সেই পদার্থের আকার ও পরিণাম ইচ্ছামাত্র কালস্রোতের প্রতিকূলে পরিবর্ত্তিত

করা যায়। স্বধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যসন্তানগণ ইহা কদাচ অস্বীকার করিতে পারেন না। যোগবাশিষ্ঠে, বিগতযৌবনা রাণী চূড়ালা, যোগবলে পুনর্যৌবন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করিয়া, যে সকল আধুনিক শিক্ষিতগণ উহা "বাতুলের উক্তি" সিদ্ধান্ত করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই; মহর্ষি চ্যবনের যৌবনত্ব প্রাপ্তি, মহারাজ যযাতির যৌবনশ্রী লাভ প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন নাই; অধুনা তাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণাফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক-যুবতীত্ব, যুবক-যুবতীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাত্ব প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বানরের দেহ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া, অস্ত্রোপচারে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পুরাতন আর্য্যমনিষিগণ যোগবলে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমানে বানরদেহ হইতে যে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। মহারাজ যযাতি স্বীয় পুত্রের দেহ হইতে সেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তাঁহার সকল পুত্র আত্মযৌবন দান করিয়া, তদ্‌বিনিময়ে পিতার জরাবস্থা গ্রহণে সম্মত হন নাই। ইতরপ্রাণী হইতে যৌবনলাভোপযোগী উপাদান গ্রহণ নিষ্ঠুরতা বা অধর্ম্ম, প্রত্যুত পশুদেহের উপাদানে মনুষ্যদেহ দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, যেহেতু পশুদেহের স্থিতিকালের ন্যূনতানুসারে পশুদেহস্থ স্নায়ু ও পেশীসমূহের শক্তি এবং জীবনীশক্তি অল্পকালস্থায়ী। বিশেষতঃ মানব, যোগবলে দৈহিক শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখিতে সমর্থ। আমাদের শাস্ত্রে সে প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং পুনর্যৌবন লাভ যদি সম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহার সহজপন্থা আবিষ্কার করা, অর্থাৎ অপর কোন মানব কিম্বা মানবেতর প্রাণী হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ না করিয়া, স্বীয় দেহ হইতেই মানসিক শক্তিবলে তাহার বিকাশ সাধন হইতে পারে কিনা, ইহাই এখন আলোচ্য বিষয়।

জরাজীর্ণদেহে পুনর্যৌবন লাভ যদি সম্ভব বলিয়া স্বীকার্য্য হয়, তবে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই শক্তি এই দেহের মধ্যে যে কোন স্থানে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত আছে; অন্য কোন পদার্থসংযোগে তাহার পুনর্বিকাশ হয় মাত্র। এখন ঐ আবশ্যকীয় পদার্থটীর শক্তি আমাদের দেহের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। (১) "আত্ম-দর্শন-যোগবলে" আমরা যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি এই দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মাকারে নিবদ্ধ আছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে সূক্ষ্মদেহস্থ যৌবন লাভের প্রয়োজনীয় শক্তিটির উপর সংযমন করিলেই, বুদ্ধিবৃত্তির কম্পনপ্রবাহ, সেই লুক্কায়িত যৌবনশক্তির সূক্ষ্মস্তরে তরঙ্গোত্থিত করিয়া, অবশ্যই তাহাকে ভাসাইয়া তুলিবে। সে অবস্থায় উহার একটি তরঙ্গ আমরা ধারণা করিতে সমক্ষ হইলেই, ক্রমে সমস্ত তরঙ্গগুলি আমাদের জ্ঞানকোটরে আসিয়া স্থিরভাব ধারণ করিবে। তখন আমরা মনের একাগ্রতাবলে বুদ্ধিবৃত্তির (জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধির) কম্পনপ্রবাহ যত স্থির ও ঘনীভূত করিতে পারিব, আমাদের স্থূল অবয়বে তাহার ক্রিয়াশক্তি ততই স্ফুরিত বা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে; ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সাধককে দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তাহার অতীতকর্ম্মের সংস্কারগুলি, সূক্ষ্ম-মূল-স্বরূপে সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত আছে, মনই ঐ সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে সংস্কারানুযায়ী পুনঃ পুনঃ নানাভাবে স্থূলদেহ গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং অপরাপ্রকৃতিগত মনই স্থূলদেহ গঠনের কর্ত্তা ইহা স্বীকার্য্য। এজন্য যোগিগণ একমাত্র মনঃশক্তিবলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন।

(১) মন বিশ্বব্যাপী, সুতরাং একমাত্র মনের মধ্যেই সমস্তশক্তি লুক্কায়িত আত্ম-দর্শন-যোগবলে সূক্ষ্মদেহ হইতে মনের সেই সূক্ষ্মশক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

অতএব মনকে প্রথমতঃ দেহযন্ত্রের যন্ত্রীস্বরূপে ধরিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি ও তোমার মন ইহার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তাহা হইলে, তুমিই তোমার দেহগঠনের মূল; তোমার সংস্কারজাত ইচ্ছাবলেই এই স্থূলদেহ গঠিত হইয়াছে; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্ম-দর্শন-যোগবলে তোমার সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তন করিবে, সেই ভাবেই তোমার দেহের আকার বা অবয়ব পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। সাধারণতঃ তুমি ধনীর সংস্কারে মনের সংস্কার সাধন কর, ধনীর ন্যায় দেহকান্তি পুষ্টি হইবে। এরূপ তুমি দরিদ্রের ন্যায় কি রোগীর ভাবে মনকে সমাহিত কর, তথন ক্রমে তোমার দেহের অবস্থা সেই ভাব ধারণ করিবে। কারণ তোমার মনের গতির তারতম্য অনুসারে তোমার দেহের স্নায়ুজাল ও পেশীগুলি তদাকারকারিতভাবে গঠিত হইবে। পরন্তু তোমার মনের শক্তির অনুরূপে, তোমার যে কোন খাদ্যপদার্থ হইতে প্রাণ, অপানাদি বায়ু বা ঐ স্নায়বিক পৈশীশক্তিগুলিও তদুপযোগী সারভাগ উৎপাদন এবং সমস্ত শরীরে যথাযোগ্যভাবে তাহা পরিচালন ও পরিগ্রহণ করিবে। মনের ঈদৃশ ইচ্ছাশক্তি সিদ্ধিবলে পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ স্ব স্ব ইচ্ছামত, রূপ বা মুর্ত্তি ধারণ করিতে পারিয়াছেন। (ইহার নামই কামরূপী শক্তি) আমরা আত্ম-অবিশ্বাসবশে আত্ম-দর্শন-যোগে বঞ্চিত হইয়াই ঐ শক্তি বিন্যাসের প্রণালী বিস্মৃত হইয়াছি এবং তদ্ধেতু ,অজ্ঞানতাবশে আমরা যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার প্রায় শক্তিহীন হইয়াছি। আমরা ঐ যন্ত্র কর্তৃক চালিত না হইয়া, আত্মশক্তি বলে (আত্ম-দর্শন-যোগাবলম্বন) যাহাতে ঐ যান্ত্রিকদেহ পরিচালন করিতে পারি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিবার কৌশলে যদি ঐ যন্ত্রের ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, তবে আমরাও ঐ ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে পুনর্যৌবন লাভ করা ত সামান্য কথা, মহর্ষি স্বষ্টা, বাল্মীকি ও বিশ্বামিত্র

প্রভৃতি ঋষির ন্যায় সৃষ্টির অধিকার লাভে কেন সমর্থ হইব না ? এই ভাবে আত্ম-শক্তি ইচ্ছাধীন করিতে পারিলে, তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্ম বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বর প্রদানে বদ্ধপরিকর হইবেন। তাঁহারা মুনি, ঋষি, দেবতা, অসুরগণকে ইচ্ছা করিয়া বরদানে শান্ত করেন নাই। প্রত্যেকেই আত্মশক্তিবলে তাহা লাভ করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আত্ম-শক্তিসম্পন্ন যোগীর নিকট ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সততই তটস্থ থাকিতেন।

হঠযোগ-সাধন-কৌশলেও দেহসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের অনেক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও মানসিক একাগ্রতা এবং অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন। "হ" অর্থে—"সূর্য্য" "ঠ" অর্থে—"চন্দ্র," অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যের সূক্ষ্ম সম্মিলন আবশ্যক, সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে সুষুম্নামার্গে ক্রিয়া পরিচালিত হইলেই, ঐ যোগশক্তি লাভ হয়, অন্যথা উহা দৈহিক "কষরৎ" মাত্র ; উহা যোগপদবাচ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যৌবন লাভ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

"রসনামূৰ্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥
রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোদ্বিতীয়কঃ ॥" শিবসংহিতা

সাধক ক্ষণার্দ্ধকাল রসনা ঊর্দ্ধগামী করিয়া (বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অবস্থান করিলে, শীঘ্র রোগ ও জরা-মরণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ঐ কৌশলে, যে সাধক জিহ্বাগ্র কণ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মনঃপ্রাণ যুক্ত করিয়া নিপীড়িত করিবেন ; তাঁহার কখনই মৃত্যু হইবে না ইহা ধ্রুবসত্য।

এরূপ অভ্যাস করিলে, সাধক দ্বিতীয় কামদেব-সদৃশ রূপ-যৌবন লাভ করিতে সমর্থ হন। অপরন্তু—

সীৎকাং কুর্য্যাত্তথা বক্ত্রে প্রাণেনৈব বিজৃম্ভিকাম্।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ॥
সীৎকারী যোগ।

সীৎকার অর্থাৎ শিষ্ দিতে দিতে ভিতরের বায়ু বিরেচন করিলে, তদ্দ্বারা যে মূলবন্ধ ও উড্ডানবন্ধযোগ অনুস্মৃত হয়। উহা ধারণ পূর্ব্বক্ উক্ত সীৎকারের অবস্থায় জিহ্বাওষ্ঠ দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে পূরক করিবে, তদনন্তর মুখ সম্যগ্রূপে বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে; অনন্তর উভয় নাসারন্ধ্রপথে রেচন করিবে। এই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক এই যে, মুখ দ্বারা কদাচ বায়ু রেচন না হয়, তজ্জন্য কণ্ঠ এমনভাবে সংকোচ করিতে হইবে, যেন অন্তরস্থ বায়ু, মুখগহ্বরে প্রবেশ না করে। পুনঃ পুনঃ এই সীৎকার-কুম্ভক-যোগ-অনুষ্ঠান করিলে, সাধক কামদেবতুল্য রূপ ও যৌবন লাভে সমর্থ হন। প্রাণায়ামযুক্ত মহামুদ্রা-যোগের অনুষ্ঠান দ্বারাও জরা ব্যাধি নাশ হইয়া পুনর্যৌবন লাভ করা যায়। "বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনম্"। মহামুদ্রাযোগে দেহে সুনির্ম্মল কান্তি, মৃত্যুজয় ও বার্দ্ধক্যভাব বিদূরিত হয়। প্রাণায়ামযুক্ত মহাবেধ-যোগ অনুষ্ঠান করিলেও যৌবন লাভ হয়।

"বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী।" শিব সংহিতা।

মহাবেধযোগে সাধকের বায়ুসিদ্ধ হয় এবং জরামরণ নাশ হয়, অর্থাৎ সাধকের কখনও বার্দ্ধক্য অবস্থা উদয় হয় না, তিনি স্থিরযৌবন লাভ করিতে পারেন। মহীয়সী কুন্তিদেবী ভগবান্ সূর্য্যের নিকট হইতে এই যোগলাভ করিয়া স্থিরযৌবনা হইয়াছিলেন। শাস্ত্রবিশ্বাসী হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে এই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিলেই ইহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে।

"কুম্ভকঃ সূর্য্যভেদস্তু জরামৃত্যুবিনাশনঃ।" যোগদীপিকা

সূর্য্যভেদন নামক কুম্ভকযোগে জরামৃত্যু সাধককে আক্রমণ করিতে পারে না। উড্ডানবন্ধ নামক যোগবলেও বৃদ্ধব্যক্তি পুনর্যৌবন লাভ করিতে পারেন।

"উড্ডীয়ানন্তুসহজং গুরুণা কথিতং সদা।
অভ্যাসেৎ সততং যস্তু বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥"

গুরূপদিষ্টভাবে উড্ডানবন্ধযোগ অনুষ্ঠান করিলে, সাধক বৃদ্ধ দেহেও তরুণত্ব বা যৌবনত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। মূলবন্ধযোগেও বৃদ্ধব্যক্তির যৌবন লাভ হয়।

"অপানপ্রাণয়োরৈক্যং ক্ষয়োমূত্রপুরীষয়োঃ।
যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ॥" মূলবন্ধযোগ।

অতএব যোগবলে এই দেহেই বার্দ্ধক্য পরিহার হইয়া, যে পুনর্যৌবনশক্তি লাভ ও ইচ্ছানুরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের শাস্ত্রকারগণও ইহা বহুপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে আত্মা কি? পবিত্র কি? সুন্দর কি? শক্তি কি? বিন্দু কি? অন্তরস্থ এই সকল জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মপদার্থ নিচয় প্রতিনিয়ত ধ্যান বা পবিত্র চিন্তাশক্তির একাগ্রতা বলে, দেহের জরা বিনাশ হইয়া যৌবনশ্রী ও শক্তি লাভ হয়।

"স্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্মোদয়েন সা।
শুশুভে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদগতা॥"

যোগবাশিষ্ঠ

পবিত্র কি? আত্মা কি? সুন্দর কি? অন্তঃকরণে ইহাই বারংবার আলোচনা করায়, রাণী চূড়ালা যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার

অভ্যন্তরে সেই আত্মজ্যোতির আবির্ভাব হইল এবং সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি নব মুকুলিতা পুষ্পলতিকারন্যায় সৌন্দর্য্যে শোভান্বিতা হইলেন।

২৫। **যোগবলে বীর্য্যধারণের উপায়।**—এই স্তব মূলগ্রন্থে (আত্ম-দর্শন-যোগগ্রন্থে) বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে এইটুকুমাত্র সংক্ষেপে পরিস্ফুট করা আবশ্যক যে, বীর্য্য অর্থ কেবলমাত্র শুক্র নহে, বীর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ মনের তেজঃ বা শক্তি। বহির্মুখগামী সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারাই ইহার ক্ষয় সাধন হয়। মনের তেজস্বিতা অর্থাৎ একমাত্র মনের শক্তি রক্ষা করিতে পারিলে, ইচ্ছামাত্র শুক্রধারণ বা শুক্রত্যাগ সাধকের পক্ষে কিছুই কঠিন বিষয় নহে। সুতরাং মনের তেজোধারণই বীর্য্যধারণের প্রধান উপায়। যোগবলেই এই শক্তি লাভ হয়। বহির্মুখগামী ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আকর্ষণে যেরূপ মনের তেজ ক্ষয় হয়, তদ্রূপ বিপ্রাকর্ষণবলে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে অন্তর্মুখী রাখিতে পারিলে, মনের তেজ বা শক্তি যে বৃদ্ধিও করা যায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করা যায়, তাহার নামই "যোগ"। একমাত্র "ব্রহ্মবিন্দুতে" সংযমন করা ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে বীর্য্যধারণ হয় না। ব্রহ্মবিন্দুতে সংযমনাভ্যাস করার নামই "ব্রহ্মচর্য্য" বা "ব্রহ্মবিন্দুধারণ"; ইহা সিদ্ধ হইলেই "বীর্য্যধারণ" সিদ্ধ হয়। এখন প্রণিধান করা আবশ্যক যে, কি উপায়ে ঐ ব্রহ্মবিন্দুধারণ সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে একবাক্যে ইহাই বলা যাইতেছে যে, আত্ম-দর্শন-যোগের অনুবর্ত্তন করা ভিন্ন, কোন প্রকার যোগসিদ্ধির অন্যপন্থা নাই (নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়) এবং একমাত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ অর্থাৎ আত্ম-দর্শী যোগী ভিন্ন আত্ম-দর্শনের উপায় বা পন্থা অপর কেহই প্রদর্শন করাইতে সমর্থ নন। শাস্ত্রজ্ঞান এক্ষেত্রে অজ্ঞ; যেহেতু ইহা উপলব্ধিকৃত বিষয়। বাহ্যানুষ্ঠান বা বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা কদাচ অন্তর্দর্শনের জ্ঞান লাভ হয় না। আমাদের বেদ ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" মণ্ডুক

অন্তর্দ্দর্শনের চেষ্টা বা যোগবলে হৃদয়গ্রন্থিভেদ হইলেই, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া আত্মা বা ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তরস্থ গ্রন্থিভেদ হইতে পারে না। গ্রন্থিভেদের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সংশয় ছিন্ন হওয়া; মনের তেজোধারণ ভিন্ন ইহার কোনটিও সিদ্ধ হয় না। ধৃতিশক্তিবলে মনের তেজোধারণ করিয়া, মহামুদ্রাযোগানুষ্ঠান করিলে, শুক্রধারণের ক্ষমতা জন্মে।

"সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুধারণম্।
জারণন্তু কষায়স্য পাতকাণাং বিনাশনম্॥" শিব সংহিতা

মহামুদ্রাযোগে শরীরস্থ সমুদয় নাড়ী চালন ও বিন্দুধারণ হয়, অর্থাৎ যাবতীয় নাড়ীমধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চালিত হইয়া, সাধকের ইচ্ছামত বিন্দুধারণযোগে শুক্রের অধঃপতন নিবারণ হয় এবং শরীরের সমস্ত কলুষবৃত্তি বিদূরিত হইয়া সমস্ত পাতক বিনাশ হয়।

একাল পর্য্যন্ত বাহ্যবস্তু দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রকার কল-কৌশল ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইলেও, অন্তর্দ্দর্শন বা আত্ম-দর্শনোপযোগী কেহ কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণ সুদূর অতীতে আত্ম-দর্শন-যোগবলে, অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, "মন"ই অন্তস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণের উৎকৃষ্ট যন্ত্র। মনদ্বারা সেই মনোযন্ত্রের উপর শক্তি প্রয়োগ কর, তখন "আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুঃ" ভাবে অর্থাৎ মনই মনের বন্ধু হইয়া, মনের তেজোবৃদ্ধি করিয়া দিবে। যোগী এই প্রণালী অবলম্বনেই কায়া মন পাকা করিয়া, আত্মার

সহিত মনের একত্ব সম্পাদন করেন। নির্ব্বেদ (১) রহিত চিত্তদ্বারা, সংকল্পসম্ভূতযোগের প্রতিকূল কামনা সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া, মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সকল হইতে বিশিষ্টরূপে নিরাকৃত করিতে পারিলেই, মনের তেজোবৃদ্ধিবলে বিন্দুধারণ সুলভ হয়। এইরূপে ধারণাবশীকৃতা বুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ মনকে পরমাত্মা বা "ব্রহ্মবিন্দুতে" নিশ্চলভাবে স্থাপন করিতে পারিলেই ইচ্ছামাত্র "বীর্য্যধারণ" শক্তি লাভ হয়।

২৬। যোগবলে কুণ্ডলিনী চৈতন্যের উপায়।—

"মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
শায়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা॥
যাবৎ সা নিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবং পশুর্যথা।
জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ॥"

আত্ম-শক্তি স্বরূপা পরমদেবতা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে মূলাধারে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। যাবৎ ঐ কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তা থাকেন, তাবৎ কোটি কোটি যোগাভ্যাস দ্বারাও জীবগণের জ্ঞানোদয় হয় না। ততদিন জীব পশুরতুল্য অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকেন।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াম্।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী॥" শিব সংহিতা

মূলাধারে কুণ্ডলিনীশক্তি দৃঢ়রূপে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন। ধীমান্ যোগী অপানবায়ুর সহযোগে, শক্তি প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে চালিত করিবেন। ইহাকে শক্তিচালনীমুদ্রাযোগ বলে। ইহা দ্বারা সকল শক্তি লাভ হয়। এতভিন্ন উক্ত কুণ্ডলিনীর চৈতন্য

(১) দুঃখ বুদ্ধিহেতু প্রযত্নের যে শিথিলতা তাহাকে নির্ব্বেদ বলে।

সম্পাদন সম্বন্ধে নানাপ্রকার ক্রিয়াযোগানুশীলন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার কালেই, আচার্য্য কর্তৃক ইহার চৈতন্য সম্পাদিত হয়। (১) অধিকাংশ স্থলে আচার্য্য তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিশালী না হওয়াতেই অধুনা ব্রাহ্মণসন্তানগণের দুরবস্থার কারণ ঘটিয়াছে। আপামর সাধারণের পক্ষে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণকালে গুরু আত্মশক্তিবলে শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগরিত করিয়া, সুষুম্নামার্গ মুক্ত রাখিবার ক্রিয়াযোগসহ, মন্ত্রশক্তি প্রদান করাই শাস্ত্রবিধি। কেহ কেহ বা এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রপুরশ্চরণ (মন্ত্র চৈতন্য) কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন জন্য মহাপুরশ্চরণাদি ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান ও শক্তির অভাবে ঐ সকল ক্রিয়াযোগের বাহ্যানুষ্ঠানই সম্পাদন হয় মাত্র। বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা, অপরন্তু ইন্দ্রিয়-বিষয়-বিক্ষিপ্ত চঞ্চলমনে মন্ত্ররূপ কতকগুলি শব্দসমষ্টি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকভাবে আবৃত্তি করিলেই, মন্ত্র চৈতন্য বা পুরশ্চরণ হয় না। মনের ত্রাণসাধনই মন্ত্রপুরশ্চরণের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত অপরাখ্য অষ্টপ্রকৃতিগত মনকে, সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে প্রকৃতির পরা-অংশে পরিচালন করিয়া, আজ্ঞাচক্রস্থ মন ও ইতরাখ্য শিবের সহিত যুক্ত করাকেই মন্ত্র-পুরশ্চরণ বা ষট্চক্রভেদ বলা হয়। (২) আজ্ঞাচক্রে মন ও ইতরাখ্য শিব সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—

"এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপপ্রসিদ্ধং।
যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং ॥" ষট্চক্র

---

(১) যোগকালে স্বপানেন প্রবোধং যাতি সাগ্নিনা।
স্ফুরন্ত্যা হৃদয়াকাশান্নাগরূপা মহোজ্জ্বলা ॥ যাজ্ঞবল্ক্য

(২) মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং সুষুপ্তা পরমেশ্বরী।
প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসামরুতাসহ ॥

ঐ দ্বিদল পদ্মমধ্যে প্রসিদ্ধ ও সূক্ষ্মরূপ মনঃ ও তৎকর্ণিকাতে শক্তিরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে এবং ঐ যন্ত্রে ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন।

"বিদ্যুন্মালাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং।

বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ ॥" (ষট্‌চক্র

ঐ স্থান বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমান এবং প্রকৃতিযুক্ত লয়ের স্থান। সাধকগণ একাগ্রতা সহকারে মূলাধার সহিত ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সংযুক্ত ঐ লিঙ্গকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবোধক বেদানামাদিবীজং "প্রণব" স্বরূপে ধ্যান করেন। যম, নিয়ম অভ্যাসপরায়ণ সংযতচিত্ত সাধক সদ্‌গুরূপদিষ্টভাবে কুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব অবগত হইয়া, তদ্‌গতচিত্তে ব্রহ্মসূত্রমার্গে "অঙ্কুশবীজ" মূলাধারাদি ষট্‌পদ্ম ভেদ করিয়া সহস্রদলপদ্মে তাহার উত্থান চিন্তা করিবে।

"হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ সুশীলো

জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং ॥

ব্রহ্মদ্বারস্থমধ্যে বিরচয়তু তরাং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবো

ভিত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব তপ্তাং ॥ ষট্‌চক্র

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, গুণবৈষম্যে কর্ম্মসংস্কার বিজড়িত জীবাত্মার নাম কুলকুণ্ডলিনী বেষ্টিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। উপনিষৎ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে ইহাকেই অহংতত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। যোগী এই অহংতত্ত্বের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তাঁহার দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ স্থূল অহং নাশ হইয়া, আত্ম-জ্ঞানরূপ "সোঽহং" ভাবের উদয় হইবে এবং সেই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে সুষুপ্তা কুণ্ডলিনী বা জীবাত্মার অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া, সুষুম্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে উত্থিত হইবে। তাই সাধক গাহিয়াছেন।—

"তস্মাদজ্ঞাননাশায় আত্মজ্ঞান কর আশ্রয় ॥

(তবে) ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হবে প্রাণায়ামবলে ॥" ইত্যাদি

আত্মজ্ঞানবলে পুরুষ-প্রকৃতি স্বরূপা "হংস" আখ্য জীবাত্মার চিরমিলন সম্পাদন হইলেই অর্থাৎ "সঃ"কার "হং"কারের স্বতন্ত্র জ্ঞান তিরোহিত হইলেই, কুণ্ডলিনী চৈতন্য হয়, তখন সাধক স্বীয় দেহাভ্যন্তরে সুষুম্নামার্গে প্রণব বিজড়িত ইষ্ট বা আত্ম-দর্শন-যোগ লাভে সমর্থ হন। পাঠক পাঠিকা ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন।

নাভিচক্রে বায়ু ধারণ করিলে, অগ্নি নিশ্চয়ই কুণ্ডলিনী স্থানে গমন করিয়া উহাকে সন্তাপিত করিবে; তখন অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত ও সমীরণ দ্বারা প্রসারিত হইয়া সে জাগরিত হইবে।

কুণ্ডলিনীর চৈতন্যসম্পাদনপক্ষে বিস্তারিত পূর্ব্বে প্রাণায়াম প্রকরণে বিবৃত করা হইয়াছে। সাধক চতুরঙ্গুলী বিস্তৃত সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করিয়া ঐ বস্ত্রকে সূত্র দ্বারা সংবদ্ধ করিবে; অতঃপর সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে নাসারন্ধ্রপথে সমাকর্ষণ পূর্ব্বক অপানবায়ুর সহিত মিলিত করিবে। যে পর্য্যন্ত বায়ু সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট না হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত শক্তিচালন-যোগের সহিত অশ্বিনীমুদ্রা অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে কুম্ভকযোগানুষ্ঠান করিলেই, কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া, উর্দ্ধপথে ধাবিত হইবে, এবং সহস্রদলপদ্মে শিবের সহিত যুক্ত হইবে। মূলবন্ধ-যোগানুষ্ঠানে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া, সহজে সরলগতি প্রাপ্ত হয় এবং মূলবন্ধযোগে প্রাণাপান বায়ুর ঐক্যতা নিবন্ধন দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।

তেন কুণ্ডলিনী সুপ্তা সন্তপ্তা সংপ্রবুধ্যতে।
দণ্ডাহতা ভুজঙ্গীব নিশ্বস্য ঋজুতাং ব্রজেৎ॥
বিলং প্রবিষ্টেব ততো ব্রহ্মনাড্যন্তরং ব্রজেৎ।
তস্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা॥

প্রাণাপানৌ নাদবিন্দু মূলবন্ধেন চৈকতাম।
গত্বা যোগস্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতো নাত্র সংশয়ঃ॥

অপানবায়ুর ঊর্দ্ধগতিতে অগ্নি উদ্দীপিত হওয়ায়, ঐ প্রদীপ্ত অগ্নির সন্তাপে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তি দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত সরল ও প্রবুদ্ধা হন এবং সর্প যেমন বিবর মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কুণ্ডলিনীশক্তি সরল হইয়া ব্রহ্মমার্গে গমন করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত যোগিগণপক্ষে মূলবন্ধযোগাভ্যাস কর্ত্তব্য। মূলবন্ধসাধনে প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু, নাদবিন্দুযুক্ত হইয়া প্রণবাকারে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়ায় যোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সহজ উপায়। এ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রত্যক্ষানুভূত সুকৌশল আছে, বাহুল্য বোধে তাহা প্রকাশ করা গেল না।

২৭। যোগবলে পীড়া আরোগ্যের উপায়।—দেহের সহিত মনের নৈকট্যসম্বন্ধ বিধায়, দেহ সুস্থ থাকিলেই, মনস্থির হয়। সুতরাং যোগবলে দেহ সুস্থ রাখার কৌশল পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে এই যোগশিক্ষা লাভ করিয়া, দেহ গঠন করিতে পারিলে, সাধককে অকালজরা বা ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু তিনি ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে যে সকল কৌশল আছে, তাহা নিম্নে সরল ভাষায় বিবৃত করা যাইতেছে।

১। শ্রমসন্তাপ নিবারণ।—জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া, পান করিতে পারিলে শ্রম-সন্তাপ ও ব্যাধি সকল বিনাশ পায়।

২। মহারোগ নিবারণ।—যিনি আত্মাতে আত্মার আরোপ পূর্ব্বক (আত্মন্যাত্মসমারোপ) কুণ্ডলিনী স্থানে নিরোধ করিয়া রাখিতে পারেন, ছয়মাস অভ্যাসবলে তিনি মহারোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন।

৩। ক্ষয়রোগ আরোগ্য।—জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া জিহ্বা-মূলেধারণ করিতে পারিলে, ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়। বায়সচঞ্চু দ্বারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনী মুখে তাহা প্রদান করিলে, ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়।

৪। জ্বর, প্লীহা আরোগ্য।—যে ব্যক্তি ছয়মাস বা তিনমাস উদরমধ্যে বায়ু ধারণ করিয়া পান করেন, তাঁহার গুল্ম-প্লীহাদি উদরমধ্যস্থ সমস্ত রোগ আরোগ্য হয় এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৫। অগ্নিমান্দ্য (ডিস্‌পেপ্সিয়া) আরোগ্য।—অগ্নিস্থানে বায়ু ধারণ করিতে পারিলে, শরীর লঘু হয় এবং জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য দূর হয়। এতদ্ভিন্ন উড্ডানবন্ধ-মুদ্রা-যোগে জঠরানল বৃদ্ধি ও রস বৃদ্ধি হয়।

৬। বাতজরোগ আরোগ্য।—অগ্নিস্থানে প্রাণবায়ু ধারণ করিলে, সমস্ত বাতজ রোগ আরোগ্য হয়।

৭। কফজ রোগ আরোগ্য।—পৃথ্বী বা জলস্থানে প্রাণবায়ু ধারণ করিলে, কফজরোগ সকল অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৮। পিত্তজরোগ আরোগ্য।—বায়ু ও আকাশস্থানে প্রাণবায়ু ধারণ করিলে, ত্রিদোষজনিত সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

৯। যে যোগী দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া, জিহ্বা ঊর্দ্ধে রাখিয়া ধীরে ধীরে বায়ু সেবন করেন, তিনি শীঘ্রই মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হন।

১০। তালু মূলে জিহ্বা রাখিয়া প্রাণবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়া, যিনি নাসিকা পথে রেচন করেন তাঁহার সমস্ত ব্যাধি নাশ হয়।

গুল্মপ্লীহাদিকান্ রোগান্ জ্বরং পিত্তং ক্ষুধাং তৃষাম্।
বিষাণি শীতলীনামকুম্ভিকেয়ং নিহন্তি হি॥

শীতলীকুম্ভকের অভ্যাসে গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি উদররোগ নষ্ট হয়। জ্বর, পিত্ত, বিকার আরোগ্য হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা দূর হয়, কোন প্রকার বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলেও কোন অপকার করিতে পারে না।

১১। পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে পৃথ্বীর অংশ ক্ষয় হইলে, প্রাণিগণের বলি আবির্ভূত হয়। জলের অংশ ক্ষয়ে কেশরাশি ক্রমশঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। তেজের ক্ষয় হইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়। বায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কান্তি বিনষ্ট হয়, দেহে কম্প উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহা লক্ষ্য করিয়া ক্ষয় পুরণের চেষ্টা করিবে।

১২। যে যে অঙ্গে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে তাহার উপকারিণী ধারণা ধারণ করিবে, অর্থাৎ শীতল হইলে উষ্ণ, উষ্ণ হইলে শীতল ধারণার অনুসরণ করিবে, এইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রবাহে যাবতীয় রোগ শান্তি হয়।

২৮। যোগবলে সংযম সিদ্ধির উপায়।— সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যোগপথে ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽয়ং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥ অষ্টাবক্র

অহো! আমি নিরঞ্জন, শান্ত, নিত্যজ্ঞান সম্পন্ন ও প্রকৃতি হইতে অতীত। আমি এতদিন মোহজালে বদ্ধ হইয়াছিলাম, একমাত্র আমিই (আত্মাই) যেরূপ এই দেহ প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ এই জগতের সকল পদার্থই আমা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং নিখিল পদার্থেই "আমি" বর্ত্তমান রহিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই সংলিপ্ত নহি। অহো! অধুনা আমি এই দেহ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে দেখিতে পাই যে, একমাত্র "আমি" ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই, আত্মাই-জগৎ; আমি অবিনাশী, ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভপর্য্যন্ত

জগতের সমস্ত পদার্থ ধ্বংস হইলেও "আমি" বর্ত্তমান থাকিব। আমি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, মোহবশতঃই আমি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন মানব, কখন পশু ইত্যাদি নানারূপ উপাধি আমাতে কল্পিত হইতেছে আমাতেই এই বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে। আমার (আত্মার) বন্ধন-মোক্ষ ভ্রান্তি নাই, সুতরাং মায়া, মোহ, শোক, বিষাদ কিছুই "আমার" থাকিতে পারে না। এতাদৃশ ভাবপ্রবণতাবশে সাধক গাঁহিয়াছেন—

যোগেশ্বরী-সাধন-সঙ্গীত—বিষয়-সমাধি।

রাগিণী—সুরট মল্লার, তাল-ঝাঁপ।

"তুমি," "তুমি" বল কারে? (জীব) "আমি" ভিন্ন "তুমি" নাই রে।
(দেখ) "তত্ত্বমসি"-জ্ঞান-যোগে (ঐ) "তুমি" "আমি"র বিচার ক'রে॥

তৎ-ত্বং-অসি "তত্ত্বমসি" (শাস্ত্রে) মায়া-নাশী বলে যাঁরে।
(ভাব্‌লে) "সেই আমি," "আমিই সেই," দেহাত্মবোধ যাবে দূরে॥
(ঐ) তুমি আমি কেবল মায়া, যথা—বৃক্ষ, বৃক্ষ-ছায়া,
(দেখ) "একৈবাহং জগত্যত্র" (আছে) দ্বিতীয় কে? মম পরে॥

তৎ—পদে পরম শিব, ত্বং—পদে ঐ জীবঃ-শিব,
(তাই) "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ" ব'লেছেন শিব পার্ব্বতীরে—
বেদ, বলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" তন্ত্র বলেন "সোঽহমস্মি"।
চণ্ডী ব'লেন "চিতি"-রূপে (আছি) ব্যাপ্ত আমি চরাচরে।

"সচ্চিদানন্দ"-রূপ আমি (আছে) বেদান্তে সিদ্ধান্ত লেখা
(তাই) সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপে (যোগীর) ধ্যানগম্য "আমিই" একা—
(দেখ) "আত্ম-জ্ঞানের" আলো ধ'রে (ঐ) তুমি আমি সব "ওঁকারে"
(তাই) "আত্ম-দর্শন-যোগে" "যোগেশ্বরী," "আত্মস্থ" সেই পরাৎপা

ইত্যাকারভাবে আত্ম-তত্ত্ব-বিষয় চিন্তা করিবেন। যাঁহার চিত্ত অনিত্য সাংসারিক বিষয়ে নিস্পৃহ হয়, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়-বিষয় আপনা হইতে সংযত হইয়া থাকে।

বিহায় বৈরিণং কামমর্থঞ্চানর্থসঙ্কুলম্।
ধর্ম্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্ব্বত্রানাদরং কুরু॥ অষ্টাবক্র

অনর্থ সংঘটনকারী অর্থ ও কাম এই উভয় প্রবল শত্রুকে পরিত্যাগ কর, কাম ও অর্থের হেতুভূত যে ধর্ম্ম (কাম্যকর্ম্মাদি) তাহাদিগকে অনাদর কর, অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মমধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠতম; কামনাই সংসারভোগ; ইচ্ছাই বন্ধন; তাহার বিনাশই মুক্তি। সুতরাং প্রাণায়াম প্রত্যাহারযোগাবলম্বনে ইন্দ্রিয় বিষয়গুলিকে অন্তর্মুখী করিতে অভ্যাস করিলেই সংযম সিদ্ধি হইবে। অমানুষত্বভাব বিদূরিত হইবে।

অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেদ্ যদি।
বায়গ্নিধারণে নৈনং দেহসংস্থং বিনির্দ্দহেৎ॥ দত্তাত্রেয়

যোগীর অন্তরে অমানুষত্বগুণ প্রবেশ করিলে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত কোন বিষয়ে চিত্ত অভিভূত হইলে, বায়ু ও অগ্নির ধারণা দ্বারাই তাহা প্রশমিত হয়। (পঞ্চতত্ত্ব ধারণযোগ আলোচনায় বিস্তৃত বিবৃত হইয়াছে।)

মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির বহির্ম্মুখীগতি দ্বারাই চিত্তচাঞ্চল্য বা অসংযমের কারণ উপস্থিত হয় এবং উহাদের অন্তর্ম্মুখী গতিই চিত্তস্থির ও সংযমের হেতু; ইহা মনে দৃঢ় ধারণা পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়-বিষয়মধ্যে কোনরূপ চঞ্চলতা বা অসংযমের কারণ উপস্থিত হইলে, একান্তমনে উহার প্রতিকূল ভাব চিন্তা করিলেই, চিত্তবৃত্তি স্থির ও সুসংযত হইবে। সামাজিক বা লৌকিক জগতের মান-অপমান, ত্রুটি বিষয়ে চিত্তের হর্ষ-বিষাদ সতত প

করিতে চেষ্টা করিবে। এ দুটি যোগীর পক্ষে বিপরীতার্থ হইলেই অর্থাৎ অপমানই মান এবং মানই অপমান বলিয়া জ্ঞান হইলে সংযম সিদ্ধি হয়।

মানাপমানৌ যাবেতৌ তাবেবাহুর্বিবিষামৃতে।
অপমানোঽমৃতং তত্র মানস্তু বিষমং বিষম্॥ দত্তাত্রেয়

মান ও অপমান এই উভয়কে বিষ ও অমৃত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, তন্মধ্যে অপমান অমৃত এবং মান তীক্ষ্ণ বিষ। যোগী এই জ্ঞান স্থির রাখিতে পারিলেই সংযম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

যেমন মনের চঞ্চলতায় বায়ুর চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ বায়ুর চঞ্চলতায়ও মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং বায়ু স্থির দ্বারাও মন এবং ইন্দ্রিয় স্থির হয়। সাধক সদ্গুরূপদিষ্টভাবে সহজ কৌশলাবলম্বনে বায়ুকেও স্থির রাখিতে চেষ্টা করিবেন। চরণাঙ্গুষ্ঠ স্বীয় বদনে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থান করিবে, তদ্দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু স্থির হইবে, কখনই প্রবাহিত হইবে না। পরন্তু মহামুদ্রাদি, মুদ্রাত্রয়যোগ অভ্যাস করিলে, নিদ্রালস্যজনিত চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে। সাধক এইভাবে সংযমসিদ্ধ হইতে সতত চেষ্টা করিবেন।

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" পাতঞ্জল দর্শন

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহা একটির পর আর একটি, কোন বস্তুর প্রতি ক্রমান্বয় বিন্যস্ত হইলে একটি সংযম হয়।

"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" পাতঞ্জল দর্শন

এই প্রকার সংযমন দ্বারা যোগীর জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যখন কোন যোগী এই প্রকার সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হন, তখন সমুদয় অন্তরশক্তি তাহার করতলগত হয়। এই সংযমনই যোগীর একমাত্র যন্ত্র। ইহাদ্বারা জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সকল বিষয় বা বস্তুরই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

তবে প্রথমতঃ স্থূল বিষয়গুলির উপরই সংযমাভ্যাস নূতন শিক্ষার্থিগণের পক্ষে আবশ্যক। সোপানক্রমে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরে তাহা পরিচালনদ্বারাসংযমন সিদ্ধ হয়, "তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ" ইহাই যোগবলে সংযম সিদ্ধির উপায়।

২৯। যোগবলে সূক্ষ্মদেহে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার উপায়।—অন্তঃপ্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি বা তত্ত্বশোধনবলে আমরা স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহের পৃথকৃত্ব সমাধান করিতে পারি, ইহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-স্বরূপে প্রকাশ করা গিয়াছে এবং প্রাণায়াম ধারণা ও ধ্যানাদি-যোগ-প্রকরণে উহা শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে। অন্তঃপ্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি বা তত্ত্বশোধন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-যোগে অতীন্দ্রিয় অবস্থা উদয় হইলেই ইহা সিদ্ধ হয়। অনেকে নিদ্রাবস্থায় কখন কখন অন্যত্রগতি ও স্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, যদিও তাহা স্বপ্ন নামে অভিহিত, তথাপি অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যে, ঐরূপ সন্দর্শনাদি হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উহা স্থূল বা অবিশুদ্ধ মনের শক্তিতে সম্পন্ন হয় বলিয়া উহা সূক্ষ্মদেহের কর্ম্মরূপে আমাদের স্থূলজ্ঞানে উচ্চতর ও দৃঢ় ধারণা যোগ্য হয় না এবং আমরা ইচ্ছাধীন ভাবে সূক্ষ্মদেহকে পরিচালন করিতে পারি না বিধায়, আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হই না। ইহার কারণ প্রথমতঃ আত্মজ্ঞানের অভাব, তন্নিবন্ধন স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। দ্বিতীয়তঃ সংযমহীন বুদ্ধি, বাহিরে বাহিরে বাবুই পাখীর মত ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া মুগ্ধ থাকে; যোগবলে সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়গত মনকে অতীন্দ্রিয়ভাবে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা সূক্ষ্মদেহকে যদৃচ্ছামত পরিচালন করিতে পারি। পূর্ব্বেই তত্ত্ব-শোধনের কৌশল প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতে সপ্তবিধ সূক্ষ্ম ধারণা-যোগে ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করিতে হইবে।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আত্মাকে "পৃথিবী" ধারণা করিয়া সংযমন করিলে, অপার্থিব সুখ লাভে সমর্থ ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই প্রকারে জলে সূক্ষ্মরস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে সূক্ষ্ম ধারণা করিয়া, স্থূলভাব ত্যাগ করিবেন। এইরূপে পঞ্চ ধারণা অতিক্রম পূর্ব্বক মনের উপর সূক্ষ্মধারণা বিন্যস্ত করিয়া, সকল জীবের মনে প্রবেশ করিতে অভ্যাস করিবে এবং মানসিক ধারণায় সংযমন করিয়া সূক্ষ্মমনোরূপে উৎপন্ন হইবে। অতঃপর সাধক ঐ প্রকারে জীবের বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধির স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিবে এবং ঐ সকল সূক্ষ্ম উপাদানগুলি ধারণাযোগে, অহংতত্ত্বের সহিত যুক্ত করিয়া, ইচ্ছামত ধ্যানযোগে সমাধি অবলম্বন করিলেই, যোগ-সূত্র-যুক্ত সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ হইতে প্রাণাত্মার প্রণব প্রবাহে নিক্রান্ত হইয়া অপ্রতিহত গতিতে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। অথবা স্থূলদেহে অবস্থিত থাকিলেও জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব ঐ সূক্ষ্মদেহের জ্যোতিঃ মধ্যে উদ্ভাসিত হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণ এই প্রকার সমাধিযোগেই, একস্থানে স্থূলদেহে অবস্থিত থাকিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতেন। আর্য্য-সন্তানগণ আত্মবিশ্বাসহীন হইয়া এই দুর্জ্জয়শক্তি লাভে বঞ্চিত ও তদ্ধেতু পুরুষকারহীন হইয়াছেন। পুস্তকের পাতায় এই জ্ঞান উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, প্রত্যুত সদ্‌গুরুকৃপায় এই শক্তি অর্জ্জন সহজ ও সুসাধ্য বটে। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।—

"সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি।
তস্মিং স্তস্মিং ল্লয়ং সূক্ষ্মে ভূতে যাতি সুনিশ্চিতম্॥"

যোগী এই সপ্তবিধ পদার্থ অতিক্রম করিলে, ইচ্ছানুসারে সেই সেই সূক্ষ্ম ভূতে বিলীন হইয়া থাকেন, ইহা সুনিশ্চিত জানিবে। পরন্তু এই সপ্তবিধ সূক্ষ্মধারণারূপ আত্ম-দর্শন-যোগানুশীলনে সাধক অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি

লাভ করিতে সক্ষম হন এবং তদ্দ্বারা সূক্ষ্মদেহে ইচ্ছামত বিচরণ, তাদৃশ যোগীর পক্ষে অনায়াসলভ্য হয়। (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগ দ্রষ্টব্য)

৩০। যোগবলে সন্তান লাভের উপায়।— আমাদের পূর্ব্বতন যোগিঋষিগণ সকলেই যে ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন তাহা নয়, পরন্তু যাহারা সংসারাশ্রমে বাস করেন, ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার্থে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সন্তানোৎপাদন আবশ্যক; নচেৎ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। দ্বিবিধ উপায়ে সন্তান লাভ হইতে পারে; মানসকর্ম্ম ও পত্নীসঙ্গ। তবে শেষোক্ত বিষয়টি যত সহজ, প্রথমোক্ত বিষয়টি তত সহজ নহে বলিয়া, আর্য্যঋষিগণমধ্যে অধিকাংশই ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া, সন্তানোৎপাদন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। যাঁহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ জানিবে।

পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে, অযোনিসম্ভবা পুত্রকন্যা লাভের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন; ইহারাই যোগবললব্ধ মানস-ক্ষেত্র-জাত পুত্র-কন্যারূপে গণ্য। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের যোগবল-প্রভাবে পূর্ব্বকালে অনেক ক্ষত্রিয়-নরপতি অযোনিসম্ভবা পুত্র-কন্যা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণ সেই অযোনিসম্ভবারই বংশধর; ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন।—

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকা ইমাঃ প্রজাঃ॥

ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু, ইহাঁরা সকলেই প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্য-গর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্র হইতে জাত। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি স্বরূপা "সঃ ঈক্ষতে লোকান্নুসৃজয়া" ইতি শ্রুতি অর্থাৎ তাহার ইচ্ছাশক্তি ও সরল দৃক্‌শক্তির দর্শনে লোক সকল সৃষ্টি হয়। অতএব যোগীর

পক্ষে সেই হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন।—

দৈবাৎ ক্ষোভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥ ভাগবত।

সংস্কারগত দৈবরূপ অদৃষ্টে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে, পরমপুরুষ, প্রকৃতি-ক্ষেত্রে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতেই সন্তানরূপ হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। যোগবলে সন্তান লাভ করিতে হইলে, সেই মূল পদার্থের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যা মধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" ভাগবত।

জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট বিষ্ণুস্বরূপ পরমাত্মা, সেই ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতিতে, আপন অংশস্বরূপ বীর্য্য বপন করেন। তৎপর সেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে তমোপহারক বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ত্ব উৎপাদিত হইয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করেন। ঐ স্বীয় অংশ স্বরূপ চিদ্বীর্য্য, কালের অধীন মহত্তত্ত্ব, পরমাত্মস্বরূপ ভগবানের ঈক্ষণরূপ প্রকৃতির অনুরাগ বা যোগে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিজন্য আপনাকে আপনি রূপান্তরিত করেন। "বিজ্ঞানাত্মাত্ম দেহস্থঃ বিশ্বব্যঞ্জং স্তমোনুদঃ।" সুতরাং বহিঃস্থ বা অন্তরস্থ যে প্রকারেই হউক প্রকৃতি-পুরুষের যে সংযোগ, তাহাতেই মহদাদিরূপ সন্তান সৃষ্টি। অতএব যোগবলপ্রভাবে মানসক্ষেত্রস্থ—সূক্ষ্মপুরুষ-প্রকৃতি অথবা বহিঃস্থ—স্থূলপুরুষ-প্রকৃতি উভয়ের সংযোগে যোগী, দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছাশক্তিবলে সন্তান লাভ করিতে পারেন। স্বীয় রূপান্তর অবস্থাই সন্তানপদবাচ্য। এজন্য সন্তানের অপর নাম আত্মজ। বর্ত্তমানে আমরা দেহ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন, আমাদের শক্তির পরিমাণ করিতে অসমর্থ,

অপরন্তু মনের একাগ্রতা সাধনেও অনভ্যস্ত ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে; সপ্তবিধ সূক্ষ্মধারণাবলে পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধির সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিতে পারিলে, সাধক সেই সূক্ষ্মভাবযোগে, যে কোন দেহ বা যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন। এই যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধককে অন্তঃপ্রাণায়ামাদি যোগে স্বীয় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞানালোকে দেহমধ্যস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-শক্তিগুলি অন্বেষণ করিতে হইবে এবং উহার ক্রিয়া নিয়ামক যন্ত্র ও যন্ত্রী কে ? তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। যখন সাধক বায়ু বা স্নায়ুশক্তি-সাহায্যে দেহমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া ঐ বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই দেহ বা দৈহিকভাব তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইবে। এই ভাবে স্বীয় দেহ আয়ত্ত হওয়ার পর, অনায়াসে তিনি পত্নী বা যে কোন প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়া, কালের অধীনতায় রূপান্তরিত বা সন্তান স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন। সন্তান না হওয়ায় যাঁহারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞাদি করিয়া বা করাইয়া থাকেন, তাঁহারা এই ক্রিয়াযোগের প্রতি বিশ্বাস ও একাগ্রতা স্থাপন করিলে, প্রত্যক্ষ ফল লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। পরমাত্মাকে কাম, ক্রোধ, প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মুগ্ধতা, গুরুগৌরব এবং সেব্যভাবের যে কোন ভাবে তাহাতে সংযমন করিবে, সেই ভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যং ক্রোধ-কাম-সহজ-প্রণয়াদি ভীতি বাৎসল্য-মোহ-গুরুগৌরবসেব্যভাবে
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে। ব্রহ্মোপনিষৎ

৩১। যোগবিঘ্ন কি ?

প্রত্যেক কর্ম্ম মধ্যেই নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, বিশেষতঃ "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" অর্থাৎ শুভকার্য্যে বহুবিঘ্ন উপস্থিত হয় ; সুতরাং যোগসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে যেমন একান্ত মনে তৎপর হইতে হইবে, তেমনই যোগবিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখা যোগিগণের

কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত আত্ম-দর্শন-যোগের পূর্ব্বাভাস ও পরিশিষ্টের প্রথম প্রকরণে যেমন যোগবিঘ্ন ও যোগসিদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে, সেইরূপ যোগবিঘ্ন উপস্থিত না হইয়া, যাহাতে যোগসিদ্ধিত্ব লাভ হয়, গ্রন্থ শেষেও শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করা যাইতেছে। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রারম্ভে বিঘ্নবিনাশনের পূজা বা বিঘ্নবিনাশকের নাম স্মরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও তাহাই; আমরা তাহার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য না বুঝিয়া স্থূলেই ভুলিয়াছি।

জ্ঞানভিন্ন যোগসাধন হয় না, "জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি, ইতি" এজন্য বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানলাভ অতীব দুষ্কর; কারণ ধর্ম্মক্ষেত্রে বণিগ্‌বৃত্তি পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি কখনও যোগলাভে সক্ষম হয় না; ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতোপদেশচ্ছলে পরিষ্কার রূপে বলিয়াছেন। ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মই বণিগ্‌বৃত্তি। স্বয়ং মহেশ্বরও তাহাই বলিয়াছেন; অর্থাৎ আসক্তিজনিত কর্ম্মই বিঘ্ন। তন্মধ্যে ভোগরূপ বিঘ্ন, ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন, জ্ঞানরূপ বিঘ্ন, খাদ্যরূপবিঘ্নগুলি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, সাধক তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

ভোগরূপ বিঘ্ন—

"নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনম্।
তাম্বুলং ভক্ষ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ॥
হেম রূপ্যং তথাতাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণম্॥
বংশী বীণা মৃদঙ্গশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনম্।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" শিবসংহিতা

ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন—

স্নানং পূজাতিথির্হোমস্তথা সৌখ্যময়ী স্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
ধ্যেয়ো ধ্যানং তথা মন্ত্রোদানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা॥
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যন্তে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্ম ফলবর্জ্জ্যং সমাচরেৎ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মাচরণ করিবে, তাহাই নিত্যকর্ম্ম।

জ্ঞানরূপ বিঘ্ন—

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্‌জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখ্যাদ্যাসনং কৃত্বা ধৌতি প্রক্ষালনং বসেৎ॥
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারো নিরোধনম্।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষীরপ্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা॥

ভোজনরূপ বিঘ্ন—

নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম।
নবং ধাতুরসং ছিন্দি ঘণ্টিকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ।
অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা।

অভ্যাসনিরত সাধকের পক্ষে অল্প অল্প করিয়া বহুবার ভোজন করা বিধেয়। লোভ, মোহ, শোক ইত্যাদি বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, দৃঢ়-আত্ম জ্ঞানে স্থিত হইবে।

সন্ত্যত্র বহবোবিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্‌যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
ততোরহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশ হেতবে ॥

শিবসংহিতা

পূর্ব্বোক্তরূপে কোন দুর্নিবার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে বিঘ্নাপসারণ জন্য ॥ মাত্রায় প্রণব অজপায় জপ করিবে।

ইতি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত
আত্ম-দর্শন-যোগ
সমাপ্ত।

"আত্ম-দর্শন-যোগস্য সচ্চিদানন্দ স্বামিনা।
ভাবমুদ্‌ভাব্যতে রত্ন-পুরগ্রাম নিবাসিনা ॥" (শ্রীহিরণ্ময়)

ওঁতৎসৎ ওঁতৎসৎ ওঁতৎসৎ।

আদর্শ-যোগ-জীবন

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত

৺কাশীধাম

যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

প্রতিষ্ঠাত্রী

যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীযুক্তা প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী

৺কাশীধাম, যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,—১১নং ব্রহ্মপুরী

(অহল্যাবাঈ)

প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীতি যা স্মৃতা, ইয়ং রাজ্ঞী হি কিং গার্গী মৈত্রেয়ী বা বহুশ্রুতা।
আত্মজ্ঞান-প্রদায়িন্যাং সভায়াং সুলভাঽথবা, মদালসাঽহোস্বিদেষা কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরালয়ে।
ইতেবং ভাষমাণৈ স্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বদিশি স্থিতৈঃ, ধর্ম্মনিত্যৈ জিতক্রোধৈ নিত্যতৃপ্তৈ জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তপঃ-স্বাধ্যায়-নিরতৈ র্দৈব্যৈ কৃত্বা বহুস্তুতিং, যোগেশ্বরীতি বৈ তস্যৈ উপাধি দীয়তে মুদা।
খ্যাতা ভবতু সা দেবী ব্রাহ্মণানাং প্রসাদতঃ, প্রমোদাসুন্দরী দেবী যোগেশ্বরীতি সর্ব্বদা॥

(উপাধি পত্রম্।)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আদর্শ-যোগ-জীবন।

যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সেই অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হয় ও ক্রমশঃ সেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ফুলফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রকার সত্য-আচরণ-অঙ্কুর হইতে আদর্শ-যোগ-জীবনরূপ তরু উৎপন্ন হইয়া, বহু তপোরূপ ফুলফলে পরিশোভিত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিভেদে এবং সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে কাহারও কেবলমাত্র অঙ্কুর হয়, কাহারও কাণ্ড পর্য্যন্ত হয়, কাহারও শাখাপ্রশাখা ও পল্লব পর্য্যন্ত হয়, কাহারও বা ফুল পর্য্যন্ত হয়। যাহাদের ফুল পর্য্যন্ত হয় না, তাহাদের উল্লেখ অনাবশ্যক। যাঁহাদের ফল পর্য্যন্ত হয়, তাঁহাদের সকলের উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবলমাত্র একটীর উল্লেখ করিলেই, এক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে। সেই একটী বিবরণের সঙ্গতির নিমিত্ত, শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার যোগ-জীবনের কিয়দংশ "আত্ম-দর্শন-যোগে"র আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। "সত্য-যোগে-আত্ম-দর্শন-প্রকরণে" যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলাগণের নাম করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইনি অন্যতমা; ইঁহার নাম যোগেশ্বরী **শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবীচৌধুরাণী**। ইঁহার জন্মস্থান পাবনা জিলার অন্তঃপাতী পুকুর পাড় (মথুরা)। ইঁহার পিতার নাম ৺কাশীশচন্দ্র লাহিড়ী, মাতার নাম স্বর্গীয়া ৺যামিনীসুন্দরী দেবী; ১২৭৪, সন ২৮ সে আশ্বিন রবিবার ৺লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিবসে শুভব্রহ্মমুহূর্ত্তোদয়ে, রেবতী

নক্ষত্রাশ্রিত° মীনরাশৌ চন্দ্রে, ইনি ভূমিষ্ঠা হন (১)। বালিকা বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, প্রাগুক্তা বহুগুণে গুণবতী ইহার জননীদেবীর একমাত্র অঞ্চলনিধি স্বরূপে, নানাবিধ সদ্গুণশিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গে ইনি লালিতাপালিতা ও বর্দ্ধিতা হন। তদবস্থায় ইহার রূপগুণের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, অনেক বিখ্যাত রাজা জমিদার ইহাকে কুলবধূরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হন; অবশেষে প্রাক্তনবশে মুক্তাগাছা বড়হিস্যার বিখ্যাত জমিদার ৺কমলনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ইহার পরিণয় সংঘটন হয়। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলে নাবালিকা অবস্থাতেই ইহার স্বামী পরলোক গমন করেন। সেই হইতে তিনি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়া, স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। বিপুল জমিদারীর শাসন সংরক্ষণাদি গুরুতর কার্য্যভার শিরে ন্যস্ত হইলেও, বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালন করিয়া ষ্টেটের যথেষ্ট উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, ইহার কৃতকার্য্যে সাধিত হয়। তাদৃশ ধনসম্পদের অধিকারিণী হইয়া এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহা পরিচালন করিয়া, কখনও তিনি, কঠোর সংযম ব্রহ্মচর্য্য বা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিলপ্রযত্না হন নাই। তিনি সম সামাজিক অভিজাত-বংশ-গৌরব-সমন্বিতা সসম্ভ্রমে, স্বীয় জননীর সহিত ভারতীয় প্রায় সমস্ততীর্থ পর্য্যটন করিয়া নানাস্থানে নানাবিধ সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্বশুর কুলের জল-পিণ্ড রক্ষার জন্য দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ পুত্র নির্ব্বিশিষে

(১) জন্মকালীন ধর্ম্মস্থানে তুঙ্গস্থ রাহু, বলবান্ বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টিতে অবস্থিত থাকায়, ইনি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারিণী সত্ত্বেও সংযমী ত্যাগী এবং জ্ঞানশালিনী হইয়া, যোগনিরতাভাবে যথার্থ ই "যোগেশ্বরী" রূপে জীবনমুক্তিলাভের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন।

তাঁহার লালন পালন ও সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার যে পরিণতি হয়, এক্ষেত্রেও কোন প্রকারেই তাদৃশ ফলভাগিনী হইতে তিনি অব্যাহৃতি প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার কর্ম্মজীবনের সকল কথা আলোচনা করা, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার যোগ-জীবনই আলোচ্য বিষয়। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত নানাকারণে অথবা ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিগত ১৩১২ সনে দত্তক পুত্রের সহিত মীমাংসা বন্দোবস্ত ক্রমে, যৎসামান্য সম্পত্তিমাত্র নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য লইয়া তিনি তীর্থবাসিনী হন এবং ৺কাশীধামে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের ব্রহ্মপুরীস্থিত ১১নং বাড়ী নিজে খরিদ করিয়া, তাহা প্রাসাদ-তুল্যাকারে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তথায় ৺প্রমোদ মহেশ্বরও ৺যামিনী কাশীশ্বর শিব এবং প্রমোদা মোহনাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাস করতঃ বহুবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে ৺বিশ্বনাথে আত্মসমর্পণ করেন। ঐ বাড়ী বর্ত্তমানে "যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও দেবালয়" নামে বিখ্যাত। তিনি প্রথম জীবনে কুলগুরু হইতে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিরজীবনই তিনি যোগানুশীলন পিপাসু; ৺কাশীধামে আগমন করিয়া তিনি ৺বিশ্বনাথে আত্মস্থ হন। তদবস্থায় তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা কর্ত্তৃক বারবার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তদুপদিষ্ট পন্থানুসরণে যোগদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, যোগানুশীলনে নিরতা হন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকারে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন। যোগ-দীক্ষা গ্রহণের পর, তিনি অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, পিত্তশূল ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যারাম, যাহা পূর্ব্বে বড় বড় বহু চিকিৎসকের চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই; যাহার নিপীড়নে তিনি ২৪ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, যে সকল কঠিন পীড়ায় তাঁহার দেহ অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া, অকাল বার্দ্ধক্যে পরিণত করিয়াছিল, ভগবৎ স্বেচ্ছায় যোগবলে সে সমস্ত পীড়া বিদূরিত হওয়ায়, দেহকান্তি ও শান্তর

অধিকারিণী হইয়া, সতত যোগানন্দ লাভ করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি নানাবিধ ভগবদ্ বিভূতি সন্দর্শন করিয়া, এক এক সময় এতদূর আনন্দে অভিভূতা ও ব্যাকুলিতা হইতেন যে, সময় সময় যেন লৌকিকভাব, অন্তর্হিত হইয়া যাইত, বহুদিন বাহ্যপূজার উপকরণ (দধি ক্ষীর ছানা মাখন ইত্যাদি) পূজিত শিবের উপর না দিয়া পুষ্প দুর্ব্বাদিসহ ঐ সমস্ত পূজোপচার স্বীয় শিরে প্রদান করিতেন এবং অত্যানন্দে কাঁদিয়া বিভোর হইতেন। এই অবস্থায় বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বদাই তিনি আত্মধ্যানে বিভোর থাকিতে ভাল বাসেন। এই যোগ-জীবন-অবস্থায় তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে; আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের ঐহিক পারত্রিক দুঃখ-দারিদ্রতা নিবারণের দ্বিতীয় উপায় নাই। সংসারস্থ জীবের মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-জনিত দ্বেষ-হিংসা স্বার্থপরতার নিষ্ঠুর মূর্ত্তি দেখিয়া, অনেক সময় তিনি হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন; মনুষ্যের দেহাত্মবোধই এই অজ্ঞানতার কারণ সিদ্ধান্ত করিয়া, অজ্ঞানী জীবকে স্বীয় যোগলব্ধজ্ঞানের সমভাগী করিবার জন্য, তাঁহার নিত্যপূজিত আত্ম-জ্ঞানেশ্বর শিবকে সভাপতি করিয়া, ৺কাশীধামে তিনি "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" সভা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আত্ম-দর্শন-যোগের আদর্শে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত আত্ম-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হন; এতৎ সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় জন্য যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ রক্ষার চেষ্টায়ও বৃতা হন। অপরন্তু নিরুপায় হিন্দুবিধবাগণ যাহাতে ৺কাশীবাস করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ঐহিক সম্পত্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়া, একটি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং দৈনন্দিন ৺ঠাকুর সেবা ও আশ্রমের কার্য্য পরিচালন একসঙ্গে নির্ব্বাহ হইবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুবিধবাগণের স্বধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন জন্য দেশে দেশে সর্ব্বত্র ইহার শাখা প্রতিষ্ঠায়ও তিনি

বদ্ধপরিকরা আছেন। আশ্রমের নিয়মাবলী ও সভার অনুষ্ঠানপত্রে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার যোগ-জীবন সম্বন্ধে আমি নিজের ভাষায় বিশেষ কিছু লিখিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। উল্লিখিত ভাবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেছি। কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু সদাশয় মহাজনগণ-কর্তৃক তাঁহার গুণরাশি নানা প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। নিম্নে তাহাই সঙ্কলিত হইল।

"জগদীশ-অক্ষর-বিজ্ঞান" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, বেদাধ্যায়ী, বাচস্পত্যু-পাধিক তত্ত্বজ্ঞানী, পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বহু তথ্যপূর্ণ হিন্দুসমাজ সংস্কার বিষয়ক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষ অংশে লিখিত আছে যে, "ব্রাহ্মণ-সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধে যত সভা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না। কারণ আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে কোন অনুষ্ঠান নাই, কেবল একটি সভার কথা আমি বলিব। কারণ তাহাতে অনুষ্ঠান দেখিয়াছি; মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার ৺মহেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া, "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" নামক একটি সভা ৺কাশীধামে স্থাপন করিয়াছেন। এই সভার সঙ্গে তিনি একটি "শিবপ্রতিষ্ঠা" করিয়াছেন। সভাতে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং "শিবপূজার" সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। (আত্ম-দর্শন-যোগও সেই শিবপূজার আদর্শেই বিবৃত করা হইয়াছে) যাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বেদবিহিত (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) আচারে নিরত থাকেন এবং প্রাণায়াম ও

যোগাভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, ইহাই সভার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যাহাতে সাধন হয়, সভাতে তাহার পথ নির্দ্ধারণ করা হয়। সন্ধ্যা, পূজা উপাসনা, ব্রত, উপবাস, প্রাণায়াম, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্ম শিবপূজার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করা হয়। কতিপয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে স্বধর্ম্মে এবং বেদবিহিত কর্ম্মে নিরত রাখিবার জন্য এবং তাঁহাদের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিমাসে তাঁহার শক্তি অনুসারে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও তিনি অনেক স্বধর্ম্ম-নিরতা বিধবাকে বৃত্তি দেন এবং সৎকার্য্যে যথাশক্তি দান করেন। তাঁহার শক্তি অল্প, সেই অল্পপরিমাণেই তিনি করেন, সৎকার্য্যের অল্পও ভাল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি যোগ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন (ইহাই বর্ত্তমানে যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে অভিহিত)। এই উদ্দেশ্য যে কেবল মহৎ, তাহা নহে; বাঙ্গালীর পক্ষে এটি একটি অভিনব ব্যাপার। বাঙ্গালীতে কেহ কোন দিন এমন ব্যাপার অনুষ্ঠান করেন নাই, সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবের কথা। তিনি "যোগেশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বারাণসীস্থ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী, মৈথিলী, উৎকলদেশীয় পণ্ডিতগণ, ৺কাশীহিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল প্রভৃতি নানাস্থান হইতে অধ্যাপকবৃন্দ সমবেত হইয়া, তাঁহাকে এই উপাধি দিয়াছেন। কার্য্যের দ্বারা তাঁহার আন্তরিক বৃত্তির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ঐ উপাধি দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের রাজ্ঞী এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ৺কাশীধামে বহুবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন এবং প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, অদ্যাপিও তাঁহাদের সেই কীর্ত্তির শত শত প্রদীপ জ্বলিতেছে। এটিও আর একটি নূতন প্রদীপ জ্বলিল।"

উক্ত যোগেশ্বরী মাতা সম্বন্ধে ৺কাশীধামের প্রাচীন স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ ঋষিতুল্য অধ্যাপক, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ তর্করত্ন মহাশয় যে শুভাশীষপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।

শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা জয়তে।

প্রমোদাসুন্দরী দেবী যোগেশ্বরী যশস্বিনী।
যোগিনাং যতচিত্তানাং যোগানন্দপ্রদায়িনী॥
ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র বঙ্গভূমেন্দ্র কামিনী।
ত্বয়া কৃত সভা কাশ্যামাত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী॥
অজ্ঞানাং জ্ঞানলাভায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
অধর্ম্মাজ্ঞাননাশায় বিশ্বেশপ্রীতিহেতবে॥
বহুকীর্ত্তিঃ কৃতা দেবি! ত্বয়া বহু ধনেন চ।
কাশ্যাং মাং পালয়িত্বা চ স্থাপয় কীর্ত্তিমুত্তমাম্॥
প্রাচীনোঽহং রাজভার্য্যে সর্ব্বশক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
কাশীবাসং কারয় মামিতি ভিক্ষা তবান্তিকে॥

শ্রীকালীচরণ তর্করত্নস্য বিজ্ঞাপনং। ২রা ভাদ্র ১৩২৮।

৺কাশীধামস্থ নাগোয়া প্রধান বৈদবিদ্যালয় হইতে যোগেশ্বরী মাতাকে বিগত ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে সংস্কৃত ও হিন্দিভাষায় দেবনাগরী অক্ষরে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহা বঙ্গাক্ষরে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণম্।

অনন্তমোদপ্রদসদ্‌গুণানাং যশোভরপ্রাপ্তিসুকারণানাং।
মনোজ্ঞমূর্ত্তিঃ করুণাসমুদ্রা হেতুঃ সুখানাং প্রথিত প্রভাবা॥১॥

সমস্তলোকৈক স্থরত্নভূতা মূর্ত্তাতিসৌম্যাতিবিচারশীলা।
উদারকীর্ত্তিঃ করুণা সমেতা দারিদ্র্যহন্ত্রীহরিপাদভক্তা ॥২॥

লীলালয়া মঙ্গলমোদমানা বিকাশমানাধিকমেধমানা।
সৎকল্পজল্পাল্পবিকল্পচিন্তা হৃত্তোষযুক্তা নিজধর্ম্মধুর্য্যা ॥৩॥

বিনীতচিত্তা ভূতভূরিবিত্তা নিত্যোদয়া নীতিসুরীতিশোভা।
রাজাপ্রজানাং হিতকৃৎসুরাজ্ঞী "যোগেশ্বরী" নাম বিভাতি এষা ॥৪॥

শ্রীরাজ্ঞী যোগেশ্বরী ভাসা ভূরিবিভাতু।
নিজশরণং সমুপাগতান্দীনজনান্ পরিপাতু ॥৫॥

"থী রাণী সবকাল মেঁ তুম্ সহী বিখ্যাত হাঁ হো গঈ।
পায়া হৈ যশ আপনে জগতমেঁ পুণ্যপ্রভা হো গঈ ॥
জীও খূব গরীব বিপ্রজন পৈ কারুণ্য হী কী জিয়ে।
রক্ষা কো করিয়ে পবিত্র ধনকো উৎসাহ সে দী জিয়ে" ॥১॥

"সদা জীত্ত জীও পরম সুখ পাও দুঃখ নহী।
সহী পীও পীও পয়মধুর সানন্দ নিত হীঁ ॥
দরিদ্রোঁ কো দীজৈ ধন বিমল লীজৈ যশ মহা।
ইসী সৎপন্থা কো সুজন সবহীনে সচ গহা" ॥২॥

"নহী আপকে তুল্য হৈ জীব কোঈ, বড়াঈ বড়ী আপকী হৈন খোঈ
রহী আপ ভারীগুণোঁ সে ভরেহী ভঈ আপরাণী বিভাকো ধরেহী" ॥৩॥
"হৈঁ আপ সম্পত্তি সুশীলতাকে নিধান সদ্ধর্ম্ম ধুরীন্ বাঁকে।
বঢ়ে সদাহী যশঃপুঞ্জ ভারী প্রতাপ তেজী রবিসে ন হারী" ॥৪॥

"জীও জীও শ্রীমহারাণী জগমে যশকোপানেবালী।
করতী রহো সদা কুছ দান ইসমে হোএগা কল্যাণ ॥
ধরা করো ঈশ্বর কা ধ্যান অপনা নাম বঢ়ানেবালী।
ধরতীরহো ধর্ম্মকো ধীর হোও সদা কর্ম্ম মে বীর
হৃদয় তুম্হারা মহাগভীর সব দিন সত্য বনানেবালী ॥
হো তুম জগমে বড়ী উদার কহতে লোগ য়হী নির্দ্ধার
উজ্জ্বল চরিত তুম্‌হারা হার ভারতভূতিভরানেবালী ॥
কহতে শ্রীগোবিন্দ পুকার সুনলো বাঁতে করলো প্যার
পাওগী সুখ অমিত অপার নিশ্ছল দান দিলানেবালী ॥"

(ছন্দ)

"শ্রীযুক্ত রাণীজী সদা সচ আপরাণীহী রহী।
পুর হো গঈ বিখ্যাত ভী যশ পায় কর জগমে সহী ॥
জীতিরহো জগমে বিজয় পাও দয়াকে ধাম হো
ইস লোক মে তুম একহী সদ্ধর্ম্মকো হও অবগেহ ॥
ক্যাহী বড়াঈ আপকী বস আপহী তো আপ হৈঁ।
কৌন ইস সংসার মে বস আপকী সমতা লহেঁ ॥
ধন্য হৈ হাঁ আপ ফির ভী ধন্য হৈ ফির ধন্য হৈঁ।
য়হ আপকী জ্যো ধন্যতা উসকো ভলা কো নহি চহৈঁ ॥
পাতী রহো সুখকো সদা দুখ কো ন আনে পাস দো।
হোকর প্রতাপী আপ সো হৈঁ তাপ বৈরী কো দহে ॥
করতী রহো খুব দান দীনোকী সদা রক্ষা করো।
দানজলধারানদী বস আপকী সব দিন বহে ॥"

(দোহা)

"শ্রীরাণী যোগেশ্বরী প্রমদাসুন্দরী নাম।
কাশীদশাশ্বমেধ মেঁ কীনে হ্যো হৈ নিজধাম॥"

শ্রীকাশিক সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়
(প্রধান নাগবা পাঠশালা) বেনারস,
পঃ গোবিন্দ পাণ্ডেয়।

৺কাশীধামস্থ সেণ্ট্রাল স্কুলের বিখ্যাত পণ্ডিত সাধক প্রবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র তত্ত্বরত্ন মহাশয় যোগেশ্বরী মাতার উদ্দেশ্যে যে "অর্ঘ্য" প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতীব সারগর্ভ বিধায়, নিম্নে সেই পদ্য কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল।

"অর্ঘ্য"

৺কাশী আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা ও যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী—

মহামান্যা,

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার অন্যতমা ভূম্যাধিকারিণী
স্বেষ্ট-দেব-চরণারবিন্দদ্বন্দ্বমকরন্দ-পানানন্দিতা
আত্মজ্ঞানৈকনিলয়া যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা প্রমোদা-
সুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহোদয়ার উদ্দেশ্যে ইদমর্ঘ্যম্।

১

"কোথায় সে ব্রাহ্মণ, যাঁর জ্ঞানালোকে
করিলা দীপ্ত এ মহীমণ্ডল।
যাঁহার আদেশে উঠিত বসিত
শাসিত সাম্রাজ্য নরেশ দল॥"

২

"ছিল যাঁরা জ্ঞানে সবার আচার্য্য
সেই বংশধর যাঁহারা এবে।
আত্মজ্ঞানহীন হইয়া তাঁহারা
অনার্য্যে সেবিছে আচার্য্যভাবে॥"

৩

"ভুলনাব ভুতাগার্গী মদালসা
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি জ্ঞানের রাণী।
হইলে বিগত ধরাতল হ'তে
বিলুপ্ত জগতে জ্ঞানের বাণী ॥"

৪

"আত্মজ্ঞানরতা রমণীর দল
যে বাণী বলিলা সহজ জ্ঞানে।
(এবে) পাণ্ডিত্যাভিমানী সে বাণীর মর্ম্ম
বুঝিতে নারিছে বসিয়া ধ্যানে ॥"

৫

আনন্দ কানন বারানসী পুরী
দেহ ত্যাগি-জন-কৈবল্যধাম।
দয়ালু মানব পরদুঃখ নাশে
বিতরি অর্থ লভিলা নাম ॥

৬

(হেথা) রাণী শিরোমণি অহল্যা, ভবানী
অন্নবস্ত্র আদি বিতরি কত।
আশ্রয়বিহীনে স্থাপিয়ে আশ্রয়ে
হইলা তাঁহারা ত্রিদিব গত ॥

৭

অদ্যাপি হেথায় শতশত নর
তাঁদেরি অন্নে উদর পুরি।
করিতেছে বাস এই মোক্ষধামে
তাঁদের সুযশ কীর্ত্তন করি॥

৮

শুধু দুঃখ দূর করিবার তরে
গিয়াছিল গ'লে তাঁদের প্রাণ।
দুঃখের কারণ নাশিবার তরে
না হইল কেহ কভু যত্নবান ॥

৯

পরকালে মোক্ষ পেলেও মানব
এ কালের দুঃখে ব্যাকুল হবে।
কি হ'লে মানব ইহ জনমেই
মোক্ষানুভূতিতে সুস্থির রবে ॥

১০

মরিলেই মোক্ষ এ বিশ্বাসে শান্তি
হেথায় কাহার (ও) না দেখিশুনি।
দারিদ্র্য-পীড়নে আশার তাড়নে
নরমুখে সদা "হায়রে" ধ্বনি ॥

১১

(হেথা) যজন যাজনে জাতিভেদ নাই
দান গ্রহণেও তদনুরূপ।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জীবন্মৃত প্রায়
জ্ঞানার্ণব এবে জ্ঞানের কূপ ॥

১২

যে ব্রাহ্মণ ছিল জ্ঞান শিরোমণি
আদান বিমুখ নিবৃত্তিমান্।
তাঁরই বংশধর প্রতিগ্রহ পর
শু'ড়ীর কাছেও লইছে দান ॥

১৩

জ্ঞানের এ গ্লানি করিবারে দূর
আবির্ভূতা শক্তি "প্রমোদা রাণী"।
স্থাপি সভা "আত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী"
শুনালেন ব্রাহ্মণে শান্তির বাণী ॥

১৪

প্রবৃত্তির পথে শান্তি নাহি মিলে
নিবৃত্তিতে শান্তি মধুর অতি।
এই ধ্রুব সত্য বুঝাবার তরে
জ্ঞানানুশীলনে করিলা ব্রতী ॥

১৫

ছ-বৎসরে দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্য পর
উপাসনা ছিল "আত্মজ্ঞান"।
(আজ) তাঁর (ই) বংশধর প্রৌঢ় বয়সে
প্রবৃত্তির দাস ভ্রান্তিমান ॥

১৬

অধুনা ব্রাহ্মণ আপনা ভুলিয়া
প্রবৃত্তির পথে করিছে গতি।
"আত্ম-জ্ঞান"বলে না আসিলে ফিরে
কোন মতে আর নাহি নিষ্কৃতি ॥

১৭

(তাই) আত্মবোধে বুদ্ধ হইয়ে ব্রাহ্মণ
বাহ্য-সুখ-লিপ্সা করিয়া নাশ।
আপনে আপনি হয়ে অনুরক্ত
(করুন) স্বাধীন আনন্দে কাশীতে বাস ॥

১৮

সদ্‌গুরু কৃপায় হয়ে জ্ঞানবতী
নিষ্কাম কর্ম্মেতে হইয়ে লিপ্তা।
হেলায় ত্যজিয়ে রাজ-সুখ-ভোগ
ব্রহ্মচর্য্য-প্রভায় হলেন দীপ্তা ॥

১৯

সামান্য বস্কলে পরমা তৃপ্তি
সামান্য অশনে পরম তোষ।
স্তুতি নিন্দা বাক্যে সদা সমভাব
আততায়ী প্রতি নাহিক রোষ ॥

২০

প্রত্যক্ষ পরোক্ষে সদা শুভ ইচ্ছা
অনুষ্ঠানে সদা আদর্শ মতি।
শুনি কাশীবাসী পণ্ডিত মণ্ডল
উপাধি প্রদানে হলেন ব্রতী ॥

২১

পণ্ডিত কেশরী শ্রীযাদবেশ্বর
তরিত মুগধ পাণ্ডিত্যে যাঁর।
(মহা) মহা উপাধ্যায় কৃত লব নাম
উপাধি প্রদানে সবে অগ্রসর ॥

২২

বারাণসী ধামে হইয়া একত্র
(যত) ঋষিকল্প বুধ উপাধিধারী।
"আত্ম-জ্ঞান-যোগ" বিবৃতির তরে
অর্পিলেন উপাধি "যোগেশ্বরী" ॥

২৩

মাতঃ।

এই কাশীধামে শুধু অন্নসত্র
স্থাপিলা মানব হৃদয়বান্।
(তুমিই) অন্ন-জ্ঞান-সত্র একত্র স্থাপিয়ে
অমৃতের পথে হলে আগুয়ান॥

২৪

"আত্ম-জ্ঞান"সহ সাত্বিক দানের
বিশুদ্ধ রুচির আবাস তুমি।
"যোগেশ্বরী" নামে থাকিবে বিখ্যাতা
(যাবৎ) ভাতিবে চন্দ্রার্ক ভারত ভুমি॥
বিনয়াবনতাশ্রিত—
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা তত্ত্বরত্ন।

এতদ্ভিন্ন এডুকেশন গেজেট ও অন্যান্য বাঙ্গালা পত্রিকায় তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সাময়িক ভাবে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, অথবা আরও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক নানাভাবে যে সকল অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে তৎসমস্ত প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। পরন্তু আমি তাঁহার জীবনকথা লিখিতে বসি নাই, আমি তাঁহার উচ্চজ্ঞান ও কর্ম্মের আলোচনা দ্বারা সমাজে তাদৃশ ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্ম-দর্শন-যোগ্য যোগানুশীলন এবং তাঁহার সত্যানুরাগ ও সৎসাহসের আদর্শই স্থাপন করিতেছি মাত্র। মাতৃজাতি, বিশেষ—বিলাস-ব্যসনাসক্ত ধনবতী রমণীগণ এই আদর্শে স্বীয় আত্মা ও স্বধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টায় ব্রতী হইলে, তদ্দৃষ্টান্তে তাঁহাদের স্বামী, পুত্রগণেরও দেহাত্মবোধ দূর হইয়া পুনর্ব্বার "আত্ম-জ্ঞানে" দেশ প্লাবিত হইবে এবং এই আর্য্যজাতি তাঁহাদের সত্য বা জ্ঞানমণ্ডিত পৈতৃক আসন পুনরধিকারে সমর্থ হইবে।

উক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ের নাম সকলেই "যোগেশ্বরী" উপাধিযুক্ত করিয়াছেন, অবশ্য ইহা যেমন গুণোচিত তেমনই অভূতপূর্ব্ব। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন রমণী, ঋষিকল্প কৃতবিদ্যগণ কর্ত্তৃক এরূপ উচ্চ উপাধি সম্মানে অর্চ্চিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং সাধারণের কৌতূহল নিবারণ ও যোগানুশীলনে উৎসাহ

বর্দ্ধনার্থে ঐ "যোগেশ্বরী" উপাধিপত্রের প্রতিলিপি সন্নিবেশ ও তৎসম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশুক।

উপাধিপত্রের প্রতিলিপি।

ওঁনমঃ পরমাত্মনে।

কাশীস্থ-বিদ্বদ্‌বৃন্দ-প্রদত্তম্‌

উপাধি-পত্রম্‌।

পরম কল্যাণবরায়া ময়মনসিংহ-মুক্তাগাছা-ভূম্যাধিকারিণ্যাঃ

শ্রীমত্যাঃ প্রমোদাসুন্দরী-দেব্যাশ্চতুর্ধুরীণায়া মহোদয়ায়াঃ করকমলেষু।

প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীতি যা স্মৃতা
ইয়ং রাজ্ঞী হি কিং গার্গী মৈত্রেয়ী বা বহুশ্রুতা।
আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িন্যাং সভায়াং সুলভাঽথবা
মদালসাঽহোস্বিদেষা কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরালয়ে।
ইত্যেবং ভাষনাণৈ স্তৈঃ সভ্যৈঃ সর্ব্বদিশি স্থিতৈঃ
ধর্ম্মনিত্যৈর্জ্জিতক্রোধৈর্নিত্যতৃপ্তৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তপঃ-স্বাধ্যায়-নিরতৈর্দেব্যৈ কৃত্বা বহুস্তুতিং
যোগেশ্বরীতি বৈ তস্যৈ উপাধির্দীয়তে মুদা।
খ্যাতা ভবতু সা দেবী ব্রাহ্মণানাং প্রসাদতঃ
প্রমোদাসুন্দরী দেবী যোগেশ্বরীতি সর্ব্বদা॥

৺কাশীধাম, ১১নং অহল্যাবাঈ-
ব্রহ্মপুরীস্থ-সমবেতাধ্যাপক-সভায়াং
১৩২৭। ২১শে চৈত্রে।

পণ্ডিতরাজকবিসম্রাট-মহামহোপাধ্যায়েন
শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণা (তর্করত্নেন)
সভাপতিনা।

(মহামহোপাধ্যায়েন)
শ্রীজয়দেব শর্ম্ম মিশ্রেণ
শ্রীদীননাথ বেদান্ত বাগীশেন
শ্রীজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগরেণ
শ্রীপদ্মনাভ শাস্ত্রিণা
শ্রীরামগোপাল স্মৃতিভূষণেন
শ্রীঅম্বাদাস শাস্ত্রিণা
শ্রীযামিনীকান্ত বেদান্ততীর্থেন
শ্রীকমলাপ্রসাদ স্মৃতিভূষণেন
শ্রীঅচ্যুতানন্দ ত্রিপাঠিনা
শ্রীমানদারঞ্জন ব্যাকরণতীর্থেন
শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারেণ
শ্রীঅম্বিকা প্রসাদ উপাধ্যায়েন
শ্রীহরিব্রহ্ম দেবশর্ম্মণা (দলপতিনা)
শ্রীসদানন্দ স্মৃতিরত্নেন
শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মণা (ভাটপাড়া)
শ্রীরামসুন্দর পাণ্ডে ব্যাকরণাচার্য্যেণ
(ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল)
শ্রীগৌরচন্দ্র শিরোমণিনা
শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রিণা ভারদ্বাজেন
শ্রীনৃসিংহদেব সরস্বতিভিঃ

(পরমহংসেন)
শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামিনা
শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্যেণ
শ্রীহরিহর শাস্ত্রিণা (সম্পাদক
সাহিত্য-পরিষৎ ও অধ্যাপক
হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীচিন্তামণি সাহিত্যাচার্য্যৈঃ
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যেণ (মথুরা)
শ্রীব্রজবিহারী ঝা (সভা-পণ্ডিত
দ্বারবঙ্গ নরেশ)
শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন-
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রিভিঃ
(ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল)
শ্রীসভাপতি উপাধ্যায়েন
শ্রীমন্মথনাথ বেদান্তবাগীশেন
শ্রীবিভূতিভূষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থেন
শ্রীফণিভূষণ প্রতিনিধিনা
(এম্ এ প্রফেসার হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী-
(জমীদার কাশীনাথপুর,
সম্পাদক বারেন্দ্র-সভা)

(মহামহোপাধ্যায়েন)
শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদিনা
শ্রীপুরুষোত্তম উপাসনিনা
শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্নেন
শ্রীচক্রদত্ত ঝা
শ্রীকালীচরণ তর্করত্নেন
শ্রীউমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থেন
শ্রীশ্রীকর শাস্ত্রিণা (উৎকল)
শ্রীতারাপদ কাব্যবিশারদৈঃ
শ্রীলোকনাথ শিরোমণিনা
শ্রীবিশ্বনাথ বৈদিকেন
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণ
(দলপতিনা)
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থেন
শ্রীকৃষ্ণদত্ত ঝা-
শ্রীগোবিন্দ ভট্টজী কুট্টে-
শ্রীউমাচরণ স্মৃতিরত্নৈঃ
শ্রীগৌরীশঙ্কর মুনিনা
শ্রীবামাচরণ শর্ম্মণা
শ্রীরাজারাম শাস্ত্রিণা
শ্রীঅনন্তদেব তর্করত্নেন
(বেদোদ্বোধিনী সভা)
শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থেন

শ্রীবিশ্বেশ্বর শাস্ত্রিনা
শ্রীশরচ্চন্দ্র তত্ত্বরত্নেন
শ্রীনিত্যানন্দ মীমাংসকেন
শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্নেন
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কাব্যতীর্থেন
শ্রীঅনন্তরাম শাস্ত্রিণা
শ্রীকৈলাসচন্দ্র নিয়োগিনা (বি এল)
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ তর্কসিদ্ধান্তেন
শ্রীসতীকান্ত ভাগবতভূষণেন
শ্রীশ্যামাচরণ সিদ্ধান্তেন
শ্রীসুলাকী কবিনা
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদেন
(সম্পাদক বারেন্দ্র-সভা)
শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণা
শ্রীকৃষ্ণজী শাস্ত্রিণা
শ্রীউমাচরণ শিরোমণিনা
শ্রীযজ্ঞেশ্বর স্মৃতিভূষণেন
শ্রীহরিনারায়ণ বিদ্যাভূষণেন
শ্রীরমাকান্ত বেদপাঠিনা
শ্রীরাধাকান্ত ঝা-
শ্রীগোপাল ঝা-
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বিদ্যানিধিভিঃ

স্থানের অল্পতা হেতু বহুনাম আমরা এইস্থলে মুদ্রিত করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য দুঃখিত। পরন্তু নানা ভাষায় স্বাক্ষরিত নাম সাধারণের বোধগম্য এবং মুদ্রাঙ্কনের অসুবিধা হেতু সকল নামই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইল।

প্রকাশক।

উক্ত যোগেশ্বরী উপাধি অভূতপূর্ব্ব ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কেবল উপাধিধারিণীর পক্ষেই যে গৌরবের বিষয় তাহা নহে, পরন্তু উপাধিদাতাগণের পক্ষেও ইহা স্বধর্ম্মানুরাগ ও যোগানুরক্তিযুক্ত মনস্বিতারই পরিচয়। এই অভূতপূর্ব্ব উপাধি ও অভিনন্দনাদি দ্বারা যে পূর্ব্বপ্রোক্ত মনীষিগণ উপাধি ধারিণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল মাত্র তাহাই নহে; এতদ্দ্বারা তাঁহারা সত্যের পথে, আত্মজ্ঞানের পথে, সংযম ব্রহ্মচর্য্য ও যোগানুশীলনের পথে, আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্ত মাতৃজাতিকে, তাদৃশ ভাবে আত্ম-দর্শন-যোগের অনুবর্ত্তী ও আত্মনিয়োগ করিবার জন্য এক অভিনব সত্যানুসন্ধিৎসা ও সদাদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুষ্ঠান মধ্যে আর একটি সত্যেরভাব যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক বিধায়, এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এই যে, পরমমাতৃভক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, উপাধি সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি স্বরূপে, উপাধিপত্র প্রদানকালে, স্বীয় জননীর ন্যায় প্রণিপাত পুরঃসর হইয়া তাঁহার হৃদয়-নিহিত সর্ব্বোচ্চ মাতৃভক্তির যেরূপ উজ্জ্বল ও অব্যক্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃশ গদগদ ভাবযুক্ত মাতৃভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার মনেও তাঁহার প্রতি হিংসার উদয় হইয়াছিল। আহা! জীব একান্তমনে এইরূপ মাতৃভক্তি লাভ করিতে পারিলে, সেই পরমসত্য, একমাত্র মাতৃভক্তিবলেই নিশ্চয় মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। আমার তখন বোধ হইতে লাগিল, যাদবেশ্বর কি কলিতে সেই "যাদবেশ্বর"রূপে পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই সত্যের ভাবে সর্ব্বজীবকে, প্রত্যেক মাতৃমূর্ত্তিমধ্যে, বিশ্বরূপা "মাতৃ-দর্শন-যোগ" শিক্ষা বিধান করিতেছেন? আহা! এই সত্যমণ্ডিত যোগপথ বিস্মৃত হইয়া, কত পাষণ্ড প্রকৃত মাতৃ-ভক্তি-সম্বন্ধ-বিরহিত-ঊষর-প্রাণে, নানাভাবে বাহ্য-ধর্ম্মাড়ম্বরে ভক্তির

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অভিলাষ করে? সত্য, ভক্তি ও মুক্তি যে মাতৃপদে, মাতৃনামে, মাতৃভাবে, মাতৃচরিত্রে এবং মাতৃরূপেই নিহিত আছে। হে যাদবেশ্বর! তোমার মধ্যেই যে সেই পরমসত্য দেদীপ্যমান; আজ তাহাই প্রত্যক্ষ করাইলে। আর্য্যসন্তানগণ এতদ্দৃষ্টান্তে একমাত্র মাতৃভক্তি-যোগে, আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকারী হউক।

উপাধিপত্র গ্রহণকালে যোগেশ্বরী মাতার মুখের কয়েকটি সম্ভাবিত সত্যবাক্য শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সত্যের অনুরোধে এ স্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "৺কাশীধাম হিন্দুসন্তানের উপাধি পরিত্যাগের ক্ষেত্র, আমিও সেই উপাধি পরিত্যাগ করিতেই ৺কাশী-বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রশংসা বা উচ্চ সম্মান যুক্ত উপাধি ধারণে আমি লজ্জিত। কিন্তু ঋষিতুল্য কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কৃত অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করাও ধর্ম্ম-বিগর্হিত বিধায়, ব্রাহ্মণের শুভাশীর্ব্বাদ স্বরূপে ইহা আমি অবনত শিরে গ্রহণে বাধ্য হইতেছি। আপনারা দেশের অনিত্য ভোগবাসনাসক্ত দেহাত্মবোধিগণকে, আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব এবং তাহাই আমার প্রার্থনা।"

তখন শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার মুখে এই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া মনে হইল যে, মা! তোমার মুখ হইতে আজ যথার্থই "যোগেশ্বরী" উপাধির যোগ্যবাণীই বাহির হইয়াছে; তুমি প্রকৃতই যোগেশ্বরী উপাধিলাভের যোগ্যা। ৺কাশীস্থ বিদ্বদ্বৃন্দ উপাধিদ্বারা যে তোমার স্থূলদেহের পূজা করিতেছেন, কেবল তাহাই নহে; তোমার মধ্যে তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান, সত্যভাব ব্রহ্মচর্য্য, সত্যজ্যোতিঃ পূর্ণ যোগশক্তি, তোমাতে অবস্থিত দেখিয়া, তোমার সেই পরমসত্য "চিন্ময়ী-যোগেশ্বরী" মূর্ত্তিরই গুণানুবাদ বা অর্চ্চনায় তাঁহারা

উৎসাহিত হইয়াছেন। আজ প্রকৃতই তোমাতে যোগেশ্বরী জ্যোতির্দর্শন করিয়া বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর যেন সেই শক্রাদি সুরগণ পরিবৃত ভাবে, এই মহামুক্তিক্ষেত্র তপোভূমিতে সেই মহাপ্রকৃতির স্তব করিতেছেন যে—

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্ত সমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি॥" দেবী মাহাত্ম্য

হে দেবি! যে বিদ্যা মুক্তির হেতু এবং দুরনুষ্ঠেয় মহান্ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত যে বিদ্যার বিষয়ীভূত, সেই তত্ত্বজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) রূপা ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতা পরমবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) তুমি। এ নিমিত্ত জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন-মুমুক্ষুগণ এবং রাগাদি বিহীন মুনিগণ সেই আত্মবিদ্যারূপা তোমার সাধনা করিয়া থাকেন। সেই ভাবপ্রবণতায় যেন আমি বিগলিত হইতে লাগিলাম।

আহা! সেই সত্যের, আদর্শভাব চিন্তা করিতেও যে, মনঃ প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়; সেই আনন্দবিগলিতভাবে মাতৃস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতাকে আমিও মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, মা! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমিই ধন্যা! সামান্য ঐ উপাধিপত্রে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা আমি মনে করি না। তোমার গুরুদত্ত আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত-আত্মজ্ঞান-প্রভায় তুমি আজ বিশ্বপূজিতা। মা! তোমার ন্যায় যোগেশ্বরীর যোগশিক্ষাদাতাও আনন্দে বিভোর হইয়া, আজ নিশ্চয়ই বলিবে যে—

"ধন্যোঽহমহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।"

এ নিমিত্তই তোমার সত্যাবলম্বনের মহিমা, পরবর্ত্তী আদর্শ জন্ম আত্ম-দর্শন-যোগে, আদর্শ যোগ-জীবনরূপে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

যে "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা"র প্রতিষ্ঠা পরদুঃখ নিবৃত্তির হেতু ও সত্য প্রচারের মূল ভিত্তি, যে আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠা শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার অন্তর্নিহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুরাগের পবিত্র নিদর্শন; সেই "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা"র অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি কি, তাহা জানিবার জন্য সম্ভবতঃ অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। এইজন্য ঐ সভার মুদ্রিত অনুষ্ঠান পত্রে সভার যে কার্য্য-বিবরণী সানুষ্ঠানভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদনে আর্য্যনরনারীগণ যাহাতে যথাযোগ্য শক্তি নিয়োগ করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ-জন্য উহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৺কাশীধাম-আত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা।

সভাপতি আত্মজ্ঞানেশ্বর শিবস্বরূপ স্বয়ং ৺বিশ্বনাথ।

স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

স্বধর্ম্মপরায়ণ মহামহিমান্বিত রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অধুনা আর্য্যজাতিমধ্যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য সকলেই স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকর্ম্মাদি ও নৈতিক উন্নতি বিধানজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীই আত্মোন্নতি সাধনায় নিশ্চেষ্ট; পক্ষান্তরে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিঋষিগণের আদর্শ ও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূত প্রাচীন শাস্ত্রাদির তত্ত্বানুশীলন, ক্রমে বিস্মৃত হওয়ায় আত্মরক্ষায় শক্তিহীন প্রযুক্ত অবনতির অতলগর্ভে দ্রুতবেগে নিপতিত হইতেছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ত্যাগ ও যোগবলে ত্রিজগতে সর্ব্বজন-পূজ্য ও সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, ভগবান্ বৈকুণ্ঠেশ্বর, যে ব্রাহ্মণ-পদচিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ এবং ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার বা ভূ-ভার-হরণেচ্ছায় নারায়ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম ভাগেও, স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া নিজের ও ব্রাহ্মণকুলের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ কি না বর্ত্তমানে অনিত্য সুখ-স্বার্থ-মোহে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত? তাঁহারা কি না আজ অধস্তন জাতিরও অনুগ্রহ আশে লালায়িত? তাঁহারা কি না আজ নিকৃষ্ট জাতির পদাঘাতে জর্জ্জরিত? বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মকর্ম্মকে স্বার্থান্ধপূর্ণ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও সামাজিক শক্তির এতাদৃশ ধ্বংস-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন যে, অচিরাৎ ইহার প্রতিবিধানে মনোযোগী না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এই সমাজ-শীর্ষ জাতির মান সম্ভ্রম ও পূর্ব্ব-গৌরব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক প্রাচীন আর্য্য ও উল্লিখিত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বপ্রকার নর-নারী মাত্রেরই স্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অদম্যোৎসাহে আত্মোন্নতির চেষ্টা সহযোগে, ধর্ম্মপথে জাতীয় দুঃখ দারিদ্র্যাবসানে কৃতসংকল্প হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? এবম্বিধ কারণে স্বধর্ম্ম-রক্ষায় অনুপ্রাণিতা হইয়া মুক্তাগাছার অন্যতম দানশীলা ভূম্যধিকারিণী, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণা যোগেশ্বরী

শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহোদয়ার বিশেষ উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে এবং কতিপয় মহাত্মার উদ্যোগে অত্র কাশীধামে "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" নামে একটী সভা, গত ১৩২৬ সনের মাঘমাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই পুণ্যতীর্থ কাশীবাসী প্রত্যেক আর্য্যসন্তান বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ ও বিদ্যার্থি (ছাত্র) বর্গের এতৎপ্রতি সহানুভূতি এবং সহযোগিতা একান্তই বাঞ্ছনীয়। আজ যে আধ্যাত্মিক বা আত্মসংযমের ক্ষীণালোক রেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে, অত্র আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভাই সেই ভাবের সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক ইহা সভার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়।

সভার উদ্দেশ্য।

১। আর্য্যদিগের প্রধান তীর্থস্থান ও মুক্তিক্ষেত্র ৺কাশীধামে বাস করিয়া যথাশাস্ত্র ৺বিশ্বনাথ ও তাঁহার অভয়বাণীর প্রতি আর্য্যজনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্মাদি তদাদর্শানুযায়ী পরিচালিত হইয়া তীর্থের পবিত্রতা ও মুক্তির সর্ব্বোচ্চ ধারণা লোকের প্রাণে যাহাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়, তৎপ্রতি কাশীবাসী নর-নারীগণের চিত্তাকর্ষণের যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

২। বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রাচীন আর্য্য-ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রমত সন্ধ্যা, উপাসনা, ব্রত, উপবাস, পুরশ্চরণ প্রায়শ্চিত্তাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম; বাস্তবিক পুরাতন আদর্শে যাহাতে সুসম্পন্ন ও তাহার উপর লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস স্থাপন হয়, তৎপ্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ বা আত্মজ্ঞান উপলব্ধির চেষ্টা করা। **যেহেতু আত্মজ্ঞান ব্যতীত কি শাস্ত্রপাঠ কি ধর্ম্মকর্ম্ম সবই প্রাণহীন নিরর্থক।** *

---

* নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদৈবত-পূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ গর্ভগীতা

৩। ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন জন্য আর্য্যঋষি-মণ্ডলীর প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ তত্ত্বানুশীলন দ্বারা লুপ্ত পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা।

৪। উক্ত ৩ দফার লিখিত আধ্যাত্মিক যোগসাধন-প্রণালী সাধারণে প্রকাশ ও শিক্ষার্থিগণকে কোন শক্তিমান সদ্‌গুরু কর্তৃক উপদেশ বা কার্য্যতঃ তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান শিক্ষা বিধানের চেষ্টা। তথাচ শ্রুতিঃ—

"আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

৫। উক্ত প্রকার তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু কর্ম্মিগণের কর্ম্মকারিণী শক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধনোদ্দেশ্যে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহজন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্যের চেষ্টা।

৬। উক্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানানুশীলনকারী মহাত্মগণ-মধ্যে কেহ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূত কোন সহজ পন্থা প্রদর্শন করাইতে পারিলে, জ্ঞানার্থীদিগের সুবিধার জন্য তাহা প্রচার করিতে সভা বিশেষভাবে চেষ্টিত থাকিবেন।

৭। তীর্থবাসের পবিত্রতা রক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার এবং ব্রাহ্মণ-জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন-জন্য, এই সভার কর্তৃপক্ষ সময় সময় সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত (সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে) এবং কাশীবাসিনী অনাথা বিধবামণ্ডলী ও অপরাপর দীন দরিদ্র অথবা বিপন্নকে যথাসম্ভব দান কিম্বা সাহায্যাদি করিতেছেন ও করিবার জন্য অভিলাষী আছেন।

৮। সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণশ্রেণীর আধ্যাত্মিক শক্তি বর্দ্ধনোদ্দেশ্যে জ্ঞানের উন্নতি বিধান ও তন্নিমিত্ত যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করাই এই সভা প্রতিষ্ঠাত্রী যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী মহোদয়ার এই সভা স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং স্বয়ং বিশ্বনাথ-রক্ষিত মুক্তিক্ষেত্র ৺কাশীধামে এখনও যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বা ঋষিকল্প, প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ

আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাঁহারাও বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে প্রকাশিত হইয়া যোগবলভ্রষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেণীর লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের অনুষ্ঠানে, সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করুন; ইহা এই সভার অন্যতম প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই সভায় ধর্ম্মোদ্দেশ্যহীন অন্য কোন বাজেকথা বিশেষরূপে বর্জ্জনীয়। ইতি

সভাধ্যক্ষ—

(স্বামী) শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মা (বিদ্যারত্ন)
শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
শ্রীকৈলাশচন্দ্র নিয়োগী (বিএ, বিএল)
শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় (বেদবাচস্পতি)

শ্রীদীননাথ বেদান্তবাগীশ
শ্রীবৃন্দবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম, এ)
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ (কবিরাজ)
শ্রীতারাপদ কাব্যবিশারদ
শ্রীঅভয়াচরণ মজুমদার (বিএ, বিএল)
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
"প্রবাস-জ্যোতিঃ" পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী

স্থান—৺কাশীধাম ১১ নং ব্রহ্মপুরী (অহল্যাবাঈ) যোগেশ্বরী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও দেবালয়।

প্রকাশক।
শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার
সহঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে উক্ত প্রকার অনুষ্ঠানযুক্ত আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভার আবশ্যকতা ও উপকারিতা, ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুক্তা যোগেশ্বরী মাতার উপাধি ও অভিনন্দনাদি দ্বারাই অপরের বাক্যে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলা আবশ্যক যে, এই উদ্দেশ্যপূর্ণ সদনুষ্ঠানজন্য তিনি একাল পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোনরূপ চাঁদা, মাথট্, কি অর্থসাহায্য প্রার্থী হন নাই; পরন্তু ইঁহার আর একটি নিষ্কামভাব এই যে, তিনি

নিজ হইতে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াও, কোন অনুষ্ঠানে নিজের নাম প্রকাশের চেষ্টা বা কোন কর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। সভার নামেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সভার আর একটি বিষয়ও বিশেষ আদর্শনীয় এই যে, সভার উৎসবাদিতে কোনরূপ নৃত্যগীতের বা অনিত্য আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান নাই; সভার উৎসব—দান। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী, নিরুপায় সধবা, বিধবা, কুমারী, সাধারণ দুঃখী কাঙ্গালিগণকে যথাযোগ্য অর্থদান। সাধু. সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গরীব-দুঃখীকে শীতবস্ত্রদান ইত্যাদিই সভার উৎসবরূপে পরিগণিত। অথচ নিজের দাতা নাম প্রকাশের জন্য কোনরূপ ঢক্কানিনাদ বা সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তদ্ধেতু এতাদৃশ সংযমপূর্ণ সদ্দৃষ্টান্ত ও সাত্ত্বিকভাব "আত্ম-দর্শন-যোগের" ক্রোড়ে শোভনীয়রূপে স্থান লাভের যোগ্য হইয়াছে।

"আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভার" এই সদনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণে বিগত ১৩২৭ সনের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি (চীফ্ জষ্টিস্) মহামান্য সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে সভার কার্য্য পরিদর্শনে শুভাগমন করেন। (১) এতদুপলক্ষে কাশীধামস্থ দেশবিখ্যাত কবিরাজ, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম

---

(১) প্রোক্ত সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের জজ হওয়ার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ১৬।১৭ বৎসরকাল শ্রীশ্রীযুক্তা যোগেশ্বরী মাতার ষ্টেটের (বাঁধা) উকিল ছিলেন। এই গ্রন্থকারও কার্য্যপ্রসঙ্গে ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে তাঁহার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তদ্ধেতু বাধ্যবাধকতাসূত্রে পরস্পরের মধ্যে একটী মধুর প্রীতিভাব থাকায়, তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভার" অধিবেশনে সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য শুভাগমন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে স্মরণীয় উৎসব হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক ও কাঙ্গালীবিদায়। এতাদৃশ সাত্ত্বিক আমোদে যিনি চিরদিন আমোদিতা, তাঁহার পক্ষে প্রমোদা নামই সার্থক হইয়াছে।

মেম্বর এবং কাশীনরেশ প্রভৃতি স্বাধীন নরপতিগণের গৃহচিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় কল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন মহাশয়, স্বরচিত একটি হৃদয়গ্রাহী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া, উক্ত যোগেশ্বরী রাণী মাতার পুণ্য-পূত চরিত্র ও তদীয় কৃত সদনুষ্ঠানের যে পবিত্র ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সদ্বৃন্দাবনসৎপ্রেমপ্রমোদানন্দবর্দ্ধনঃ !
আশুতোষো হরির্ব্বায়ং হরোবা সার আগতঃ ॥"

অসারে (সংসারে) যোঽয়ং সার আগতঃ "সঃ কঃ" ইতি প্রশ্নে কশ্চিদাহ—যতোঽয়ং সদ্বৃন্দাবনসৎপ্রেমপ্রমোদানন্দবর্দ্ধনঃ অতঃ অয়ং সারঃ হরিরেব।

অন্যার্থঃ—সৎ যৎ বৃন্দাবনং তত্র সৎপ্রেমপ্রমোদানাং (অর্থাৎ সতি ভগবতি পরমাত্মনি প্রেম যাসাং তাঃ সৎপ্রেমপ্রমোদা গোপিকাঃ তাসাং আনন্দবর্দ্ধনঃ আশু শীঘ্রং তোষঃ সন্তোষঃ যস্য সঃ হরিঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব ইত্যর্থঃ।

অপরস্তু আহ:—যতঃ অয়ং সৎবৃন্দাবনসৎপ্রেমপ্রমোদানন্দবর্দ্ধনঃ অতঃ অয়ং আশুতোষঃ সারঃ হর এব।

অর্থস্তু:—সতাং বৃন্দঃ, সদ্বৃন্দঃ সদ্বৃন্দস্য অবনে (রক্ষণে) সৎ (সুষ্ঠু) প্রেমঃ (প্রীতিঃ) যস্যাঃ ঈদৃশী যা প্রমোদা যোগেশ্বরী ভগবতী তস্যা, আনন্দবর্দ্ধনঃ সারঃ শ্রেষ্ঠ আশুতোষঃ হর এব।

অন্যস্ত্বাহ:—যতঃ অয়ং সদ্বৃন্দাবনসৎপ্রেমপ্রমোদানন্দবর্দ্ধনঃ অতঃ অয়ং সারঃ আশুতোষ এব।

অর্থস্তু:—সতাং বৃন্দঃ সদ্বৃন্দঃ, সদ্বৃন্দস্য অবনে (রক্ষণে) সৎ (সুষ্ঠু) প্রেমঃ যস্যা ঈদৃশী যা প্রমোদা (রাণী প্রমোদাসুন্দরী) তস্যা আনন্দবর্দ্ধনঃ আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী নামধেয়সভাশোভাবর্দ্ধকত্বাৎ সার আশুতোষ ইত্যর্থঃ।

অথবা :—সতাং বৃন্দঃ সদ্বৃন্দঃ সদ্বৃন্দস্য অবনে তথাসতি পরমাত্মনি চ প্রেম যস্যাঃ ঈদৃশী যা প্রমোদা (রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী) তস্যাঃ আনন্দবর্দ্ধনঃ (পূর্ব্ববৎ) ।

অথবা :—সতাং বৃন্দঃ সদ্বৃন্দঃ সদ্বৃন্দস্য অবনং রক্ষণং যস্যা সা সদ্বৃন্দাবনরূপা যা "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা" তস্যাং সভায়াং সৎ শোভনং প্রেম প্রীতিঃ যস্যাঃ অথবা সদ্বৃন্দাবনরূপায়াং সভায়াং সতি যোগেশ্বরে ভগবতিপরমাত্মনি চ প্রেম প্রীতিঃ যস্যাঃ ঈদৃশী যা প্রমোদা (রাণী প্রমোদাসুন্দরী) (পূর্ব্ববৎ) ।

এই সংস্কৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন মহোদয় বাঙ্গালা ভাষায় যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

এই শ্লোকটীর ভাবার্থ হরি, হর ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এই তিন পক্ষেই সঙ্গত হইতেছে। যথা—

পাপানুবিদ্ধ দুঃখ শোকময় এই অসার সংসারে সার কে আসিয়াছেন ? এই প্রশ্নে কেহ বলিতেছেন যে (যেহেতু ইনি সদ্বৃন্দাবন সৎপ্রেম প্রমোদানন্দবর্দ্ধন অতএব সার) হরিই আসিয়াছেন।

(এপক্ষে অর্থ) সৎ অর্থাৎ নিত্য বৃন্দাবনধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে প্রমুদিতা গোপিকাগণের সৎপ্রেমে শীঘ্র সন্তোষ দ্বারা তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনকারী হরিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মাশুচ।"—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য ও "তরতি শোকমাত্মবিত্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা, এই অসার পাপ সংসারে একমাত্র নিস্তার কর্ত্তা হরিই সার হইতেছেন।

(হরপক্ষে অর্থ) সৎপুরুষদিগের অবনে' অর্থাৎ রক্ষণে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্তা যে প্রমোদা ভগবতী অন্নপূর্ণাদেবী তাঁহার আনন্দবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ আশুতোষ হর মহাদেব আসিয়াছেন।

(সার আশুতোষপক্ষে অর্থ)। সৎ অর্থাৎ সাধুব্যক্তির বৃন্দ (সমূহ) তাঁহাদিগের রক্ষা হয় যে সভা হইতে, সেই সদ্বৃন্দাবনরূপা যে "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা সেই সভাতে সৎ (সুষ্ঠু) প্রীতি আছে যাহার,-অথবা সদ্বৃন্দাবন-রূপ সভাতে শ্রীমৎ ভগবৎ পরমাত্ম-প্রেমানন্দে প্রকৃষ্টরূপে মুদিতা (হর্ষিতা) অতএব সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা সুতরাং রাজ্ঞী অর্থাৎ প্রকাশমানা শ্রীমতী রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবী তৎপ্রতিষ্ঠিত আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভায় সার আশুতোষ আসিয়াছেন।

ভাবার্থ এই যে—সাক্ষাৎ হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপা গোপিকাগণের প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনধামে থাকিয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন, কাশীক্ষেত্রে সর্ব্বদা অন্নদানে নিরতা, যোগেশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণাদেবীর 'হর' যেরূপ আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আজ সেইরূপ শঙ্কর প্রতিম সার্ আশুতোষ, পরমাত্মস্বরূপা সতী যোগেশ্বরী সদৃশা পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদাসুন্দরী দেবীর ভবনে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, সভাসদ্বৃন্দকে সেইরূপ আনন্দিত করিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের রচিত শ্লোকটি ও তদানুষঙ্গিক ব্যাখ্যা এবং অপর কোন কোন মহদ্ব্যক্তি কর্ত্তৃক "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী" সভার মহৎ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা উক্ত রাণীমাতার উচ্চ জ্ঞান ও সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত কার্য্য কারণাদি প্রত্যক্ষ করিয়া, সভায় সমাগত কতিপয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক, রাণী মাতাকে বর্ত্তমান যুগের আদর্শ নারীস্বরূপে "যোগেশ্বরী" উপাধি প্রদানের সংকল্প করেন এবং ঐ সনের ২১ শে চৈত্র সেই পবিত্র সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া তিনি "যোগেশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

যোগেশ্বরী মাতা তীর্থবাস করা হেতু তাঁহার দান ও কৃত অনুষ্ঠান যে একমাত্র তীর্থক্ষেত্র মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে

বিপন্ন জনগণের দুর্দ্দশা শ্রবণে তাঁহার চিত্ত সততই বিগলিত হয়। অন্যান্য নরনারীগণকেও তিনি সেই ভাবে অনুপ্রাণিতা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। বিগত ১৩২৬ সনের ৭ই আশ্বিন ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে স্মৃতি অনেকেরই প্রাণে অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকাই সম্ভব। সেই ভীষণ বার্ত্তা শ্রবণে পরদুঃখ কাতরতায় তাঁহার চিত্ত এতই দ্রবীভূত হয় যে, কাশীধাম হইতে কেবলমাত্র স্বীয় সাধ্য শক্তি অনুরূপ অর্থ প্রেরণই তিনি কর্ত্তব্য শেষ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত তিনি কাশী হইতে প্রচুর অর্থ প্রেরণের চেষ্টায় অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে তিনি একটি মহিলাসভা আহ্বানার্থ যে অশ্রুসিক্ত পত্রিকা-খানি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সাত্ত্বিক আচরণপূর্ণ মানসিক ভাব প্রকাশ পাইবে। এ নিমিত্ত নিম্নে সেই মুদ্রিত পত্রখানি বিপন্নের সাহায্যে সাধারণের আদর্শ-যোগ্যরূপে প্রকাশিত হইল।

মহিলা সভার অনুষ্ঠান পত্র।

যথা বিহিত সম্মানপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন—

মহোদয়া! গত ৭ই আশ্বিন পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ ভীষণ খণ্ডপ্রলয় হইয়া অসংখ্য নরনারী অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে সে নিদারুণ সংবাদ সকলেই অল্পাধিক অবগত আছেন। তাদৃশ প্রলয়ের ভীষণ চিত্র সামান্য পত্রের ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। প্রকৃতির সেই ধ্বংসলীলাবসানে যাহারা কোনরূপে জীবনধারণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাও আজ নিঃসম্বল, অন্ন-বস্ত্রাভাবে নিদারুণ দুর্দ্দশায় নিপতিত; সেই দুর্দ্দশাপন্ন কোটী কোটী নরনারীর মর্ম্মভেদী করুণআর্ত্তনাদ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলেও সহৃদয়া মা, ভগ্নীগণ, অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই দারুণ বেদনা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের সেই শোচনীয় দুর্দ্দশা দৃষ্টে

দয়া পরবশ হইয়া অন্যান্য স্থানের নরনারীগণ বিপন্নের সাহায্য জন্য যথাশক্তি অর্থাদি প্রদান করতঃ নানারূপে সহানুভূতি প্রকাশে অগ্রসর হইয়া, সর্ব্বসাধারণের সাহায্যপ্রার্থীভাবে মনুষ্য জীবনের যে মহতী কর্ত্তব্যের আদর্শ আমাদের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন ; তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেক বঙ্গললনার নিকট নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র ও পাত্রী। সদাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও সাধারণের সাহায্য প্রার্থীভাবে সেই দুর্দ্দশা মোচনে আজ অগ্রসর। মা ভগ্নীগণ! এরূপক্ষেত্রে এই পুণ্যতীর্থ কাশীবাসিনী বঙ্গ রমণীগণের কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই ? আমরা কি নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তির সামান্য কণা অংশও সেই বিপন্ন নর নারীগণের সাহায্যে নিয়োগ করতঃ একটী মহাপ্রাণীর অন্ততঃ একবেলা জীবন রক্ষা করিতে পারি না ? আমার মনে সতত এই প্রশ্নটী উদয় হওয়ায়, আমি এই কাশীবাসিনী প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মহিলার সমবেত শক্তি ও সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য, আগামী ৫ই কার্ত্তিক বুধবার দিবা ৩।।০ ঘটিকার সময় মদীয় কুটীরে সকলের সম্মিলন প্রার্থনা করিতেছি। মহোদয়াগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্ব স্ব পুরমহিলাগণসহ সবান্ধবে এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বাধিতা করিবেন। নিবেদন ইতি।

১১ নং অহল্যাবাঈর ব্রহ্মপুরী, বিনীতা
৩ রা কার্ত্তিক ১৩২৬ সাল। শ্রীপ্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী।

প্রোক্ত মহিলা সভায় তিনি যে প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে, ইহার মধ্যেও তাঁহার সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ নিষ্কাম আদর্শ এই যে, নিজের প্রদত্ত ও সভায় সংগৃহীত অর্থ তিনি নিজের নামে প্রেরণ করিয়া একটা নাম কিনিবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি সমস্ত অর্থ (প্রেরণের খরচ নিজ হইতে দিয়া) কাশীস্থ বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটির হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক উক্ত কমিটির নামেই, বর্ত্তমান ভারতের আদর্শত্যাগী,

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন্ দাস (ব্যারিষ্টার) মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই ভাবেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এরূপ নিষ্কাম সাত্বিকভাব যে কতদূর সংযম ও সত্যে আদর্শরূপে অনুকরণীয়, সদ্বৃত্তি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বাপর এতাদৃশ প্রাকৃতিক বিপ্লবে সততই তিনি মুক্তহস্ত; অথচ নীরব নিষ্কাম।

আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভার অনুষ্ঠান পত্রের মর্ম্মমতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য তিনি দৈনিক এক টাকা করিয়া অদ্যাপিও দান করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন নিত্য পূজার নৈবেদ্যভাবে, অনেক নৈবেদ্য দৈনিক ভাবে অনেক বিধবাকে প্রদান করিয়া এবং কাহাকেও বা মাসিক নগদ বৃত্তি দিয়া, বহু বিধবার ৺কাশীবাসের সহায়তা করিতেছেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধানেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হয়; এজন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি চরকা টাকুয়া সুতা প্রস্তুত এবং তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইয়া ব্যবহার জন্য, স্বহস্তে সুতা কাটিয়া থাকেন। পরন্তু সেই আদর্শে সুতা কাটিয়া অশন বসনের সংস্থান জন্য বহু অনাথা, দরিদ্র, সধবা ও বিধবাকে বহু চরকা দান করিয়া তাহাদের কাশীবাসের সাহায্য করিয়াছেন; ইত্যাকার বহু প্রতিষ্ঠানেও তিনি চরকা দানের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও চরকা কাটার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি যে একমাত্র কাশীধামেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু অন্যান্য নগর ও পল্লীগ্রামে অনাথা হিন্দু বিধবাগণের জন্য ৺রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায়, এই যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অনাথা বিধবাগণ যাহাতে অপরের গলগ্রহ বা নীচবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে যোগশিক্ষা লাভ করতঃ পবিত্রভাবে জীবন রক্ষা ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে

মাতৃজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারে, সেই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তিনি এই যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাধন-তত্ত্বযুক্ত নিয়মাবলীতেই এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। সংযমপরায়ণ আত্মদর্শনেচ্ছুকগণ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহাতে যথা সম্ভব আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাহারও সুব্যবস্থা আছে। তবে তাঁহার বিশ্বাস যে, সর্ব্বাগ্রে নারীজাতি সংযমী ও প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যশীল এবং যোগানুশীলনে নিরতা না হইলে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে পুরুষজাতিকে সংযম ব্রহ্মচর্য্য ও যোগানুশীলনের পথে আকর্ষণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

এক্ষেত্রে আমিও বলিতেছি যে, যোগেশ্বরী মা! তোমার বাণীই সত্য। প্রকৃতি বা নারীশক্তি ভিন্ন এই আর্য্যসন্তানগণকে বিপন্মুক্ত ও রক্ষা করা নিষ্ক্রিয় পুরুষের সাধ্য নহে; তাহা ত জানাই আছে। মধুকৈটভ বধেও মা তোমার সেই যোগেশ্বরী নারীশক্তি, মহিষাসুর বধেও মা সেই যোগেশ্বরীশক্তি। ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ বধেও মা তোমার সেই যোগেশ্বরী শক্তিই মূল পরাপ্রকৃতিরূপে দেবগণকে সতত রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়েও সেই ব্রহ্মস্বরূপা যোগেশ্বরী নারীশক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা না হইলে যে, দৈববাণী মিথ্যা হয়; চণ্ডী মিথ্যা হয়। কারণ চণ্ডীতে উক্ত আছে যে, শুম্ভ সংহার অর্থাৎ ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ এই ষড়রিপু তুল্য ছয়টি মহাসুরকে সম্যকরূপ—আহরণ বা মুক্তি বিধানের পর (লৌকিক চক্ষে বধ্য) দেবতারূপ আর্য্যগণ যখন—

> "শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
> সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

শরণাগত দীন ও আর্ত্তজন ত্রাণকারিণী, সর্ব্বজীবের পীড়ানাশিনী হে দেবি! নারায়ণীরূপে তোমাকে বারম্বার নমস্কার পূর্ব্বক, দেবগণ তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনায়, স্বরূপ কথনে স্তব করিয়াছিলেন যে,—

"এতৎ কৃতং যৎকদণং ত্বয়াত্ম, ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈ র্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎপ্রকরোতি কান্যা॥"

হে মাতঃ! হে দেবি! তুমি অদ্য বহুপ্রকারে আত্মমূর্ত্তিকে নানারূপে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণের যে বধ সাধন করিলে, তাহা তুমি ভিন্ন (তোমার ন্যায় পরা প্রকৃতি ভিন্ন) আর কে করিতে পারে? তিনি দেবগণের এই প্রকার স্বরূপ সত্যবাক্যে সন্তোষ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছত।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥"

হে অমরগণ! আমি প্রীতা হইয়াছি, অতএব জগতের উপকারক যে কোন বর ইচ্ছা করিতেছ প্রার্থনা কর, তাহাই দিতেছি। তদনুসারে দেবগণও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—

"সর্ব্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্ বৈরি-বিনাশনম্॥"

হে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি! আমাদের যেমন শত্রু নাশ করিলে, এরূপ ত্রিভুবনের সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতাদৃশ বৈরী বিনাশ করাই যেন তোমার কার্য্য হয়। তদুত্তরে সেই মহাদেবী বলিয়াছিলেন যে—

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥

পুনশ্চাপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥"

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি পরিমিত যুগে (দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে) শুম্ভ নিশুম্ভ তুল্য (কংসাসুরাদি) দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে। তৎকালে আমি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিন্ধ্যাচল-বাসিনীরূপে, ঐ অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব। (সে সময় অতীত) অপরন্তু পুনরায় ঐ বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি পরিমিত যুগে (কলির মধ্যভাগে) যখন "বৈপ্রচিত্ত" নামক দানবকুলের প্রাধান্য সংঘটন হইয়া, ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইবে, তখন আমি সেই বৈপ্রচিত্ত দানব বংশকে ধ্বংস করিবার জন্য অত্যন্ত রৌদ্ররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইব। সুতরাং এখনই সেই সময় উপস্থিত। এই ত সেই চণ্ড্যুক্ত বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগ। এইত কলির মধ্যভাগ, এইত বৈপ্রচিত্ত দানবকুলের প্রাধান্যে ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্ত হইতেছে; এইত বৈপ্রচিত্ত অসুরগণের প্রতাপে সত্যধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া, মিথ্যায় সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, এখনইত সেই বৈপ্রচিত্ত—(বিপ্রচিত্ত শব্দ—ষ্ণ প্রত্যয়ে বৈপ্রচিত্ত) অর্থাৎ বিপ্ররূপী ব্রাহ্মণগণের চিত্তজাত দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ-পরতা ও মোহ নামক বৈপ্রচিত্ত-অসুরগণকে বধ বা বিনাশ করিবার জন্য, বর্ত্তমানে অতি রৌদ্ররূপে অর্থাৎ অত্যুগ্র ব্রহ্মতেজঃযুক্ত "আত্মজ্ঞান"-জ্যোতিতে, সেই মহাপ্রকৃতির আবির্ভাব সময় উপস্থিত; ইহা সেই দৈববাণী। সুতরাং মা যোগেশ্বরি! তোমার নারী শক্তি সেই মহাপ্রকৃতি। ("স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু") অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীজাতিই সেই মহাশক্তি। তোমাদের আত্ম বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আত্মজ্ঞান-উদ্বুদ্ধ হইলেই, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই মহাশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। উক্ত দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ-পরতা ও মোহ

নামক বৈপ্রচিত্ত অসুরগণই সত্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এ সময় তোমরা আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশে ঐ মিথ্যার আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্য প্রকাশিত কর। অতএব মা যোগেশ্বরি! তুমি এই সময়ে অন্যান্য মাতৃগণ সহযোগে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য—আচরণোদ্দেশ্যে "আত্ম-দর্শন-যোগ" আশ্রয় করিয়া, পূর্ণ-আত্ম-জ্ঞান-জ্যোতীরূপ অত্যুগ্র ব্রহ্মতেজ বলে, অনিত্য ভোগ-সুখ-পরায়ণ, দেহাত্মবোধী, বিপ্রচিত্ত-জাত অর্থাৎ বিপ্ররূপী ব্রাহ্মণাদির মানসক্ষেত্র-উৎপন্ন দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ-পরতা ও মোহনামক বৈপ্রচিত্ত অসুরগণকে সংহার করিয়া পৃথিবীতলে পুনর্ব্বার নারীশক্তির মহিমা ও সেই যোগেশ্বরী আদ্যাশক্তির মহিমা প্রচার কর। তোমরা ভিন্ন ঐ অসুরদলন অপরের সাধ্য নহে; সুতরাং এখন ঐ ব্রহ্মতেজে আবির্ভূতা হওয়া প্রয়োজন বিবেচনায়, কি মা! তুমি সেই মহাশক্তি ভবানীর ন্যায় নানাবিধ সদনুষ্ঠানে আত্মমূর্ত্তি নানাভাবে বিভক্ত করিয়া, "আত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা" ও "যোগেশ্বরী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" দেশময় প্রতিষ্ঠা করিতে, তোমার যথাসর্ব্বস্বশক্তি নিয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াছ। এই জন্যই কি ঋষিতুল্য দূরদর্শী বিদ্বদ্‌বৃন্দ তোমাকে নানাভাবে আশীর্ব্বাদাভিষিক্ত অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন যে—

"যাসীদ্রাণী ভবানী বিপুল ধনবতী দানশীলা সুমান্যা।
যা ত্যাগাৎ শীর্ষমান্যান্ দ্বিজবরনিকরান্ শাপদানম্প্রচক্রে॥
সা রাণী ব্রাহ্মণাদীন্ সকলগুণযুতান্ শাপমুক্তঞ্চ কর্ত্তুং
সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপা শিবশিবভবনেচাবতীর্ণা প্রমোদা॥"

উক্ত কবিতাটিমূলে কাব্যদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত তারাপদ কাব্যবিশারদ শাস্ত্রি মহাশয় শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার উদ্দেশ্যে "পঞ্চ পল্লব" নামে যে কবিতাটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বড়ই উচ্চ আদর্শ বিধায়, নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পঞ্চ পল্লব।

১

যাঁহার মহিমা এ ভারত জুড়ে
আজিও সকলে করিছে গান
যাঁহার তেজেতে ভারত দীপ্ত
এবে দিব্যালোকে অমরধাম।

২

বিপুল দানেতে আদর্শা রমণী
গুণ কুল শীলা অতি মহান্
যাঁহার কীর্ত্তি বারাণসীধামে
রয়েছে এখনও দেদীপ্যমান।

৩

যাঁর তেজস্বিতা-গৌরবে বঙ্গ
প্রাতর উত্থানে লইছে নাম
যাঁর অভিশাপে অজ্ঞানী দ্বিজ
নীচ প্রতিগ্রহে হতসম্মান।

৪

ভবানী তুল্যা সে রাণীভবানী
ছাড়িয়া কি পুনঃ ত্রিদিব ধাম
আসি কাশীধামে "যোগেশ্বরী"রূপে
বিতরিছে মুক্তি—"আত্ম-জ্ঞান"।

৫

বিধবার দুঃখ বিনাশিতে ব্রত
ব্রহ্মচর্য্যআশ্রম সু-প্রতিষ্ঠান
করেছেন যিনি নিষ্কাম দানে
"যোগেশ্বরী" প্রমোদা যাঁহার নাম

৬

এ "পঞ্চ পল্লব" শুভাশীষ রূপে
তাঁহার উদ্দেশে করিনু দান
হও দীর্ঘজীবী যোগেশ্বরী মাতঃ
(সাধ) যোগশক্তিবলে দেশ কল্যাণ!

শ্রীতারাপদ শর্ম্মা।

যোগেশ্বরী মাতার সত্যানুরাগপূর্ণ কার্য্যকলাপে যে দেশীয় সুধীবৃন্দই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেবলমাত্র তাহাই নহে। বিদেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণও ইহার অনন্যসাধারণ সংযম, ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত যোগানুশীলনতত্ত্ব অবগত হইয়া যে তাঁহার প্রতি সমধিক সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহাও একটি ঘটনায় বিশেষরূপ দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে তাঁহার গৃহে একবার কয়েকজন দস্যু প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন অপহরণের চেষ্টা করে।

তখন তিনি অন্যলোক ডাকিবার চেষ্টা করিলে, দস্যুগণ তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে, তাঁহার চীৎকারে লোকজন উপস্থিত হইলে, তিনটা দস্যু ধৃত হয়। কাজেই সরকার বাদীভাবে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইয়া ঐ মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের সাক্ষীভাবে তাঁহার জবানবন্দী আবশ্যক হয়, কিন্তু তিনি জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করেন; গবর্ণমেণ্টও ছাড়িবার পাত্র নহেন। এবম্প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমায় কমিশন জবানবন্দীর রীতি না থাকায়, পূর্ব্বে অনেক দেশপ্রসিদ্ধ বড় জমিদার ও রাজপরিবারস্থ মহিলাগণকেও পাল্কীতে কোর্টে যাইয়া জবানবন্দী দিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি সে ভাবেও পাল্কীর ভিতরে থাকিয়া জবানবন্দী দিতে এবং কাশীধামের পঞ্চক্রোশী মধ্যে বাস করিয়া জবানবন্দী দিতে ইচ্ছুক নহেন। অপরন্তু তাঁহার জন্য উপযুক্ত ভাবে পৃথক্ স্থানের ব্যবস্থা না হইলে এবং তাঁহার সঙ্গীভাবে উপযুক্ত সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপর সম্ভ্রান্ত মহিলা, চাকর, চাকরাণী, পরিচারিকা, দ্বারবান্ ইত্যাদি অনুগত ও সম্ভ্রান্ত লোকজন উপস্থিত থাকার সুব্যবস্থা না হইলে, তাঁহার পক্ষে স্থানান্তরে যাইয়াও জবানবন্দী দেওয়া অসম্ভব। এই সম্বাদ বিচারপতিকে পরিজ্ঞাত করা হইলে, তদানীন্তন সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেব বাহাদুর, উভয় কোর্টের বিচারকালেই বিচারপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ বিচার আসন এবং শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতা ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকজনকে যথাযোগ্য ভাবে তাঁবুতে অবস্থানের অনুমোদন ও তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, এক স্বাধীন রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মান ও তাঁহার বিশুদ্ধ ভাবোচিত পবিত্রতা রক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার প্রতি, তাঁহার অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মাচরণের প্রতি তাঁহার সত্যানুরাগ ও সৎসাহসের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। এতদ্ সম্পর্কে যে অভিনব নজিরের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্দ্বারা সদাশয় বিচারপতিদ্বয় ও যোগেশ্বরী মাতা, ঐতিহাসিক ভাবে

সর্ব্বত্র যশস্বী ও বিখ্যাত হইবেন। পরন্তু যোগেশ্বরী মাতার যোগবল প্রভাবে এবং সত্য ও সৎসাহসের বলে এরূপ ক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার অভিনব পন্থা যাহা সৃজিত হইল, বৃটিশ রাজত্বে এই সুবিচার এ দেশবাসী চিরকাল ভোগ করিয়া যোগেশ্বরী মাতাকে ধন্যবাদ করিবে।

সত্যের আদর্শ বর্ণনার উপসংহার কালে শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার সত্যানুরাগ, সৎসাহস, স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধির দৃঢ়তা ও তীর্থবাসের পবিত্রতা রক্ষণ বিষয়ক আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। কারণ সমাজ ও স্বধর্ম্মাচরণপক্ষে ইহা সত্যের উজ্জ্বল চিত্র স্বরূপে অতীব আদর্শনীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মহামুক্তিপ্রদ মহাশ্মশান ৺কাশীধাম-প্রবাসী বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দলাদলী সৃষ্টি বা সূচনা হয়। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ নানা ভাবে দেশ বিখ্যাত বড় বড় লোকের নাম সংযোজিত থাকিলেও সম্ভবতঃ অনেকেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে উহার ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়া, হয়ত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই, তাঁহাদের নাম সংযোগের অনুমতি দিয়া থাকিবেন। তজ্জন্য কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত নহে। এনিমিত্ত আমিও তাঁহাদের অনুষ্ঠানপত্রের প্রতিলিপি প্রকাশে বিরত হইলাম। আমার উদ্দেশ্য এই যে, একটি মহীয়সী জননীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও কর্ত্তব্যের দৃঢ়তার আদর্শ গ্রহণ। যাহা হউক উক্ত অনুষ্ঠান পত্র দ্বারা এবং লোকানুপ্রেরণায় যোগেশ্বরী মাতাকে তাঁহার স্বশ্রেণীমধ্যে দলবদ্ধ করাইবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঐ দলাদলীর অনুষ্ঠানে যোগদান না করায়, তাঁহাকে সমাজচ্যুত, অবশেষে লাঞ্ছিত ও নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এবম্বিধ ভয় প্রদর্শনেরও ত্রুটী হয় নাই। পরন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহার স্বশ্রেণীস্থ আত্মীয় কুটুম্বগণও সেই দলভুক্ত ও

সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেও, এরূপ ক্ষেত্রে সত্যরক্ষা কল্পে তিনি কিছুমাত্র ভীতা ও বিচলিতা না হইয়া, অদম্য সৎসাহসবলে ঐ অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ স্বরূপে, যে সংশোধন প্রস্তাব, সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্দারাই তাঁহার মানসিক অন্তঃস্তলের ভাবটি পর্য্যন্ত স্ফুরিত হইয়াছে। ঐ চিঠি-খানার অবিকল নকল নিম্নে আদর্শরূপে প্রকাশিত হইল।

২৫ নং

৺কাশীধাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের

মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সদনে।

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয় ; উক্ত সমাজ কর্ত্তৃক অদ্যকার সভাধিবেশনে যোগদান করার জন্য কতিপয় দেশ প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত এবং আরও কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর উল্লেখে গত ১২।৪।২৭ তাং মুদ্রিত একখানা অনুষ্ঠান পত্র আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তজ্জন্য অনুষ্ঠাতাবর্গকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু মাদৃশাজনের পক্ষে নানা কারণেই ঐসভায় যোদদান করা অসম্ভব বিবেচনায়, এতৎ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত নিম্নে জ্ঞাপন করা গেল।

১। অনুষ্ঠান পত্রের ১ হইতে ৬ দফায়, সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা এই পুণ্যক্ষেত্র কাশীবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের নূতন প্ররোচনার নামান্তর মাত্র। এতদ্দারা ধর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত উৎকর্ষতার পরিবর্ত্তে পরস্পরের একতা বিচ্ছিন্নকর একটি বিশেষ দলাদলীর সৃষ্টি হইবে। অদ্ধেতু এই সুদূরতীর্থ প্রবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও তথা কথিত যাবতীয় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ৺কাশীবাসের মূল উদ্দেশ্য ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া, জাতীয় শক্তি ধ্বংস ও মোক্ষপথের ঘোর অন্তরায় স্বরূপ এক প্রবল বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত হইবে।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ইহা জাতির পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যে অনিষ্টদায়ক কেবল তাহাই নহে; আমার বিবেচনায় ইহা ধর্ম্ম ও আত্মার পক্ষেও ঘোর সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। দেশে সর্ব্বসাধারণের জীবনরক্ষা উপযোগী অন্নবস্ত্রের অভাবে নিয়ত হাহাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর; শ্রুতিগোচর কেন অনুভূত হইতেছে। তন্নিবারণ কল্পে অনেক মহাত্মা ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে পরস্পর একতা ও সহানুভূতি সংস্থাপন জন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নানা প্রকার উদারতা প্রদর্শন ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। তাহা কি আমাদের আদর্শনীয় নহে? যে আমরা আমাদের মুক্তিক্ষেত্র কাশীধাম মহাশ্মশানে আসিয়াও সাম্প্রদায়িকতার বহ্বাড়ম্বরে আত্মশক্তি ধ্বংসের বিরাট অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

২। অনুষ্ঠানপত্রে "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ" একমাত্র স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর কোনরূপ সাহায্য করিবেন কি না? এবং তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় অর্থাদি কিরূপ ভাবে সংগ্রহ করা হইবে? তাহার কোন উল্লেখ নাই; এ বিষয় আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আমার শক্তি অনুযায়ী অপরের সাহায্য বা দানাদি সম্পর্কে কখনও ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিচার করি নাই। (ইহা মুক্তাগাছারও নিয়ম বিরুদ্ধ) বিশেষতঃ বর্ত্তমানে এই মহাশ্মশান ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে যতদূর সম্ভব সাত্ত্বিক ভাবের বিপরীতাচরণ করি, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। বিপন্নের সাহায্য সম্বন্ধে আমি জাতিভেদেরই সমর্থন করি না। আমার যৎসামান্য শক্তি অনুযায়ী এখানে দৈনন্দিন ভাবে যেসকল দানাদির অনুষ্ঠান আছে, তাহাও রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আপনাদের লিখিত প্রকারের কোন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে এখান হইতে কখনও বিফল মনোরথ হইয়া গিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। অপরন্তু আপনাদের ৩।৪।৫

দকার লিখিত কার্য্য সম্পর্কে কেহ এপক্ষ সন্নিধানে সাহায্য প্রার্থী হইলে যথাসম্ভব ভাবে তাহা সম্পূরণ জন্য চেষ্টায় কখনও কুণ্ঠিত হইয়াছি তাহাও মনে হয় না এবং আমিও ৫ দফার লিখিত কার্য্যানুষ্ঠানে জন সাধারণের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিতা হই নাই। এমতাবস্থায় আমার সংশোধন প্রস্তাব এই যে, এরূপ সম্প্রদায়গত একটি দলের সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্মগত নীতিগত উৎকর্ষ বিধান হইতে পারে, সেই মহানুদ্দেশ্যে এই শক্তি নিয়োগ করতঃ আসুন আমরা সকলে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হই; ইহাই আমার সবিনয় প্রার্থনা। এতৎ প্রতি আমি সভাস্থ সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিবেদন ইতি

১১ নং অহল্যাবাঈর ব্রহ্মপুরী, ২৫ শে শ্রাবণ ১৩২৭ বাঙ্গালা

বিনীতা
শ্রীপ্রমোদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী।

তীর্থের পবিত্রতা স্বধর্ম্ম ও সত্য রক্ষণে তাঁহার এই সৎসাহসপূর্ণ নির্ভীকতা অথচ দূরদর্শিতা পূর্ণ সংশোধক প্রস্তাব অর্থাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণজাতির উন্নতি বিধানের জন্য কর্ত্তব্যের দৃঢ়তাভাব, যে নারীর মনে সতত বদ্ধমূল, যিনি সত্যের অনুরোধে সমাজচ্যুত বা লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভীতি প্রদর্শন এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের বিদ্রোহিতায়ও কিছুমাত্র বিচলিতা হন নাই এবং সত্যকে পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি সত্যের অনুরোধে ধর্ম্মের রক্ষণে নানা প্রকার পীড়ন সহ্য করিয়া, সৎসাহসবলে অচল অটল থাকিয়া, নিজের স্বধর্ম্ম আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুক্তাগাছা জমিদার বংশের অর্থাৎ স্বামী শ্বশুরকুলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। (কারণ মুক্তাগাছার জমিদার বর্গের কুলগুরু বৈদিক শ্রেণী, পুরোহিতও প্রত্যেকেরই রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় শ্রেণী থাকা সত্বে, তিনি কি প্রকারে রাঢ়ী ও বৈদিক শ্রেণীর সহিত স্বীয় অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কর্ম্মে সম্বন্ধ বিরহিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন?) সুতরাং সর্ব্বপ্রকার

সত্যের অনুবর্ত্তিনী ভাবে তিনি যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শনারী স্বরূপে জগৎ পূজ্যা হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এহেন সদ্‌গুণশীল আর্য্যনারীর পক্ষে যোগেশ্বরী উপাধি "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" হইয়াছে। অবশ্য বারেন্দ্র সমাজ-নেতৃবর্গও পরিশেষে তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যোগেশ্বরী মাতার সংশোধক প্রস্তাব মূলেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, সমস্ত ব্রাহ্মণজাতি রক্ষা বা ব্রাহ্মণজাতির উন্নতি কল্পে ব্রতী হইয়াছেন; এজন্য তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র। সত্যের অনুরোধে এরূপ যাঁহারা ভ্রম সংশোধন করেন তাঁহারাও মহান্ সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা সত্য প্রণিধান ক্রমে সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার বর্ত্তমান যোগজীবন অবস্থায় তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য সমূহের কথঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক দৃষ্টান্তচ্ছলে "আত্ম-দর্শন-যোগে" বিবৃত হইয়া থাকিলেও, যখন সতন্ত্রভাবে আদর্শ-যোগ-জীবন লিখিত হইতেছে, তখন এস্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে ২।১টী বিষয় অবতারণা না করিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ হেতু আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। কাজেই তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈধব্যদশা হইতেই তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরায়ণা। অতঃপর যোগ-জীবন-পর্ব্বে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বত্যাগিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রারব্ধ সাপক্ষে দেহধারণ জন্য, ইষ্টদেবতা স্বরূপ ৺ঠাকুর ভোগের যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। লজ্জা নিবারণার্থে বল্কলস্বরূপে খাদি বা দেশীয় সাধারণ মোটা কাপড়ের গৈরিক আলখল্লা, শয্যা ও শীত নিবারণার্থে সাধারণ কম্বল ও মাদুর ইহাই মাত্র তিনি স্বীয় দেহরক্ষার পক্ষে প্রচুর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর যতকিছু অনুষ্ঠান, তৎসমস্তই পরার্থে অর্থাৎ দেব-দ্বিজ এবং আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণীগণের সেবা, বিপন্নের সাহায্য, দুস্থরোগীকে ঔষধ

বিতরণ, সাধু-সন্ন্যাসী ও দীন-দুঃখীকে যথাসম্ভব অর্থ ও শীতবস্ত্রাদি দান ইত্যাদি কুলোচিত সম্ভ্রমে সাত্ত্বিকভাব-যুক্ত স্বধর্ম্মরক্ষাই তিনি জীবনব্রত স্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি রাত্র ৩টার পরই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক গুরূপদিষ্টভাবে ধ্যানে নিমগ্না হন, অতঃপর সকাল ৭৷৮টার সময় গীতা ও চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করেন। গঙ্গাস্নান ও ৺বিশ্বনাথ দর্শনাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইলেও তিনি অতিরিক্ত ফলকামনায়, বার তিথি দেখিয়া কোন কার্য্য করেন না। তিনি ৺কাশীধামের প্রতিষ্ঠিত শিবমাত্রকেই ৺বিশ্বনাথ বলিয়া, মনে করেন, এনিমিত্ত তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠিত শিব অতিক্রম বা উপেক্ষা করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠিত শিবকেই একমাত্র বিশ্বনাথজ্ঞানে, ৺বিশ্বনাথকে সীমাবদ্ধরূপে মনে করেন না। তিনি গুরুকৃপালব্ধ যোগশক্তিবলে মানসক্ষেত্রে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই ধ্যান সেই জ্ঞানেই সর্ব্বদা বিভোর থাকিতে ভাল বাসেন। তাঁহার জীবনে তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন ও দেবতা পিঠ দর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যোগজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, মানসতীর্থ-জ্ঞান ভিন্ন, জঙ্গমতীর্থ ও স্থাবরতীর্থ বা ভৌমতীর্থাদি দ্বারা মনের একাগ্রতা বা চিত্তশুদ্ধি হয় না, পক্ষান্তরে ভেদবুদ্ধিই উৎপাদন হয়। এনিমিত্ত চিরজীবনই একমাত্র বাহিরে বাহিরে আর ঘুরিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি দেহাত্মবোধে চিরজীবন অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহকৃত বাহ্যাড়ম্বর অপেক্ষা আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-লক্ষ্যে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়াদিকোষের পন্থানুসরণ, যে আত্মত্রাণের বিশেষ উপযোগী ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত ধারণাবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্বধর্ম্ম রক্ষণে "সহজাত" কর্ম্মের অনুসরণ ভিন্ন বাহিরের বাহ্য আড়ম্বরে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া লোক চক্ষে ধর্ম্মপরায়ণা সাজিতে আর অভিলাষিণী নহেন। বাহ্যভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী তাঁহার মতে স্বতন্ত্র, তিনি তাঁহারই

অনুসরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মতে নিত্যকর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক, ৺ঠাকুরসেবা, ঠাকুরভোগ ও আশ্রমের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান নিজে পর্য্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণভোজনান্তে যৎসামান্য আহার গ্রহণ করিয়া, অত্যল্প সময় বিশ্রাম করেন। অন্ততঃ একঘণ্টাকাল চরকায় সূতা কাটা তাঁহার একরূপ নিত্যকর্ম্ম। বৈকালে তিনি আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও সমাগত মহিলাগণকে, "আত্ম-দর্শন-যোগ" সম্বন্ধে উপদেশ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রবণ ও পরষ্পর আলোচনাদি, তাঁহার দৈনদিন অন্যতম কর্ম্ম। সন্ধ্যারকাল হইতে পুনর্ব্বার তিনি নির্জ্জনে ধ্যানমগ্না হন। ইত্যাকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান নিয়া তিনি দিবা-রজনী অতিবাহিত করিলেও, কর্ত্তব্যপালন ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন সময় নিজের ষ্টেটের আয় ব্যয় নিজেই কর্ম্মচারীর নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া স্বয়ং কাগজ পত্র স্বাক্ষর করেন। প্রজাগণের অভাব অভিযোগ বা আবেদন প্রার্থনা পত্রাদি নিজেই পরিদর্শন ক্রমে, যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করেন। এবম্বিধ ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কর্ত্তব্যে তাঁহার উপেক্ষা বা অবহেলা নাই। অথচ নিজে সংসার নির্লিপ্তা, সর্ব্বত্যাগিনী ও যোগনিরতা। তাঁহার ষ্টেটের প্রজাগণ তাঁহার দয়ায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; তাঁহাদের মধ্যে জলকষ্ট বা দৈন্য-দুর্দ্দশা নাই, এজন্য সকলেই যোগেশ্বরী মাতাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার বহুগুণাবলী আছে, কিন্তু পুস্তকের কলেবর আরও বৃদ্ধি হয় বলিয়া এইখানেই বিরত হইলাম। ভবিষ্যতে যিনি এই আদর্শ মহিলার জীবন-চরিত লিখিবেন, তিনিই তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবেন। "যোগেশ্বরী-সাধন-সঙ্গীত"গুলি তাঁহার যোগ-জীবনে পূর্ণ আদর্শ।

অলমিতি।

আত্ম-দর্শন-যোগের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া যেসকল মহাত্মা তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন এস্থলে তাহার ২।৪ খানা প্রকাশিত হইল।

স্থানীয় পত্রিকা "প্রবাস জ্যোতিঃ" ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় "কাশীগেজেট" লিখিয়াছেন যে—

"আত্ম-দর্শন-যোগ"

বঙ্গসাহিত্য নানাদিক দিয়া নানালঙ্কারে ভূষিতা হইলেও, যোগের দিক দিয়া তাহার অভাব ও অসম্পূর্ণতা একবাক্যে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যোগসংক্রান্ত সহজ ও কঠিন সকল বিষয় পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষার্থিগণের প্রণিধানযোগ্য হয়—এমন একখানি আদর্শ-যোগ-বিজ্ঞানের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, এতদিনে সেই অভাব নিরাকরণের সূচনা ঘটিয়াছে।—কাশীর স্বনামখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত পরমনিষ্ঠাবান্ যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী তাঁহার যুগব্যাপী সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে "আত্ম-দর্শন-যোগ" নামে এক অপূর্ব্ব বিরাট যোগ-দর্শন রচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের চূড়ান্ত অবদানরূপে যাহাতে ইহা জনসমাজে সমাদৃত হয় ও যোগানুরাগী সর্ব্বসম্প্রদায়ের আদরণীয় হয়, স্বামীজী সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ বিরাট গ্রন্থ এখন যন্ত্রস্থ। যাঁহারা

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামীজীর নামে ১১ নং অহল্যাবাঈ ব্রহ্মপুরী, বেনারস সিটী—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হইবেন।

মুক্তাগাছার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেটের ও পাইকপাড়া রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী যিনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি সাত আটটি ভাষায় সুপণ্ডিত, সেই স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাবান্, সমাজসংস্কারক বেদাধ্যায়ী, সত্যপরায়ণ, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় বেদবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছে—

"আত্ম-দর্শন-যোগ"

শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত। "আত্ম-দর্শন" অভাবে আর্য্যসন্তানদিগের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান সময়ে অধঃপতন ঘটিয়াছে। "আত্ম-দর্শন-যোগে" যাহাতে তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়, পূর্ব্বগৌরব পুনঃ সংস্থাপিত হয়, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত দাসত্ব করিতে না হয় এবং ইহজীবনে সুখশান্তিভোগ করিয়া পরিণামে মোক্ষলাভ হয়, ইহাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত স্বামী মহাশয় যতদূর যত্ন করিতে হয় করিয়াছেন, কোন প্রকারে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। যে রকমে যত প্রকারে সহজে আত্মজ্ঞান ও আত্ম-দর্শন হয়, তাহা তিনি নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছেন। যোগ সম্বন্ধে আমাদের যে সকল দর্শনাদি শাস্ত্র আছে, তাহা জটিল। অধিকারী গুরুর অভাবে বর্ত্তমানে তাহার সম্যক্ পঠন পাঠন হইতেছে না; সুতরাং উহা পাঠে শব্দবোধ ভিন্ন অন্য কোন ফল হইতেছে না। কিন্তু এই গ্রন্থে স্বামী মহাশয় তাঁহার নিজের অনুভূতি দ্বারা সকল বিষয় সরল ভাষায় এমন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই

পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন অন্তর্দৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্যদৃষ্টি বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই ; সেইজন্য যাহা কিছু বাহ্যপূজা, যাহা কিছু নিত্যকর্ম্ম অভ্যাস ; সমস্তই অন্তর্দৃষ্টি হইতে লাভ করিতে হইবে।

পুস্তকখানি পাঁচটী স্তরে বিভক্ত এবং এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, 'সাধক যেন তাঁহার বিশুদ্ধ ভাবসত্ত্বাকে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া তাঁহার আত্মপদার্থ ব্রহ্মে লয় করিতে সমর্থ হন ;" গ্রন্থের তত্ত্ব-বিভাগ-প্রণালী অদ্ভুত, ইহার সঙ্গে সূচী ও পরিশিষ্ট বিষয় যাহা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই সাধক পাঠক বুঝিতে পারিবেন গ্রন্থকার আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তত্ত্ব সমূহ কিরূপ বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গযোগ (প্রাণায়ামাদি) মানসপূজা, গঙ্গাস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, সূক্ষ্মশরীর ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্য কোন পুস্তকে দৃষ্ট হইবে না। এইরূপ শাস্ত্রবর্ণিত অনেক বিষয়ের এবং এতদ্ভিন্ন কলি, উপবাস, নাস্তিক্যবাদ, আস্তিক্য ও ৺কাশীতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন ভাব এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহা পাঠ করিলেই সেই সমস্ত কথা সিদ্ধ পুরুষের বাণী বলিয়াই উপলব্ধি হইবে।

বেদ ও তন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচার প্রণালী অসাধারণ ও সিদ্ধান্ত একান্ত অদ্ভুত। ব্রাহ্মণ সতত বৈদিক আচারে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিবেন, তন্ত্রোক্ত আচারসমূহ বেদানুমোদিত হইলেই ব্রাহ্মণ তাহা নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তঃকরণে প্রতিপালন করিবেন। তান্ত্রিকগণ বেদ বহির্ভূত আচার অবলম্বনে কিরূপে কুপথগামী হইয়া থাকে ও আত্ম-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত হয় এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থাও গ্রন্থকার বিশেষ ভাবে এই পুস্তকে নির্ণয় করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিশেষে যোগ সিদ্ধি সম্বন্ধে তিনি সাধনা ও সিদ্ধিলাভের উপায় এবং ক্রিয়াসমূহ এরূপ বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কোন ধর্ম্মপ্রাণ

সাধক সেই সমস্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ক্রিয়াতৎপর হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যেন, সম্মুখেই এক অখণ্ড মণ্ডলাকায় জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ, তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইবার জন্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এই জন্যই গ্রন্থ-প্রণেতা স্বামীজি মহারাজ গ্রন্থের নাম "আত্ম-দর্শন-যোগ" রাখিয়াছেন, কেন না তিনি "আত্ম-দর্শন" অবস্থাকেই প্রকৃত যোগাবস্থা বলেন, অন্য সকল অবস্থাই তাঁহার মতে বিয়োগ অবস্থা বা আত্ম-পদার্থের অস্বাভাবিক অবস্থা।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, এই পুস্তক পাঠে স্বধর্ম্মপরায়ণ নরনারী মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবেন। সাধন তত্ত্বের নিখিলরহস্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট দেখিবেন; সাধনা রাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব ও সিদ্ধিলাভের সহজপন্থা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইবেন। অলমিতি

৺কাশীধাম
২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩০। } স্বামী শঙ্করানন্দ সেবক।
S. Bharaty

জিলা ময়মনসিংহের ৺"মহারাজ সূর্য্যকান্ত ষ্টেটের" ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, "ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থপ্রণেতা; পরমনিষ্ঠাবান্ তাপসরত্ন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী বিএ, বিএল; মহাশয় "আত্ম-দর্শন-যোগ" পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আত্ম-দর্শন-যোগ"

যোগেশ্বরী শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার যোগাশ্রমের ও "আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা"র প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী মহাশয় কর্তৃক "আত্ম-দর্শন-যোগ" নামক গ্রন্থ রচিত।

আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ বিশেষ আনন্দ ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের